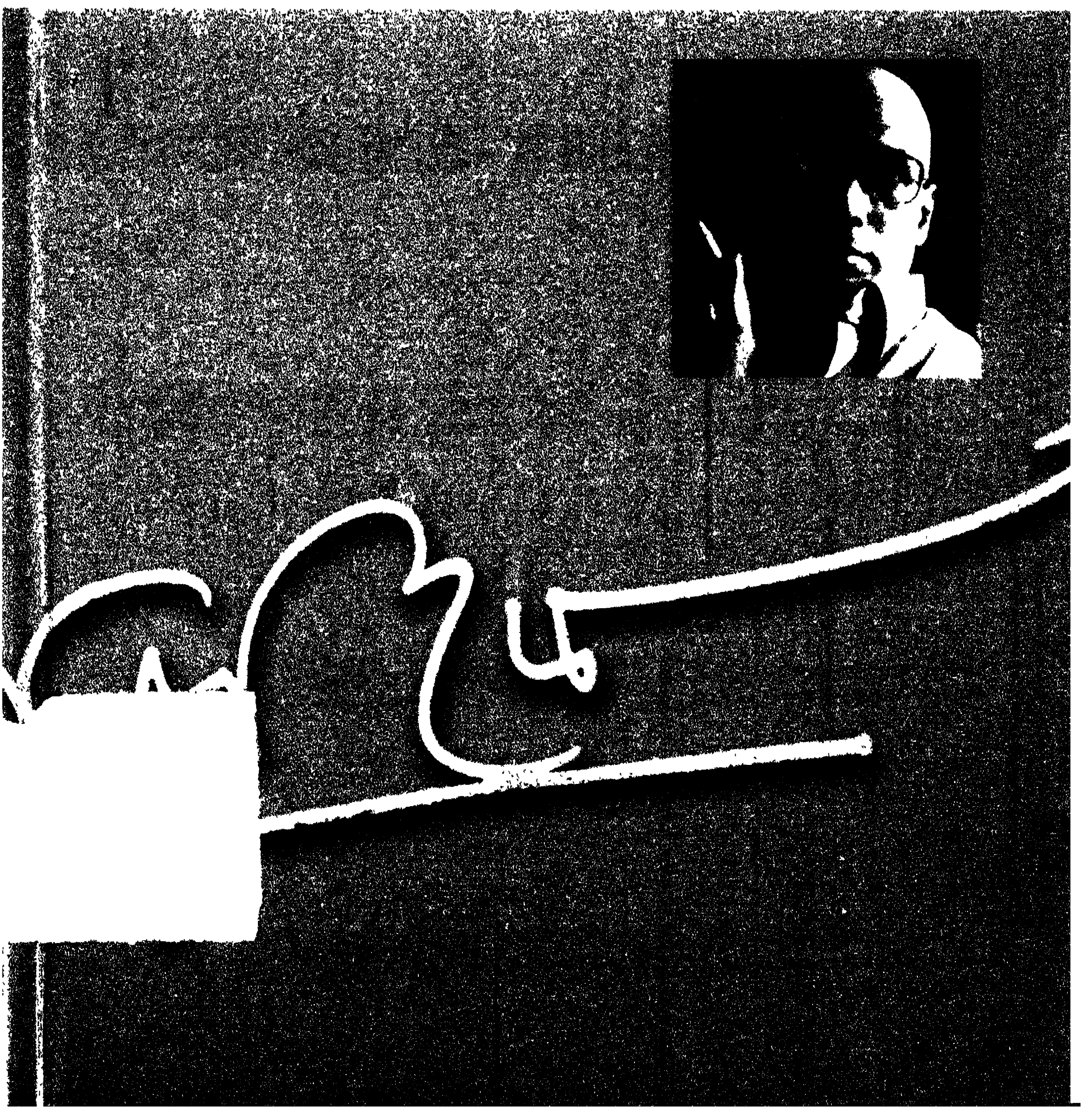
সৈয়দ শামসুল হক

উপন্যাস সমগ্র

২



উপন্যাস সমগ্র ২

উপন্যাস সমগ্র ২

সৈয়দ শামসুল হক

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | কলকাতা বইমেলা ১৯৫৯

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৫০৪২২৬, ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ২৫০ টাকা

Upanyash Samagra 2 | By Syed Shamsul Haq
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Dhruba Eash
Price : Tk 250 only
ISBN : 984-8160-59-0



সূচিপত্র

সবিনয় নিবেদন

আমার বাবা ডাঃ সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন বড় উচ্চাশা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন চিকিৎসক হবার জন্যে। ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে; কিন্তু পীর পরিবারের সন্তান হবার দরুন, ইংরেজি লেখাপড়ায় অনুমোদন তিনি পাননি তাঁর পিতা সৈয়দ রইসউদ্দিনের; ফলে আমার বাবাকে সেই স্কুল জীবন থেকে একইসঙ্গে জীবিকা উপার্জন ও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হচ্ছিল।

কলকাতায় এসে, তিনি ওখানকার বৈঠকখানা রোডে এক বই বাঁধাইয়ের দোকানে কাজ করতেন ও মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন। কিন্তু বই বাঁধাইয়ের মতো কঠিন শারীরিক শ্রম ও মেডিক্যালের পড়াশোনা চালিয়ে যাবার একাগ্র সময় তিনি কিছুতেই মেলাতে না পেরে, একদিন একেবারে ভগ্নদ্যোম হয়ে, মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে দেন এবং হোমিওপ্যাথিক পড়তে শুরু করেন। কিন্তু ওই যে তিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, সেখানে প্রথম দিনের ক্লাশে ইংরেজ এক শিক্ষকের একটি কথা তিনি কখনোই ভুলতে পারেননি।

কথাটি পরবর্তীকালে বালক আমাকে বহুবার তিনি বলেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হোমিও রইসি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদেরও তিনি বলতেন; সেই কথাটিকে আমি আমার লেখক জীবনের বীজমন্ত্র হিসেবে আজো দেখি।

ইংরেজ সেই শিক্ষকটি বলেছিলেন : ভালো ডাক্তার হতে হলে চাই তিনটি গুণ– সিংহের হৃদয়, ঈগল পাখির চোখ এবং নারীর হাত।

আজ আমি যখনি কলম ধরি, স্মরণ করি কথাগুলো।

একজন লেখকেরও হৃদয় হবে সিংহের মতো, হবে সে অকুতোভয়; চোখ ঈগল পাখির মতো, কোনো কিছুই দৃষ্টি এড়াবে না তার; হাত হবে নারীর মতো মমতাময়, জননীর মতো কল্যাণমাখা।

বলতে পারি, ওই তিন থেকে আমি সজ্ঞানে কখনো সরে আসিনি।

আর আমার পরম শোক এই যে, আমার প্রথম বইটি বেরুবার আগেই, আমার মাত্র আঠারো বছর বয়সে, ১৯৫৪ সালে বাবার দেহান্ত ঘটে। বেঁচে থাকলে, আর কেউ না হোক, তিনি অন্তত অনুভব করতেন, তাঁর ওই বীজমন্ত্রটি কীভাবে আমি আজো ধারণ করে চলেছি– কবিতায়, গল্প-উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে– এবং বাংলার মানুষের জন্যে রাজপথেও।

উপন্যাস সমগ্রের এই দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হলো আমার চারটি রচনা :

জনক ও কালোকফি, সীমানা ছাড়িয়ে, রক্তগোলাপ এবং খেলারাম খেলে যা।

প্রথম তিনটি রচনাই ষাটের দশকের; শেষ রচনাটি ষাটের দশকের একেবারে শেষ প্রান্তে লেখা এবং সত্তরের দশকের শুরুতে পরিমার্জিত ও সমাপ্ত।

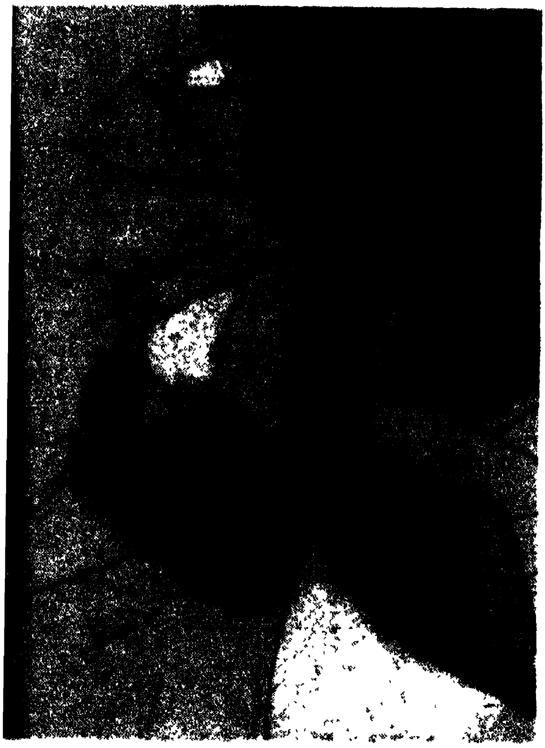
মনে পড়ে, জনক ও কালোকফি আমি নিজেই একবার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলাম 'দা ড্রিমইটার' নামে, প্রকাশিত হয়েছিল ষাটের দশকেই বাংলা একাডেমীর ইংরেজি সাহিত্যপত্রে।

মনে পড়ছে, রক্তগোলাপ লিখেছিলাম এক রেস্তোঁরায় বসে– সকাল থেকে এক টানে প্রায় মধ্যরাত অবধি।

আজকাল লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে যাদু-বাস্তবতা বলে একটি ধারা সনাক্ত করা হয়। পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন রক্তগোলাপ লেখাটি দেখি, তখন আবিষ্কার করে বিস্মিত হই, ঘটনা-বিন্যাস ও কল্পনার 'যাদু' আমি সেই ১৯৬৩ সালেই ব্যবহার করেছিলাম, তবে, এই যাদু নির্মাণের সুত্রটি কিন্তু পেয়েছিলাম আমাদেরই রূপকথা ও ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে। একালের সদাব্যগ্র সমালোচকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই– বাংলা সাহিত্যে এই যাদু-বাস্তবতার নির্মাণ ছিল বহুশত বৎসর পূর্ব থেকেই।

সৈয়দ হক

ঢাকা



জনক ও কালোকফি

আমাকে আবার ফিরে আসতে হলো। নিশাতের সঙ্গে আমার কখনো যদি দেখা না হতো তাহলে আসতাম না। নিশাত না হয়ে অন্য কেউ হলে কী হতো জানিনে। নিশাত এতদিন আমার কাছে কাছে, ওকে ছাড়া এই যে আমি আর কিছু ভাবতে পারিনে, এই যে আমার সব কাজ, সব ভবিষ্যতের মধ্যে কেবল নিশাতের মুখ দেখতে পাই— তবু এতদিন এখানে ফিরে আসার কথা মনে আসেনি। আজ আসতে হলো।

মা'র কাছে আমি ছাব্বিশ বছর পরে ফিরে আসছি। নিশাত বলেছে, আমার বউ হতে ওর কোনো আপত্তি নেই।

বউ ? আমার বউ ? চব্বিশ ঘণ্টা আমার শয়নে জাগরণে তন্দ্রায় কি স্বপ্নে একটা মেয়ে থাকবে। যেখানেই যাই না কেন, ফিরে এলে ঘরে দেখব একটি মুখ, হাসিতে খুশিতে ভরা; খামের মধ্যে উঁকি দেয়া চিঠির মতো উৎসুক একটি মেয়ে। তাকে সকালে দেখব সবুজ পেস্ট ব্রাশে লাগিয়ে দাঁতে ঘষে ঘষে ফেনা তুলে দাঁত মাজছে; দেখব ভিজে চুলে একাকার হয়ে এক পায়ে স্যাণ্ডেলে গলাতে গলাতে বেরিয়ে আসছে বাথরুম থেকে; দেখব অবেলা দুপুরে ঘুমে লালায় ভিজিয়ে তুলেছে বালিশের কোণ— চকচক করছে ঠোঁট— গালে ভাঁজ পড়েছে লাল ফিতের মতো— মুখ দেখাচ্ছে নতুন তুলোয় তৈরি যেন; দেখব খাটের কোণে পা ঝুলিয়ে হাসতে হাসতে সে খুন হয়ে যাচ্ছে; দেখব রাতের অন্ধকারকে খুব ভয় করে আমার মুখের 'পরে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বলছে— এই ওঠো না, আমি একটু বাইরে বেরুবো। বউ ? আমার বউ ? নিশাত আমার বউ হয়ে আসবে, আসতে পারে যদি আমি তুলে নিই, বলেছে।

যেন একটা সরোদ হঠাৎ সোনার কমলের মতো বিরাট এক ফুল তৈরি করতে লাগল আমার বুকের মধ্যে, চোখের 'পরে, যখন কথাটা শুনলাম। আমরা, আমি আর নিশাত, তখন স্কুটারে মোহাম্মদপুর থেকে শহরের দিকে আসছি। সন্ধ্যেটা কেবল হয়েছে, বাতিগুলো তখনো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা তখনো রাস্তায়। আর একটা লাল মেঘ নতুন শালের মতো ঝকঝক করছে পশ্চিম আকাশে।

নিশাত থাকে মোহাম্মদপুরে। ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের দেখা হতো বড্ড মজা করে। বড় রাস্তা থেকে সুরকি ঢালা সরু একটা গলি চলে গেছে কাঁঠাল গাছের তলা দিয়ে ডানদিকে, মাঠের সঙ্গে মিশেছে। মাঠ পেরিয়ে বর্ষার পানি ভরা ডোবা। সে ডোবার পাড় দিয়ে ভিজে এঁটেল মাটি পেরিয়ে বাঁদিকে বেড়ায় ঢাকা টিনের ছোট্ট একটা বাড়ি। নিশাতদের। ওর ভাইজান '৫০ সালের রায়টের পর কলকাতা থেকে এসে কিনেছিল। ওর ভাবীর ছোট্ট ছেলে খোকনটাকে সারাদিন চোখে চোখে রাখতে হয়, কখন পানিতে পড়ে; পানির দিকে ওর এত লোভ, ছাড়া পেলেই টলমল করতে করতে ডোবার পানিতে গিয়ে মুখ দেখাবার চেষ্টা করবে। সেবার ওপাশের রায়হানরা দেখেছিল, নইলে ঠিক মরতো। আরেকবার নিশাতের বুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুপুরে। নিশাতও। কখন যে উঠে গেছে জানে না। ভাবী খুব বকেছিলেন নিশাতকে। কাঁধের ব্যাগটা ঘোরাতে ঘোরাতে নিশাত আমাকে বলেছিল, বাবারে বাবা এত দুষ্টু। আমার নিজের ছেলে হলে মার খেয়ে মানুষ হতো। নিশাতের মুখে 'নিজের ছেলে' শুনে অবধি ধুক করে উঠেছিল আমার ভেতরটা। তখনো নিশাতকে বলিনি, ওকে আমি বিয়ে করতে চাই। মেয়েদের সম্পর্কে গল্প-উপন্যাস-সিনেমা থেকে আর বন্ধুবান্ধবের কাছে মেলারকম শুনে শুনে একত্রিশ বছর বয়স করেছি। শুনেছি, ওরা নাকি বড় চাপা, মুখে কিছু বলবে না, যদি বলে তো আকারে বলবে, ইঙ্গিতে বলবে,

নীরব চোখে নাচন তুলে জানাবে, কথায় কখনো না।

খুব স্পষ্ট মনে আছে আমার, সেদিন নিশাতের মুখে 'নিজের ছেলে' কথাটা আমাকে বেশ চঞ্চল করে তুলেছিল। তারপর নিশাত যে সারক্ষণ বকবক করে কী বলেছিল কিস্‌সু আমার মাথায় যাচ্ছিল না। আমার চোখের ভেতরে আমি যে সমস্ত জিনিস ভালোবাসি, যেমন নতুন চাদর, লাল ফুল, সিনেমার বড় বড় পোস্টার, স্টেডিয়ামের মোড়, নিশাত— এই জিনিসগুলো অর্থহীন কারণহীন একটা নাচ করছিল। ঘুরে ঘুরে, একটার গায়ে আরেকটা গড়িয়ে পড়ে আমাকে তন্ময় করে রাখছিল। আর কার যেন সুন্দর গানের মতো একটা তান শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই তানের ভেতর থেকে পাড়ের বুনোনের মতো একটা ছলোছলো আবছা হাসি শুধু। আর কিচ্ছু না। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি বড় রাস্তা থেকে সুরকি ঢালা গলির মুখে কাঁঠাল গাছের নিচে আমি একা দাঁড়িয়ে। আর নিশাত চলে যাচ্ছে। তার পেছনটা শাড়ির ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন, একটা অতিকায় ফুলদানির মতো দেখাচ্ছে। তখন মনে পড়ল, একটু আগেই তো নিশাত বলল, 'আমি যাচ্ছি' আর আমি বললাম, আচ্ছা।

যে কথা বলছিলাম। নিশাতের সঙ্গে আমার দেখা হতো বড্ড মজার। গলিটার মুখে একটা নতুন ওঠা দোতলা বাড়ি, তার সামনের জমিতে টিনের একটা শেড তুলে দিয়েছে বাড়িওলা। শেডের মধ্যে তিনটে দোকান। একটা লন্ড্রী। একটা মুদিখানা। আর এপাশে চায়ের দোকান। চায়ের ওখানে আমি এসে বসি বাস থেকে নেমে। একা যখন আসি তখন বাসে। নিশাতের সঙ্গে বেরুতে হলে স্কুটার। স্কুটারে চাপতে আমার খুব ভালো লাগে। হেলান দিয়ে বসে, একটা হাত সিটের মাথায় বিছিয়ে, ঝরঝর ভট্‌ভট্ করতে করতে পীচঢালা রাস্তা দিয়ে দালান ইস্কুল পেট্রলপাম্প সায়েন্স ল্যাবরেটরী পেছনে ফেলে নিউ মার্কেটের মোড়ে শোঁ-ও করে বাঁক নিয়ে চলতে আমার ভারী আনন্দ। নিশাতের আগে মাথা ধরে যেতো স্কুটারের ঐ কটকটানিতে। আজকাল কিছু বলে না। মেয়েরা নাকি যাকে ভালোবাসে তার অপছন্দটাকেও পছন্দ করে নেয়। আমার এটা ভালোই লাগে যে নিশাত আমার স্কুটার চাপার আনন্দটাকে নিজের কষ্ট তুচ্ছ করে বড় করে দেখছে। এতে হাতেনাতে একটা প্রমাণ পেয়ে যাওয়ার তৃপ্তি হয় আমার যে নিশাত আমাকে ভালোবাসে।

সেই চা-দোকানে বসে থাকব। বসে বসে এক কাপ চা আর অনেকগুলো সিগারেট খাবো। এইসব সাংঘাতিক মিষ্টি আর কাঁচা দুধের গন্ধ ধরা চা খেতে একটুও ভালো না, তবু। দেয়ালে অনেকগুলো ক্যালেন্ডার। কোনটাতে সিনেমা স্টারদের ছবি, কোণে সাবানের নক্সা, আবার কোনটাতে ঝিল পাহাড় কী নদীতে পাল তোলা নৌকার রঙ্গিন সিনারি। দোকানে টেবিলের ঢাকনা থেকে দুপুরে খেয়ে যাওয়া মাছ তরকারির আঁশটে ভিজে ভিজে গন্ধ দেবে। পেছন থেকে অবিরাম গ্লাশ বাসন কাপ ধোয়ার টুংটাং ছলছলাৎ শব্দ আসবে। বিকেলটা নামতে থাকবে থিয়েটারের স্ক্রীনের মতো দুলতে দুলতে। ইট বোঝাই একটা দু'টো ট্রাক এসে দাঁড়াবে। মাল খালাশের হুল্লোড় শোনা যাবে সারাক্ষণ। তারপর দোকানের রেডিওটা খুলবে ওরা। পাঁচটা বাজেনি। এক মিনিট কী দু'মিনিট বাকি। রেডিও থেকে একটানা সিগনেচার টিউন আকাশ বাতাস জুড়ে বড় বড় আঁচড় টানছে যেন। হঠাৎ সেটা থেমে যাবে। ঢং ঢং করে বাজবে ঘণ্টা। শোনা যাবে অনুষ্ঠান আরম্ভের ঘোষণা। আর তক্ষুণি দেখতে পাবো নিশাত গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তাটা দিয়ে খুব আনমনা হাঁটছে। তার কাঁধের ওপর বড় খোঁপা থেকে কী একটা শাদার ওপর পড়ন্ত সূর্যের আলো ঝিলিক দিয়ে দিয়ে উঠছে; হেয়ার

পিনের রূপোলি তীরটা, নয়ত জরির শাদা রিবন। তখন আমি উঠে দাঁড়াবো। হাঁটতে হাঁটতে যখন দেখব নিশাত ইস্কুলের কাছে চলে গেছে, তখন কাছে গিয়ে দাঁড়াবো। দেখেই নিশাত হাসবে। বলবে, কতক্ষণ? বলবো, এইতো, এইমাত্র।

নিশাত কলেজে পড়ায়। বলে, আমি একটা লেকচারার। রাস্তার মোড়ে দোকানগুলোতে কী সব আড্ডা। দু'জনকে দেখলে খামোকা হি-হি করবে। তাই বেশ খানিকটা দূরে না গেলে দেখা হয় না। আমার অবশ্যি এসব বালাই নেই। এক এ্যাডভোকেটের জুনিয়র আমি; মক্কেলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবার সময় আসেনি। তাছাড়া, রাস্তায় কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখবে আমার মক্কেল, দেখুক— পুরুষদের এ ব্যাপারে সুবিধে অনেক, বদনাম কম। ও নিয়ে মাথা ঘামাইনে। নিশাতের দিকটা ভাবতে হয়। বাড়িতে যেতে পারি, যেতে দেবে না ও। বলবে, ভাইজান আমাকে খুব ভালোবাসে। কিছু বলবে না তোমাকে। তবু যাবে কেন? এটাও আমি বুঝতে পারি। লজ্জার অবকাশ রাখতে চায় নিশাত, ভয় নেই তবু ভয়কে কল্পনা করতে চায় মেয়েটা। ভাবতে চায়, তার ভালোবাসায় বাধা অনেক, বিপদ বহু। লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি করছে, সংসারের একমাত্র মাথা বড় ভাই প্রশ্রয়ে আদরে বোনকে গড়ে তুলেছেন— তবু, তুব নিশাত তার হৃদয়ের ব্যাপারে যেন কল্পনা করে নিজেকে সেই মেয়েটির মতো যাকে থাকতে হয় চার দেয়ালের মধ্যে, বেরুতে হয় লুকিয়ে, কথা বলতে হয় ফিসফিসিয়ে। বেড়ালের পায়ের শব্দে শাদা হয়ে যেতে হয় ভয়ে। আমি এটা প্রথমে বুঝিনি, বুঝেছি অনেক পরে। কিন্তু নিশাতকে বলিনি। আমার ভাবতে ভালো লাগে, নিশাতের একটা কথা জানি যা নিশাত জানে না আমি জানি। ভারী একটা বোকা ছেলেমানুষের মতো লাগে তখন নিশাতকে। যেন খেলনা-টেলনা কিনে দেয়া যাবে টানতে টানতে মেলায় নিয়ে গিয়ে।

ক'দিন আগে আমার সিনিয়র কাজি সাহেব একটা খুনের কেসের আসামিকে বেকসুর খালাস করিয়ে দিলেন। জুনিয়র ছিলাম আমি আর শরিফ। দু'জনে কিছু মোটা টাকা পাওয়া গেল। সিনিয়র আমার কাজের খুব প্রশংসা করলেন বাসায় একা ডেকে। তাঁর ছোট শালী রুমি থাকত এ বাড়িতে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে এবার। রুমি চিড়ে ভাজা আর চা এনে রাখলো। আড়চোখে তাকাল একবার আমার দিকে। চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে উঠলো হাসি। ছুট্ দিল ভেতরে।

মেয়েটা কালো, নাকটা কেমন ছড়ানো, পাতলা ঠোঁট, শরীরটা ছিপছিপে, ভালো করে কাপড় পড়তে জানে না, রংও চেনেনা। সবুজ শাড়ি পরেছে। ভারী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। কিন্তু খুব চঞ্চল। ঐ চঞ্চলতাটুকুর জন্যে একেক সময় আমার ভালো লাগে। কোন কোন দিন একটু দেখতেও ইচ্ছে করে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর আর মনে থাকে না। আবার একেকদিন আমার সিনিয়রের পুরনো ফোর্ডে চেপে কোর্টে যাবার পথে রুমি এসে সামনে বসে। সে কলেজে যাবে। সারাক্ষণ তার ভিজে ভিজে বেণি দু'টো বড্ড ভারী আর নির্জীব দেখাবে, তেলে মলিন লাল ফিতেটা থেকে কী কোথা থেকে একটা জ্বালা ধরানো গন্ধ বেরুবে। মেয়েটা আমার সিনিয়রের লায়াবিলিটি। শ্বশুর মারা যাবার সময় জামাইর হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলে শরিফ বলছিল। শরিফকে বলেছিলাম, তুমি বিয়ে করো। উন্নতি চড় চড় করে হবে। ভদ্রলোকও বাঁচবেন। তোমার নতুন করে এস্টাবলিশমেন্টের খরচ আর লাগবে না। শুনে শরিফ নাক সিটকে ওয়াক করে নাটকীয় ভঙ্গিতে থুতু ফেলে বলেছে, তোবা

তোবা। তুমি থাকতে আমি ? ময়ূর থাকতে দাঁড়কাক ?

ব্যঙ্গচ্ছলে শরিফ নিজেকে দাঁড়কাক আর আমাকে ময়ূর বলেছে। উপমাটা বেজেছে কিন্তু আমার অন্যখানে গিয়ে। রুমি আর নিশাত। নিশাত আমার ময়ূর।

এটা একটা মুশকিল হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে টের পাই, কোনো কারণ নয় এমনিতেই যেন বুঝতে পারি, আমাকে নিয়ে কথা হয়। মনে হয়, কাজি সাহেব আমার চারদিক থেকে জাল এমনভাবে গুটিয়ে আনছেন যেন একদিন সঙ্কুচিত হতে হতে হঠাৎ দেখতে পাবো আমি রুমির বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছি। একেকদিন খুব অস্বস্তি করে যখন ভাবনাটা হয়ে ওঠে প্রবল। চেম্বারে বসে ঘামতে থাকি। বেরুতে পারলে যেন বাঁচি।

আবার নিঃশ্বাস ফেলি মুক্তির। কারণ, তখন হঠাৎ সব তুচ্ছ হয়ে যায়। হাসি পায়। ভাবি, আমি ব্যাচেলের বলেই আমার ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে-কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত লোককে সন্দেহ করা। আর এ-ও বোঝাই নিজেকে— তুমি তো বেশ লোক হে ? কাজি সাহেব বললেই তো আর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না। তুমি যদি না করো তো সাধ্য কী তোমাকে রাজি করায়। এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কববার, ভয় পাবার কী আছে ?

কিন্তু ভয় হতো। ভয় হতো, যখন কোনো কোনো রাতে, ফাঁকা চেম্বারে আমি আর কাজি সাহেব বসে থাকতাম আর উনি অহেতুক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন পরিবারে; বড় ছেলেটার যে ফেল করে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছোট মেয়েটা যে এবার নাচের স্কুলে ভর্তি হবে বলে বায়না ধরেছে, স্ত্রীর অসুখ লেগেই আছে, তিনি আর কত দিন বাঁচবেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস, শ্যালকেরা কেউ মানুষ হলো না, প্রতিবেশীর সঙ্গে পেছনের জমির মালিকানা নিয়ে মামলা এবং রুমিটা বড় হচ্ছে— এইসব শুনতে শুনতে আমার ভয় করত। আমি হাঁ-নার বেশি কিছু বলতে পারতাম না। আমার তখন উঠে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু ওঠবার আগেই, দৈবেরই কী ইচ্ছা আমাকে নেস্তা করবার, দেখতাম রুমি এসে দাঁড়িয়েছে; বলছে— আপা রাতে আপনাকে খেয়ে যেতে বলেছে. আমার তখন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার যোগাড়। যেন একটা ষড়যন্ত্রের আভাস দেখতে পাই চারদিকে, সব কিছুতে। রুমির এই হঠাৎ আসাটাকে কাজি সাহেবের সুচিন্তিত একটা চাল মনে করে শিউরে উঠি।

গোড়ার দিকে বুঝতেই পারতাম না, এত ভয় কিসের ? রুমি কালো বলে ? কুৎসিৎ ? না, সে রুচিতে শ্রীমতি নয় বলে ? আচ্ছা যদি রুমি দেখতে খুব ভালো হতো ? ফর্সা হতো ? নিশাতের মতো। তাহলে ?

নিশাতকে বলতে পারতাম না। মেয়েরা এ ধরনের কথা শুনতে আদৌ পছন্দ করে না, তারা খেপে যায়— এ রকম একটা ধারণা আমার আছে। হোক রুমি কালো, দেখতে ভালো না, চাই কি নিশাত একটা ফালতু ঝামেলা করে বসতে পারে। তাছাড়া বলব কী, নিশাতের কাছে যতক্ষণ থাকি বিশ্বসংসারের আর কারো কথা মনে পড়ে না আমার। রুমিকে নিয়ে দুর্ভাবনার সীমা ঐ চেম্বার পর্যন্তই। আর কখনো কখনো যখন গাড়িতে ওর সহযাত্রী আমাকে হতে হয়।

পরে একদিন আবিষ্কার করেছি ভয়ের কারণটা। চিন্তা করে নয় ভাবনা করে নয়, কিছু না। একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছি— কালো, দুধ ছাড়া— কোন একটা উপন্যাসে পড়েছিলাম কে যেন কালো কফি খেতে ভালবাসত— সেই থেকে অভ্যেসটা। নাকে এসে লাগছিল র'কফির ঝাঁঝালো মিষ্টি ঘ্রাণ আর ধোঁয়ায় বারবার মেঘলা হয়ে যাচ্ছিল আমার চশমার কাচ, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম কারণটা।

ভয় আমার জীবিকার উপার্জনের, প্রতিষ্ঠার। কাজি সাহেব যদি বলেন আর আমি রুমিকে বিয়ে না করি, তাহলে আমাকে তাঁর চেম্বার ছেড়ে দিতে হবে— এইটেই আমার অজ্ঞাতে জন্ম দিয়েছে ঐ ভয়টার। কাজি সাহেবের মতো খ্যাতনামা, প্রতিপত্তিসম্পন্ন এ্যাডভোকেটের জুনিয়র হতে পারাটা ভাগ্যের কথা; পশার তার অমিত সম্ভাবনায় ভরা। সেই কাজি সাহেব যদি আমাকে খারিজ করে দেন তো আমাকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আবার নতুন করে শুরু করতে হবে জীবন। আবার সেই সংগ্রাম। মাসে যে আজ আমার শ'চার পাঁচেক আসছে— এর ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ আমার সব স্বপ্নের মৃত্যু।

আমি তো জানি কী ভীষণ এই একাকীত্ব, এই টাকা না থাকাটা, এই লড়াই।

ছোটবেলায় বাবা মারা যাবার পর, আমার তখন চার বছর বয়স শুনেছি, মা'র আবার বিয়ে হলো। আমাকে রেখে গেলেন চাচাদের হাতে। তাঁর নতুন স্বামীকে দেখিনি কখনো। মা-কেও তারপর থেকে আর কোনদিন না। চাচাদের কাছে ভয়ঙ্কর বর্ণনা শুনতাম। লোকটা খুব চাষা, চোয়াড়ে আর বিস্তর টাকা তার। মামারা কেউ ছিলেন না, মামা-বাড়ির অবস্থা ছিল খুব খারাপ। মা-কে তাই আবার নতুন ঘর করতে যেতে হয়েছিল। আমার এসব কিস্‌সু মনে নেই। কেবল একটা ছবি মনে আছে, আমাকে কোলে করে দলা করে ভাত পাকিয়ে ছড়া বলতে বলতে মা খাইয়ে দিচ্ছেন। চেহারাটা মনে নেই। ঘরে একটা ডিবে জ্বলছে। খুব ধোঁয়া হয়েছে। আর একটা ছবি, গোরস্তানে বাবাকে ওরা কবর দিতে নিয়ে গেছে। আমিও গেছি। আমি আমার সমান কয়েকটা ছেলের সঙ্গে দূরে একটা ভাঙা কবর থেকে ছাতার গোড়া দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলছি একটা মড়ার খুলি আর খুব মজা পাচ্ছি। খুব রোদ বলে আমাকে ছাতাটা দিয়েছিল। খুলিটাকে গড়াতে গড়াতে নিয়ে যাচ্ছি বালু-বালু মাটির ওপর দিয়ে, থানকুনি পাতার ভেতর দিয়ে, কারা যেন গাদা ফুলের গাছ লাগিয়েছে তার দিকে। মেলা ফুল ফুটেছে হলুদ হলুদ। ছাতাটাকে আমি কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। এমন সময় কে একজন এসে বলল, গ্যাদা, শীগগীর আসো। তোমার বাপেরে না মাটি দিতাছে, দেখবা না? ব্যাস এইটুকু। আর কিছু মনে নেই। আমি গিয়েছিলাম কী গিয়েছিলাম না, দেখেছিলাম কী দেখেছিলাম না— কতদিন ভাবতে চেষ্টা করেছি— একেবারে শাদা, কুয়াশার মতো। কিছু মনে পড়ে না।

চাচারা খুব কালো মুখ করে দেখতেন আমাকে। আমি সেই ছোটবেলা থেকেই জানতাম, যাদের বাবা নেই তাদের কেউ নেই। ইস্কুলে আমাদের হেডমাস্টার ক্লাশের ছেলেদের বলতেন, ওর সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করো না যেন। ওর বাবা নেই। ওর কত দুঃখ। দুঃখের কথা শুনে খুব আবছা একটা গর্ব হতো তখন। আমি সবার থেকে আলাদা। ক্লাশে একদিন ইংরেজির স্যার 'অরফান' শব্দের বাংলা বলতে গিয়ে উদাহরণ দিলেন আমাকে। ভারী স্ফুর্তি হলো আমার। এখন মনে পড়লে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। আবার ভাবি, বেশ ছিলাম তখন। দুঃখকে দুঃখ মনে হতো না, আনন্দকে বুঝতে পারতাম না তখন। মানুষ বড় হলেও যদি এ রকম হতো তাহলে তাকে বুঝি সুখী বলতো সবাই। কিন্তু ওটাতো অবোধের কাল। এখন এই যে আমি বড় হয়েছি, দুঃখ হলে দুঃখটাকে একেবারে ভেতর থেকে নিংড়ে নিংড়ে বেরোতে দেখছি, এক ঝলক আলোর মতো আবার আনন্দে ভরে উঠছি— আর সেই আনন্দটুকু স্মৃতির মধ্যে প্রদীপের মতো জ্বলছে, এই শক্তিটার নাম বোধ হয় জীবন।

চাচারা অনেক করেছেন। এম.এ. পরীক্ষায় যখন থার্ড ক্লাস পেলাম, বকলেন তাঁরা। কী যে

দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, সিএসপি-র জন্য পরীক্ষা দিলাম। চাচারা খুব খুশি হলেন। বললেন, গ্যাদা হাকিম হলি পর বংশের একটা নাম থাকে। আল্লার উপর ঈমান রাখলি সব হয়। চাচারা আমাকে গ্যাদা গ্যাদা বলেই ডাকেন। আমার নাম যে মুশতাক সেটা মনে হয় ওঁরা জানেনও না। সিএসপি পরীক্ষাতে কিছু হলো না। রিটেনেই ফেল করলাম। চাচারা বললেন, আর পড়াতে পারবেন না। না বললেও আমি নিজেই আর ভার হয়ে থাকতাম না। তখন কিছু দিন বিরাট এক শূন্যতার ভেতর দিয়ে আমার জীবন কাটলো । চার বছর।

এই চারটে বছরের কোন স্মৃতিই আমার নেই। যেন এই চার বছররের এক হাজার চারশো ষাট দিন একরকম। সেই সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, জুবিলি স্কুলে ইতিহাস পড়ানো সেভেন আর এইট ক্লাশে, তারপর বিকেল থেকে নিয়ে রাত এগারটা অবধি ফরাসগঞ্জে গোবিন্দর সরু তেল কালিতে আচ্ছন্ন, কয়লার ধোঁয়ায় হাঁসফাস রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা দেয়া। শেষদিকে তো রেস্তোরাঁর পেছনে কয়লা আর কাঠ রাখবার শেডে বসে ফ্লাস খেলতে শুরু করেছিলাম। একটা পায়া-ভাঙা নড়বড়ে টেবিল ছিল, দু'দিকে দু'টো বেঞ্চ আর আধখানা, মানে পিঠ-ভাঙা, টিনের চেয়ার। রোজ সন্ধ্যেয় সেখানে ফ্লাস বসতো। কোনদিন হারতাম, কোনদিন জিততাম। আমার ভাগ্যে চূড়ান্ত কিছু লেখা ছিল না। অনেকে ছিল রোজ হারতো, আবার অনেকে জিতে যেত দিনের পর দিন। দেখতাম, কেবল আমিই আলাদা। গোবিন্দ যখন চপ দেয় তখন সঙ্গে একটা ছোট্ট ভিনিগারের শিশি আসে। সে শিশিটা কেউ খোলে না। বিস্বাদ নাকি। কিন্তু টেবিলে নিত্য আসা চাই। আমার অস্তিত্ব ছিল ঐ ভিনিগারের শিশিটার মতো।

তখন নিশাতের সঙ্গে আমার দেখা।

তারপর একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হলো না। মনে হলো, আমার সমস্ত শক্তি গতরাতে কে যেন নিঃশেষে বার করে নিয়ে গেছে। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা সুন্দর একটা বাতাস বারে বারে এসে আমার মুখ ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একবার খুব দাপাদাপি করে বাতাসটা এলো। আর আমার তখন কান্না পেল। আমার এক বন্ধু বিয়ে করেছে, তার সঙ্গে থাকি। বাইরের ঘরটার আব্রু নেই। চাকরটা আসবে ঘর ঝাঁট দিতে। কাঁদতে লজ্জা করল আমার। যদি নিজের বাসা থাকতো— বাসা করবার মতো যদি কিছু করতাম আমি।

ছেলেবেলায় পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে রাতে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসত না এককেবার । প্রতিজ্ঞা করতাম, সামনের বছর ফার্স্ট হবই হব, যেমন ওরা সবাই হয়। ঠিক সেই রকম করে উঠল বুকের ভেতরটা। নিশাতকে গিয়ে বললাম, আমি ল' পড়ব।

নিশাত একেবারে আকাশ থেকে পড়ার মতো চেহারা বানিয়ে মুখ গোল করে প্রতিধ্বনি করল, ল ?

সেই থেকে শুরু হলো আমার নতুন করে চলা। একেবারে সব ভুলতে শুরু করলাম। অতীতের সবকিছু। কী করে, কিছু বলতে পারব না। দেশের কথা আর মনে পড়ে না, চাচাদেরও না। সেই মেজো চাচির কথা, যার সঙ্গে রাতে ঘুমোতাম, তাকেও না। যেন ওসব অন্য কারো জীবনের গল্প। যেন আমি জন্ম থেকে এখানে এমন করে রাতে রাতে ল' পড়ছি, কখনো দেখা হচ্ছে নিশাতের সঙ্গে, হাঁটছি স্টেডিয়ামের মোড়ে, আমার বন্ধু-স্ত্রী বাচ্চা হবে বলে হাসপাতালে গেছে— দু'বন্ধুতে হাত পুড়িয়ে রান্না করছি, সিনেমার পোস্টারে অতিকায় মুখগুলো থমকে দাঁড়িয়ে দেখছি।

আশ্চর্য, চাচারাও ভুলে গেলেন আমাকে। হাকিম হয়ে বংশের নাম পেটাতে পারলাম না বোধহয় সেই দুঃখে। কখন যে আমার জীবনের সব ক'টা নোঙর আস্তে আস্তে খসে পড়ল তার এতটুকু বুঝতে পারিনি। নিঃশব্দে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল, কেউ জানতে পারল না। তাকিয়ে দেখি, নতুন নোঙর কখন আমি ফেলে বসে আছি; কখন সেই বাঁধনে স্থির হয়ে বড় বড় ঢেউগুলোকে অনায়াসে কাটাতে পারছি; আমার জীবন বড় সুমিত হয়ে গেছে; অনেক কাদা ডোবা খানা খন্দ পেরিয়ে সাজানো গোছানো ছবির মতো বড় বাড়ির নিরিবিলি বাগানে গিয়ে দাঁড়ালে যেমন হয় তেমনি।

নিশাত। ভারী সুন্দর নামটা। ওর চেহারার সঙ্গে, চলনের সঙ্গে, চিবুক তুলে কথা বলবার ধরনটার সঙ্গে নামটার কোথায় যেন মিল আছে। মিলটা যে কী, আর কোথায়, জিগ্যেস করলে তা বলা যাবে না— কেবল অনুভব করা যায়। একেকটা নাম, কী জানি কেন, উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার মতো কল্পনার ভেতর থেকে একটা মুখ ভেসে উঠতে থাকে। সেই মনে করা মুখটার সঙ্গে কখনো আসল মানুষটার আশ্চর্য মিল থাকে, কখনো থাকে না। নিশাতকে বলেছিলাম। শুনে অবধি ও এমন উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগল।

বলছিলাম না, নিশাতের সঙ্গে সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। মনটা ছিল অসম্ভব রকমে ভালো। খুনের মামলায় জিতে যাওয়ার দরুণ করকরে টাকাগুলো ছিল পকেটে। অক্টোবরের শীত-শীত দেখে আমার ফিকে সবুজ জাম্পারটা বার করে পরেছিলাম। রুমালটা পকেটে ঢোকাতে গিয়ে দেখি মলিন হয়ে আছে। জিন্নাহ এভেন্যুতে এসে একটা শাদা ফিনফিনে রুমাল ভারী পছন্দ হলো। দাম তিন টাকা বারো আনা। মসৃণ, ইস্ত্রী করা, হাতে রাখলে যেন পিছলে পড়ে যাবে। পকেটে সারাক্ষণ হাত ঢুকিয়ে অনুভব করতে লাগলাম রুমালটার স্পর্শ। নিশাত বোধহয় এতক্ষণ কলেজ থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে আয়নায় নিজেকে দেখছে।

আজ আর চা-দোকানে বসতে ভালো লাগল না। সেই অল্প অল্প বাতাসে পাতা-পত্তর দুলতে থাকা কাঁঠাল গাছের গোল ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম। নিশাতের সঙ্গে দেখা হতো রোববার আর বুধবার। আজ বুধবার, নিশাতের কলেজ ছিল চারটে অবধি। সুরকির পরে আমার ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। জাম্পারটা থেকে ট্রাঙ্কের ঘ্রাণ এসে নাকে লাগছে আমার। আর বুকের ভেতরটা উদ্বেগে অস্থির— যেন কী হয়, কী হয়।

বাঁক পেরিয়ে নিশাত বেরিয়ে এলো। থমকে দাঁড়াল আমাকে দেখে। যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। তারপর মুখটা নিচু করে হাসি ফুটিয়ে কাছে এসে বলল, আজ এখানে যে।

চা-দোকানটা বড্ড বাজে আর নোংরা।

এতদিনে বুঝলে ?

বড় রাস্তায় আমরা পা রেখে বললাম, শোনো, আজ অনেক ক'টা কথা বলব।

আজ ভাবী তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছেন।

আজ আমাদের অনেক দেরি হবে।

বাড়িতে মেহমান আসবে। বলল নিশাত।

বাড়ির তো গিন্নি আছে।

মেলা কথাটা কী ?

কিস্‌সু না। এমনি। এই— এই— বেবি। পাশ দিয়ে স্কুটার যাচ্ছিল, সেটাকে থামাবার জন্যে চিৎকার করলাম। কিন্তু থামল না। টুক করে বাতি জ্বলে উঠল রাস্তার। আমাদের চোখের সামনে যতদূর পথ বেঁকে গিয়েছে, একটা আলোর রেখা পোস্টের মাথায় মাথায় নাচতে লাগল। স্থির হলো।

বললাম, নিশাত, দ্যাখো, আজ আমার অনেক কথা আছে।

আহা, তাই তো জিগ্যেস করছি, কী কথা ?

যেন আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না, নিশাত তাই আমাকে তিরস্কার করছে। বললাম, সেটা এভাবে বলা যায় না।

নাহ, একটা স্কুটারও পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুটারে চাপবার জন্যে উসখুস করছে মনটা, ভালো লাগছে না হাঁটতে কিন্তু হাঁটতে হচ্ছে। একবার দাঁড়ালাম আমি। দাঁড়াল না নিশাত। তখন আবার আমাকে হাঁটতে হলো। তখন আর নিশাতের দিকে দেখতে পারছি না, সামনে দেখছি আর বারবার পেছনে। বারবার উচ্চকিত হচ্ছি দূরের কোনো যানবাহনের শব্দে। একটা স্কুটারও কি আজ আসতে নেই এদিকে ? পথে নিশাতের সঙ্গে এক মহিলার দেখা হলো। তিন বাচ্চা তার সঙ্গে। এক মুখ হাসি। চওড়া পাড় শাড়িটা সমস্ত শরীরে পল্লবিত ; অতএব আমাকে দূরে দাঁড়াতে হলো।

স্কুটারে উঠতে উঠতে নিশাত বলল, খামোকা দেরি হয়ে গেল। তারপর অন্যমনস্কভাবে জানাল, আজ কলেজে নতুন প্রিন্সিপাল এলেন।

আমি বললাম, আগে নিউমার্কেট, নিউমার্কেট থেকে— আচ্ছা, চলো দেখি, বলছি।

নিশাত কী যেন বলল, সেটা শুনতে পেলাম না। প্রচণ্ড আওয়াজ করছে স্কুটার। বোধহয় গিয়ার আটকে গেছে। হাতলটা ঘোরাচ্ছে খুব। আমি চেঁচিয়ে বললাম নিশাতকে, কিছু বলবে ?

তখন নিশাতও গলা তুলে বলল, বলছিলাম— উহ্, কী শব্দ— নিউমার্কেট কেন ?

এমনি। কোথাও তো যেতে হবে।

তবু ভালো। ভাবলাম, ওখানে বুঝি তোমার কথা কিনে আমাকে বলতে হবে।

আওয়াজটা সয়ে এসেছে ; নিশাতের গলা তাই ঝন্‌ঝন্ করতে লাগল আমার কানে। বেসুরা ঠেকল। বললাম, ঠাণ্ডা পড়েছে।

তুমি তো জাম্পার চড়িয়েছো।

তুমি একটা কিছু গায়ে দিয়ে এলে পারতে।

হাসল নিশাত। বলল, মাফলারটা বাদ পড়ল কেন ?

আমাদের কথাবার্তাই ঐ রকম। একেকজন একেকটা বলতে থাকি— আরেকজনের উত্তর দেয়া হয় না। যেন চিন্তার দু'টি বেণি পাকিয়ে পাকিয়ে কেবলি নামতে থাকে— এক হয়ে যায় না। বেশ লাগে। অনেক অহেতুক কথা মনের ভেতরে জমতে জমতে ভার হয়ে ওঠে, সেগুলোর একটা পথ হয়। আর শুনতে ভালো লাগে— অনেক অর্থহীন কথা এত ছন্দময় হয়ে ওঠে একেক সময়, মনে হয় সারাদিন শুনতে থাকি, ধরে রাখি, লিখি।

একবার আমার খুব শখ ছিল নিশাতকে চিঠি লেখার। ক'দিন লিখলাম খুব। তারপর হাঁফ ধরলো। কী লিখব, কিস্‌সু মাথায় আসে না। কথা বলার সময়ে কেমন সহজ হয় সব, কিছু লিখতে বসলে আধখানা লিখে সেন্টেন্স আর শেষ করা যায় না। আর ওদিকে নিশাত লিখত আমার চেয়েও বড় বড় চিঠি। কেমন সাজানো গোছানো। তেলের শিশি হাত থেকে পড়ে ভেঙেছে সেটা একটা চিঠিতে লেখার বিষয় হতে পারে এই প্রথম জানলাম; কলেজে ছাত্রীদের মুখের বর্ণনা এত জীবন্ত হতে পারে— তা নিশাত না হলে জানতাম না; আর কী আশ্চর্য, সেই মুখগুলের বর্ণনা, যাদের আমি হয়ত কোনদিন দেখব না, দেখলেও চিনতে পারবো না— আমার এত ভালো লাগবে তাইবা কে ভেবেছিল ?

চিঠি লেখার অসুবিধে অনেক। সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে না। পোস্টাফিস হয়ে আসতে যেতে কম করেও তিনদিন। তিনটে দিন চুপ করে বসে থাকা আর ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে যাওয়া প্রথমদিকে বেশ লাগত। পরে কেমন অসহ্য হয়ে উঠল। নিশাতকে বললাম, চিঠি কে লেখে? আমি আর না।

গ্রীন রোডের কাছে ছুটে আসা একটা দৈত্য স্টেট বাস এড়াতে গিয়ে আমাদের স্কুটার আচমকা পাশ কাটালো। নিশাতকে ধরে না ফেললে হয়ত ছিটকে পড়ত রাস্তায়। রাস্তার লোক ইস্-ইস্ করে উঠল। আমি ড্রাইভারের জামা টেনে চিৎকার করে বললাম, পাশে করো।

পাতার মতো কাঁপছে নিশাত।

সমস্ত ব্যাপারটা এত আকস্মিক, আর আমরা এত তন্ময় হয়ে ছিলাম যে, ভালো করে বুঝতেই পারছিলাম না কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। নিশাতের কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপড় দিয়ে বললাম, কী হতো বলোত ? কিস্‌সু হয়নি। আর স্কুটারওলাকে একটা টাকা দিয়ে বললাম, আর একটু হলেই—।

সে খুব বিষদৃষ্টিতে দেখল আমাদের। যেন, সে তো এ ধরনের অ্যাক্সিডেন্টকে হর-হামেশাই এড়াচ্ছে, আমরাই কেবল তার ওস্তাদির কদর করছি না, নেমে যাচ্ছি। নিশাতকে বললাম, একটা রিকশা নিই।

রিকশায় বসে বললাম, এই রাস্তাটায় সেদিন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল। স্কুটারের সঙ্গে ট্রাক। স্কুটারে ছিল গান গাইত, খেয়াল, মস্তান গামা। পড়োনি কাগজে ? মারা গিছল।

আমার খুব একটা খারাপ লাগছিল না। কিন্তু নিশাত চুপ করে রইলো সারাক্ষণ। বললাম, একসঙ্গে মরে গেলে একটা হৈচৈ পড়ে যেত কিন্তু। যেত না ? লোকে, আমরা, মানে মনে করত আমরা স্বামী-স্ত্রী।

লজ্জা করল আমার। তাকাতে পারলাম না নিশাতের দিকে। চেনটা পড়ে গেল রিকশার। রিকশাওয়ালা যতদূর গতির মুখে যাওয়া গেল, তারপর নেমে উপুড় হয়ে পরাতে লাগলো হুইলের সঙ্গে চেন। পাবলিক লাইব্রেরীর জানালা থেকে চৌকো চৌকো আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। আবার চলতে শুরু করল।

নিশাত বলল, আজ বেরুনোর মুখে ভাবীর ছেলেটা ভারী দুষ্টুমি করছিল। একটা চড় দিয়েছি।

মন খারাপ করছে ?

নাহ। আবছা হেসে ফেলল নিশাত। আবার বলল, এমনি মনে পড়ল। খুব বেঁচে গেছ কিন্তু

আজ।

আমার অনেকগুলো কথা ছিল। বলে নিশাতের দিকে চোখ ফিরিয়ে রাস্তার পাশে বুড়ো গাছগুলোর মাথায় মাথায় তাকালাম। শাদা মেঘ হয়েছে। চাঁদটা গেল কোথায়?

বলো, শুনছি।

বলব, এভাবে বলা যায় না।

হাসল নিশাত। ঐ রকম করে নিঃশব্দে, মেলা রকম মনে হয় হাসতে পারে নিশাত।

তুমিই বলো এভাবে বলা যায়?

না যায় না। কিছুতেই বলা যায় না। আমার কণ্ঠ অনুকরণ করে নিশাত বলে উঠল।

নিশাত না হয়ে অন্য কেউ হলে ঠিক চটে যেতাম। বদলে যেন খুব উপভোগ করেছি এমনিভাবে হেসে ফেললাম সশব্দে। আর আমিও বললাম, না বলা যায় না। কিছুতেই বলা যায় না। তারপর প্রস্তাব করলাম, চলো. খাই।

খাই মানে?

বাইরে। কোনো রেস্তোরাঁয়।

নিশাত দু'হাতে মানা করে উঠল। বলল, আমি কবে বাইরে খাই? তুমি জানো না?

আজকে।

উঁহু। না।

কী হবে?

বাসায় মেহমান আসবে।

তো আমি খাবো। তুমি বসে বসে দেখো।

আমি এ রকম যখন রাগ করে বসি, নিশাত কিছু বলে না— এটা অনেকদিন দেখেছি। একদিন ওকে একটা কলম কিনে দিলাম। নেবে না কিছুতেই। বললাম, না নেবে তো না। বলে কলমটা খুলে নিবটা ভেঙে ফেলব বলে হাত তুলেছি, খপ্ করে হাত ধরে ফেলল নিশাত। কেড়ে নিয়ে কলমটা ব্যাগে রেখে দিল। বলল, 'নিলাম।' আবার আরেকদিন আমার মেজাজটা কিসে বিগড়ে ছিল বলতে পারব না। নিশাতের সঙ্গে আলাপটা জমছিল না। ও একাই কথা বলছিল সারাক্ষণ। বলতে বলতে একবার শুনলাম. কই, কী হয়েছে তোমার? কিছু বলো। হঠাৎ কী হলো ঠাস্ করে বলে ফেলাম, কী বলব? তুমিই তো সব বলছ। বলেই বুঝতে পারলাম অন্যায় করেছি। ভয় হলো, নিশাত হয়ত এক্ষুণি উলটো হন্‌হন্ করে হাঁটতে শুরু করবে। কিন্তু, তার বদলে হাসল নিশাত। যেন অন্ধকারে ফিক করে চাঁদ উঠল। নিজেকে খুব ছোট আর নষ্ট মনে হলো তখন।

চীনে দোকানে খেতে বসে দু'জনের জন্যেই আনতে বললাম। নিশাত আমাকে বাধা দিল না। বেয়ারা পানির গ্লাস রেখে চলে যাবার পর ও আস্তে আস্তে বলল, আমি, কী যে আমি, মানে আমি না করব না।

অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার?

জানোই তো।

তখন ঝুঁকে পড়ে বললাম. জানিই তো. আমি খাবো আর তুমি বসে বসে দেখবে, সে হতেই

পারে না।

তখন নিশাত চোখ নামিয়ে বলল, সেটা নয়। আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা।

ওহো।

যেন হোঁচট খেলাম। খুব বিব্রত মনে হলো নিজেকে। আমি কিনা ভাবছি, ছিঃ। নিজের বুদ্ধিকে ক্ষমা করতে পারলাম না। একটুও না। আর খুব অবাক হলাম, নিশাত কী করে বুঝল, এই কথাটা ওকে বলার জন্যেই আজ সন্ধ্যে থেকে আমি তৈরি হয়ে আছি। শুনেছিলাম মেয়েরা নাকি ছেলেদের চোখ দেখে সব বুঝতে পারে।

বললাম, আমিও তাই ভাবছিলাম।

বেশ তো। বলল নিশাত। তখন ধোঁয়া ওড়ানো সুপ এলো সমস্ত ঘ্রাণ আচ্ছন্ন করে। পেটের ভেতরে চন্‌চন্‌ করে উঠলো খিদে। ন্যাপকিন দিয়ে খামোকা ঠোঁট মুছে ওর পেয়ালা নিয়ে চামচে চামচে তুলে দিতে লাগলাম সুপ। নিশাত বলল, থাক, আর না। তুমি নাও।

ব্যাস ?

অনেক।

বললাম, তুমি সব দেখে শুনে নাও। একটু নুন লাগবে। ঐটা নিয়ো না বড্ড ঝাল। আমি আজ সন্ধ্যে থেকেই ভাবছিলাম, বুঝলে।

আর আমি ক'দিন থেকেই বুঝতে পারছিলাম, যেন কিছু একটা হবে আমার। এক চামচ মুখে দিয়ে ঠোঁটটাকে সঙ্কুচিত করে চুষতে চুষতে নিশাত আবার বলল, দূর, কী যে সব বলছি। দ্যাখো, দ্যাখো, ওরা কী সুন্দর গোল হয়ে বসেছে।

তাকিয়ে দেখি এক মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক, কাঁচা-পাকা চুলে ভর্তি মাথাটা, চোখে চশমা, গায়ে শাদা হাওয়াই শার্ট। আর তাকে ঘিরে বসেছে এক— দুই — ছয়— সাত— আটটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ভদ্রলোক একবার এর আর একবার ওর মুখে তুলে দিচ্ছেন খাবার। গরম লাগছে, ছেলেটা মুখ বিকৃত করে ফিরিয়ে নিচ্ছে আর হেসে উঠছে তার ভাইবোনেরা। ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকালেন, তখন টুক্‌ টুক্‌ করে মাথা গুঁজে খেতে লাগল যারা হাসছিল।

নিশাত বলল, আহা, ওদের মা নেই বোধ হয়।

বললাম, কিংবা মা আবার বাচ্চা হতে হাসপাতালে গেছে।

যেমন তোমার বন্ধুর বউটি বছর বছর যায়। নিশাত যোগ করল বিদ্রূপ করে।

যেন তুমি কত দেখেছ ?

বাহ তুমিই তো গল্প করো।

আমার বন্ধুটি ঐ রকম। কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাচ্চা হবে বছর বছর। যদি আমি বিয়ে করি, তো অনেকদিন ছেলেপু হবে না। নিশাত যদি ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারে, আসার কথা হচ্ছে, ভালো নই স্কলারশিপটা নিয়ে যাক ও বিলেতে। আর আমি দু'দিন পরেই জুনিয়র থেকে প্রমোশন পাবো। নিজের পশার জমে উঠতেও বছর দু'বছর। তখন একটা ছোট্ট বাড়ি করব। একতলা। আজকাল কত লোকে বাড়ি করছে। আমারও হবে। তারপর ছেলে।

নিশাত জিগ্যেস করল, হাসছ যে ?

কই না।

বেয়ারা এসে পেয়ালাগুলো নিয়ে গেল আমাদের। কাঁটা চামচ সরিয়ে জায়গা করল। আমি একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললাম, তাহলে সামনের মাসে ?

ভাইজানকে বলো।

আমি ?

কেন ? ভয় কিসের।

না, এমনি। আমার যেমন কপাল। তিনকুলে কেউ নেই তো। নিজের বিয়েতেও নিজেই ঘটক।

নিশাতকে খুব ম্লান দেখাল তখন। হঠাৎ একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, আমি কী বলব ? তোমার যেদিন ভালো মনে হয়।

ঠিক তখন আমার বুকের মধ্যে রিমঝিম করে উঠল সরোদের ঝঙ্কারের মতো। মনে হলো, আজকেই আমাদের বিয়ে। এখান থেকে উঠে গেলেই দেখতে পাবো, বাইরে আলো ঝলমল করছে, মেলা লোকজন এসেছে, গাড়ি এসেছে, কাজি সাহেব এসেছেন, শরীফ এসেছে, ফটাস ফটাস করে পাড়ার ছেলেরা বাজি পোড়াচ্ছে আর আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ভেতর বাড়িতে। চোখের সামনে নিশাত বসে আছে, নিশাতকে আর দেখতে পাচ্ছি না। ঘরের মধ্যে সমস্ত মানুষ যেন স্বপ্নের ভেতর থেকে এসে সব বসে আছে, আর আমি বুঝতে পারছি না— কেন ?

উঠে দাঁড়াল নিশাত। বলল, মেলা দেরি হয়ে গেল না ?

নিশাত কিছুতেই স্কুটারে উঠবে না, বাস স্টপেজে কিউ দিয়ে দাঁড়াল। বাসটা যখন ছেড়ে দিল, আমি দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, ভাবীকে বোলো যে সামনের মাসে। কেমন ?

বাসটা জোরে চলতে শুরু করেছে। সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শোঁ করে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা শূন্যতা লাফিয়ে পড়ল পথের 'পরে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো বুকটা অকারণে হু হু করে উঠল আমার। চৌরাস্তার লাল বাতিটা দপ্ করে সবুজ হলো। স্রোতের মতো চলছে স্কুটার, কার, বাস, রিকশা। আমি দাঁড়িয়ে আছি তখনো। আমার যেন কোথাও যাবার নেই।

এত হালকা লাগছে নিজেকে, এত খুশি, কিন্তু কোথায় যেন কিসের একটা মোচড়— সব অথচ কিছু নেই। দু'টো লোক আমার দু'দিকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল সামনে, গিয়ে আবার হাত ধরাধরি করে তারা হাঁটতে লাগল।

একটা রিকশা এসে থামলো। যাইবেন সাব ? উঠে বসলাম। যেন এই কথাটাই এতক্ষণ কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না যে আমার একটা রিকশা দরকার। তাকে নবাবপুর দিয়ে সোজা যেতে বলে পকেটে হাত দিয়ে দেখি-- বুকটা ধ্বক করে উঠলো— আমি টাকা হারিয়েছি। না এ-পকেটে, না ও-পকেটে, আমার মানিব্যাগটা নেই।

বন্ধু-স্ত্রী রাঁধেন ভালো। ঘরে পা দিতেই রান্নাঘর থেকে তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল, আজ এত দেরি

যে ?

দেরি কোথায় ? রোজ তো এই সময়েই ফিরি।

আসলে দেরিই হয়েছিল। সন্ধ্যের পর ঘরে ফিরে আসা আমার বেশ পুরনো অভ্যেস— যখন থেকে কাজি সাহেবের জুনিয়র হয়েছি। প্রথম দিনেই তিনি বলেছিলেন, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি দিয়ে বিদায় করে। আসল লেখাপড়ার শুরু তারপর থেকে। মাথাটা খুব সাফ রাখতে হবে। পড়তে হবে প্রচুর। ভালো ল-ইয়ারের সিক্রেট হচ্ছে স্টাডি অ্যান্ড শার্প মেমরি।

আমার একটা স্বপ্ন, বড় ল-ইয়ার হবো। পয়সা হবে। বাড়ি হবে। জাল-ঘেরা প্রশস্ত বারান্দায় থাকবে আরাম চেয়ার। বাড়ির সামনে রাস্তাটা হবে চওড়া আর রাস্তাটার নাম চিনবে সবাই একডাকে। কাজি সাহেবের যে পশার প্রতিপত্তি, তাতে এ সবকিছুই তিনি করতে পারতেন। তিনি পুরনো কালের মানুষ বলেই হয়ত করবার মন নেই তাঁর। সেই পুরনো দোতলা, আগে ভাড়া থাকতেন, এখন কিনে নিয়েছেন। গাড়িটার বয়স কুড়ির কাছাকাছি, মাসের মধ্যে পনের দিন গ্যারেজে পাঠাতে হয়। বসবার ঘরে খাড়া নক্‌শাপিঠ চেয়ারের আর বদল হলো না। দরজার পর্দা কেমন ভিজে ভিজে মলিন আর তার আসল রংটা কোনদিন দেখেছি বলে মনেও পড়ে না। তবু তাঁর পশারের কথা জানতাম। তাই তাঁর মতো হবার আশা করছি।

সন্ধ্যের পর পড়তে বসতাম। পুরনো সমস্ত কেসের রিপোর্ট। মনে রাখবার চেষ্টা করতাম, চাঞ্চল্যকর সমস্যাগুলোর সন তারিখ ঘটনা আর কোন কোর্ট, কোন হাকিম, কী রায়। আমার স্মৃতিশক্তি তেমন সক্ষম বলে মনে হয় না। কোনদিন কোনো কিছু স্পষ্ট মনে রাখতে পারিনি। কেবল ভাসা ভাসা এখান থেকে ওখান থেকে মনে থেকেছে। গেল বছরের হয়ত ঘটনা, কিন্তু সব সময় আমার ধারণা হবে, দু'তিন বছর আগে হয়েছে। কতবার যে মাস ভুল করেছি, নাম ভুলে গেছি, একজনের বদলে আরেকজনকে ভেবেছি তার লেখাজোখা নেই। কাজেই আমাকে পড়তে হতো বারবার, কষ্ট করতে হতো মনে রাখবার জন্যে। রাত বারোটা একটা হতো রোজ।

ভেজানো দরোজাটা একটু হাত দিতেই দড়াম করে খুলে গেল। সুইচ টিপতেই পাণ্ডুর আলোয় ম্লান হাসতে লাগল বালিশ, বিছানা, টেবিল, আলনা।

দরোজার কাছে শব্দ করে এসে দাঁড়ালেন বন্ধু-স্ত্রী। বললেন, খাবেন এখন ? না, পরে।

জালাল ?

জালাল আমার বন্ধুর নাম।

তার একটু জ্বর দেখলাম।

জালালের একট না একটা ছোট অসুখ এ রকম লেগেই আছে। আজ সর্দি, কাল মাথাব্যথা, পরশু জ্বর। শীত পড়তেই শুরু করেছে। শুরু হবে সারা সিজন ধরে খুক খুক কাশি। জ্বরটা বোধ হয় তারই পূর্বাভাস। জাম্‌পারটা খুলে আলনায় রাখলাম।

বন্ধু-স্ত্রী জানালেন জালাল শুয়ে আছে। রাতে রুটি খাবে। তারপর দরোজার কাঠ ধরে মাথাটা ভেতরে ঝুঁকিয়ে আচমকা ঝরঝরে গলায় জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার ? আজ বড় খুশি খুশি যে।

কে, আমি ?

তাকিয়ে দেখি, তিনি হাসছেন মাথায় কাপড় দিতে দিতে। বললাম, না, খুশি লাগছে আপনাকে। সন্দেহ হলো, জালালের বোধ হয় জ্বরটা মিছে কথা। আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে। এ রকম ঠাট্টা ইনি মন্দ করেন না। বিশেষ করে আমার সঙ্গে। দেখলে কে বলবে, অভাবের সংসার আর পাঁচ ছেলে-মেয়ের মা। যেন গল্পে পড়া সুয়োরাণীর সেবাদাসী— সারারক্ষণ হাসি মুখে, আর রসিকতার তুবড়ি। মন্দ লাগে না। একেকদিন আমিও খুব উৎসাহের সঙ্গে লেগে যাই ঠাট্টার কম্পিটিশনে।

বললাম, আমাকে তো খুশি লাগবেই। চোখ দেখান শীগগীর।

কেন ?

টাকা তুলে নিয়েছে। শ'তিনেক। এই তো আধঘণ্টাও হয়নি।

পকেট মেরেছে ?

হুঁ।

ইস। তিনশ ? কী করে ?

জানলে কি আর নিতে পারতো ? কপাল খারাপ। আমি এত কশাস্লি চলি !

লুঙ্গিটা আলনা থেকে নিয়ে চেয়ারের ওপর রাখলাম। দরোজা থেকে চলে গেলেন বন্ধু-স্ত্রী। তাঁর মুখটা আমার চেয়েও অনুতাপে কালো দেখাল।

মুখ ধুয়ে বলে এলাম, আজ আর খাবো না। দাওয়াত ছিল। বলতে ভুলে গেছি।

এতগুলো টাকা হারিয়েও মনটা খারাপ নেই। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে অবাক হলাম। যেন অনেক বড় কিছু একটা পেয়েছি। আনন্দে ভেতরটা আলো হয়ে আছে। নিশাত রাজি হয়েছে, তাই ? আমি যেন জানতামই নিশাত রাজি হবে। না, সে আনন্দও নয়। কিছুতেই মনে পড়ছে না এ রকম একটা কিছু; কিন্তু। কী সেটা ? অনেকক্ষণ ভাবলাম। অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। দেখি, এতক্ষণ কিছুই ভাবছিলাম না। একেবারে শাদা, শূন্য নিরবলম্ব লাগছে নিজের অস্তিত্বকে।

আজ পানি আনতে ভুলে গেছি। উঠে দাঁড়িয়ে রান্না ঘরের কুঁজো থেকে জগ ভরে নিয়ে এলাম। ঘরের ভেতর থেকে জালাল ডেকে উঠল, কে ?

আমি।

আবার নিস্তব্ধ হয় গেল রাত্রিটা।

আমি এখন মাসে চারশ' থেকে পাঁচশ' করে পাই। আর নিশাত কি তিন সাড়ে তিনশ' পায় না ? কলেজে লেকচারারদের মাইনে কত, আমার ধারণা নেই। নিশাতকেও কখনো বলতে শুনিনি। তাহলে দু'জনে সাত থকে আটশ'ই হবে। মন্দ কী ? ক'জন আছে মাস গেলে ঘরে এতগুলো টাকা তুলতে পারে ? বেশ চলে যাবে আমাদের সংসার। সংসার আর কী ? আমরা দু'জন শুধু। দু'জনের আর কতই বা লাগবে ? জমানো আছে পৌনে চার হাজার আমার। বিয়ের পর একটা বছর গেলে দু'জনে অন্তত আরো হাজার চারেক জমাতে পারবো। ভাইজানের বাড়ির পাশের জায়গাটা তো খালিই পড়ে আছে নিশাতের নামে। সেখানে বাড়ি করতে পারব। বছর খানেক কষ্ট করতে হবে। তারপর এককামরা দু'কামরা করে আস্তে আস্তে দালান তোলা যাবে। একটা কামরা হলেই থাকতে শুরু করা যাবে। এক তলা।

ইংরেজি এল-এর মতো করে তুলবো। এল্-এর ছোট মাথাটায় থাকবে আমার চেম্বার। আজকাল সুন্দর প্রিন্ট বেরিয়েছে, দোর-পর্দা করা যায়। সোফার রংটা হবে ধূসর— বর্ষার আকাশের মতো। বেশ লাগে রংটা। একটা শার্ট কিনেছিলাম ঐ রকম— রংটা টিকল না। জাপানি ইম্পোর্ট বলেছিল।

কিন্তু নিশাত যে বলছিল ওর স্কলারশিপটা বোধ হয় হয়ে যাবে। বিলেতে দু'বছর থাকতে হবে। আমার মনেই ছিল না। সেটা বরং আরো ভালো— যাক ও বিলেত। ফিরে এলে নাম হবে। ইউনিভার্সিটির কাজটা হয়ে যাবে হয়ত তখন। দু'বছরে আমিও অনেকটা গুছিয়ে বসতে পারবো। আজকাল উকিল বেড়েছে— কম্পিটিশন বড্ড টাফ।

বাতিটা খামোকা জ্বলছে। নিভিয়ে দিলাম। কাল আলোয়ানটা বার করতে হবে। শুধু চাদরে বেশ ঠাণ্ডা করে। ঠাণ্ডা পড়ছে। রাত বোধ হয় একটা। দূরে হঠাৎ মানুষ চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে, একটা গানের কলি, হাসি। সেকেণ্ড শো থেকে ফিরছে বোধ হয়।

বুকের কাছে পা টেনে নিতেই নিশাতের মুখটা মনে পড়ল। ছবির মতো। অনেক বড়। সিনেমার পোস্টারে যেমন। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। আমি একটু হাসলাম। নিশাত হাসল। আমার চোখে পলক পড়ছে না। নিশাতেরও না। আমি একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, নিশাত আর নেই।

আবার মনে করলাম নিশাতকে। ঐতো ওর চোখ দু'টো, নাকের তরতরে রেখা, চাপা ঠোঁট, একটা গালে চুলের ছড়িয়ে থাকা। আবার নিশাতকে দেখতে লাগলাম তেমনি নিঃসাড় পড়ে থেকে, বালিশে মাথা কাৎ করে রেখে, বুকের কাছে দু'পা দ-এর মতো টেনে।

আমাদের যখন বিয়ে হবে, তখন বালিশ থেকে মুখ তুলেই দেখতে পাবো ওর মুখ। পাশের বালিশে ঘুমে ডুবে আছে নিশাত। অন্ধকারে আচ্ছন্নের মতো, কী হলো আমার, মুখ তুললাম। হাত রাখলাম। জানি নেই, জানি বিয়ের পরে, তবু যদি থাকে।

হাসি পেল আমার। একেবারে উঠে বসলাম। ছেলেমানুষের মতো করছি আমি। সিগারেটের জন্যে হাত বাড়াতে যাবো হঠাৎ হাতটা জগের গায়ে লাগল। চট্ করে সামলে নিতে পেরেছি, নইলে ভেঙেই ফেলেছিলাম। হৃদপিণ্ডটা এখনো লাফাচ্ছে। আস্তে আস্তে সন্তর্পণে উঠে বাতি জ্বালতে যাবো, তখন—

তখন হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টির মতো মা-র কথা মনে পড়ল। আমার আর ওঠা হলো না। সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে অদৃশ্য ঠাণ্ডা পানির রেখা নামতে লাগল যেন। আমি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ এক নিমেষে খুইয়ে বিহ্বল নির্বাক এক ভিখিরির মতো বসে রইলাম। যেন শরীর থেকে এক ধাক্কায় ছিটকে আলাদা হয়ে গেছে আমার আত্মা; কয়েক হাত দূর থেকে আমাকে সে দেখছে অসীম করুণার সঙ্গে।

নিশাত জানে না। নিশাতকে আমি মিথ্যে বলেছি। বাবা মারা যাবার পর মা-র বিয়ে হয়েছিল আবার। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মা-র দ্বিতীয় বিয়ের কথা মনে পড়লেই মনটা গ্লানিতে, লজ্জায়, ছোট হয়ে যেত। যেন দোষটা আমারই। যেন এ লজ্জার কুলান হয় না পৃথিবীতে। যেন আমার মা যদি মরে যেতেন তাহলে খুব ভালো থাকতাম আমি। ছাব্বিশ বছর দেখা হয় না, মরে যাওয়াই তো। নিশাতকে বলেছিলাম, আমার মা-ও মারা গেছেন ছোটবেলায়। আমি তখন অনেক ছোট। কিস্সু মনে নেই।

অনেকদিন ভেবেছি, এ রকম তো কত হচ্ছে। কাঁচা বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, মামারা ছিলেন না কেউ; থাকলেও কিছু হতো না, কারণ শুনেছি নানা ছিলেন বড় গরিব; আবার বিয়ে ছাড়া উপায়ই বা কী ? চাচারা কেন মাকে রাখেননি, কোনদিন জানতে পারিনি। হয়ত তারা পছন্দ করেননি মাকে, বোঝা বইতে চাননি। অনেকবার মনে মনে রাগ করতে চেয়েছি চাচাদের ওপর, পারিনি; কেমন নির্জীব একটা মায়া হয়েছে বরং।

মা-র দ্বিতীয় স্বামী আমাকে একেবারে কাছে ঘেঁষতে দেননি। বিয়ের পর সেই যে গেছেন, আর কোনদিন আসেনওনি মা আমাকে দেখতে। এখন বুঝতে পারি, ছোটবেলায় সে অভিমানটা কত ছেলেমানুষের মতো করেছি; দ্বিতীয় স্বামীর ঘর থেকে প্রথম স্বামীর পুরনো সংসারে কেউ আসে না— থাক না যতই মায়ার টান— এই সাধারণ কথাটা তখন বুঝিনি।

আর মা-র কথা মনেই নেই যে মনে করে কোনো কিনারা হবে। কেবল একটা অবোধ আকুতির মতো, কিছুতেই মনে না পড়া স্বপ্নের মতো, অস্পষ্ট কম্পিত বহু দূরের অনুভূতির মতো মা-র অস্তিত্ব টের পেতাম। এই পৃথিবীর কোনখানে তিনি আছেন। একেক সময় স্পষ্ট দেখতে পেতাম যেন, গ্রামের মধ্যে টিনের বাড়ি একটা, সামনে আঙ্গিনা, আঙ্গিনায় হলুদ খড় শুকোতে দেয়া হয়েছে, কামলা বসে হুঁকো খাচ্ছে, গরু-ছাগল মাটিতে মুখ রেখে ঘুরছে আর চড়া রোদ উঠেছে আকাশ পুড়িয়ে— চারদিক খাঁ খাঁ করছে। তার মধ্যে মা কাজ করছেন। আমার কল্পনায় তাঁকে দেখতে পেতাম, ট্রেন থেকে গ্রামের একেকটা আঙ্গিনায় হঠাৎ হঠাৎ যেমন নীল তাঁতের ময়লা শাড়ি পরে, মাথায় কাপড় তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে, কী উপুড় হয়ে কাজ করতে, বা গাড়ির শব্দে মুখ ফেরাতে বৌ-ঝিদের দেখা যায়। তাদের আলাদা করে মনে থাকে না, সব মুখ এক হয়ে যায়— সেই কালো শ্যামল রং, দুঃখী, নির্বাক। দেখতে পেতাম, যেন তার চারদিকে কালো কালো ন্যাংটো কী ছেঁড়া প্যান্ট পরা, ধুলো মাখা, নাকের সর্দি গালে চট চট করতে থাকা অনেকগুলো ছেলেমেয়েকে। তাদের পেট ফুলে উঠেছে, হাতে একটা আম, ভন ভন করছে মাছি— চকচকে চঞ্চল চোখে তারা আমাকে দেখছে।

বাতিটা আর জ্বালানো হলো না। সিগারেট খেতে চেয়েছিলাম। থাকগে। সিগারেটের দাম আবার বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্যাক্স, ট্যাক্স আর ট্যাক্স। এক বছরে ক'টা ক্যাবিনেট ভাঙলো আর হলো ? একটা স্টেবল গভর্ণমেন্ট চাই। আমার কিস্‌সু হবে না। একটা লাইন করতে পারতাম, একটা যোগাযোগ থাকতো কোথাও— এক মাসে আমারও বাড়ি হতো ধানমণ্ডিতে, গাড়ি হতো, টাকা আসতো বন্যার মতো। ঐ বাড়িগুলোতে কারা থাকে ? অমন সুন্দর বাড়ি। আমার বাবা যদি মিনিস্টার হতেন, বেশ হতো। উঠে বসে আবার খুঁজতে হলো সিগারেট। ধরাবার পর মনে পড়ল, একটু আগেই খাবো না ভাবছিলাম। আজ আমার কোনো কিছুই মনে থাকছে না।

জানালার পাট খুলে দিতেই ঝলক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে পড়ল। বেশ লাগছে শীতটা। নিশাতের কথা ভাবছিলাম। নিশাতকে সুন্দর দেখতে পাচ্ছি, যেন বাতি জ্বালিয়ে ফটোগ্রাফ দেখা হচ্ছে। আর মা-কে।

একেকদিন হুহু করত মনটা— খুব যখন আনন্দ হতো, তখন, তখন সব আনন্দকে ব্যথায় মুচড়ে দিত মায়ের স্মৃতিটা। চমকে উঠতাম তখন। মনে হতো, আমার কথা শুনে মা খুব খুশি হতেন। ম্যাট্রিক যেবার পাশ করলাম, এত খারাপ লাগল। একটা গরম কোট ভালো ফিট করেছিল আর মানিয়েছিল চমৎকার— হলে থাকতাম তখন— তীরের মতো মা-র কথা

মনে পড়ল। আরেকদিন স্টেশনে একটা পরিবারকে আপার ক্লাশ ওয়েটিং রুমে ঢুকতে দেখলাম— বাচ্চাগুলো এত সুন্দর আর চঞ্চল আর লাফাচ্ছিল— আমার মুখটা হাসিতে ভরে গেল, তখন মনটা খুব খারাপ করল হঠাৎ।

আশ্চর্য! কতবার আমার জ্বর হয়েছে, কই মাকে একটুও মনে পড়েনি। আমার রুমমেট একটু অসুখ হলেই খালি বাড়ি যেতে চাইতো মাকে দেখতে। এম.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলো, তখনো না। আশ্চর্য নয়? দুঃখের সঙ্গে কোনো যোগ নেই আমার মা-র। অথচ মাকে যখনি মনে হয়েছে, যেন চোখে দেখতে পেয়েছি দুঃখী, মলিন এক মহিলা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা আটটা বেজেছে। খচ খচ করছে দু'চোখ এখনো। মনে হচ্ছে, আরো খানিকটা ঘুমোলে ভালো লাগত। কিন্তু ন'টার মধ্যে না পৌঁছুলে কাজি সাহেব রাগ করবেন। বলবেন, আমি ক'টায় উঠি জানো? পাঁচটা। পাঁচটায় তোমাদের মাঝরাত হয়।

রুমির কথা মনে পড়ল অহেতুক। আর তক্ষুণি মনে হলো, কাজি সাহেবকে দিয়ে নিশাতের ভাইজানের কাছে প্রস্তাব পাঠাবার কথা ভাবছিলাম। সেটা খুব সহজ হবে না। খুব অস্বস্তি লাগল। জালালকে পাঠাব? মন্দ হয় না। কিন্তু কাজি সাহেব তো আজ হোক কাল হোক জানতে পারবেনই। রুমির জন্যে কাল্পনিক ভয়টাকে প্রশ্রয় দেবার কোনো মানেই হয় না। আমি একেক সময় এমনসব কাণ্ড করতে পারি। কাজি সাহেবকেই বলব। বরং তাঁকে পাঠানোই সবদিক দিয়ে সুন্দর হবে। আমার সিনিয়র, নাম আছে, গাড়ি আছে। বিয়ের প্রস্তাব, একটু আভিজাত্য হলে চমৎকার মানায়।

আজ নিশাতকে কলেজে টেলিফোন করে বলতে হবে। ভাবতে ভাবতে খুব হালকা লাগল ভেতরটা। নিশাতের সারারাত কেমন করে কেটেছে সেইটে কল্পনা করতে ডুবে গেল আমার মন। টুথ ব্রাশে পেস্ট লাগালাম, ঠাণ্ডা পানিতে আমার চোখ থেকে ঘুম ধুয়ে গেল, জালালের ছেলেমেয়েরা পড়তে না বসার দরুণ বকা খাচ্ছে, জালাল আমার হাতে খবর কাগজের ভেতর শীটটা দিল, চায়ে একটা পাত ভাসছে, সেটাকে চামচে কিছুতেই তুলতে পারছি না— সারাক্ষণ নিশাতের কথা মনে পড়তে লাগল। কাল এলোমেলো কী সব স্বপ্ন দেখেছি যেন— একটা জায়গায় অনেকগুলো বেলুন উড়ছিল, তারপর আর মনে নেই। আবার দেখলাম সিনেমা শুরু হয়ে গেছে, আমি তবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছি , কেন যেন ঢুকতে পারছি না, অথচ খারাপ লাগছে না একটুও, আমার যেন কোনো উদ্বেগই নেই। তারপর কী হলো জানি না। দেখলাম একটা গাড়ি মাঠের ভেতর দিয়ে খেলনা ট্রেনের মতো যাচ্ছে, কিন্তু কোনো শব্দ নেই, হুইসেল নেই, একজন প্যাসেঞ্জারও নেই— সবগুলো কামরা খালি।

জালাল জিগ্যেস করল, কাল তোমার পকেট কাটা গেছে শুনলাম।

আমি বললাম, সে এককাণ্ড শোনো, দাঁড়িয়েছি জিন্নাহ এভেন্যুতে... উৎসাহের সঙ্গে তাকে সবটা কাহিনী শোনালাম।

সে শুনে খেদোক্তি করল, তোমার মতো গাধা তো একটা দেখিনি। এত টাকা নিয়ে ভিড়ের মধ্যে যেতে আছে?

তখন বললাম, আরে শোন। তোমাদের বলাই হয়নি, আমি বিয়ে করছি।

কাকে? একসঙ্গে জালাল আর তার স্ত্রী জিগ্যেস করল, হঠাৎ খুশিতে লাফিয়ে ওঠা গলায়।

আবার কাকে ? নিশাত।

আরে— আরে... ওরা কী বলবে বুঝতেই পারল না। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল খামোকা।

বললাম, আর আমি কাল পরশু একটু দেশে যাচ্ছি। চাচাদের বলতে হবে না ? অনেকদিন তো যাইনি, দেখিনি।

জালালের স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, যাওয়া উচিত। বিয়ের ব্যাপার, তাঁরাই তো আগে জানবেন, আসবেন। কী বল ? যেন এটা একটা মতামতের অপেক্ষা রাখে এমনি চোখে তিনি তাকালেন স্বামীর দিকে।

আমি হেসে বললাম, এতদিনে মনটা বেঁধেই ফেললাম। অনেক হলো। আর কত ?

নাশ্‌তা শেষে ঘরে এসে একা দাঁড়াতেই বুকটা ভার হয়ে গেল আমার। মুখ ফিরিয়ে চোর চোখে দেখলাম বাইরে বারান্দায়। না, দেখা যাচ্ছে না কাউকে। ওদের কাছে তো আমি বলতে পারি না। আসলে আমি যাচ্ছি আমার মাকে দেখতে।

স্বপ্নের মতো জ্যোছনা নেমেছে। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা অস্পষ্ট গাছ আর বাড়িগুলো ক্রমাগত ঘুরছে, যেন একটা বাঁধনে আটকা পড়ে গেছে ওরা এই বিশ্বের সঙ্গে। সে বাঁধন কিছুতেই আর খোলা যাচ্ছে না। তাই বারবার, গ্রামে গ্রামে, অন্ধকারে অন্ধকারে ফিরে আসছে, গাছ, আবার গাছ, বাড়ি, আবার বাড়ি।

চীনে দোকানে যখন খাচ্ছিলাম আমরা, নিশাত বলছিল, আমার মা থাকলে খুশি হতো। ভাইজানও হবেন।

বিকট হুইসিল দিল আমাদের ট্রেন। গলা বাড়িয়ে দেখি ব্রীজ আসছে। জ্যোছনার মধ্যে অতিকায় একটা খেলনার মতো দেখাচ্ছে। এইতো নিচে ছবির মতো দুধে ভরা নদী, নদীর 'পরে একটা কালো নৌকা, এতটুকু। উদ্দাম শব্দ উঠছে। রাতের স্তব্ধতা খানখান করে লোহার কড়ি বরগায় প্রতিধ্বনি তুলে, উদ্দাম করে চলেছে আমাদের ট্রেন। একটা শূন্যতার মধ্য দিয়ে যাত্রা— ওপরে স্বচ্ছ আকাশ, নিচে অতল নদী, আকাশটা স্বচ্ছ আর ভঙ্গুর, আর কাছে অথচ দূরে, যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবো, লাফিয়ে উঠলে পৌঁছে যাবো বেহেশতের দরবারে।

আমার তখন ভয় করল খুব। যেন পড়ে যাবো। আমাদের ট্রেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তলিয়ে যাবে নদীর অতলে।

মা-র সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার।

সড়াৎ সড়াৎ করে সরে যেতে লাগল প্রতিধ্বনিগুলো, পিছিয়ে যেতে লাগল। চাকার নিচে আবার মাটির স্পর্শ বুঝতে পারছি। আবার দু'পাশের থোকা থোকা অন্ধকার— মানে গাছ, সবুজ বাতি, আশেপাশে আরো অনেকগুলো লাইন, চিকচিক করছে, জীবন্ত স্রোতের মতো ওরা সচল, মন্থর হয়ে আসছে আমাদের ট্রেন।

আসলো। যেন প্লাটফরমে নামলেই দেখতে পাবো মাকে। উৎসুক হয়ে জানালার বাইরে তাকাতেই বুকের ভেতরটা থমথম করে উঠল আমার। এ যে কী অনুভূতি না ভয়, না আনন্দ,

না বেঁচে থাকা, না কিছু। কিছু না, এবং একসঙ্গে সবকিছু।

নিশাত আমার বউ হবে এই আনন্দটার মতো স্পন্দিত বিশাল যেন আর কিছু হয় না। সে রাতে শুয়ে শুয়ে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। যেন এক্ষুণি একটা বিকট চিৎকার চিরে ফেলবে আমার হৃদয়টাকে।

আমার সমস্ত কিছু যেন আরেক জীবনে, অন্য কারো জীবনে ঘটে গেছে। অতীতের কিছুই আমার নয়, তবু সেই অতীতটা দুঃসহ বেদনার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে, মৃত্যুমুখে অজগরের মতো আছড়াতে আছড়াতে আমার ভেতরে মাথা কুটে মরছে।

কুলির মাথায় সুটকেস দিয়ে পথ জিগ্যেস করে পথ চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের জন্যে জ্যোছ্না ঢাকা পড়েছে শাদা মেঘে। আমার খুব শীত করছে। জাম্পারটা পরেছি, তবু।

কে জানে কীভাবে আমাকে ওরা নেবে। চিঠি লিখে দিয়েছিলাম। কাজেই আচমকা হাজির হবার নাটকীয়তা থেকে বাঁচা গেছে। তবু ছাব্বিশ বছরের ব্যবধান কি সহজ হয় এত সহজে ? মাকে আমি বলব নিশাতের কথা। আমার ওপরে কেউ নেই, আমার অপেক্ষা করতে হবে না কারো মতামতের। তবু স্বাধীনতা শূন্য ঠেকল, নিশাত যখন বলল আমার বউ হবে। কেউ থাকুক যার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আমি বলতে পারি— এই করছি, আমাকে নিষেধ করো যদি ভালো না লাগে; বলতে পারি— আমাকে দোয়া করো, যদি ভালো মনে হয়।

সেদিন সারারাত মা-র কথা আমার মাথায় ঘুরেছে অন্ধ একটা পাখির মতো, কিন্তু বুঝতে পারিনি। সকালে যখন উঠলাম তখন চোখ খচ্খচ্ করছিল। কাজি সাহেবকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাবার কথা, তাঁকে বলা হলো না। নিশাতের সঙ্গে বসে বিস্তারিত আরো অনেক কিছু কইবার শোনবার কথা, তাও হয়নি। সবার চেয়ে বড় হয়ে, বড় করে দেখা দিলেন আমার মা। যেন তাঁকে যতক্ষণ না বলতে পারছি, তাঁর মতামত না শুনতে পারছি, তাঁর দোয়া না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার আর স্বস্তি নেই।

দেখা হলো অনেক পরে। অন্ধকারের ভেতরে বসে থাকতে থাকতে যখন আমি আর বুঝতে পারছিলাম না আমার জীবন্ত অস্তিত্বকে, তখন মা এসে দাঁড়ালেন আমার স্বপ্নের ছবিকে খানখান করে।

বাড়ির সামনে বিরাট আঙ্গিনা। একপাশে পুকুর। ঘাটে শান বাঁধানো বসবার জায়গা। চৌচির হয়ে ফেটে আছে, আর ভেতরে শুয়ে আছে কালো রেখার মতো অন্ধকার। পুকুর থেকে উঠে আঙ্গিনা পেরিয়ে বাড়ির দিকে মুখ করলে বড় বড় চালাঘর চোখে পড়ে। খড়ে ভর্তি। গন্ধটা সুন্দর। খসখস করছে। ভূতের মতো শুয়ে আছে তার 'পরে লোক।

এরকম দু'টো চালার পরে কয়েকটা মাথা ঝাঁকরা আম গাছ। সেই গাছের ফাঁক দিয়ে গেলে ভেতর-বাড়ি।

প্রথমে যাকে দেখলাম, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ছাব্বিশ বছরের ব্যবধান এক সেকেণ্ডে দৌড়ে পার হয়ে যেন মা'র সামনে দাঁড়ালাম। আমার মাথার ভেতবটা ঝিমঝিম করতে লাগল, স্মৃতির মধ্যে বুককাঁপানো ট্রেনের হুইসিল শুনতে পেলাম। কিছু বলতে পারলাম না। সে আমার মুখের কাছে হারিকেন তুলে নিঃশব্দে নিরিখ করতে লাগল। কথা বলল না, নড়ল না; স্তম্ভিত সময়ের মধ্যে আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবিকল যেমন আমি ভেবেছিলাম। সেই দুঃখী, নির্বাক, মলিন মুখ। অবিকল সেই নীল

তাঁতের ময়লা শাড়ি পরনে, মাথার 'পরে একটুখানি ঘোমটা, খালি পা, রূপোর হাঁসুলি গলায়, শিথিল, শ্যামল, পুঞ্জীভূত অবোধ মমতার মৃত রেখায় গড়ে ওঠা একটি মুখ। হারিকেনের নিস্তেজ আলোয় যেন আরো কাছে দেখাচ্ছে তাকে। যেন আরো করুণ হয়ে উঠেছে তার অস্তিত্ব।

আমি একটা কিছু বলতে যাবো, ঠিক তখন সে হারিকেনটা নামিয়ে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। এতক্ষণ যে আমগাছগুলোর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম আবার তারা সহাস্যে অন্ধকারে আমার বন্ধু হবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল। কুলিটাকে বিদেয় করলাম আমি।

তারপর আবার এলো সে। বলল. কী বলল অস্ফুট কণ্ঠে আমি বুঝতে পারলাম না। আমার সুটকেশ পড়ে রইলো বাঁ পাশে একটা বড় টিনের ঘরের দাওয়ায়। সেদিকে আমি হাত বাড়াতেই শুনলাম, 'থাইক। আনবনে।' আমি তার পেছনে চললাম। যেন আমি পায়ে পায়ে এক অন্ধকার থেকে আরেক অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমার ছোটবেলায় ফিরে যাচ্ছি। যেন আমি আগেও কতবার এসেছি এ বাড়িতে, যদিও সত্যি তো আমি কোনদিন আসিনি। যেন এইবার আঙ্গিনা থেকে ভেতর-আঙ্গিনায় যাওয়া, খড়ের দুর্মর দুর্বোধ্য সুবাস, পাতার মধ্যে থোকা থোকা অন্ধকার, দূরের থেকে থেকে হারিয়ে যাওয়া, কাউকে হাটের পথে ডেকে ডেকে ফেরা, ঐ হারিকেনের চলমান আলো, পায়ের নিচে তকতকে মাটি— সব আমার চিরদিনের চেনাশোনা। দূরে দূরে, আঙ্গিনায় চারদিকে থমথমে বাতি নেভা ঘরগুলো, তাদের চালে তারা ও জ্যোছনার অস্পষ্ট বার্নিশ— দু'পা এগোতেই ওপাশে অন্ধকারের মধ্যে গণগনে চুলোর লাফানো আগুন আর কাঠ পোড়ার পট্‌পট্‌ শব্দ, কয়েকটা মুখ তাকাল আগুনের পটভূমিতে আমার দিকে।

বারান্দায় উঠে একটা চেয়ার দেখিয়ে সে বলল, বসেন। আম্মা আসতেছে।

আমি চোখ তুলে তাকালাম। বুঝতে পারলাম, আমি ভুল করেছি। এতো আমার মা নয়। স্বস্তিতে সুন্দর লাগল ভেতরটা। এতক্ষণ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করেছিলাম, নিঃশ্বাস পড়ল।

হারিকেনটা নামিয়ে রেখে গেছে। তার আলোয় পায়ের কাছটা আলো হয়ে আছে আমার। ভারী অচেনা লাগছে। অপলক তাকিয়ে আছি আমার জুতোর দিকে। জুতোর দু'পাশে কাঁচা এঁটেল মাটি লেগেছে, অদ্ভুত দেখাচ্ছে, যেন আর কারো জুতো পরে বসে আছি আমি।

অনেকক্ষণ পরে একটা অব্যক্ত মৃদু ধ্বনি উঠল আমার পেছনে। অন্ধকারের ভেতর থেকে আমার সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল আলো। তাকিয়ে দেখলাম, প্রথমে সেই যে আমাকে হারিকেন দেখিয়েছিল সে তার হাতের আলো তুলে ধরে আছে. তার আলো যাকে আলোকিত করে তুলেছে তাঁকে স্বপ্নেও আমি কোনদিন দেখিনি।

আমার মা।

না বিস্ময়, না ভীতি, না কিছু। চেনাও মনে হলো না, অচেনাও নয়। দূরেও না, কাছেও না। সারা অঙ্গে ঝলমল করছে অলঙ্কার। পদ্মপাড় শাড়ি পরনে। শাদা। অত্যন্ত ফর্সা, আর ভারী, থলথলে একটি মুখ। ঠোঁটের পরে খয়েরি রেখা পানের।

আমি কদমবুসি করলাম। নিঃশব্দে তিনি সেটা গ্রহণ করলেন। তারপর নির্লিপ্ত কণ্ঠে অনাবশ্যক প্রশ্ন করলেন, কখন আসছ?

এইমাত্র।

ভালো আছো না ?

জি।

ঢাকা-ই থাকো ?

হ্যাঁ। ওখানে ওকলতি করি।

বাসা নিয়া ?

জি— ঐ আর কী—।

মা তখন পাশ ফিরে বললেন, ওরে পানি দিছাস ? গামছাটা বাইর কইরা দে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ফিরোজার বাপ কইলো তুমি কাইল আইসবা।

একদিন আগে হয়ে গেল। আমি বললাম।

আইচ্ছা। তুমি বসো।

তিনি চলে গেলেন। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একটা ঝড়ের মতো দৃশ্যের অবতারণা হবে ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু তার বদলে দেখলাম ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত একটি মানুষকে। তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের নয়, যেন লৌকিকতার সম্পর্ক। তার সঙ্গে কেবল কুশালাচার বিনিময় আর সাংসারিক উন্নতি-অবনতির সংবাদ ছাড়া আর কিছুই দেয়া নেয়া যেন চলতে পারে না। আমি তাঁর ছেলে নই, অন্য কেউ, অন্য কোনো জন। এমন একজন, যাকে ভেতর-বাড়ি পর্যন্ত আসতে দেয়া চলে, বারান্দায় তার বসবার আসন হয়, বাড়ির গিন্নী তার সঙ্গে এক-আধ মিনিট আলাপ করতে পারেন দরোজায় দাঁড়িয়ে। ঐ পর্যন্ত।

মনটা বিষিয়ে উঠল আমার। অনুতাপ হলো। কেন আমি আসতে গেলাম এখানে ? কে আমাকে বলেছিল ? কী দরকার ছিল ? আমার যেন মনে হলো, যার সংগে এক মুহূর্ত আগে খুচরো আলাপ করলাম, তিনি আমার মা নন। আমার মা আছেন অন্য কোথাও, অন্য কোনো গ্রামে। এখান থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে যে-কোনো দিকে কয়েক মাইল হেঁটে গেলেই তার দেখা পাবো; যিনি দেখা হলে আমাকে কিছুই বলবেন না। কোনো কথা হবে না, এবং আমার মনে হবে, আমি তাঁর দেখা পেয়েছি।

আমি কিছুদিন থেকেই লক্ষ করছি আমার মনটা মাঝে মাঝে আমার হাতের বাইরে চলে যায়। সে যা খুশি তা করতে থাকে, তার খেয়াল খুশি নির্বিবাদে অনুগত ক্রীতদাসের মতো তামিল করে আমার জীবন্ত দেহটা, আমি কিছু করতে পারি না। যেমন, আমি যখন রাগ করি, তখন হয়ত রাগতে মোটেই চাই না। যখন একজনকে ভালো লাগে তখন আসলে হয়ত তাকে ঘৃণা করতেই চাই। এ এক অদ্ভুত টানাপোড়েন। এর কিস্‌সু বোঝা যায় না। রুমিকে দেখলে আমার গা শিরশির করে; শিউরে উঠি, কিন্তু হেসে কথা বলি। আদালতে যে আসামির ওপরে অসীম করুণা হয়, তাকেই নিষ্ঠুর তরবারির মতো জেরার আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত, অবসন্ন, পরাজিত করি। অথবা বিয়ের কথা বলব নিশাতকে, আমার মনের মধ্যে এক দ্বিতীয় মন কেবলি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, ছুঁতো খুঁজে দেরি করিয়ে দেয়।

শিশিরে ভেজা ঢিলে-ঢালা ঘুড়ির মতো শিথিল ঠেকছে ভেতরটা। এ কোন অচেনা এসে দাঁড়াল আমার সমুখে মা বলে ? যেন যাবার জন্যে, আমি উঠে দাঁড়ালাম।

সেদিন রাত্তিরের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। মা, মা'র দ্বিতীয় স্বামী খোরশেদ

সাহেব, তাঁর আগের পক্ষের বিধবা বড় মেয়ে ফিরোজা আর তার ছেলে রিয়াজ; এ পক্ষের— আমার সৎ ভাই-বোন আটজন। একে একে তারা এসে দাঁড়াল আমার সমুখে। চোখে তাদের অনিশ্চয় সন্দেহের ঠাণ্ডা দ্যুতি, দ্বিধার থরথর হাওয়া। বোনগুলো ছোট ছোট; তাদের গায়ের নীল কী হলুদ একরঙা কী ছোট ছোট প্রিন্ট ফুল করা জামা থেকে উঠছে জ্বালাকর গন্ধ, মুখে গৃহপালিত জন্তুর ছায়া। তার মধ্যে একজনের মুখ অবিকল আমার মতো। তার নাম জিগ্যেস করলাম, বলল না; পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। যেন বুঝতে পারল না আমার কথা। ওদের বাবা তখন বললেন, অর নাম নীলা।

খানিকক্ষণ গল্প করে উঠে গেলেন খোরশেদ সাহেব। তাঁর বুকের মধ্যে জমে থাকা কাশির প্রবল উঠে আসবার চেষ্টা আর খড়মের আওয়াজ অন্ধকারকে ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। যেমন শুনেছিলাম ঠিক তেমনি এই মানুষটা। যতটুকু না করলে নয় মেহমানকে, তার বেশি কিছুই পেলাম না তাঁর কাছ থেকে। পেলে কি খুশি হতাম? তাই কি আশা করেছিলাম? কী জানি। এটুকু কেবল মনে আছে, আমার বড্ড ভয় করছিল। যেন আমি একটা বিরাট অপরাধ করেছি এবং যে-কোনো মুহূর্তে তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন। চলে যখন গেলেন, স্বস্তি পেলাম।

ফিরোজা এলো। এসে বলল, বিছানা কইরা দিছি।

তারপর হাতের লণ্ঠনটা রেখে বলল, শ্যাষ রাইতে ঠাণ্ডা পড়ে। গায়ে দেওয়ার কিছু আনেন নাই?

আমি বললাম, তাই নাকি? নাতো।

খ্যাতা দেই একখান? বলে সে চলে গেল, হয়ত কাঁথা আনতে। তখন সুন্দর লাগল ফিরোজাকে। ও আমার কেউ নয়, আমার মা-র রক্ত নেই ওর শরীরে, অথচ আমরা ভাইবোন। শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল, যেন কোথাও কিছু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, প্রবল মায়া করছে ফিরোজার জন্যে। কয়েক ঘণ্টা আগেও যাকে জানতাম না, যাকে দেখিনি, সে-ই যেন কতকালের চেনা মনে হচ্ছে। শ্যামল মুখ ওর চিকচিক করছিল আলোয়। নিরাভরণ বাহু, কণ্ঠ, কর্ণমূল যেন হাহাকার করছে। মনে হচ্ছে, ফিরোজার জন্যে কোন উপকার যদি আমি করতে পারতাম তো পরম শান্তি মিলতো।

পায়ের শব্দে ফিরোজাকে টের পেলাম। ভালো করে তাকাতে পারলাম না ওর দিকে। হাত বাড়িয়ে কাঁথাটা দিল ও। চুপ করে থাকা যায় না আর। বললাম, কে সেলাই করেছে? মা?

না, আমি।

চলে গেল না, দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসল নিঃশব্দে। বলল, আপনের কথা আম্মা একদিন কইছিল। আমি কই, বাঁইচা থাকলি একদিন দেখমু।

এলাম তো তাই।

রাইত হইছে, যাই।

আমার মায়ের জন্যে অবাক লাগছিল সবচে' বেশি। এই যে মেয়েটা আমাকে কোনদিন দেখেনি, সেও কত আপন হয়ে উঠছে। অথচ মা এলেন না একবারও। যেন আমার আসা ফিরোজাদের জন্যে। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বুঝতে পারলাম ছাব্বিশ বছরে রক্তের সর্বশেষ ধারাটা নিঃশেষে শুকিয়ে গেছে, মরে গেছে বন্ধন, হারিয়ে গেছে স্মৃতি। এখন আর কিছুতেই

আমি তাঁকে কাছে পাবো না, না তিনি আমাকে। আমার চলে যাওয়াই ভালো।

ভাগ্যি ভালো নিশাতকে বলে আসিনি কোথায় যাচ্ছি। তাহলে তাকে আর মুখ দেখাতে পারতাম না। ইচ্ছে থাকলেও অবশ্যি বলা হতো না। কারণ, ওকে বলেছি, আমার মা নেই। নিশাত— ফিরে গিয়েই নিশাতকে ডাকতে হবে। ওর ভাইজানকে বলতে হবে। বিয়ের তারিখটা ঠিক করে ফেলতে হবে।

আসলে, মরে গেলেই ভালো ছিল আমার। মা যদি সত্যি সত্যি মরে যেতেন তো এই ভীষণ আঘাতটা আমাকে পেতে হতো না। অন্ধকারে শুয়ে আছি, এখন তো আর নিজের মনের কাছে কিছুই লুকোনো সম্ভব নয়। আমি খুব আহত হয়েছি মা-র ব্যবহারে। কিছুতেই মেলাতে পারছি না, কী করে এমন হতে পারে ? ছেলেকে রেখেও নির্বিকার মুখ করে চলে যেতে পারে মা ? নাড়ির সঙ্গে টান থাকে নাকি মায়েদের। মিথ্যে কথা। আমি শুধু কল্পনাই করতে জানি, বাস্তব যে কত নিষ্ঠুর তা বুঝি না। যে মাকে মনে মনে কতদিন দেখেছি, তার একেবারে বিপরীত ছবি দেখে তাহলে আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না। পাগলের মতো ঢাকা থেকে এতদূর ছুটে আসার মতো বোকামিও করতাম না আমি।

বরং ফিরোজাকে আমার আপন মনে হচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে কে জানে ? আমি চাই না, তবু। তাই আরো রাগ হচ্ছে নিজের ওপর, আমার মা-র ওপর। আক্রোশে আঙ্গুলের ডগাগুলো লাল হয়ে উঠছে। উঠে পায়চারি করতে ইচ্ছে করছে আমার। রাত্রির নিস্তব্ধতা থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে ঝিম-ঝিম- ঝিঁ-ঝিঁ করে। থেকে থেকে একটা বাতাস দিচ্ছে। সারাদিন ট্রেন চলার ক্লান্তিতে নিস্তেজ নিরুৎসাহ লাগছে ভেতরটা। যেন আমি মরে যাচ্ছি; বা আজ রাতেই যাবো।

ফিরোজার কাছে মা আমার গল্প করেছিলেন— বিদ্যুতের মতো মনে পড়ল কথাটা। কী বলেছিলেন যে, ফিরোজা ভেবেছিল, বেঁচে থাকলে আমাকে একদিন দেখবেই ? হয়ত ফিরোজার ছেলে রিয়াজকে দেখে মনে পড়েছে আমাকে। হয়ত রিয়াজকে কোলে করে বসেছিল ফিরোজা, তখন আচমকা মা-র মনে হয়েছে আমার কথা। ফিরোজার যদি আবার বিয়ে হয়ে যায়, তাহলে রিয়াজ বড় হবে আমার মতো। তা কেন ? নিজের ভাগ্য সবার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছি আমি। রিয়াজকে নিয়েই তো দ্বিতীয় সংসার করতে পারে ফিরোজা। হয়ত তারা খুশি হয়েই কোলে নেবে তাকে। মানুষ করবে নিজের ছেলের মতো। রিয়াজ কেন আমার মতো হতে যাবে ? আমার মাথার কিছু ঠিক নেই। ফিরোজারই বা আবার বিয়ে হতে যাবে কেন ? আমার মা ছিলেন গরিবের মেয়ে, রূপ ছিল, যৌবন ছিল হয়ত— বোমার মতো বিপজ্জনক একটা বস্তু অভাবের সংসারে। তাই তাঁর না হয় হয়েছে, ফিরোজার কেন হতে যাবে ? আমাকে যদি দিত, আমি রিয়াজকে নিয়ে যাই ঢাকা। আমার কাছে থেকে পড়বে, বড় হবে। কাল বলব ফিরোজাকে ? আশ্চর্য তো, ফিরোজা আমার কে ?

এখানে, এ বাড়িতে আসবার পরমুহূর্ত থেকেই আমার মন যেন সহস্র চক্ষু হয়ে উঠেছে— এইমাত্র সেটা টের পাচ্ছি। সব কিছুর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি অর্থ, সব কিছুকে নিজের অংশ করে তোলার প্রচণ্ড টান বোধ করছি। যেন এমনি করে আমার ব্যর্থতা, ক্ষয়, স্মৃতি সমস্ত কিছুর ওপরে গড়ে উঠবে অসামান্য সুন্দর সৌধ। আসলে সব কষ্টের মূলে রয়েছে মানুষের এই কষ্ট পারার ক্ষমতাটা। আমার মন যদি পাথরের হতো, আমার চোখ যদি দৃষ্টির অতীতে কিছু না [redacted] *হলে চমৎকার দিন কাটতো আমার। কিন্তু কোথায় যে কবে কুড়িয়ে পেলাম*

এই স্বভাবটা— ঘুরে ফিরে উলটে পালটে একটা ছবি, একটা মুহূর্ত, কী একটা অনুভূতিকে না দেখতে পারলে যেন শান্তি হয় না। নিশাত বলে, আমার আইন না পড়ে সাহিত্য কী দর্শন পড়া উচিত ছিল।

হয়ত আগাগোড়াই আমি ভুল করে এসেছি। জীবনে যা করা উচিত ছিল, যা করলে আমার সুখে সম্মানে দিন কাটতো, তা করিনি। ঝোঁকের মাথায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখার প্রবল ইচ্ছেটা যদি না থাকত, তাহলে আজ আমি আদৌ আসতাম না মাকে দেখতে। নিশাতকে যদি ভালো না বাসতাম তাহলে আসতাম না।

অথচ এমনিতে আমি খুব হিসেবি। অন্তত সবাই তাই বলে। জালাল এ নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করে। জালালের বউ খোঁচা দেয়। নিজেকে যারা এমনি ক্রমাগত বিশ্লেষণ করে চলে তাদের কি সতর্ক পুরুষ বলে? বলে হিসেবি লোক? বৈষয়িক লোক?

মা-র ছবিটা কালো মনে হচ্ছে। মনটা খুব খারাপ। যে মহিলাকে দেখলাম ভরা মুখ, অলঙ্কারে আভরণে সম্ভ্রম ছড়ানো, ফর্শা তাঁর সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারছি না ছাব্বিশ বছর আমার স্বপ্ন-জাগরণে দেখা মাকে। খোরশেদ সাহেবের স্ত্রী হিসেবে তাকে কোনদিন ভাবতে পারিনি বলেই কী এই কষ্ট আমার? এই ছবি না মেলার দুঃখ?

কাল সকালেই চলে যাবো। এই সিদ্ধান্তটা নেবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সমস্ত মেঘ যেন কেটে গেল, ভালো লাগল ভেতরটা। শীত শীত করছে। ফিরোজা ঠিকই বলেছিল। কাঁথাটা টেনে নিতেই পুরনো সুতোব আচ্ছন্ন করা ঘ্রাণে ঘুম এলো। যেন পুরনো রোদ-বৃষ্টির গন্ধ সঞ্চিত হয়ে আছে এই কাঁথাটায়। টুপটাপ করে শিশির পড়তে শুরু করেছে। চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ।

ঘুমের মধ্যে মনে হলো সুন্দর রোদের মধ্যে গা খুলে বসে আছি আমি। খুব আরাম লাগছে। হাত পা টান-টান করে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। চোখ মেলে দেখি, সেই মুখ, সেই অলঙ্কারের শব্দ, ফর্সা চাঁদের মতো। আমার মা।

চমকে উঠে বসতেই একেবারে বুকের মধ্যে পড়লাম গিয়ে তাঁর। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। হাত বুলোতে লাগলেন মাথায়, চুলের ভেতরে, আমার পিঠ ঘষতে লাগলেন যেন প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে আমার ওখানে।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটলো এক পলকের মধ্যে। আমার ঐ রোদের আমেজ থেকে তাঁর কান্না পর্যন্ত। হতবাক হয়ে পড়ে রইলাম আমি। যেন স্বপ্ন দেখছি, আর কিছু না।

তারপর আস্তে আস্তে বোধ ফিরে এলো। টের পেলাম, রাত এখন অনেক। চোরের মতো মা এসেছেন আমার ঘরে। খুব করুণা হলো তাঁর জন্যে। ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। তখন ফিসফিস করে মা জিগ্যেস করলেন, গ্যাদা আইছস ক্যান?

কী জবাব দেব এর? মা আবার নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। এত দূর মনে হলো তাঁকে যে বাধা দিতে পারলাম না। তিনি আবার জিগ্যেস করলেন, টাকা পয়সা দরকার? কয় ট্যাকা?

না, না।

আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম তাঁর কথা শুনে। তিনি কি মনে করেছেন, টাকার দরকার পড়েছে বলে আমি এসেছি? পৃথিবীতে এত কথা, এত কারণ থাকতে, আমার মা'র কেন মনে হলো টাকার কথা? বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না ভালো করে। চৌকির 'পর আধো উঠে বসেছেন, কোলে লুটিয়ে পড়েছে আঁচলটা। অদ্ভুত অর্থহীন কয়েকটা ভাঁজ সৃষ্টি হয়েছে আঁচলে। আমার চোখ স্থির হয়ে রইল সেখানে। যেন সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা লুকানো রয়েছে, আমার দৃষ্টি ওখানে খুঁজছে সেই চাবিকাঠি।

বললেন, ফিরোজার বাপ কত রাগ কইরলো। কয়, ছাওয়াল আইছে ক্যান ? কী চায় তারে জিগ্যাস করো নাই ?

আমি কী ক্ষতি করেছি খোরশেদ সাহেবের যে তিনি না দেখেই আমার শত্রু হয়ে আছেন বুঝতে পারলাম না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো এসেছি, এর মধ্যে এত কথাই বা কখন হলো, তাও ঠাহর করতে পারলাম না। মনটা বিষিয়ে উঠল। তেতো গলায় বললাম, সে কথা তিনি জিগ্যেস করলেই পারতেন।

চুপ করে রইলেন মা। একটা নিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। বললেন, তাঁর মাথার উপর কত ঝামেলা— এত বড় সংসার যে কী কইরা চালায় তা সে জানে আর উপরে আল্লাহ জানে।

আমার কথার পিঠে এ কথার মানেটা স্পষ্ট হলো না। আরো রোখ চেপে গেল আমার। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, টাকার দরকার, ছি-ছি, তাই হলে আপনার কাছে আসতাম না, ছাব্বিশ বছরে একটা খবর নিয়েছেন আপনি আমার ? আপনাকে মা বলে কে ? যান আপনার ছেলে-মেয়েদের কাছে। লজ্জা করে না লুকিয়ে আসতে ? ভালো মানুষী দেখাতে ?

আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না, কী ধরনের পরিস্থিতি হলে মানুষ তার মাকে এ রকম কথা বলতে পারে। আমি যদি নিজেই একথা শুনতাম, হেসে উড়িয়ে দিতাম একটা অলীক গল্প বলে। কিন্তু জীবনটা অলীকের ঊর্ধ্বে, অসম্ভবের হাতে, এক দুর্বোধ্য ঘটনা-প্রবাহ ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তাই জীবন নতুন নতুন চমক দিতে পারে আমাদের।

মা তখন আবার নতুন করে কাঁদতে বসলেন। কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ালেন অনিশ্চিতভাবে। তাঁর কান্নাটাকেও মেকি মনে হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে, নিজের জন্যে নয়, আমার জন্যে নয়, এক অর্থহীন অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে কেঁদে চলেছেন তিনি।

কিন্তু আসলে আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছি। ওরকমভাবে কথাগুলো না বললেই পারতাম। কাল সকালেই তো চলে যাবো, কী লাভ হলো মনটাকে তেতো করে ? আরেক মুহূর্ত হলে হয়ত আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে ক্ষমা চাইতাম, কেঁদে ফেলতাম। চোখে পানি এসে গিয়েছে আমার টের পাচ্ছি। তার আগেই মা বললেন, মাইনষরে শান্তি দিলি না তুই। তুই তো কবিই। তুই কবি না ? বাপেরে জানে মারলি, সে সম মনে আছিল না ? এখন আইছস মায়ের জল্লাদ হইয়া ? যে কথা কাউরে কই নাই, তাই আমি আইজ চিল্লাইয়া কমু। তর জন্যে আইজ আমার এই শাস্তি। তুই, তুই মারছস তর বাপেরে।

তাঁর চাপা চিৎকারে শিউরে উঠলো অন্ধকার। এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল আমার আত্মা। কালো একজোড়া হাত যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। শুকনো গলায় ঢোক গেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে জিগ্যেস করলাম, আমি, আমি মেরেছি মানে ?

সে মানুষটা সাঁতার জানতো না। আজরাইল হইয়া আইছিলি তুই মনে নাই ? গাঙের পাড়ে খাড়াইয়া আছিল, ধাক্কা দিয়া তারে ফালাইলি। ভরা বর্ষার ঢল থিকা আর সে উইঠল না। আমার কপাল ভাইঙা এখন আমারেই শাসাস ? কমুই তো, তর সাথে আমার কিসের

সম্পর্ক ? আমি চিল্লাইয়া কমু—

একটা দীর্ঘ তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে কে যেন আমার হৃদপিণ্ডটা উপড়ে নিয়ে চলে গেল। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

আমার চশমার কাঁচ আচ্ছন্ন হয়ে গেল গরম কফির ধোঁয়ায়— ঠিক যে মুহূর্তে চুমুক দেবার জন্য মুখ নামিয়েছি, তখন।

এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগত; এই বাষ্প লেগে দৃষ্টি শাদা হয়ে যাওয়া, বিন্দু বিন্দু জলকণার মধ্যে অণুর মতো রামধনুর রং দেখতে পাওয়া। আর সুগন্ধ, কালোকফির সাড়া জাগানো সুবাস। অন্যান্য দিন, এই রকম একা বসতাম আমি, কোনো রেস্তোরাঁয়, কালো কফির পেয়ালা নিয়ে, বিকেলে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইতো এয়ার কণ্ডিশনার থেকে, লোকেরা চলত মৃদু পায়ে, সুন্দরী মেয়েদেব দেখা পাওয়া যেত। ভুলে যাওয়া এক উপন্যাসে পড়া নায়কের মতো আমি কালোকফি চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ করতাম, যেন এমনি করেই সে নায়ক কাছে পাচ্ছে তার মেয়েটিকে যে মেয়েটি ভালোবাসত কালোকফি। আমার অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে, নিশাতকে ঐ উপন্যাসের মেয়েটির মতো কালোকফির জন্যে পাগল হতে দেখি। কিন্তু আমার স্কুটারে চড়ার আনন্দও যেমন অর্থহীন কিংবা দুর্বোধ্য নিশাতের কাছে, তেমনি কালোকফির স্বাদটা। নিশাত কালোকফি একেবারেই খেতে পারে না। সরু করে ফেলে ঠোঁট, বলে, হেমলক। বিষ।

আমি তখন হো হো করে হেসে বলি, আর আমি সক্রেটিস ?

আহা। তার পায়ের কড়ে আঙুল। বলতে বলতে নিশাত ঢেলে নেয় দুধ। কালোকফির স্বচ্ছ মেহগনি রংটা ঘুরতে ঘুরতে বাদামি হয়ে যায়। আমার মনে হয়, আমার একটা আনন্দ ঐ পেয়ালার মধ্যে চামচের আবর্তনে বিষাদের চেহারা নিল।

ঢাকায় ফিরেছি সকালবেলা। স্টেশন থেকেই টেলিফোন করে দিয়েছি নিশাতের কলেজে। সন্ধ্যে সাতটায় দেখা হবে, মোহাম্মদপুর স্কুলের বোর্ডিং গেটে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। এবং আজকেই ঠিক করে ফেলব বিয়ের প্রস্তাব কবে কীভাবে পাঠানো যায়।

সিনেমার ব্যানারে বড় বড় মুখ। আমি অবাক হয়ে দেখছি। হাত ঘড়িতে স'পাঁচটা বাজে। হাসি পেল। বড় অধৈর্য হয়ে উঠেছি আমি: নিশাতের সঙ্গে অনেক ক'টা দিন এবং অনেকগুলো মাইল ভ্রমণের পর আজ আবার দেখা হবে, তাই আমার ভেতরটা লাগছে নতুন প্রেমে পড়া ছোকরার মতো— মাতাল, উদ্বেগে অস্থির; গলার কাছে নামহীন বাষ্পের পিণ্ড আর রক্তিম কর্ণমূল আমার।

বসলাম সেই রেস্তোরাঁটায় যেখানে নিশাতের সঙ্গে সে রাতে বসেছিলাম। নিশাত বলছিল, বাড়িতে মেহমান আসবে; আর আমি বলছিলাম, খানিকটা অভিমান করেই, বেশ তুমি খাবে না তো খাবে না, আমি খাই, বসে বসে দেখো। নিশাত অবশেষে খেতে রাজি হয়েছিল। একজন বেয়ারা প্যাড পেন্সিল হাতে করে লিখে নিচ্ছিল আমাদের পছন্দ। গরম সুপের স্পর্শে নিশাত তার ঠোঁট কুঁচকে ফেলেছিল।

কফির জন্যে বললাম আমি। কফি এলো। চুমুক দিতে যাবো, তখন তার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার চশমার কাচ। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঁকের ভেতরটায় কী হয়ে গেল কিছু ঠাহর করতে

পারলাম না, বিশ্ব-সংসারের চেহারাই যেন পালটে গেল এক নিমেষে। লুপ্ত হয়ে গেল চারদিকের ছবি, দেয়াল, মানুষ, কাউন্টার, আমার কফির পেয়ালা। চোখ তুলে দেখি, ভালো করে কিছুই দেখতে পারছি না আমি। ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে আমার কাচ, না, পৃথিবী আমার সমুখ থেকে বিদায় নিচ্ছে? হঠাৎ প্রচণ্ড কান্না হতে লাগল ভেতরে। নিজেকে নিঃসঙ্গ, বধির, পরিত্যক্ত মনে হলো। ভুলে গেলাম চশমার কাচ পরিষ্কার করলেই সব আবার দেখতে পাবো আমি। যেন পৃথিবী আমাকে চরমভাবে বঞ্চিত করে চারদিক থেকে হা-হা করে হাসছে আর আমি ডুবে যাচ্ছি।

কোথায় আমার আনন্দ? আমার কালোকফির প্রিয় স্বাদ? বাষ্পের মধুর স্পর্শ? আমি হত্যাকারী। বাবাকে আমি হত্যা করেছি। চোখের সামনে খাটো কালো কোট পরা বেয়ারাকে মনে হচ্ছে ব্যারিস্টার, আমার দিকে তর্জনী তুলে, দূরে কাউন্টারে, যেন বিচারকের উচ্চাসনে আসীন বিচারপতি ঐ নির্বিকার-মুখ ম্যানেজার, তাকে বলছে, এর চেয়ে ঘৃণ্যতম অপরাধ আর কী হতে পারে। পুত্র হত্যা করেছে পিতাকে। পিতা, যে পিতা মুখের অন্ন আর বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছে সন্তানকে।

এই পৃথিবীটাকে আমার মনে হয় এক অর্থহীন অদ্ভুত চক্রান্ত, যার ভেতর থেকে আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থ বার করে নিই— এবং যার একাংশও বোধগম্য নয় আরেকজনের কাছে। কাল রাতে বাজ পড়ল, আজ আমার ছেলেটা মারা গেল— অতএব বাজ পড়াটা ছিল মৃত্যুর অগ্রদূত, এমনি করেই তো দুই বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে ঐক্য খুঁজেছি, অর্থের সঞ্চার করেছি আমরা। সঞ্চার বলাও ভুল, বলতে পারি— জন্ম, জন্ম দিয়েছি অর্থের। মানুষ বোধহয় অর্থহীন, সম্পর্কহীন কোনকিছুকেই ধারণা করতে পারে না। সম্ভবত তার রক্তের মধ্যে রয়েছে এক অসীম-শূন্যতার আতঙ্ক, যার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মানুষ প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করছে স্বপ্ন আর বিভ্রম।

আমি কি ব্যতিক্রম?

কী জানি। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার সমুখে কালোকফি, তার ধোঁয়ায় চশমার কাচ হঠাৎ কুয়াশা হয়ে যাওয়া, এর সঙ্গে আমার বাবার মৃত্যুর ইতিহাস মনে পড়ে যাবার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু মনে পড়েছে। এবং এত কঠিনভাবে মনে পড়েছে যে আমার পুরনো পৃথিবী ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে তার নির্মম আঘাতে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

আমি তাকিয়ে আছি পেয়ালায় রাখা কালোকফির দিকে। আস্তে আস্তে বাতাসে কেটে যাচ্ছে কাচ থেকে বাষ্পের কণাগুলো। স্বচ্ছ হয়ে আসছে। আবার আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি মৃদু রেখায় তখনো ধোঁয়া উঠছে পেয়ালা থেকে।

এ সবই কয়েকটি সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেছে। কিন্তু আমি সেই পুরনো আমি আর নেই। আজ যখন পেছনের দিকে তাকিয়ে এই ঘটনাটা মনে করবার চেষ্টা করছি, আবার যখন মুহূর্তগুলোকে তাদের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, তখন এক হতাশায় ভরে আসছে আমার মন, ক্লান্ত হচ্ছে আমার কলম। কারণ, কিছুই সঠিক অনুক্রমে মনে পড়ছে না, অনেক জরুরি জিনিশ, মনে হচ্ছে, ভুলে গেছি এবং দেখছি অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্মৃতির আলোয় জ্বলজ্বল করছে। ঠিক কোন্ জিনিস কোন্ ভাবনা কিংবা কার মুখ অথবা কোন মুহূর্ত, আমাকে মনে করিয়ে দিল বাবার মৃত্যুর ইতিহাস সেদিন সেই রেস্তোরাঁয় তা আজ আর কিছুতেই বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, যদিও বা কোনো কারণ

বের করতে পারি, তা হবে কাল্পনিক, আমার নিজের সৃষ্টি করা। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি, কালোকফির ধোঁয়ায় যখন আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার চশমার কাচ তখন সেই চরম বিপ্লব ঘটে গেল আমার চিন্তার ভেতরে।

অথচ সেদিন রাতে গ্রামের সেই রুদ্ধশ্বাস অন্ধকার ঘরে, মা যখন আমার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিষের মতো কথাগুলো উচ্চারণ করলেন তখন এতটা লাগেনি। তখন কেবল একটা যন্ত্রণা হয়েছিল, যার পরিণতি হয় না। আমি যখন চলে এলাম— পরদিন সকালে আসতে পারিনি, ফিরোজা আমাকে আরো একদিন জোর করে রেখে দিয়েছিল— তখনো এত সহস্র হয়ে বাজেনি ঐ মৃত্যুর ইতিহাস। বরং আমার মনটা বেশ ভালোই ছিল পরদিন। ফিরোজা এসে বলল, চা পাইতে দেরি হইব। আমরা কেউ চা খাই না। বাজারে মানুষ পাঠাইছি।

আমার তখন মনে হলো, অকারণে, কিন্তু একটা বেদনার মতো, ফিরোজার স্বামী বোধহয় চা খেতেন রোজ সকালে। বললাম, রিয়াজ কই ?

কে জানে ?

পাঠিয়ে দিন না ? বেশ হয়েছে দেখতে। পড়তে দেননি ?

অর আবার পড়া। ফিরোজা ম্লান হেসে বলল, পইড়া যা করবো আমার জানা আছে। হালের মুঠি না ধরলে ভাত জুটবো না। ঐ বই নিয়া মনে কইলে যায় ইস্কুলে।

অবাক হলাম ফিরোজার কথা শুনে। লেখাপড়ার দিকে এত বিতৃষ্ণা, আমি, হতে পারে জানতাম না। ছেলে হবে, এবং বয়স হলে স্কুলে যাবে, পাশ করবে, এইটেই আমার কাছে স্বাভাবিক। হাল না ধরলে ভাত জুটবে না— এর মতো অসম্ভব যেন আমি আর কিছু শুনিনি। ব্যাকুল হয়ে বললাম, ছি ছি, এটা কী হলো ? লেখাপড়া না শিখলে কেউ বড় হয় ? টাউনে কেউ নেই ?— মানে ওর বাবার— মানে, শহরে থাকলে ওর লেখাপড়ার মন হতো। ভালো হতো।

ফিরোজা বলল, অর চাচারা নিতে চাইছিল। আমি দেই নাই। কী খাইবো, কী পরবো, চাচিরা নিজের থুইয়া পরের ছাওয়াল আপনা করবো কেন ? পর আপনা হয় না, ভাই। একবারে এতিম হইয়া যাইতো রিয়াজ, নিয়া আসছি. আল্লা দিলে এমনি চলবো।

চোখে পানি এসে গিয়েছিল আমার। গতরাতে ভাবছিলাম, বললে রিয়াজকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। সে কথাটাও বলতে পারলাম না। বললাম, ভারী সুন্দর হয়েছে ছেলেটা। ফিরোজা তখন চলে গেল।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চনমন করে খিদেটা উঠল আমার। খেলাম প্রচুর। রিয়াজ আমার কোলের কাছে বসে পা ছড়িয়ে ভাত-তরকারি ঢেলে বাঘা বাঘা হাতে খেল। মা এসেছিলেন পরবেশন করতে। খোরশেদ সাহেব একটা মামলার তদবিরে ফজরের আগেই চলে গেছেন শহরে, ফিরবেন রাত্তিরে। তাঁর সঙ্গে আমার সকালে দেখা হয়নি। যাবার কথা বলতেই মা মৃদুস্বরে আপত্তি করলেন এবং কারণ দেখালেন, ফিরোজার বাপ বাড়ি নাই। তুমি যাইবা, সে কী কইবো ?

গত রাতের কিছুই যে আমার মনে নেই, এবং মনে থাকলেও তা দুঃস্বপ্ন বলেই ধরে নিয়েছি— এ বিষয়ে আমি এখন নিশ্চিত। কারণ, ঐ কথাগুলো মনে থাকলে আমি তখন হাসতে পারতাম না।

হাসছিলাম। মা আমাকে চোখ তুলে কৌতূহল ভরে একবার দেখলেন, দেখে চোখ নামিয়ে নিলেন আমার চোখ পড়াতে। দু'জনেই বুঝতে পারলাম, অথচ কেউই বললাম না, তিনি আমাকে যেতে দিতে চান না, খোরশেদ সাহেব থাকলেও আজ সকালে আমার যাওয়া হতো না। আমি যে বুঝতে পেরেছি এটা টের পেয়ে মা'র মুখ রাঙা হয়ে উঠল। এবং আমার তখন সেই মুহূর্তে সেই এক দুপুরের রৌদ্র ঝরা বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে চিরদিনের চেনা মনে হলো মা-কে।

সেই রাঙা হাসিটা মনে আছে আমার যে কোনো এইমাত্র দেখা ছবির মতো। আরো বিশেষ করে মনে আছে এই কারণে যে, অমৃতের মতো মধুর মনে হয়েছিল যে মুখ, সেই মুখ কল্পনার চোখে যদিও, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আজ কিন্তু অনুভূতির লেশমাত্র আর নেই। কী করে এই বিচ্যুতি ঘটলো, স্মৃতির ছবি থেকে কখন অপসারিত হলো অর্থের ইন্দ্রজাল, তা বিশ্লেষণ করলে দুটো পাঁচটা রাত কেটে যাবে, কোনো তথ্য দিতে পারব না।

আমার সেদিন আর যাওয়া হলো না। তার পরদিনও না। পরদিন দুপুরবেলায় মা আমাকে তাঁর প্রথম বিয়ের লাল চেলিটা ভাঁজ করে বুকের কাছে লুকিয়ে এনে দিলেন। আমি খুব অবাক হলাম। সকালে মাকে বলেছিলাম, নিশাতের কথা। বলছিলাম, আমার বিয়েতে তাঁর আসা চাই। তিনি মুখে কিছু বললেন না, নামিয়ে নিলেন মুখ, তাঁর কোলের 'পরে ঘুমিয়ে পড়ল সব ছোট মেয়েটা— আমি বুঝতে পারলাম, আসলে আমার মা-কে ডাকাই উচিত হয়নি। আমার বয়স হয়েছে, এবং আমার বোঝা উচিত ছিল, মা'র পক্ষে কিছুতেই এখন আর সম্ভব নয় এই বাড়ির বাইরে এসে তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে, আমি, আমার সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করা। অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। মা'র জন্যে আমার প্রবল কষ্ট হলো। সেটাকে কবর দেবার জন্যে জোর করে হেসে বললাম, বিয়ের পরে নিয়ে আসব নিশাতকে।

আমার দিকে বোবা চোখে তাকালেন তিনি। তখন সে চাহনিটার কোনো অর্থ স্পষ্ট হয়নি আমার কাছে, কিংবা অবান্তর একটি অভিব্যক্তি বলে মনে হয়েছে ওটা, যা আমরা অহরহ প্রশ্রয় দিয়ে থাকি যে কোনো দু'জন বা তারো বেশি একসঙ্গে বসলে। আমার ফিরতি ট্রেনটা যখন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল ঢাকার দিকে, তখন বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো ছবির ভেতরে মা'র এই বোবা চাহনিটা মনে পড়েছিল। কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি কী তিনি বলতে চেয়েছিলেন সে দৃষ্টি তুলে। আজো তার সন্ধান পাইনি। অথচ, আমার স্মৃতি যখন এত উজ্জ্বল করে ধরে রেখেছে সেই চাহনিটা, তখন নিশ্চয়ই তার কোনো মানে আছে, আমার মনে এত গভীর দাগ কেটে গেল যে মুহূর্ত, তার অর্থ আমি না জানলেও কোথাও না কোথাও লেখা আছে।

লাল চেলিটা হাতে নেবার পরও ভালো করে বুঝতে পারিনি আমি একটা বিয়ের শাড়ি হাতে করে আছি, এবং এই শাড়ি পরে আমার বাবাকে প্রথম দেখেছিলেন মা আজ থেকে তিরিশ বছর আগের এক রাতে। শিরশির করে উঠলো আমার গা। নিঃশ্বাস ভারী করে তুললো দীর্ঘদিন ট্রাঙ্কে বন্দি হয়ে থাকার মোহনীয় ঘ্রাণ। বোকার মতো জিগ্যেস করলাম, কার?

কার আবার? আমার বিয়া হইছিল এই শাড়ি পইরা।

বলে না দিলেও বুঝতে পারলাম বিয়ে মানে আমার বাবার সঙ্গে বিয়ে। বুঝতে পারলাম দীর্ঘ বৎসরগুলো মা এই শাড়ির সঙ্গে তাঁর প্রথম পুরুষ, ভালোবাসা, ভয়, মৃত্যু ও অশ্রুকে একত্রিত করে সমস্ত আলো ও বাস্তব থেকে দূরে তোরঙ্গের তলায় নিরন্ধ্র গহ্বরে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। জানতে পারেনি বিশ্ব, হয়ত তিনি নিজেও ভুলে গেছেন একদিন আস্তে আস্তে;

আমি সেই মৃতকে জীবন্ত করে তুললাম।

বললাম, কী করব ?

বউরে দিও।

আমার এখনো মনে আছে সেই শাড়িটা নিয়ে আমি অনেকক্ষণ বসেছিলাম অবাক হয়ে। বৃষ্টির মতো নরোম গুঞ্জনে, কিসের কে জানে, আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল আমার মন। মা'র দিকে দেখছিলাম। এবং আমার কিছুতেই যেন খুশির কুলান হচ্ছিল না হৃদয়ে। রিয়াজ এসে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, টানাটানি করতে লাগল শাড়িটা নিয়ে। মা তাকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, সর, সর, ডাকাইত।

এক সময় ফিরোজা বলল, বউ নিয়া আসবেন কইলাম।

আচ্ছা, আসব।

এখন আমার ভালো করে মনেও নেই সেদিন কোন ঘটনা কোনটার পরে ঘটেছিল। মা'র শাড়ি দেয়া, ফিরোজার অনুরোধ, রিয়াজের এসে দাঁড়ানো— এসব কোন্ অনুক্রমে ঘটেছিল ? কেবল এটুকু মনে আছে আমার মনটা খুব ভালো ছিল, আমি বেশ সহজ হয়ে উঠেছিলাম, পরদিন আসবার সময় খুব খারাপ লেগেছিল আমার, ফিরোজা আর মা বাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত এসে পুকুরের ওপারে সুপুরি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় তাকিয়েছিলেন। আমি ধরা গলায় বলেছিলাম, আবার আসব, বউ নিয়ে।

আগাগোড়া ঘটনাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁকি ছিল যেটা আমি তখন বুঝতে পরিনি। আমি সহজেই ভুলে যেতে পেরেছিলাম প্রথম রাতে দুঃস্বপ্নের মতো মা'র আবির্ভাব আর বিষের মতো মৃত্যুময় কিন্তু সত্য, আমার বাবার সেই মৃত্যুর ইতিহাস এবং সহজেই পেরেছিলাম এই সংসার, যে সংসার আমার নয়, যে সংসারে আমি চিরদিনের অবাঞ্ছিত, সেই সংসারকে আপন করে দেখতে; এমন কি ফিরোজাকে আমার ভালো লাগতে চেয়েছিল, রিয়াজকে আমি শহরে নিয়ে যাবার কথাও চিন্তা করেছি।

ফাঁকি ছিল নিশ্চয়ই, আমি আমার অজ্ঞান্তে অভিনয় করেছিলাম। এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে অমন ব্যবহারে। বাবার মৃত্যুর ইতিহাস শোনবার পর নিজের দুঃসহ গ্লানি ঢাকবার হয়ত ব্যর্থ চেষ্টা ছিল ওগুলো। নইলে ওখানে দু'দিন, তারপর সারাদিন সারারাত ট্রেনে ঢাকায় ফেরা, ঢাকায় ফিরে এই বিকেল অবধি কম করে হলেও মোট নব্বই ঘণ্টার মধ্যে একবারও কেন মনে পড়ল না রাতে মায়ের মুখে শোনা কথাগুলো ? আমার হাতে বাবার মৃত্যু হয়েছে, এই অপ্রত্যাশিত খবরটা নিয়ে কোনো আলোড়নের স্মৃতিই আমার মনে নেই।

কফির ধোঁয়ায় চশমার কাচ যখন কুয়াশা হয়ে গেল, তখন কোন ইন্দ্রজালে অবচেতনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। ছড়িয়ে ছিটকে পড়ল আমার গ্লানি, আমার পাপ, আমার ক্ষমাহীন অস্তিত্ব। আমার কাছে লুপ্ত হলো আশা বাস্তব এবং বর্তমান; দুলে উঠল অতীতের ভারী পর্দা যা ঢেকে রেখেছিল আমার স্মৃতিকে।

পেয়ালার দিকে তাকিয়ে একে একে মনে পড়তে লাগল পেছনের দিনগুলো। আমাকে কোন আয়াসই স্বীকার করতে হচ্ছে না, তারা আপনা থেকেই আসছে এবং দেখিয়ে যাচ্ছে নিজেদের গঠনগুলো। ছাব্বিশ বছর যে স্মৃতির কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না, ঈশ্বর তা বিস্মৃতির ধূলি থেকে

আবার নবদেহে হাজির করতে লাগলেন। দেখলাম, আমি শিশু হয়ে গেছি। দেখলাম, বাবার হাত ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির সামনে ঘাসের ওপর, বেলা পড়ে যাচ্ছে। আবার দেখলাম, ও পাড়ার এক গরিব বউ এসে মা'র কাছে চাল চাইছে— আমাকে দেখে হাসছে আর বলছে, গ্যাদা কত বড় হইছে গো। শুনলাম, এই আমার দাই মা। দাই মা আবার কেমন মা ? স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি সারাদিন একা একা হাঁটছি আর এ কথাটা ভাবছি।

কোথায় ছিল স্মৃতিগুলো এই ছাব্বিশটি বছর ? মা'র একটা কথার শেষ যেন উড়িয়ে দিয়েছে শোয়ার দরোজা, পতন হয়েছে বিস্মৃতির নগরের, ঐ দেখা যাচ্ছে। দেখলাম, নদীতে প্রবল স্রোত নেমেছে, ঘোলা পানি খল খল করে তালি বাজাতে বাজাতে ঘুরতে ঘুরতে বয়ে চলেছে; তার মুখে গাছপালা বাড়িঘর কিছু আটকাচ্ছে না, পাড় থেকে বড় বড় চাঙ্গড় ধ্বসে পড়ছে দিনরাত। ভোর রাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বাবা বললেন, গ্যাদা চলো, নদী দেইখা আসি। ভাঙতেছে।

আমি ভোরের অস্পষ্ট আলোর ভেতরে চলছি চোখ ডলতে ডলতে। ক্রমে রাঙা হয়ে উঠছে সূর্য, আস্তে আস্তে বাড়িঘর গাছপালার ছবি স্পষ্ট হয়ে আসছে, দূর থেকে বেতালা ঢাকের মতো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আর নাকে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে ভোরের ফুরফুরে হাওয়া।

বাবা বললেন, শুনছাও ? নদী ভাঙ্গে তার আওয়াজ। য্যান ঢাক বাজে না ?

তখন আমার খুব স্ফুর্তি হলো। বাবা হাত ছেড়ে দিয়ে লাফাতে লাফাতে তাঁর আগে আগেই চললাম। তিনি পেছনে থেকে মুখে যদিও বললেন, দেইখ্যা, পইড়া যাইবা, কিন্তু বাধা দিলেন না আমাকে।

একেবারে সেদিনকার কথার মতো আমার মনে পড়ছে এই লাফিয়ে চলার দৃশ্যটা। মনে করতে করতে চোখে পানি এসে গেছে আমার, খেয়াল করিনি। কফিতে একটা চুমুক দিয়ে নড়ে-চড়ে বসলাম তখন। সিগারেট ধরালাম। ধরিয়ে দেখি, স্মৃতির সূত্রটা ছিঁড়ে গেছে। ধারাবাহিকভাবে কিছুতেই আর মনে পড়ছে না কিছু। যেন ঐ লাফিয়ে চলাটা অনন্তকাল পর্যন্ত চলেছিল।

তারপর যে ছবিটা মনে পড়ল— দেখতে পাচ্ছি, বাবা নদীর উঁচু পাড়ের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কী দেখছেন। আমি তাঁর পেছনটা দেখতে পাচ্ছি অনেক দূর থেকে। খুব মজা লাগছে আমার বাবাকে অমন ঝুঁকে পড়ে থাকতে দেখে। দৌড়ে এসে হাসতে হাসতে তাঁর পিঠে দিলাম ধাক্কা; এখনি তিনি যেন সচকিত হয়ে উঠবেন এবং দেখে হেসে ফেলে তাড়া করবেন ধরবার জন্যে, যেমন আমার খেলার বন্ধুরা করে থাকে। কিন্তু বাবা সে সব কিছুই করলেন না। বিরাট একটা গাছের গুঁড়ির মতো গড়িয়ে পড়লেন নদীর ভেতরে। ছলাৎ করে একটা শব্দ উঠল। আমার চোখের সামনে হাত খানেক মাটিতে সরু কালো সূতোর মতো চিড় ধরলো। চিৎকার করে পেছনে ছুটে আসতেই দেখলাম একটা বড় চাঁদের আকারে খানিকটা পাড় ধ্বসে পড়ল নদীতে যেখানে একমুহূর্ত আগে ছিলাম আমি এবং আমার একমুহূর্ত আগে বাবা।

আর মনে নেই। তারপর যে স্মৃতিটা একেবারে পিঠেপিঠে মনে পড়ে তা হচ্ছে আমার চাচি ডিমের মতো গোল দলা পাকিয়ে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন আমাকে— আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

এই একটা ছবি— বাবার গড়িয়ে পড়া, আমার লাফিয়ে পেছনে হটে আসা, বারবার ফিরে

ফিরে মনে পড়তে লাগল রেস্তোরাঁয় বসে। যেন এমনি করে দেখে দেখে আমি আরো কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবো। আমি তো হত্যাকারী, বাবাকে হত্যা করেছি, নতুন কোনো তথ্য যেন সে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে আরো; আমাকে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করবে জগতের ঘৃণ্যতম অপরাধী হিসেবে।

পেয়ালার কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরো এক পট আনতে বললাম বেয়ারাকে। একটু আগে যাকে আমার মনে হয়েছিল আদালতের ব্যারিস্টার, অভিযুক্ত করছে আমাকে, চরম শাস্তি প্রার্থনা করছে আমার জন্যে, সে আরেক পট কফি এনে রাখলো।

আজ আমি আর ওকালতি করি না, কাজি সাহেবের জুনিয়রি ছেড়ে দিয়েছি যেন কত যুগ আগে, তাই আজো আমার স্পষ্ট করে মনে পড়ে ওয়েটারের কালো কোটকে ব্যারিস্টারের কালো কোট বলে ভুল করার করুণ সম্ভব মুহূর্তটি।

আমার তখন ঝোঁক চেপে গিয়েছিল নিজেকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার। যে কয়েক হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ছিল, তা আমার শেষ নির্ভর, আমার অনেক স্বপ্নের ভিত্তি। প্রথমেই সে টাকাগুলো উড়িয়ে ছত্রখান করে দেবার তীব্র বাসনা হলো। একদিন পাঁচশ টাকা তুললাম। কিন্তু কী করা যায় পাঁচশ টাকা দিয়ে এই ঢাকা শহরে? একটা দোকানে উঠে সেন্ট কিনলাম এক গাদা, শাড়ি কিনলাম, মেয়েদের চপ্পল পছন্দ হলো দু'জোড়া— তাও নিলাম। আর নিজের জন্যে, যা কোনদিন পারব কল্পনা করিনি, কিনলাম দামি টোব্যাকো, পাইপ, ড্রেসিং গাউন আর একটা সোনার ক্যাপ কলম। এক সন্ধ্যায় ফতুর পাঁচশ টাকা। আজ সে সব কথা মনে পড়ে হাসি পায়। সিনেমা দেখার অভ্যেসটা ছিল আমার ষোলআনা; মনে হয়, বাংলা কোনো ছবিতে কাউকে দেখে থাকব গাউন পরে পাইপ খেতে, কথা বলতে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে— তাই নিজের জন্যে ওগুলো কিনেছিলাম। আসলে নিজেকে শক্ত সবল করে দাঁড় করানোর হাস্যকর প্রয়াস হিসেবেই এই কেনার অভিযান, যা তখন বুঝতে পারিনি। এখনো হয়ত সুটকেশের তলায় পড়ে আছে গাউনটা, প্রথম কয়েকদিন ব্যবহারের পর সেই যে ফেলে রেখেছি আর ফিরে তাকানোও হয়নি।

ফিরে তাকাবো কী, আমার মনে তখন শূন্য মাঠে তপ্ত বাতাসের ঘূর্ণি হচ্ছে। আমার তখন একটাই কথা, আমি যখন আমার বাবাকেই এই দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে হত্যা করতে পেরেছি, তখন পৃথিবীতে আমার কিসের ভয়, কিসের তোয়াক্কা। আমি যেন যা খুশি তা করতে পারি। যে ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে তার অঙ্কে দশ পেলেই কী আর আশি পেলেই বা কী? আমার যেন সমস্ত নীতি, শৃঙ্খলা-বোধ, সব তছনছ হয়ে গেছে; উচ্চাশা হাস্যকর, সংসার অসম্ভবের আহ্বান, কর্ম এবং অর্থ অর্থহীন। যে শাস্তি আইন আমাকে দিতে পারেনি, তার চেয়ে বড় শাস্তি সৃষ্টির সাধনা তখন আমি করছিলাম সমস্ত স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়ে, সাধ উপেক্ষা করে, আত্মনিপীড়ন আর বঞ্চনার ভেতর দিয়ে।

সেন্ট, শাড়ি, চপ্পল কিনেছিলাম কার কথা মনে করে এখন আর মনে নেই। নিশাতের কথা ভেবে থাকব? কিন্তু নিশাত তখন আমার চেনাজগৎ থেকে এত দূরে যে তাকে মনে হতো মৃত একটি মানুষ, যার নাম আমার মনে আছে, মুখ; কিন্তু যার কাছে আর যাওয়া যায় না। রুমি? সম্ভবত তাও নয়। কারণ, রুমি হলে আমি বেছে বেছে গাঢ় রংয়ের শাড়িগুলো কিনতাম না। রুমি ছিল কালো; আমার বেশ মনে আছে, রুমি একেকদিন সবুজ বা ঐ রকম গাঢ় রংয়ের শাড়ি পরতো বলে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠতো। আমি যা কিনেছিলাম তা

একজন ফর্সা রক্তিম মেয়েকেই মানাতো বেশ। ফিরোজার জন্যেও কিনিনি। কারণ, সেদিন রেস্তোরাঁয় কালোকফির ধোঁয়ায় চশমার কাচ ঢেকে আসবার মুহূর্তেই আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে মোরশেদ সাহেবের পরিবারের সঙ্গে।

আজ আমার মনে হয়, নিশাতকে ভুলেও আমি ভুলতে পারিনি সেদিন-- যেমন আজো পারিনি, এই লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত পারছি না। নিশাতের কথা ভেবেই হয়ত কিনেছিলাম ওগুলো। যে দেয়াল আমি নিজেই তুলেছি, তা ভেঙ্গে আবার নিশাতের কাছে ফিরে যেতে পারবো না; কারণ, আমার আত্মাভিমান বড় প্রবল তখন। যা কিছু ছিল আমি যে আমিই, এবং আমার সব সঠিক— এই অহঙ্কারটা ছিল ষোলআনা। কিন্তু মনের একেবারে শেষ কোণায় বোধহয় আকাঙ্ক্ষাটা মরেও মরেনি; এই আশেপাশেটা যায়নি, যে ইচ্ছে করলেই নিশাতকে আমি বউ করতে পারতাম। তাই ওই সেন্ট, শাড়ি, চপ্পল কেনার ভেতর দিয়ে হয়ত অসম্ভব আশা করেছি, নিশাতকে আমি নিজেই সৃষ্টি করে নিতে পারবো। জিনিসগুলোর মধ্যে তার রক্তিম উষ্ণ শরীরটা যেন স্পন্দনমান হয়ে উঠবে। এটাকে আমার এখন মনে হয় মস্তিষ্ক বিকৃতির এক ধরনের লক্ষণ। কিন্তু তখন সেটা বুঝতে পারিনি কারণ, তখন আমি যা করছিলাম তা-ই মনে হচ্ছিল এবং যে কোনো যুক্তি ও সত্যের বিরোধিতা করবার জেদ ছিল প্রচুর।

বাড়ি বয়ে নিয়ে এসে, মনে আছে, প্রথমেই হাঁক পেড়ে ডাকলাম জালালের স্ত্রীকে। তিনি ছেলেটাকে পড়াচ্ছিলেন মেঝেয় শুয়ে শুয়ে। আমার আওয়াজ শুনে ধরমর করে উঠে এলেন। গায়ে গতরে শাড়ি টানতে টানতে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমি বলি, কে না কে ? এগুলো কী ?

দেখুন না কী ? বলতে বলতে তার হাতে তুলে দিলাম সেন্ট, শাড়ি, চপ্পলের ব্রাউন কাগজ মোড়া প্যাকেটগুলো। জালাল আমার দিকে চকচকে চোখে তাকাল, যেন মহা দুর্বোধ্য কিছু তার চোখের সামনে ম্যাজিকের মতো ঘটে যাচ্ছে।

আমার এখন হাসি পায়, আমি ওকালতি করতাম, মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমাকে কারবার করতে হতো, অথচ সেদিন যা করলাম তা নেহাৎ মূর্খের কী নির্বোধের মতো একটা কাণ্ড; পূর্বাপর ভাবলাম না একটুও, জালালের স্ত্রীকে সেই শাড়ি চপ্পল দিয়ে বসলাম। তার সঙ্গে আমার ঠাট্টা চলত, জালাল আমার ভালো বন্ধু। তারো চেয়ে সত্য, মানুষের মন এক জটিল যন্ত্র যার কোন্ কাঁটার আবর্তনে কোন্ কাঁটা ঘুরবে তা অঙ্ক-ফলের মতো বলা যায় না।

জিনিসগুলো খুলতে খুলতে জালালের স্ত্রীর মুখে গভীরতর হতে লাগল আনন্দ-উল্লাসের রেখাগুলো, ছোট্ট একটা মেয়ের মতো খুশি দেখাতে থাকল সে। আমি সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম।

নিশাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে না, একথাটা ওদের জানানো হয়েছিল কিনা মনে নেই। খুব সম্ভব বলেছিলাম। এবং এটা আরো সম্ভব, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে নিশাতের সঙ্গে আমার সম্পর্কের এত বিরাট পরিবর্তন কী করে ঘটল তা জানবার জন্যে ওরা স্বামী স্ত্রীতে ভীষণ পীড়াপীড়ি করেছিল আমাকে। সম্ভবত এইজন্যে বলছি, আমার উপহার তাহলে জালালের মুখ কালো করে দিত না। জালাল ভেবেছিল, আসলে আমি একা উড়নচণ্ডি লক্কা পায়রা— এইমাত্র একটি মেয়েকে কথা দিয়ে আর বিয়ে করলাম না এবং পরদিন বিনি মাশুলে গাড়ি চড়ার আনন্দ খুঁজতে বেরুলাম কৌশলে বন্ধু-স্ত্রীর প্রতি নিজের অনুরাগ জানিয়ে। আমি

জালালকে দোষ দিই না। নিশাতের মতো সাফ মাথা, অনুভূতি-সম্পন্ন মেয়েই যদি ভুল বুঝতে পারে তো জালাল কোন ছার। জালাল আমার বন্ধু কেবল, আর নিশাতের সঙ্গে ছিল আমার হৃদয়ের সম্পর্ক।

এ সবই ভুল। একটা মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারে না আরকটা মানুষকে। যত নিকট হোক দু'টি মন, এমনকি তারা বিনিময় করুক তাদের রক্ত, তবু তারা বুঝতে পারবে না একজন আরেকজনকে সম্পূর্ণভাবে। যে সেতু আমরা কল্পনা করে থাকি তা সেতুর বিভ্রম মাত্র। নইলে মুখে না বললে, ভাষায় না ভাবনাকে ব্যক্ত করলে কেন অচল হয়ে যায় জগৎ? নিশাতকে যেহেতু আমি কিছুই বলিনি আমার চেতনার বৈপ্লবিক পবির্তনগুলো সম্পর্কে, সে হয়ত মনে করে বসে আছে, আমি সেই আমিই আছি এবং আসলে আমি এক হৃদয়হীন পশু।

আশ্চর্য, মানুষের মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুখের রেখা বদলায় না, তা যদি বদলাতো তাহলে এই পৃথিবীতে বাস করা সহজ হতো অনেক।

সেদিন রেস্তোরাঁয় আমি বসেছিলাম স'পাঁচটায়। সাতটায় দেখা করবার সময় ছিল নিশাতের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে ঘটলো অঘটন. আমার চশমার কাচ আচ্ছন্ন হয়ে গেল কালোকফির ধোঁয়ায় এবং আমি বিকৃত হতে লাগলাম হত্যাকারী হিসেবে। আমার মনে হলো, আগেই বলেছি, এখন আমার পক্ষে পৃথিবীর যে-কোন পাপ করা সম্ভব এবং তা হচ্ছে লঘুকীর্তি। মনে হলো, এই বেঁচে থাকাটা অর্থহীন এবং আরো মনে হলো, ততোধিক অর্থহীন মৃত্যু।

সেই মুহূর্ত থেকেই আমার অধঃপাতের শুরু। কিংবা একে নবজন্ম বলব? জীবনের নতুন মুখ? এই কয়েক বৎসর আমি বয়সে যা না বেড়েছি তার চেয়ে মনটা বুড়ো হয়েছে। পুরনো আর প্রচলিত কথাগুলো এখন আমিও সোচ্চারে বলতে শুরু করেছি। যেমন, অধঃপাতের কথা লিখতে লিখতে আমি ভাবছি, আসলে আমরা কি জানতে পারি কোন্‌টা আমাদের জন্যে ভালো আর কোনটা খারাপ? যা হয় মঙ্গলের জন্যেই হয়। এবং বুড়োদের মতো এখন আমিও বলতে দ্বিধা করি না— আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে আছে কোথাও না কোথাও; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্নতা মানুষেরই কীর্তি।

ভাগ্যবাদীতার শুরুও সেদিন সেই বিকেলেই হয়েছিল, আমি অনুমান করছি। কারণ, নিজের বিধ্বস্ত স্বপ্ন থেকে চোখ তুলে যখন সময় দেখলাম, তখন সাড়ে সাতটা বাজে। নিশাতের সঙ্গে দেখা করবার নির্ধারিত সময় আধঘণ্টা হলো পেরিয়ে গেছে। এতক্ষণ বসে বসে কফির পেয়ালায় আমি বারবার সেই ছবিটাই দেখছিলাম— আমার দৌড়ে আসা, দৌড়ে এসে ধাক্কা দিলাম বাবাকে, তিনি গড়িয়ে পড়লেন, একটা ধ্বস খসে পড়বার আগেই চিৎকার করে পিছিয়ে এলাম আমি।

অভিভূতের মতো উঠে এলাম রেস্তোরাঁ থেকে। বেরিয়ে এসে দেখি সিনেমা হলের মাথায় নতুন ছবির ব্যানার লাগাচ্ছে। নৃত্যভঙ্গিমায় দাঁড়ানো মেয়েটির কাটা ছবিতে দড়ি পরিয়ে আস্তে আস্তে কুলিরা টেনে তুলছে পোর্টিকোর মাথায়। একটা অতিকায় স্বপ্নের মতো সে উঠে যাচ্ছে। আমি হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

আমার যাওয়া হলো না। নিশাত এতক্ষণে আমার জন্যে ইস্কুলের বোর্ডিং গেটে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে গেছে। কাঁঠালতলা দিয়ে পুকুরের পাড় ভেঙ্গে বাসায়। বাসায় গিয়ে খোকনকে কোলে নিয়ে হয়ত ভাবছে কেন আমি এলাম না? আমিতো কোনদিন কথা দিয়ে এরকম

করিনি। হয়ত কাঁঠালগাছের নিচেও দাঁড়িয়েছে কিছুক্ষণ যদি আমি শেষ মুহূর্তে আসি, যদি শোনা যায় কোনো স্কুটারের শব্দ।

নিশাত কি জানবে কী আমার হয়ে গেছে। নিশাতকে আমি কোনদিন বলতে পারব না।

ঠিক তখন ইন্টারভ্যাল হলো। আচমকা ভরে উঠল সিনেমা হলের সামনের জায়গাটুকু। আর দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। লোকের ধাক্কায় আমি ক্রমাগত নাজেহাল হচ্ছি।

তখন হাঁটতে শুরু করলাম। সিঙ্গারের সামনে দিয়ে চলতে লাগলাম স্টেডিয়ামের দিকে। সে চলায় না আছে কোনো উদ্দেশ্য, না কোনো চেতনা আমার মনে হচ্ছে, আমাকে এরকম হাঁটতে হবে এবং থামলে চলবে না। যেন আজ সারারাত্রির মধ্যে আমি হাঁটতে পারবো এবং পৌঁছে যেতে পারবো পৃথিবীর অপর প্রান্তে।

আজ আমার মনে হয়, সত্য থেকে পলায়নের স্পৃহা সে মুহূর্তে প্রবল হয়ে উঠেছিল আমার ভেতরে।

স্টেডিয়ামের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ বেচা হকারদের খেলা দেখলাম খানিক; আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সেকেণ্ড গেটের পাশে একসিডেন্ট হয়েছে, উল্টে পড়ে আছে নতুন ঝকমকে একটা গাড়ি, পাশে দাঁড়ানো একটা ট্রাক, ড্রাইভার পালিয়েছে। লোকেরা উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে, দৌড়ুচ্ছে, ভিড় করছে, আহতকে আরেকটা গাড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেখান থেকে এগিয়ে বড় চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবলাম কোনদিকে যাবো। একটা সিগারেট ধরালাম। তেতো লাগল। কাশি উঠল। হাঁটতে লাগলাম পার্কের দিকে, পার্ক পেরিয়ে রেসকোর্স বাঁ হাতে ফেলে অন্ধকার গা ছমছমে রাস্তা দিয়ে শাহবাগের দিকে। শাহবাগের সামনে সার সার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। যেন বিরাট বিরাট হলুদ কালো ফুলের মালা গেঁথে রাতের রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে কেউ।

কাল নিশাতকে টেলিফোন করব। কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। আবার আমি হাঁটছি। আর্টস্কুলের বিরাট খোলা সিঁড়িতে দুধের মতো আলো বয়ে যাচ্ছে। গাছের গায়ে কারা যেন কোন্ আন্দোলনের পোস্টার সেঁটে গেছে। দেখা যাচ্ছে পাবলিক লাইব্রেরীর দেয়ালে আঁকা ছবির একটা অংশ। আমি থমকে দাঁড়ালাম।

একটা লোক আমার কাছে সিগারেট ধরাবার জন্যে আগুন চাইল। ধরিয়ে নিয়ে গেল সে। আমি এগুলাম। নীলক্ষেত ফায়ার স্টেশনে লাল গাড়িগুলো জ্বলজ্বল করছে। বারান্দায় তাস পিটছে কারা। সামনে সুন্দর করে ছাঁটা ফুলের কেয়ারি, ঘন ঘাসের ঝোপ।

নদী ভাঙছিল। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। আমি দৌড়ে এসে ধাক্কা দিয়েছিলাম বাবাকে। একটা বড় ধ্বস ভেঙে পড়ল তারপর। তিনি আর উঠে আসতে পারেননি। এই ছাব্বিশ বছর কোথায় ছিল এই ছবিটা?

রাস্তার লোকগুলোকে একেবারে অন্যগ্রহের মনে হচ্ছে। তারা আসছে যাচ্ছে, গাড়ি বাস ছুটে চলেছে, রিকশাওলা বেল বাজাচ্ছে— কোনো কিছুর সঙ্গেই যেন আমার আর কোনো বন্ধন নেই।

আজিমপুরে আমার এক ক্লাশের একদা বন্ধু থাকতো। কখনো সখনো যেতাম তার ফ্ল্যাটে। তার দরোজায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম। সে দরোজা খুলে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে তোমার? অসুখ?

বড় ক্লান্ত লাগছিল তখন। আলাপকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্যেই মিথ্যে করে বললাম, হ্যাঁ, অসুখ।

সে রাতে ওর ওখানে থেকে গেলাম।

পরদিন টেলিফোন করতে গিয়ে আমার হাত কাঁপল। যখন রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে গিয়েও রেখে দিলাম, কাজি সাহেব অবাক হয়ে আমাকে দেখলেন। নিঃশব্দে একটা প্রশ্ন আঁকলেন ভ্রু তুলে।

আমি যে চমৎকার মিথ্যে বলতে পারব, আমার ধারণা ছিল না। বললাম, সময় জানতে চেয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো আজ সকালেই ঘড়ি মিলিয়েছি, তাই রেখে দিলাম।

ও।

আরেকবার আড়চোখে দেখলাম কাজি সাহেবকে। কী জানি, তিনি যদি বুঝতে পেরে থাকেন, আমি মিথ্যে বলেছি। কিন্তু তিনি ততক্ষণে তাঁর নথিপত্রে আবার ডুবে গেছেন। আমি বাঁচলাম।

নিশাতকে আর টেলিফোন করা হলো না।

প্রথমে ছিল দ্বিধা। পরে এলো নিস্পৃহতা। সেদিন সন্ধ্যে সাতটায় নিশাতের সঙ্গে দেখা হবে, ও আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু আমি যাইনি। এই প্রথম ওকে কোনো কথা দিয়ে সে কথা রাখতে পারিনি। পরদিন টেলিফোনে যোগাযোগ করতে গিয়েও পারলাম না, দ্বিধা আমাকে থামিয়ে দিল। কাজি সাহেবের চেম্বার থেকে তারপর যখন শরীর খারাপ বলে বেবিয়ে এলাম তখন আমাকে জড়িয়ে ধরলো এক অবসাদ আর নিস্পৃহতা। মনে হলো, আমার ভাগ্যই হচ্ছে নিশাত থেকে দূরে থাকা, আমার সমস্ত সুখের কবর হয়ে যাওয়া। তখন বড় অর্থহীন মনে হলো আমার বাড়ির স্বপ্ন, গাড়ির শখ, ফুটফুটে একটি ছেলের কল্পনা। মনে হলো, এসব থেকে নিজেকে আমি যতক্ষণ না বঞ্চিত করছি ততক্ষণ পিতৃহত্যার দায় থেকে আমার মুক্তি নেই।

আমি নিজেকে সবকিছু থেকে একেবারে দূরে সরিয়ে দিলাম। এই অভিশপ্ত জীবন আমাকে যে একটা ধারণ করতে হবে। এখানে কেউ বন্ধু হতে পারবে না, অংশ নিতে পারবে না।

নিশাত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিল কিনা বলতে পারব না। করে থাকলেও আমার তা জানবার উপায় ছিল না। কারণ সে আমার ঐ ঠিকানাটাই জানতো— জালালের বাসার ঠিকানা; কিন্তু মা'র কাছ থেকে ফিরে আসবার পাঁচদিনের মধ্যেই আমি জালালের বাসা ছেড়ে চলে যাই। যাই মানে, যেতে হয়েছিল। আমার দেয়া সেন্ট, চপ্পল, শাড়ির বিশ্রী ব্যাখ্যা করেছিল জালাল। এবং একদিন আমার সামনেই সে তার স্ত্রীর হাত থেকে সেন্টের শিশিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ড্রেনে। সেদিনই আমি আমার বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসি। সেদিন আমার আরো দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে আমার স্পর্শমাত্রই অমঙ্গল। এই পরিস্থিতিতে জালালের কাছে নতুন ঠিকানা রেখে আসার কথা কল্পনাও করা যায় না। তাই নিশাত যদি এখানে খোঁজ করেও থাকে আমি আর জানতে পারিনি।

আরেকটা হতে পারত, নিশাত যদি আমাকে টেলিফোন করত কাজি সাহেবের চেম্বারে। কিন্তু পরদিনই, ঐ টেলিফোন তুলেও রেখে দেয়ার পর, পনেরো দিনের ছুটি নিই আমি। সেই পনেরো দিনে আমি এতটা বদলে গেলাম যে, মনে হলো ওকালতি আর করবো না। সেই কথা লিখে একটা পোস্টকার্ড কাজি সাহেবকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলাম। তাঁকে লিখেছিলাম, আমি ঢাকাতেই থাকছি না। কাজেই নিশাত যদি এখানেও খোঁজ নিয়ে থাকে তো ব্যর্থ হয়েছে।

এখন মনে হয়, সত্যি নিশাত সেদিন কী ভেবেছিল তার জীবন থেকে আমার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে। একথা তো সে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। সে আমাকে ভালোবাসত এবং আমার ওপরে নির্ভর করে ছিল। আমি যে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাকে ভুলে যেতে পারব একথা সে বিশ্বাস করবে কী করে ? সে নিশ্চয়ই মনে করেছে— আমি মরে গেছি, কী আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, কী কেউ আমাকে বন্দি করে রেখেছে। হ্যাঁ, এইসব অসম্ভব অবাস্তব কারণ ছাড়া আর কী ইবা সে ভাবতে পারত ?

কিন্তু আসলে যা সত্যি তা নিশাত তার দুঃস্বপ্নেও দেখতে পারবে না। সে কি কেঁদেছিল ? তার রাত কি বিনিদ্র হয়েছিল ? তার শরীরে কি জীবন-রসের ধারা ক্ষীণ, ম্লান হয়ে গিয়েছিল ?

আজ আমার মনে হয়, নিশাত যদি আমার খোঁজ পেত, তাহলে আমার জীবন আবার অন্যখাতে বইতো। তার সঙ্গে যদি একবার দেখা হয়ে যেত আমার, তাহলে আমি স্বাভাবিক হয়ে যেতাম। মনে হয়, আমাকে যেভাবেই হোক তার খুঁজে বার করা উচিত ছিল। কিন্তু, এ পৃথিবীতে কার দায় পড়েছে আমার চেতন বা অচেতন মনের ইচ্ছেগুলোর তোয়াক্কা করবার ? মানুষ নিজেই তার নিজেকে তৈরি করে এবং সেখানে অন্য কারো দায় নেই।

নিশাতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক এভাবে চুকিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত যে কী করে নিতে পারলাম সেদিন। সাতদিন আগেও তো কত অসম্ভব মনে হতো বিচ্ছেদ। আজ আমার সাকুল্যে এই ধারণা হয়েছে, মানুষ আবিষ্কার করতে পারে মহাদেশ, পর্বত, নক্ষত্র; জয় করতে পারে যুদ্ধ; সৃষ্টি করতে পারে সঙ্গীত; কিন্তু চির অচেনা চির অজেয় এবং স্বয়ম্ভু তার নিজেরই মন।

জালালের ওখানে থাকতেই, কী ওখান থেকে চলে আসবার ক'দিন পর, আমি বহুদিন পর আবার গিয়েছিলাম ফরাসগঞ্জে গোবিন্দর চা-দোকানে। কতকাল পরে সেখানে পা দিয়েই আগের মতো নাকটা ধরে উঠল রান্না করা ঝাল মুরগির ঝাঁঝালো গন্ধে, বাতাসে ধোঁয়ার গুমোট, হলুদ দেয়ালে কালির পরত— এক মুহূর্তে যেন ফিরে গেলাম আমার সেই দিনগুলোয় যখন আমি পরীক্ষায় ফেল করে তিতাস ধরেছিলাম।

গোবিন্দ আমকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো।

আসুন, আসুন স্যার। ওরে, চেয়ারটা মুছে দে। বলতে বলতে সে নিজেই একটা চেয়ার বেশ ঘষে মুছে দিল। হেসে জিগ্যেস করল, কেমন আছেন ? অনেকদিন এদিকে আসেন না। অ্যাডভোকেট হয়েছেন শুনলাম ?

বললাম, ভুলে যাইনি বলেই তো এলাম। তোমার দোকানটা যে কে সেই রয়ে গেল গোবিন্দ।

চলে যায় স্যার। কী খাবেন ? মুরগি পাউরুটি ? না ওমলেট ?

দাও, তোমার বেস্ট যা আছে। মনে আছে, আমি ঠাট্টা করে বলতাম এটা আমাদের লিটল

শাহ্‌বাগ।

হেঁ হেঁ করে হাসল গোবিন্দ। তার কোঁকড়ানো বাবড়ি চুলে হাতের পিঠ ঘষলো অনাবশ্যক ভাবে একবার। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরোজার মুখে কয়লার চুলোয় চাপানো ডেকচির ঢাকনাটা তুলল। আমি ভেতরে গেলাম।

যাদের আশা করেছিলাম, সবাই আছে। আমার তাসের পুরনো বন্ধুরা এবং নতুন আরো দু টি মুখ। পুরনোরা আমাকে দেখে প্রথমে বোকা হয়ে গেল। আর তাদের অবাক হওয়া দেখে নতুনেরা তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল আমাকে।

আমার বেশ ভালোভাবেই মনে আছে, আমিও অবাক হয়েছিলাম ওদের সেই একই টেবিলে এই দীর্ঘদিন পরেও একই ভাবে গোল হয়ে বসে থাকতে দেখে। তাসের প্যাকেটটা তেমনি পড়ে আছে পাশে, হাতগুলো উদ্যত এবং স্থির। যেন আমার উঠে যাওয়া আর আজ ফিরে আসার মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিট কাল অতিবাহিত হয়েছে; আমি বেরিয়ে গিয়ে ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিন বৎসর পরিক্রমা করে এসেছি— তিন বৎসর।-- নিশাত, ভালোবাসা, বিয়ের কথা, মা, আমার বাবার মৃত্যুর ইতিহাস। তফাৎটা কেবল এখানে, আগে আমি ছিলাম গোবিন্দর ভিনিগারের শিশির মতো ফালতু, আর আজ ওরা আমাকে দেখছে মুগ্ধ চোখে, ঈর্ষার কাচের ভেতরে দিয়ে; যেন রাজার সঙ্গে দেখা করে গাঁয়ের মানুষ আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

লোকমান টেবিলে চাপড় দিয়ে বলে উঠল, বাই জোভ, কে এসেছে ভাঙা ঘরে?

আসাদ বলল, বেশ যাহোক আপনি। একেবারে লাপাত্তা। একবার তো আসতে হয়, নাকি?

তাইতো এলাম।

আরো দু'হাত খেলল ওরা। আমি বসে বসে দেখলাম। একবার একটা তর্ক হলো তাস নিয়ে। আমাকে তার সালিশী করতে হলো। গোবিন্দ মুরগি পাউরুটি এনে দিল। পর পর দু'কাপ চা খেলাম আমি।

ওরা উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, এত সকালে কোথায়?

তখন এ-ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল ওরা। দ্বিধাটা কোথায় বুঝতে পারলাম না। অবশেষে লোকমান বলল, যাবেন আপনি?

কোথায়?

যেখানে যাচ্ছি।

সবাই যাচ্ছে?

হ্যাঁ, আগে থেকেই ঠিক হয়েছিল। চলুন মন্দ লাগবে না।

আমি ভেবেছিলাম, সিনেমা। বললাম, বেশ তো।

বেরুনো গেল ওদের সঙ্গে।

সে রাতে আমি প্রথম মদ্যপান করি। খারাপ লাগছিল বেশ, কিন্তু ওয়াক-থু করিনি। বরং আমার বেশ স্ফুর্তি করছিল ভেবে যে এতকাল শুনেই এসেছি, জিনিসটার স্বাদ নেওয়া গেল। নেহাৎ মন্দও নয়। গলা পুড়তে পুড়তে ভেতরে নেমে যায়, পাকস্থলীতে গিয়ে ফণা তুলে বসে থাকে। তারপর মনে হয় মাথার পেছনে কে যেন মৃদু হাতে অবিরাম চাপড় দিচ্ছে— তার

আরামে ভারী হালকা আর রঙিন হয়ে আসে মেজাজটা।

পরদিন আমি ওদের খাওয়ালাম। এবং তারপর থেকে নিয়মিত। ব্যাঙ্কে যে টাকাগুলো ছিল তার সঠিক অঙ্ক মনে থাকত না; মনে হতো আমি যদি কিছু নাও করি সারাজীবন আর এভাবে সারারাত ফ্লাস খেলে, মদ খেয়ে, হৈ হৈ করে কাটিয়ে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোই তো কোন অভাব হবে না কোনদিন।

নিশাতের কথা এখন আর মনে পড়ে না। আমার মনে হয় না এই এক বৎসরে নিশাতকে আমি ভাববার চেষ্টা আদৌ করেছি। একদা তাকে ভালোবাসতাম। সে ভালোবাসা সুদূর আর অবাস্তব মনে হতো এই দিনগুলোয়। যেন অন্য কারো জীবনে ওসব ঘটে গেছে, কিংবা আমার আরেক জীবনে। নিশাতের কোনো ছবি আমার কাছে ছিল না। আমার মনে হয়, যদি চোখ বুঝে দেখবার চেষ্টা করতাম তো দেখতে পেতাম না নিশাতকে। নিশাতের চেহারাই ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

এই সময়ে একটা নতুন ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। আমি ভাবতে চেষ্টা করতাম আমার বাবাকে। যে কোনো মুহূর্তে পেয়ে বসত এই ভাবনার রোখ। টের পেতাম, কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছে আমার চোখ— কোনো বস্তু বা শূন্যের মধ্যে চোখ রেখে আমি কোন এক অদৃশ্য বলীয়ানের সঙ্গে লড়াই করতাম, যে শক্তিমানের কাছে গচ্ছিত রয়েছে আমার বাবার মুখ। যেন তাকে হারিয়ে দিতে পারলে, দৃষ্টির তীরে বিদ্ধ করতে পারলেই সব পেয়ে যাবো— স্পষ্ট দেখতে পাবো বাবাকে।

একেকদিন তাস হাতে স্তব্ধ হয়ে যেতাম। তাসের টেক্কা হঠাৎ বিস্তৃততর হতে থাকতো আমার সমুখে। টেক্কার শরীরে দুর্বোধ্য কারুকাজের ভেতরে ছড়ানো ছিটানো দেখতে পেতাম ভ্রু-যুগলের অংশ, চিবুক, নাকের রেখা, ঠোঁট— ধাঁধার মতো, খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন; আমার সাধনা সেগুলো একত্রিত করে মিলিয়ে বাবার মুখ সৃষ্টি করা।

বন্ধু কেউ ধাক্কা দিলে ঘোরটা কেটে যেত। খুব অপ্রস্তুত হয়ে যেতাম। খেলা আর জমতো না।

এবারে আমার একটা উন্নতি লক্ষ করা গিয়েছিল। তাসে আমার কপাল খুলে গিয়েছে। আগে, নিশাতের আগে, যখন এই গোবিন্দর দোকানের পেছনে বসে খেলতাম, তখন হারতাম। যদিও বা জিততাম তো সেটা এমন কিছু বিস্ময়কর জিৎ হতো না। আর আজ ওরা আমাকে তাস বেঁটে দিতে বলে, কপাল তো তোমার। লাও দেখি কী হয়।

কী আবার হবে? গোবিন্দ যখন দোকান বন্ধ করছে বলে শেষবারের মতো তাগাদা করত, আর আমরা 'আরো এক হাত' বলে আরো তিন চার হাত খেলে উঠতাম, তখন দেখা যেত আমার পকেটে লাভের কড়ি আসল উপচে উঠেছে। অবশ্যি, আমার মনটা ছিল খুব উদার এবং টাকাগুলোর সদ্ব্যবহার হতো মদের বোতলে, মাংসে, সিনেমায়, সিগারেটে। আজ মনে হয়, ওরা আমাকে ভালোবাসত। আমার সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা ছিল ওদের। কিন্তু কী কারণে এই ভালোবাসা, আর কেনই বা এ উচ্চ ধারণা তা বলতে পারব না।

ওরা ছিল কয়েকজন চমৎকার বন্ধু। কোনো প্রশ্ন করত না, আমার কোনো কিছুই জানতে চাইতো না, দিনমানে কী করি, আমার সংসার আছে কী নেই— এসব ওদের কাছে তুচ্ছ। আমার তো মনে হয়, আমার পুরো নামটাও ওরা কেউ বলতে পারবে না। অথচ কত

গভীরভাবে আমরা একে অপরকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। মানুষ যখন স্কুল বানায়, দেশ চালায়, সংসার করে, হাসপাতাল কী মসজিদের পরিকল্পনা করে— তখন তারা একজন আরেকজন সম্পর্কে কিছু না জেনে একসঙ্গে মিলিত হতে পারে অথচ সেই মানুষই যখন একসঙ্গে জুয়ো খেলে, মদ্যপান করে, ধর্ষণে সঙ্গী হয়, রাহাজানির জন্যে জোট পাকায় তখন কত সহজে এবং পরস্পরের কত কম তথ্য জেনে হাতে হাত মেলাতে পারে। আসলে, আমাদের রক্তের ভেতরে রয়েছে পাপ আর বুদ্ধির মধ্যে পুণ্যের ধারণা। এই পাপের বেসাতিতে বন্ধু জোটে সহজে। রক্তের ডাক বলেই হয়ত পাপের বন্ধু যত নিকট হতে পারে পুণ্যের বন্ধু ততখানি হতে পারে না।

আমরা একসঙ্গে মদের টেবিলে প্রাণ খুলে সব কথা বলতাম, বিশ্বাস করুন, কোনো রাখা ঢাকা ছিল না; পারতাম একজন আরেকজনের সমুখেই ট্রাউজারের বোতাম খুলে প্রস্রাব করতে; আরো পারতাম মেয়েমানুষের ঘরে একজন ঢুকলে বাকি সবাই বাইরে অপেক্ষা করতে, আর পারতাম সরকারকে নির্ভয়ে গালি দিতে, বেপরোয়ার মতো দেশনায়কদের সম্পর্কে যা খুশি তা বলতে— যার একাংশ বাইরে গেলে নির্ঘাত রাষ্ট্রদ্রোহীতার দায়ে পড়তে হতো। আমার সময়গুলো কাটছিল চমৎকার। জীবন মৃত্যুর দায়মুক্ত পরমপুরুষের মতো মনে হতো আমার নিজেকে— যার পাপে পাপ নেই, পুণ্যে প্রয়োজন নেই, বন্ধন যার কাছে এক অশ্রুত শব্দ।

আমি জানি, আপনারা চমকে উঠেছেন মেয়েমানুষের উল্লেখে। আমি নিজেও এখন কম আশ্চর্য বোধ করি না, যখন পেছনের দিকে তাকিয়ে আমার এ ছবিটা দেখতে পাই। আমিওতো কোনদিন ভাবিনি, এরকম হয়ে যাবো। আমার বরাবর ধারণা ছিল, পুণ্য বরং সহজে করা যায়, কিন্তু পাপ করতে রীতিমত প্রস্তুত হতে হয়ে নিজেকে। যখন আমি এম.এ পড়তাম তখন কী জানি কীভাবে আমার মাথায় ঢুকেছিল কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটাবার খেয়াল। কার কাছে যেন শুনেছিলাম জিন্নাহ এভেন্যুর মোড়ে দাঁড়ালেই সন্ধ্যের সময় দালাল এসে কাছে দাঁড়ায়, বিশ তিরিশ টাকা লাগে। কয়েক মাস ভাবতে ভাবতে অবশেষে একবার সদ্য পাওয়া চাচাদের মনি অর্ডার থেকে তিরিশ টাকা পকেটে ফেলে রাত আটটায় জিন্নাহ এভেন্যুতে এসে দাঁড়ালাম। মাথা তো ভোঁ ভোঁ করছিলই, যখন এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছি আমার হৃদপিণ্ড যেন হাজারখানেক সৈন্যের মতো দুমদুম করে মার্চ করে চলেছে, আর কোনো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। ডিসেম্বরের শীতে পেয়েছে যেন ট্রাউজারের ভেতরটা। একটা করে লোক নির্লিপ্ত মুখে ছায়ার মতো এগিয়ে আসে, আমার মনে হয়, এখুনি বিস্ফোরণ হবে কোথাও, মরে যাবো, লোকটা চলে যায়।

সে রাতে একাই ফিরে আসতে হয়েছে। কিছু হয়নি। কোনো দালালের দেখা পাইনি। দেখা পেলেও যে যেতাম তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কেমন একটা মোহের মতো পেয়ে বসেছিল, কোনো বোধই ছিল না। যখন ফিরে এলাম আবার এত স্বচ্ছন্দ মনে হলো নিজেকে যেন ফাঁসির আসামি খালাস পেয়ে বাড়ি যাচ্ছি।

সেই আমি মাত্র কয়েক বৎসর পরে কত সহজে পয়সা দিয়ে পাওয়া একটা মেয়েকে অভিজ্ঞ শিকারীর মতো কোলে টেনে সিক্ত চুমো দিতে পেরেছিলাম। আর যখন মেয়েটা আমাকে লোক দেখানো খিদে বাড়ানো লজ্জা দিয়ে দূরে রাখবার চেষ্টা করছিল, আমি তাকে হ্যাঁচকা টানে বিছানায় ফেলে তার ওপরে শরীরের সমস্ত ভার ছুঁড়ে দিয়ে বলতে পেরেছিলাম, খুব হয়েছে। বাইরে আরো তিনজন বসে আছে তোমার জন্যে।

অবশ্যি এটা খুব নিয়মিত কিছু ছিল না, যেমন তাস বা মদ। ঝোঁক উঠলে, কিংবা ভালো কিছুর খবর পাওয়া গেলে বেরুতাম। একবার একজনের সঙ্গে শুতে গিয়ে মাথার মধ্যে ঘুরে উঠল নিশাতের ছবি। আমার মনে হলো, বিয়েটা যদি হতো তাহলে আজ এই মেয়েটার বদলে নিশাতের শরীর আমার নিচে নৌকোর মতো দুলে দুলে উঠতো। পরপর কয়েকদিন রোজ রাতে রোখ উঠতো আমার, আর আমি বেরুতাম। নিত্য নতুন চাই। আরো নতুন। আমি ও-রকম সময়গুলোতে চোখ বুজে শরীর আর মনকে কেন্দ্রীভূত, ভয়াবহ ও বিক্ষুব্ধ করতে করতে কল্পনা করতাম নিশাতকে। কানে যেন শুনতে পেতাম নিশাতের কণ্ঠস্বর, তার অনুনয়।

নিশাতের সঙ্গে বিয়ে হবার কোনো বাধাই ছিল না। তবু হলো না। আজকাল আমি ভাগ্যদেবী হয়ে উঠেছি এবং আগেই বলেছি, এখন আমার মনে হয় অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আমাদের নিছক কল্পনা। সবকিছুই ঘটেছে এবং ঘটবে। জীবন এক অসম্ভব প্রস্তাব এবং তার সমাধা করতে হলে আমাদের কর্মগুলোকে অসম্ভবের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। নিশাতের সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে না তার ইঙ্গিত অনেক আগেই আমার পড়ে নেয়া উচিত ছিল, যা তখন আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বিয়ের কথা যেদিন বলব সেদিন নিউমার্কেটের কাছে স্কুটার অ্যাকসিডেন্ট হতে হতে আমরা বেঁচে গেলাম। নিশাত বিয়েতে রাজি হয়ে যখন বাসে উঠে চলে গেল, তখন পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার পকেট কাটা গিয়েছে। তবু আমি লিখন পড়তে পারিনি। আর শেষ অবধি এই নিশাতের কারণেই আমি জানতে পেলাম, আমার হাতে মৃত্যু হয়েছে বাবার; এই যে দু'টো হাত, এই হাতে ধাক্কা দিয়েছি তাঁকে, পড়ে গেছেন বর্ষায় উন্মত্ত নদীতে— সাঁতার জানতেন না, মৃত্যু থেকে জীবনের পাড়ে আর উঠে আসতে পারেননি তিনি।

আজ আমি ভাবি, ওটা কি সত্যি সত্যির পর্যায়ে পড়ে ? আজ যখন মা'র মুখে কথাটা শোনবার পর একটি বছর চলে গেছে, নিশাতের সঙ্গে আবার অপ্রত্যাশিত আমার দেখা হয়েছে, আমি খানিকটা পারছি নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকে পুরো ঘটনাকে দেখতে।

তিন সাড়ে তিন বছরের শিশু যা করছে তা কি সজ্ঞান মানুষের জন্যে প্রযোজ্য আইন দিয়ে দেখা সম্ভব ? না, উচিত ?

কিন্তু যা ঘটে গেছে তা সত্য। আমার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সজ্ঞানে কী অবোধ-চেতনায় যে মৃত্যু আমি এ দু'হাতে একদা ধারণ করেছিলাম তাকে অস্বীকার করবো কী করে ?

নির্জন ঘরে এখন রাত্রির নিস্তব্ধতা তাকিয়ে আছে আমার দিকে তার গভীর চোখ মেলে। বাতি জ্বালিয়ে লিখছি, লিখতে লিখতে ঘামছি, আবার লিখছি। খেই হারিয়ে যাচ্ছে কথার, স্মৃতির পল্লবিত শাখার সহস্র পাতায় লাগছে ঝড়ের মাতন, মনে হচ্ছে আমি বিশ্বের সবচে' একা অথচ বিশ্বের সঙ্গে আমার বন্ধন এত যে নিবিড় তা এর আগে এমন করে আর উপলব্ধি করিনি। আমার জীবন-কাহিনীর কোনো সুস্পষ্ট শুরু নেই, ধারাবাহিকতা নেই স্মৃতির— কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ছবির অ্যালবাম নিয়ে আজ আমি আমার হারানো ভালোবাসার সন্ধান করছি। আবার আমি সৃষ্টি করতে চলেছি পিতাকে আমার আদর্শ, কর্ম আর লক্ষ্যের মধ্যে। আমার যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে এই রচনার মাধ্যমে। যা ঘটে গেছে তা আর ফেরাতে পারব না; কিন্তু লেখক হয়ে লিখতে পারব যা ঘটতে পারত— আমার লেখায় সাজাতে পারব অভিজ্ঞতা, মুল্যবোধ, আর জীবনকে, যেন আমি চেয়েছিলাম সৃষ্টি করতে পারব মানুষ,

যেমনটি আমি নিজে হতে পারেনি।

কিন্তু লেখক হবার এই সিদ্ধান্তটাও আকস্মিক। একেবারে একটা ঝড়ের মতো। সেদিন ছিল এরকম—

গোবিন্দর দোকানে রোজকার মতো বসেছিল তাসের আড্ডা। এই আমি প্রথম ক্রমাগত হারছিলাম। বন্ধুরা খুব অবাক হচ্ছিল এবং একজনকে বেশ লজ্জিত মন হচ্ছিল তার জিতবার পরমুহূর্তে। আমি বললাম, তাতে কী আছে? চলুক না? কিন্তু খেলা চলল ধুঁকে ধুঁকে— কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। আমি ওদের মেজাজ ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রস্তাব করলাম, চলো কোথাও যাই। খানিকটা গেলা যাক। আর যদি পাওয়া যায়— বলে বাঁ চোখ ছোট করলাম।

ওরা হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, চমৎকার। চমৎকার। আজ থাক তাস পড়ে।

বেরিয়ে কোথাও পাওয়া গেল না কিছু। সব বারই বন্ধ হয়ে গেছে। একটা মেয়েমানুষের বাড়ি আমাদের জানা ছিল যেখানে খানিকটা মদ রাখা থাকত। আমার বন্ধুরা বলল, চলো সেখানে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, বন্ধুরা আমাকে স্ফুর্তিতে রাখবার জন্যে কী আকুলি বিকুলিই না করছিল সে রাতে। আমি যে বারবার তাসে হেরে যাচ্ছিলাম, ওরা ধরে নিয়েছে, আমার মনটা খুব দমে গেছে। একটা পয়সা খরচ করতে দিল না আমাকে ওরা। নিজেরা খানিকটা খেল। আর সবাই চলে গেল আমাকে রেখে। যেন আমি একা একটা রাত মেয়েটার কাছে থাকলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। ওরা সত্যিই ভালো বন্ধু ছিল আমার। ওদের ধারণা যতটুকু করলে একজন বন্ধুকে খুব চাঙ্গা করে তোলা যায় তাই করেছে। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে ঘুমোতে পারত সবাই মেয়েটাকে নিয়ে— সে ইচ্ছে বলি দিয়েছে ওরা একজন বন্ধুর জন্যে।

ওরা যখন চলে গেল রাত একটা। আমি প্রথমে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মেয়েটা হাসল, আর বুঝতে পারলাম আমি একা। কিন্তু সে বোঝাটাও স্পষ্ট করে নয়— মাথার মধ্যে নয়— রক্তের ভেতরে যেন ছলাৎ করে উঠল। আমি উঠে বাইরে গেলাম, নাম ধরে ডাকলাম ওদের, কিন্তু সাড়া পেলাম না।

রাস্তাটা জনশূন্য। আজ আমার ভাবতে অবাক লাগে নিয়তিই বোধহয় আরেকবার, বোধহয় শেষবারের মতো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তখন; নইলে পা টলছে নেশায়, মাথা ঘুরছে মিলের চাকার মতো, তবু অতটা পথ হাঁটলাম কী করে?

বেরুতেই মেয়েটা আমাকে ধরে ফেলল। বলল, যাচ্ছেন কোথায়?

বললাম, কী চাও? টাকা?

জানতাম, অন্তত একটু আমার জ্ঞান ছিল, বন্ধুরা সমস্ত টাকা দিয়ে গেছে, এমনকি মেয়েটার জন্যেও। তাই সে যখন বলল— হ্যাঁ টাকা— তখন আমি কুৎসিত একটা গাল দিয়ে তার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আমার জামা থেকে । সে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আমার বন্ধুদের নাম ধরে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে ডাকতে পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

কেউ নেই ওরা। কোথায় গেল? আমার রক্তের ভেতর থেকে ডাক উঠছে ওদের জন্যে। একা লাগছে। আমি আরো জোরে ডাকতে লাগলাম, আসাদ, লোকমান, সমশের। কান পেতে রইলাম যদি ওদের কণ্ঠে শুনতে পাই আমার নাম, মুশতা—ক।

রাতের অন্ধকার থেকে একটানা শব্দ শুনছি ঝিঁঝিঁর, আর কিছু না। আকাশে কোটি কোটি

নক্ষত্র জ্বলছে, যেন তাদেরও পুড়ে যাবার চিড় চিড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার নাম ধরে ডাকছে না কেউ। আবার আমি ডাকলাম, লোকমা—ন।

ফকিরাপুল পেরিয়ে, নটরডেম কলেজ ছাড়িয়ে এসে পড়লাম মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার চৌরাস্তায়। চারটা পথ চলে গেছে চারদিকে। কোন্ দিকে যাবো ? পেছনের পথটা আমাকে নিয়ে যাবে যেখান থেকে আমি উঠে এসেছি। বন্ধুরা গেছে সমুখে। তিনটে পথের কোন্টা ধরে ? আমি জানতাম কে কোথায় থাকে, কিন্তু সেই নেশাগ্রস্ত মুহূর্তে তা মনে পড়ল না। আমার মনে হলো, পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওরা। তাই ভয় করতে লাগল আরো। উন্মাদের মতো আবার আমি ডাকলাম ওদের নাম ধরে।

তাকিয়ে দেখি নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে আছি আমি। রেল গেটটা বন্ধ। একটা ট্যাক্সি থমকে দাঁড়িয়ে আছে তার সমুখে। কয়েকটা মুখ ভেতরে। যেন এই প্রথম আমি এক মহাপ্লাবনের পর মানুষের মুখ দেখলাম। ক্ষুধার্তের মতো তাকালাম তাদের দিকে। ট্যাক্সির গায়ে ফুলের ম্লান মালা জড়িয়ে আছে, কয়েকটা ফালি ফালি আলো ভেতরটা খণ্ডিত ছবির মতো করে তুলেছে।

নিশাত। সে আমাকে চোখ তুলে দেখল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ভিখিরি এই এত রাতেও কোথা থেকে এসে হাত বাড়ালো আমার সমুখে। আমি এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে একটা আনি বার করলাম। একটা ইঞ্জিন মাথার ওপরে আগুনের ফুলঝুরি ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। ভিখিরিটা গিয়ে দাঁড়াল ট্যাক্সির কাছে। আবার সে হাত বাড়াল।

চলতে লাগল ট্যাক্সিটা। ক্রসিং বারের লালবাতিটা দুলতে দুলতে স্থির হয়ে গেল আকাশে। কুঙ্কুমে সাজানো বিয়ের শাড়ি পরা নিশাত। পাশে তার বর। বিয়ের শেষে ফিরে যাচ্ছে ওরা ওদের বাসরে। বরের মুখ আমি দেখতে পেলাম না।

বন্ধুদের নামগুলো ঘুরতে লাগল আমার ভেতরে, কিন্তু আর ডাকতে পারলাম না আমি। নিশাত। ঝাঁপিয়ে পড়া দুরন্ত মমতায় আর সমস্ত কিছু স্থির হয়ে আসা অতল ভালোবাসায় আমি বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

না কি স্বপ্ন দেখছি ?

তখন আমার মাথার মধ্যে একটা জলপ্রপাত যেন হঠাৎ বিশ্ব ডোবানো গর্জন করতে করতে নেমে এলো, যার পুঞ্জিভূত, উৎক্ষিপ্ত, ফুলের মতো কোটি কোটি শাদা ফেনায় আমি প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম অবিশ্বাস্য, নতুন, চিরন্তন, মর্মরিত এক সুন্দর।

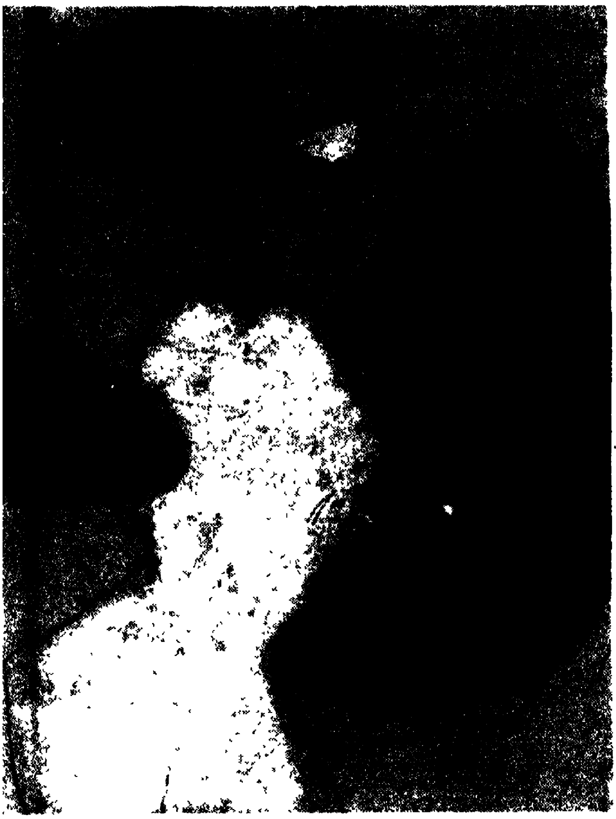
একটা স্কুটার এসে বিকট শব্দ করে থামল আমার পাশে। এক মুহূর্তে আমার সবকিছু ফিরে এলো আমার কাছে। ড্রাইভার গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, সাব কহি্ যানা হ্যয় ?

বললাম, হ্যাঁ কহি তো যানা হ্যয়। মুঝে ঘর পহচা দো।

আমাকে নিয়ে স্কুটার ছুটে চলল সেই পরিচিত প্রচণ্ড শব্দ, গিয়ার ফেঁসে যাওয়ার করুণ আর্তনাদ, চাকার নিচে অসমতল রাস্তার ধাক্কা। ড্রাইভার জানে না যাকে সে উঠিয়েছে আর যাকে সে নামিয়ে দেবে তারা দু'জন এক নয়। রাত্রির ভেতর দিয়ে ঘুমন্ত শহরের রাজপথে একটা মৃত্যু থেকে জন্মের দিকে চলেছে তার স্কুটার।

নয়াপল্টন, ঢাকা

১৯৬৩



সীমানা ছাড়িয়ে

মা মারা গেছেন যখন জরিনা মাত্র সাত। শিশু-মনে লেগে থাকা কবেকার কয়েকটা মাত্র ছবি, আর অ্যালবামে কয়েকটা ফটোগ্রাফ শুধু বেঁচে আছে। যখন তার তার বয়স বারো, তখন বাবা মাঝে মাঝে দেখাতেন সেই ছবিগুলো। বলতেন তার মায়ের কথা। বলতেন, যখন নতুন মা রোকসানা ঘরে থাকতো না, কিংবা কাছাকাছি। একটাতে এক মহিলা তার বাবার পাশে বসে আছেন। পাড় গাঁর কাঠ চেঁছে রং মাখানো চ্যাপ্টা পুতুলের মতো। পেছনের পটভূমির সঙ্গে যেন সেই মহিলার কোনো দূরত্ব নেই। আরেকটা ছবিতে শুধু সেই মহিলা। লতার মতো লীলায়িত একটা ময়ূর পাড় ঘোমটা ঘিরে রেখেছে সেই কাঠ পুতুলের মুখ। কিন্তু ঠোঁট জোড়া ভারী, একটু কালো কালো—ছবিতে কালো, আসলে হয়ত গোলাপি—এখুনি হয়ত হাসবেন। তারপর অ্যালবামের আরো দু'টো পাতা ওলটালে বড়ো ছবি। সেই মহিলা শাল গায়ে বসে আছেন ভারী কাজ করা উঁচু নকশাপিঠ চেয়ারে। পাশে দাঁড়িয়ে এগারো বছরের চালাক চালাক ছিপছিপে এক মেয়ে নূরুন্নাহার নতুন শাড়ি পড়েছে। এমন কি এও হতে পারে ওই ছবি তোলবার দিনই প্রথম সে শাড়ি পড়ল, তাই কেমন আড়ষ্ট। আর সেই মহিলার কোলে পাঁচ বছরের আরেকটি মেয়ে। হাঁ করে বোকার মতো তাকিয়ে আছে সমুখের দিকে। ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। অপরূপ ভঙ্গিতে তাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে আছেন সেই মহিলা।

কিন্তু ছবিগুলো জরিনা আর কোনোদিন দেখতে চায়নি। এখন তো একেবারেই নয়। বরং সে মনে না করতে পারলেই বাঁচে। সে স্মৃতি শুধু থেমে থাক, দৃষ্টি করলে যার প্রতিক্রিয়া হয় না, সে স্মৃতি স্মৃতিই নয়। তার মনে যে মহিলা আছেন, সেই ভালো, যে মহিলা ঝুঁকে পড়ে তার পাঁচ বছরের কোঁকড়ানো কালো চুলে গাঢ় নীল রিবন বেঁধে দিচ্ছেন।

শাহ সাদেক আলী একবার হাসলেন রোকসানার দিকে তাকিয়ে। গলাটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, তোমার ওই দোষ। নিজের মতটাকে অন্যের ওপরে চাপিয়ে দিতে চাও। সে বেচারার যে কিছু বলার থাকতে পারে তোমার মনেই হয় না।

রোকসানা বলেছিল, নতুন বাড়িতে দোরপর্দা হবে হালকা বাদামি রঙের। কিন্তু সাদেক বলেন, সবুজ। শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি, গত পরশু সেই নির্দেশ দিয়ে এসেছেন ডেকোরেটর মোহাম্মদ সোলেমানকে। কিন্তু তাতেও দোষ হতো না, যদি পরশুদিনই তিনি কথাটা বলতেন রোকসানাকে। বলেছেন সবে আজ। রোকসানার রাগ এ কারণেই আরো কিছুটা উঁচু পর্দায়। আবার সে বললো, আপনি তাহলে--।

একটু চা দিও।

সাদেক আলী কলম তুলে প্যাডে লিখতে লিখতে বললেন। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে রোকসানা এটুকু জেনেছে যে, এই কথার আড়ালে কী তিনি বলতে চান। তাই কথাটা দূরে দাঁড়ানো রোকসানার কানে গিয়ে বাজলো যেন 'থামো'। তাকিয়ে রইলো সেই মানুষটার দিকে যে প্যাডে একটানা লিখে চলেছে দেশে খাদ্য সঙ্কটের ওপর বিবৃতি।

শাহ সাদেক আলী পছন্দ করেন না তাঁর বিবৃতি লিখে দেবে কোনো মাইনে করা সেক্রেটারী অথবা তাঁর পার্টির কোনো উমেদার, যারা অপেক্ষায় থাকে পার্টি কবে ক্ষমতায় আসবে, আর ক্ষমতায় এলেই যারা উঠে পড়ে লেগে যাবে, কীসে দুটো পয়সা করা যায়। এই সততাই

সাদেককে অত্যন্ত সাধারণ স্তর থেকে তুলে এনেছে আজকের ঈর্ষাযোগ্য সামাজিক স্তরে, রাজনৈতিক খ্যাতির শিখরে। অবশ্য আজকের দিনে রাজনীতিতে খ্যাতি বলতে যা বোঝায় সে খ্যাতি কোনোদিনই তাঁর আসেনি, তিনিও চাননি।

জরিনার মা এসেছিলেন যখন, সাদেক তখনো ছাত্র। শ্বশুর পাঠালেন বিলেতে। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এলেন। প্রাকটিস শুরু করলেন কলকাতা হাইকোর্টে। সে কতকাল আগের কথা। তারপর সারা ব্রিটিশ বাংলায় জেগে উঠলো মুসলমান সমাজ। মুসলিম মধ্যবিত্তের যেন মেরুদণ্ড গড়ে উঠলো মাত্র কয়েক বৎসরে। মেরুদণ্ড পেলেন শাহ সাদেক আলী। এই সময়ে এক মামলার ব্যাপারে যেতে হয়েছিল বম্বে। আর এই যাত্রাই তাঁর জীবনে এনে দিলো এক নতুন মোড়। বম্বেয় তাঁর সঙ্গে দেখা হলো মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর।

কলকাতায় ফিরে এসে সাদেক যোগ দিলেন রাজনীতিতে। সেদিন থেকে শুরু করে আজ আটান্ন বছর বয়স অবধি রাজনীতি তাঁর সাধনা হয়ে আছে। এর পেছনে তাঁর প্রথমা স্ত্রী জরিনার মায়ের দানও কম নয়। কিন্তু জরিনার মা থাকতেন সকলের, এমনকি সাদেকেরও অলক্ষ্যে। তাই কোনদিনই তিনি বুঝতে পারেননি যে একজোড়া শুভ্র চোখ তাঁকে সারাক্ষণ উজ্জ্বল করে রেখেছে।

একদিন বড় অন্ধকার ঠেকল, যেদিন জরিনার মা মারা গেলেন। সেদিন তাঁর একটি অঙ্গচ্ছেদ হয়ে গেল যেন। সেদিন তিনি বিশেষ করে বুঝতে পারলেন কতখানি অবলম্বন তিনি পেয়েছিলেন তাঁর এই রাজনৈতিক জীবনে জরিনার মায়ের কাছ থেকে। কাজ আর কাজ— কাজের অবিরাম প্রবাহে হঠাৎ একটা বিষম ধাক্কা খেলেন সাদেক। কিন্তু সামলে নিতে জানেন তিনি। তাই ওপর থেকে কিছু বোঝা গেল না, সাদেক স্থিরতর হলেন, আরো নিমগ্ন— লক্ষ্য রইলো তেমনি অবিচল।

রোকসানা এসেছে তাঁর জীবনে অনেক পরে, দীর্ঘ চার বৎসর একক জীবন যাপনের পরে। রোকসানা ইউনির্ভাসিটিতে পড়েছে। রোকসানা যে ধরনের মহিলা সেকালে তাকে বলা হতো স্বাধীন জেনানা। জরিনার মা পড়তে পারতেন কাগজের মোটা হেডিংগুলো আর লিখতেন একটা বানান তিনবার ভেবে। জরিনার মা সাদেকের সমুখেও ভালো করে ঘোমটা না টেনে স্বস্তি পেতেন না। একটা তুলনামূলক বিচারে এলে, শাহ সাদেক আলী অনেকদিন ভেবেছেন, জরিনার মা তাঁর অন্তর্লীন একটি সত্ত্বা, আর রোকসানা তাঁর শুধু স্ত্রী, দ্বিতীয়া স্ত্রী।

তাই রোকসানা যে মানুষকে পাবে বলে আশা করেছিল, সে মানুষকে কোনদিনই পায়নি। কিন্তু এ অভিযোগও সে কোনোদিন করতে পারবে না যে সাদেক তাকে ভালোবাসেননি। মনে আছে বিয়ের পরদিন রোকসানা স্বামীকে 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলেছিল। সাদেক তখনি কিছু বলেননি। বলেছেন খাবার টেবিলে। তুমি আমার স্ত্রী, তোমার আমার দূরত্ব থাকবে না। শুধু একটা 'তুমি' দিয়ে যদি কাছাকাছি হতে পারি তাহলে মনে হয় বিশ্ব-সংসারে অনেক সমস্যাই এরপরে আর থাকছে না।

এ কী কথা বলার ধরন! কোনো উত্তাপ নেই, নেই রুক্ষতাও। বরং যে হাসি তাঁর ঠোঁটে তখন ফুটে উঠেছিল তার চেয়ে স্নিগ্ধ কিছু সারা জীবনে রোকসানা জানে নি। অথচ গোঁড়ামির অপবাদও কেউ তাঁকে কোনদিন দিতে পারবে না। মেয়েরা তাঁকে 'তুমি' বলে। বড়ো মেয়েকে বেশি দূর পড়াতে পারেননি। জরিনার বেলায় সেটা দ্বিগুণ হচ্ছে। জরিনাকে

সাদেক পড়িয়েছেন ইংরেজি মাধ্যমে ইংরেজি স্কুলে। শাহ্ সাদেক আলীকে বার থেকে দেখে এটা অনুমান করা শক্ত। রোকসানারও একেক সময় অবাক লাগে মানুষটার এই দ্বৈত চেহারা দেখে। বিশেষ করে যখন তার মনে পড়ে, সাদেক নিজে অনেক সংস্কার মনে প্রাণে মেনেও, সন্তানের জন্য, পরিবারের জন্য, সে সংস্কারকে জরুরি করে তোলেননি। আসলে যা রোকসানাও বুঝতে পারেনি, প্রগতিকে অন্য অর্থে নিয়েছেন তিনি। নিজে ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেন না। তাই বলে ভাঙ্গতে যারা পারবে তাদের তিনি বাধা দেবেন কেন?

আর এ থেকেই স্পষ্ট হয়, কী করে তিনি সবাইকে, প্রকট না করেও, নিজের আয়ত্বে রেখেছেন আজীবন। তিনি যে কর্তৃত্ব করেন তা নয়, কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব না হলে চলে না। তাঁর ইচ্ছেই শেষ ইচ্ছে, এ কথা তিনি কোনদিনই বলেননি, কিন্তু তাঁর ইচ্ছেই শেষ অবধি চিরকাল টিকে এসেছে অনায়াসে।

তাই কখনো কখনো তাকে পাহাড়ের মত অনড় আর ভারী মনে হয়েছে রোকসানার। মনে হয়েছে, দূর থেকেই ভালো, কাছে গেলে শিউরে উঠতে হবে তার বন্ধুরতা দেখে। অথচ আলীজাহ্, সাদেকেরই আপন ছোটভাই, সে কতো আপন মনে হয় তার। মনে হয়, এই একটা মানুষ যাকে শাসন করা যার, যে উদ্ধত ঋজু, কিন্তু নমনীয়। ভাইয়ে ভাইয়ে এত তফাৎ খোদা কেন যে করেছেন তা বুঝতে পারে না রোকসানা।

আলীজাহ্‌কে রোকসানা দেখেছে কম। কেননা সে এ পরিবারে আসার আগে থেকেই আলীজাহ্ তার পেশার তাগিদে প্রায় ঘর ছাড়া। আলীজাহ সাদেকের চেয়ে অন্তত কুড়ি বছর কী তারো বেশি ছোট হবে। পেশাটাও সাদেকের চেয়ে অনেক দূর পারের, একেবারেই ভিন জাতের, গোটা পরিবারের ধারা থেকে আলাদা। আলীজাহ্ চিত্রনাট্য লেখে। তার স্বপ্ন, একদিন সে চিত্র-পরিচালক হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজো সে একটা বড়ো রকমের সুযোগ পেল না। অন্য কেউ হলে যেখানে হাল ছেড়ে দিতো, সেখান থেকেই আলীজাহ্ যেন হালের মুঠি আরো শক্ত করে ধরেছে। আলীজাহ্ সময় পেলেই লাহোর থেকে আসে, আর আসে টাকার প্রয়োজনে সাদেকের কাছে। আর যে ক'দিনই সে থাকে বেশির ভাগ কাটে তার জরিনার সঙ্গে। রোকসানা এ পরিবারে আলীজাহ্‌কেই সবচেয়ে দেখেছে কম। অথচ স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো একটা অভিযোগ গড়ে উঠলেই একটা মন কখন যেন নিজের অজান্তেই আলীজাহ্‌র সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে বসে যায়।

শাহ্ সাদেক আলী স্টাডিতে আরাম চেয়ারে বসে হাতলে প্যাড রেখে দ্রুত লিখে চলেছেন তাঁর বিবৃতি। হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন রোকসানা ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

সাদেক চোখ নাবিয়ে আনলেন প্যাডের ওপর। দু'টো শব্দ লিখলেন। তারপর কলম মুড়ে, কী ভেবে বললেন, দোরপর্দার রং ইচ্ছে করলেই বদলানো যায়। কিন্তু বাড়ি একবার তৈরি হলে বদলানো অসম্ভব। বাড়িটা কিন্তু তোমার কথামতই হয়েছে।

রোকসানা হাসলো। বলল, তা হয়েছে। এখন মানে মানে ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দিতে পারলেই বাঁচি।

রোকসানার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল নিজের একটা বাড়ি হবে। আজ সে ইচ্ছে তার পূর্ণ হতে চলেছে।

সাদেক তার হাসিমাখা মুখের দিকে সুঁচালো-কৌতুক চোখ করে বললেন, তা তুমি বাঁচো বৈকি! আমিও জিরোন পাই। রোজ রোজ তোমার অনুযোগ আর আমাকে শুনতে হবে না।

শেষ কথাটি সাদেকের অত্যুক্তি। অত্যুক্তি এই কারণে যে রোকসানা কোনদিন অনুযোগ করেনি তাঁর কাছে। অভিযোগ হয়ত ছিল, জানিয়েওছে, কিন্তু অনুযোগ বলতে যা বোঝায় তা কখনোই নয়। এই যেমন, বাদলার দিনে বাথরুমে যেতে গিয়ে খানিকটা বৃষ্টিতে ভিজলেন সাদেক, কেননা শোবার ঘর থেকে বাথরুমে যেতে হলে উঠোন পেরুতে হয়, ফিরে যখন এলেন, তখন হয়ত বলেছিলেন, তোয়ালে দাও তো মাথাটা মুছে ফেলি। সেই তখন রোকসানা বললেও বলে থাকতে পারে—হতো নিজের বাড়ি, শোবার ঘরের সঙ্গেই থাকতো বাথরুম। ভাড়া দেবে বলেই কি লোকে এত বিচ্ছিরি করে বাড়ি তোলে! কিংবা খিড়কি দরোজা দিয়ে বেরুতে গেলে বারান্দা দিয়ে নেমেই পড়ে ডালিম গাছের নিচু ডালটা। সাবধানে না নামলে মাথায় লাগতে পারে। হয়ত জরিনার একদিন লাগলো। সেই নিয়েও কথাটা উঠিয়ে থাকতে পারে রোকসানা। কিন্তু অনুযোগ, কখনো নয়।

বরং যা করতে সে ঠিক সাহস পায়নি সেই কথাটাই যখন স্বামীর মুখ থেকে শুনল তখন মনে মনে গর্বিত হয়ে উঠল রোকসানা। একটা বড় দায়িত্ব কৃতিত্বের সংগে পালন করার তৃপ্তিতে তার মন মুখর হয়ে উঠলো।

আরেকটা চেয়ারে, যেটা এতক্ষণ খালি ছিল এবং যেখানে একটা মাছি কয়েকবার বসবার চেষ্টা করছিল, রোকসানা বসলো। বলল, লেখা বন্ধ করতে কে বলল আপনাকে ?

কই ? শেষ হয়ে গেছে। বিকেলে চা খেয়ে একবার পড়ে নেবো, ব্যাস।

রোকসানা বলল, আবার কীসের প্রতিবাদ ?

প্রতিবাদ নয়—প্রশ্রয়ের কৌতুক সাদেকের চোখে—বিবৃতি বলতে তোমরা শুধু প্রতিবাদই বোঝ। আর তাছাড়া ক্ষমতায় থাকলে না হয় প্রতিবাদের প্রশ্ন উঠতো। ক্ষমতা নেই, গদি নেই, আমার আবার প্রতিবাদ কাসের ? আমরা সবাই আবার গদি না থাকলে কথার কানাকড়ি দাম দিই না কিনা।

কিন্তু পরিহাসটুকু ধরতে পারল না রোকসানা। বুঝতে পারার মতো ক্ষমতা নেই একথা বললে ভুল হবে। আসলে আগ্রহ নেই।

একেক সময়ে সাদেকের মনে হয়েছে, যেহেতু জরিনার মা তাঁর কর্মজীবনের জন্য অমন অবশ্যম্ভাবী ছিলেন তাই হয়ত রোকসানা বিপরীত বিন্দুতে তার নিজের স্থান বেছে নিয়েছে। আর এ ধারণার জন্যই খুব কম, প্রায় একেবারেই না, তিনি রোকসানার সঙ্গে তাঁর কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করতেন।

রোকসানার নিস্পৃহতা চোখ এড়ালো না সাদেকের। আরো স্পষ্ট হলো রোকসানা যখন ভিন্ন প্রসঙ্গ পাড়লো।

ইস, যা বিষ্টি নেবেছিল। ভাবলাম রাত অবধি চলবে বুঝি। শীতের মুখে কিন্তু হঠাৎ অমন একদিন পাগলা বিষ্টি নাবে।

হ্যাঁ, আমারো তাই ভাবনা হচ্ছিল। ভালো কথা, আলীজাহ্ সন্ধ্যের প্লেনে আসছে।

কই, শুনিনি তো। তাই নাকি ?

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো রোকসানা।

এই তো খানিক আগে তার এলো। বলতে মনে নেই।

তা বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ যে ?

হঠাৎ আবার কোথায় ? ও তো ওমনিই। টাকার দরকার পড়েছে হয়ত।

তা-ই হবে। হাসলেন শাহ্ সাদেক আলী। ওর তো ধারণা আমার বিরাট টাকা, হাত পাতলেই হলো। তা যদ্দিন থাকে নিক না।

শেষের কথাটা ইচ্ছে করেই বললেন সাদেক। কেননা তিনি জানেন, আলীজাহ্ যে লাহোর থেকে এসে এমনি করে হাত পাতে তা রোকসানার পছন্দ নয়। কোনদিন রোকসানার মুখোমুখি আলীজাহ্ টাকা নেয়নি, সাদেক দেননি—তবু রোকসানা জানে। আর জানে বলেই তিনি তা লুকোন নি কোনদিন।

আর লুকোবেনই বা কেন ? আলীজাহকে তিনি ভালোবাসেন শুধু সহোদরের মতো নয়, সন্তানের মতোও। দু'জনের বয়সের দূরত্ব কুড়ি বছরের মতো হলেও মনের দিক থেকে বুঝি আলীজাহ্ সাদেকের সবচেয়ে কাছাকাছি।

মনে আছে কলকাতার কথা। সাদেক তখন প্র্যাকটিস করছেন, রাজনীতি করছেন আর আলীজাহ্ কলেজে নতুন উঠেছে। সাদেক চেয়েছিলেন আলীজাহ্ ডাক্তার হবে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে যার আবদার তিনি শুনে এসেছেন উদার জনকের মতো, এ ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন ?

আলীজাহ্ বললেন, আর্টস পড়ব লেখক হবো। সাদেক বললেন, বেশ তো। লেখকরাও মানুষের ডাক্তার বৈকি। আমার ইচ্ছাটা কিন্তু একদিক থেকে অপূর্ণ রইলো না।

শেষ অবধি পড়াটাও ঠিক মতো হয়নি আলীজাহ্‌র। তবু সাদেক কিছু বলেননি। বি.এ. পরীক্ষার রাতে দরোজায় খিল তুলে আলীজাহ্ হ্যামলেটের পাঠ রিহার্সেল করছিল— পরদিন বেতারে অভিনয় করতে হবে। আড়াল থেকে চুপ করে দেখে নিঃশব্দে সরে এসেছেন সাদেক। কেবল বুঝতে পারেননি, লেখক হবার আকাঙ্ক্ষা যার সে কেন অভিনয় নিয়ে এমন করে, এমনকি এই পরীক্ষার রাতেও মাথা ঘামাবে ? বরং তিনি ক্ষুণ্নই হয়েছিলেন মনে মনে। শাহ সাদেক আলী একটি মাত্র জীবনকালে একটি লক্ষ্যেরই সমর্থক, সে লক্ষ্যে যা কিছুই হোক না কেন। কই, সুযোগ তো এসেছিল অনেক, কিন্তু তিনি দশের উন্নতি আর নিজের উন্নতি একসঙ্গে কখনোই প্রার্থনা করেননি।

আলীজাহ্‌র বি.এ পরীক্ষা দেয়া হলো না, অভিনেতা হতে পারল না, লেখক হতে পারল না। হতে পারল না নয়; কী যে হলো তার, কিছুইতে মনের স্থিরতা এলো না অনেকদিন; কোথা থেকে অকারণে যে একটা বাতাস এলো— বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো ভাবনা, আচ্ছন্ন হয়ে রইলো আকাঙ্ক্ষা। এমনি করে তিন বছর। এমন কি বাসাতেও আলীজাহ্ নিয়মিত ফিরত না খেতো না ঘুমোত না। তবু সাদেক কিছু বলেননি; আলীজাহ্‌র প্রতিভায় তাঁর অগাধ বিশ্বাসকে কোনদিন এতটুকু ক্ষুণ্ন হতে দেননি।

অবশেষে একদিন নিতান্তই আকস্মিকভাবে আলীজাহ্ তার লক্ষ্য বেছে নিল— চলচ্চিত্র। বলতে গেলে গোটা পরিবারে এ এমন একটা বিদ্রোহী সংকল্প যা প্রথমে সাদেককেও চিন্তাকুল করে তুলেছিল। কিন্তু মুখে তিনি কখনোই তা জানতে দেননি। বরং বম্বেতে প্রথম

কাজ যখন সে পেল তখন সাদেকই খুশি হয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশি। আর সেই চরম খুশির প্রকাশটা ছিল, আলীজাহ্ যখন বম্বে থেকে গ্রেট পেনিনসুলারে এসে সকালে নাবলো হাওড়ায়, সাদেক নিজে তাকে গাড়ি করে আনতে গিয়েছিলেন।

তবু প্রতিষ্ঠা এলো না আলীজাহ্‌র। দেশ বিভাগের পর গেল লাহোরে। সেখানেও না। অর্থের জন্য বেনামে চিত্রনাট্য লিখতে পারে আলীজাহ্ কেননা অর্থের অনেক দোষের মধ্যে একটা বড় গুণ, ওটা বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। শস্তা ছবির শিরোনামায় আলীজাহ্ নিজ নাম কী করে যুক্ত হতে দেবে ? শিল্পমাধ্যম যদি শিল্পকেই অস্বীকার করলো, তাহলে এখানে আলীজাহ্ কেন ? তাই আজ অবধি রচয়িতা-পরিচালক হবার, ভালো ছবি করার ইচ্ছে তার রয়ে গেছে অপূর্ণ।

আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, এটা সব চেয়ে ভালো করে বোঝেন শাহ্ সাদেক আলী। তাই তাঁর স্নেহের উৎস আলীজাহ্‌র জন্যে আজো নির্মল, স্রোতস্বিনী।

পক্ষান্তরে এটা রোকসানার একটা গোপন মর্মপীড়া। কিন্তু কোন কালেই সাহস করে উচ্চকণ্ঠে কিছু বলা হয়নি। এবং আর দশটা কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে, তাতে সাদেক আহত হবেন।

সাদেক বললেন, চা দেবে না ?

রোকসানা মুখে বলল, দিচ্ছি।

কিন্তু মনটা পড়ে রইলো আলীজাহ্‌র দিকে। আলীজাহ্ আসছে। এবারো সেই পুরনো ব্যর্থতার গল্প অমিত উপহাস মেশানো কণ্ঠে—দু'দিন কী তিনদিন। তারপর সে চলে যাবে। না, এবার আলীজাহ্‌কে এত তাড়াতাড়ি যেতে দেবে না রোকসানা। নতুন বাড়ি হয়েছে। তাকে দেখাতে নিয়ে যাবে রোকসানা। অনেক পরামর্শ আছে সাজানো গোছানোর ব্যাপারে। জরিনার সঙ্গে হয়ত এ নিয়ে কথা বলা যেত, কিন্তু যখনি বলতে গেছে, প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে তার, জরিনা হেসে উঠবে— যে হাসি গিয়ে বিঁধবে তার মর্মমূলে। মনে হয়েছে, জরিনা সংসারের এইসব খুঁটিনাটিকে উপহাস করে নিজ সত্তাকে নিশানের মত উঁচু আর ভাবনাহীন করে রাখতে পারে। না, জরিনা থাক তার নিজেকে নিয়ে; আলীজাহ্‌কে তার এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আসছে, ভালোই হলো।

আর হঠাৎ মনে পড়ল রোকসানার—আলীজাহ্ কি খুশিটাই না হবে যখন সে দেখবে তার নিজের কামরা। দোতলার উত্তর-পূর্ব দিকের কামরাটা নির্দিষ্ট হয়েছে আলীজাহ্‌র জন্যে। যদিও নক্‌শায় কামরাটা দাগ দিয়ে রেখেছে জরিনা, তবু সাজিয়ে তোলা তো তারই হাতে। আলীজাহ্‌কে এবার রোকসানা সত্যি সত্যি অবাক করে দেবে। বলবে, তুমি তো বাইরে বাইরে থাক, বউ নিয়ে এসো. সে এখানে থাকবে, তুমি তোমার মতো সিনেমা করোগে হিল্লি দিল্লি।

মনটা আস্তে আস্তে প্রীত হয়ে এলো রোকসানার। কেউ জানলো না এ কথা, এত একান্তে। শুধু চেয়ারের বাজুতে চোখ-বোঁজা বেড়ালের বাচ্চার মত বাঁ হাত তার শীতল হয়ে পড়ে রইলো।

হঠাৎ হাতটা ছিটকে পড়লো কোলের ওপর। জরিনার কামরা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা সংগীতের আচমকা ধাক্কায় রোকসানার স্নায়ুগুলো যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

জরিনা তার রেডিওগ্রামে আবার সেই রেকর্ড চাপিয়েছে যার শুরুতে ট্রাম্পেটের বিকট কয়েকটা খোঁচা। বেশ তো ছিল এতক্ষণ মেয়েটা ঘুমিয়ে। হঠাৎ এই বিশ্রী আওয়াজটাকে জীবন্ত করে তুলতে বলল কে তাকে ? আর কী চড়া ভল্যুম, যেন সব কিছু ডুবিয়ে ছাপিয়ে দিতে চায়, যেন বাড়িতে একটা ছোটখাটো রেডিওর দোকান খোলা হয়েছে।

সুর আসছে। চপল, বহুমুখী, তীব্র, ধাতব।

রোকসানা উঠে দাঁড়াল। এত জোরে না বাজালেই কি নয় ?

হয়ত কানে হাত দিত রোকসানা, কিন্তু দিল না। সাদেক বললেন, কিছুটা নিরুত্তাপ কণ্ঠে, বোসো তুমি। না, বসবে কেন ? আমাদের চা দিতে বলো। জরিনাও খাবে। আমি ওকে দেখছি।

আস্তে আস্তে জরিনা মাথা রাখলো বালিশে। দু'হাত চুলের পেছনে রেখে, দু'পা সমুখে ছড়িয়ে, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। শাড়ি উঠে এসেছে শুভ্ররক্তিম, চিতা বাঘের বুকের মত জানু অবধি। বৃষ্টি নেমেছিল দুপুরে। একটু ঠাণ্ডা করছে বৃষ্টি-শেষের বাতাসে। তা করুক।

আলীচাচা বলেন, হৃদয়কে যা স্পর্শ করে একমাত্র তা-ই সত্য।

একটু আগেই কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছিল জরিনা। একটি সুন্দর সনেট। কিন্তু হলো না। বদলে আলীচাচার মুখ ভেন্টিলেটর থেকে উপুড় হয়ে পড়া আলোর মতো তার দু'চোখ জুড়ে রইলো। তার সমস্ত কবিতা যেন তার অজান্তেই একটি মাত্র পাঠকের জন্য গড়ে ওঠে; অক্ষর হয়, হয়ে এসেছে, এই এতকাল, তার পনেরো বছর বয়স থেকে, যেদিন থেকে সে কবিতা লিখতে শুরু করে—আলী চাচার জন্যে।

ঠিক এমনি মুহূর্তগুলোয় আর কাউকে তার মনে পড়ে না।

আর মাকে তার মনে পড়ে, যে-মার কথা মনে করলে কথা কয়ে ওঠেন, যে মার মুখ শুধু কাঠ পুতুলের মতো নয়, যে মা মাথার নীল রিবন বেঁধে দেন মনে করলেই—সেই মাকে মনে পড়ে।

আলীচাচার নাম কবে যে পর্দায় দেখতে পাবে জরিনা! শহরের সবচেয়ে অভিজাত শো হাউস; ঠিক দুপুর রোদে কিশোরী মুখের মত সবুজ তেতে ওঠা, লম্বা কাচের প্যানেল আর মানুষের পোশাকের ভিড়—একটা ছবির মতো তার চোখের সমুখে ভেসে ওঠে। ভেতরে আলো নিবলো মিষ্টি ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। আর অন্ধকার। আর সুবাস। চোখ সয়ে এলে পর মানুষ। ততক্ষণে পর্দায় ভেসে উঠেছে—'রচনা ও পরিচালনা—আলীজাহ্।' তারপর নিবে যাওয়ার আগে, আসন্ন ছবির শুরুতে, আগুনের মতো একবার জ্বলে উঠে— সেই নাম মিলিয়ে গেল।

আলীচাচা বলেছিলেন, আমার ছবির শুরুতে, একেবারে প্রথমে, বইয়ের নামেরও আগে কবিতার একটা লাইন ভেসে উঠবে পর্দায়। কার কবিতা জানিস ?

কার ?

তোর।

আমার ? আমার!

বিস্ময়ে প্রায় আর্তনাদের মত শুনিয়েছিল জরিনার কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, তোর মানে, সেবার আমাকে কতগুলো কবিতা দিয়েছিলি ইংরেজিতে লেখা, হ্যাঁরে, ইংরেজিতে লিখিস কেন ? বাংলায় লিখতে পারিস না ? বাংলায় লিখবি।

জরিনা যেন নিবে যায়। বলে, তাই তো লিখি। শুধু কখনও ইংরেজিতে। তোমরা মনে কর আমি বুঝি বাংলায় লিখতে জানি না।

তা কেন ? তোর সেই ছোটবেলায় লেখা বিচ্ছিরি রকমের অদ্ভুত চিঠিগুলোর কথা আমার মনে আছে। আমার চেয়েও ভালো বাংলা লিখিস তুই সেই তখন থেকেই।

জরিনা একটু বিব্রত হয় যেন চিঠির প্রসঙ্গে। চটপট মুখ সুঁচালো করে বলে, আমার কোন কবিতা নিয়েছ তাই বলো।

আলীজাহ্ তার সুগন্ধ সিগারেটে টান দেয়।

তোর সেই কবিতা— 'A Torso I am' এর প্রথম দুটো লাইন।

আমার মনে নেই।

আমার আছে।

আলীচাচা তখন তর্জনী তুলে শূন্যে একটা সরল রেখা এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি টানতে টানতে বলেছিলেন,

ফেড ইন করছে—দ্যাখ—

'Beneath the black sun
We shall rise in a flame'

তার কণ্ঠ এত গভীর আর আবৃত্তি এত সুন্দর যে জরিনার মনে হয়েছিল এ দু'টো লাইন সে কোনকালে লেখেনি। যেন পৃথিবীর অন্তস্থল থেকে এক যথার্থ কবি কোন এক মঙ্গলমুহূর্তে উচ্চারণ করেছিল এই দু'টো লাইন, আর তা জীবনকাল, জীবনকে অতিক্রম করে অনন্তকালের মত শুদ্ধ এবং সত্য হয়ে আছে আলীজাহ্‌র উজ্জ্বল আত্মায়।

আলীজাহ্‌র আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে জরিনার চোখে তৈলচিত্রের মতো একটা ছবির জন্ম নিয়েছিল সেদিন। বিশাল কোবাল্ট নীলের দিগন্তজোড়া ক্যানভাসে কার এক অদৃশ্য আঙুল যেন দীর্ঘ অথচ সরু সোনালি তরঙ্গ এঁকে গেল। তখন তার বয়স ষোল...Beneath The Black Sun.. কী সে ভেবেছিল সেই ষোল বছর বয়সে ? এখন, এই মুহূর্তেও সেই ভাবনা তার ভাল লাগলো একটা ব্যথার মত... We Shall Rise... সে আর আলীচাচা...সোনালি তরঙ্গ...In A Flame... যদি তা সত্যি হতো।

আলীচাচা একদিন ছবি করবেনই।

কিন্তু আজ এই বৃষ্টি থামবার পর কোন কবিতা লিখতে চেয়েছিল জরিনা ? কী ভাবছিল সে ? না, না, না। নাম— অমর নাম পৃথিবীতে একটিও নেই— যে নাম জন্ম নিয়েছে জ্বলন্ত, দীর্ঘ, রক্তিম, আদিম অগ্নিশিখা থেকে। নেই, নেই, নেই। পনেরো বছর বয়সে পুরো হাক্সলি। জরিনা জানে, খুব ভালো করেই জানে, পনেরো বছর বয়সে সে পড়েছে অল্‌ডাস হাক্সলি

রূপকথার সমান আগ্রহ নিয়ে পড়ে শেষ করেছে এমন মেয়ে গোটা দেশে আর একটিও জন্মায়নি। আর এখন তার বিষ-ফল ভুগতে হচ্ছে। কিন্তু হাক্সলি তাকে পড়তে বলেছিল কে ?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। নূরু আপার বাসায় একদিন সে একটা ইংরেজি পত্রিকা দেখেছিল। নূরু আপার স্বামী হামিদুর রহমান ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। সেই পত্রিকায় জরিনা দেখেছিল হাক্সলির ছবি। থ্রি কোয়ার্টার প্রোফাইল। চশমার একটা তেকোণা ছায়া, প্রায় দাঁড়া ছড়ানো মাকড়শার মতো, পড়েছে চোয়ালের হাড়ে। অদ্ভুত মনে হয়েছিল মানুষটাকে জরিনার। মনে হয়েছিল, কেন মনে হয়েছিল এই হাস্যকর কথাটি তা সে জানে না, লোকটা কী খেয়ে বেঁচে থাকে ? কোন দর্জির দোকান থেকে কাপড় কাটিয়ে থাকে এই লেখক ? আর তার বিছানার চাদরের রঙ ?

জরিনা জানে, জরিনা অনেকদিন দেখছে, মাঝে মাঝে যাদের নিয়ে এইসব কথা মনে হয়, যা অন্তরঙ্গ, অথচ মুখে বললে শোনাবে হাস্যকর, সেই মানুষগুলো তার জীবনে কোনো না কোনো নতুন মানে যোগ করে দিয়েছে।

সেদিনই জরিনা হামিদ দুলাভাইয়ের কাছ থেকে প্রথম নিয়ে এসেছিল হাক্সলির বই। বেতের গোল চেয়ারে দু'পা বুকের কাছে ছড়িয়ে তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মেতে থেকেছে এই নতুন লেখকের বই নিয়ে, যার চোয়ালের হাড়ে একটা ছবিতে ছায়া ফেলেছিল দাঁড়া ছড়ানো মাকড়শা।

সেই হাক্সলি, ঠিক মনে পড়ছে না, কোথায় যেন বলেছিলেন, আজো মনে পড়ে জরিনার— আমাদের এই পৃথিবী অন্য কোনো গ্রহের নরক।

কথাটা ভালো লেগেছিল তার। যেমন করে তার ভালো লাগে আলীজাহ্‌র কথা। মনে হয়েছিল তার নিজেরই ভাবনায় এতকাল এই কথাটা জন্ম নিয়ে প্রচ্ছন্ন থেকে প্রতীক্ষা করছিল মুক্তির জন্যে। এত সহজ, এত গভীর, এত চেনা। এই পৃথিবী, এই সবুজ পৃথিবী, এই আলোয় জ্বলা আঁধারে ডোবা পৃথিবী অন্য কোনো গ্রহের নরক। তাহলে স্বর্গ কোন্‌ গ্রহ ? সেখানে কি লেখক নেই একজনও ?—হাক্সলির মতো ?— যে এমনি চেনা গলায় বলতে পারে এই গ্রহ অন্য কোনো গ্রহের স্বর্গ ?

তারপর অনেকদিন পরে, যখন তার অনেকদিন হলো পড়া হয়ে গেছে হাক্সলি, হাক্সলির ওপরে হঠাৎ বিতৃষ্ণা জন্মে জরিনার।

আলীচাচা বলেছেন—সবার চেয়ে বড় কথা, হৃদয়কে যা স্পর্শ করে একমাত্র তা-ই সত্য।

জরিনার মা মারা গিয়েছিলেন সন্তান হতে গিয়ে, প্রায় তিনদিন যমে-মানুষে টানাটানির পর। মা আর সন্তান বাঁচলো না কেউই। শাহ সাদেক আলী তখন উত্তর বাংলা সফরে বেরিয়েছেন।

আলীজাহ্‌ তার করল তিন জায়গায়। সেই তার সাদেকের হাতে গিয়ে যখন পৌঁছুলো আর যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন দাফন হয়ে গেছে। সাদেক নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন তাঁর স্টাডির চামড়া-মোড়া গভীর চেয়ারে।

সাদেক কাছে ডাকলেন না কাউকে। না নূরুন্নাহার, না জরিনা। আলীজাহ্‌ তাদের আগলে

রইলো। সারা বাড়ি ভরে উঠলো পাষাণ-চাপা নিস্তব্ধতায়। একটা মানুষ যে সহস্র হয়ে আলো করে থাকতে পারে, তা কে জানতো? কোনদিন সরাসরি সম্পর্ক ছিল না সংসারের সঙ্গে সাদেকের। এখন সেটুকুও আর রইলো না। হঠাৎ যেন এক সাগর-সংগ্রামে এসে দাঁড়িয়েছেন শাহ সাদেক আলী। যেন তাঁর এই স্তব্ধতার, অনুপস্থিতির, স্বল্পভাষীতার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই আর; আর, উত্থান নেই, পতন নেই; কেবলি প্রবাহিত হচ্ছে একটি স্থির অকল্প দীর্ঘ সরলরেখা।

বিপরীতে পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো দু'বোন, জরিনা আর নূরুন্নাহার। পিঠেপিঠি দু'বোন নয় তারা, তখন তারা সাত আর তেরো। নূরুন্নাহার ছিল চপল দুষ্টু। তার কপাল ছিল আধখানা চাঁদের মত ছোট আর চাপা, নাক তিলের মতো এই এতটুকু। আর প্রশস্ত দুই পাতলা ঠোঁটে রেশমি রক্তিমতা। দুষ্টুমিটা ছিল ওর নেশা। চতুরালি ছিল ওর স্বভাব। উল্টো দিকে জরিনা তার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত কপাল, চাঁদের মতো গোল মুখ আর ক্রীম রঙা রেকাবির মতো গাল—যা ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠতো লাল—আর ব্রাউন রঙ চুল নিয়ে নূরুন্নাহারের পাশে ছিল অনেকটা বোকা, মন্থর, হয়ত কিছুটা সাবধানী। চট্ করে দেখলে বাইরের কেউ মনে করেও বসতে পারত যে, মেয়েটা বোবা—এমনি তার চাহনি, এমনি তার চলন।

নূরুন্নাহারের সমস্ত দুষ্টুমি গিয়ে পড়ত জরিনাকে নিয়ে। জরিনার কান্না পেত। কিন্তু তবু নূরুন্নাহারের সঙ্গ থেকে এতটুকু দূরে সরে যেত না সে।

বৃষ্টি পানিতে সমুখের পথটা নদী হয়েছে তো নূরুন্নাহারকে নৌকা বানাতে হবে। আর তার কাগজ জোগাবে জরিনা নিজের খাতা ছিঁড়ে—এতে তার আনন্দ। অথচ একটা নৌকাও যদি কোনদিন সে ছুঁতে দিয়েছে জরিনাকে। আর সন্ধ্যে বেলায় খাতার এ হেন অবস্থার জন্যে মাস্টারের বকুনিটুকুও খেতে হলো জরিনাকে। নূরুন্নাহার তখন মুখ টিপে হাসছে। এমন কি মাস্টার নূরুন্নাহারের লক্ষ্মীপনার আদর্শ তুলে ধরে জরিনাকে তখন বলছে—এইতো তোমারই বোন, তার খাতা দেখ দিকি— কেমন ঝকঝক করছে।

কিংবা নূরুন্নাহারের বুদ্ধিতেই একটা নতুন খেলা আবিষ্কার হলো, পাল্লা দিয়ে সিঁড়ি থেকে কে কত তাড়াতাড়ি নেবে আসতে পারে। তখন দুপুর বেলা। চারদিক ঝুম ঝুম করছে। দৌড়ে নাবতে গিয়ে ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল জরিনা। কপালের কাছে তেরছা হয়ে আধ ইঞ্চিটাক কেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল দর দর করে। চিৎকারে করে উঠলো। যে মেয়েটি স্বভাবতই কিছু বলে না তার এই আকস্মিক চিৎকারে ঝন ঝন করে উঠলো গোটা বাড়ি। ওপর থেকে মা এলেন, এলেন সাদেক। ওদিকে নূরুন্নাহারই তখন উবু হয়ে পড়ে কামিজের খুট দিয়ে রক্ত মুছে দিচ্ছে জরিনার। জিজ্ঞেস করলে বলছে, আমি তো জানি না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, চিৎকার শুনে এসে দেখি বাবুর এই অবস্থা। আমি কী করব বল? কোন প্রতিবাদ করল না জরিনা। আর আশ্চর্য, সেই রক্তঝরা যন্ত্রণার মধ্যেই সে মুগ্ধ হলো, ঈর্ষান্বিত হলো বোনের মিথ্যে বলার অপূর্ব সাবলীলতা দেখে। কপালের সেই কাটা দাগটা জরিনার এখনো আছে একটা আবছা খয়েরি দাগ হয়ে।

এই তো সব দুষ্টুমি। তবু জরিনা সঙ্গ ছাড়বে না নূরুন্নাহারের।

একেকটা হঠাৎ পাওয়া ছুটির দুপুরে কিংবা কোনদিন রাতে কেন যে নূরুন্নাহার একলা থাকতে চাইতো, তন্ময় হয়ে যেত নিজেকে নিয়ে, জরিনা তা বুঝে উঠতে পারত না। তখন

কাছে গেলে তাড়া খেয়ে ফিরে আসতে হতো। কিংবা এমনও হয়েছে, নূরুন্নাহার ডুবে গেছে নিজের প্রসাধনে। আয়নার সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুল বাঁধা, রিবনে বো তোলা, চলছে তো চলছেই। আর পাউডার পাফ আর ভ্রু আঁকা। তখন জরিনাকে সে তাড়িয়েও দিত না, কথাও বলতো না—তার উপস্থিতিকে একটা করুণার দৃষ্টি দিয়েও যেন স্বীকার করতে চাইতেন নূরুন্নাহার। আর জরিনার মনে হতো একটা নতুন মানুষ, একটা বাইরের মানুষকে সে দেখছে। অনেকক্ষণ— সে দাঁড়িয়ে থাকতো, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার চিবুক অবনত হয়ে আসত—*প্রায় ছুঁই ছুঁই হতো গলার ভাঁজটার কাছে। তবু নূরুন্নাহার নির্বাক, নিস্পৃহ।*

একদিন রাতের বেলায় খেয়ে দেয়ে জরিনা গিয়েছিল নূরুন্নাহারের কামরায়।

বছরখানেক হলো নূরুন্নাহার বড় শোবার ঘরের পাশে ছোট কামরাটায় থাকে আর জরিনা মায়ের কাছে। জরিনা গিয়ে দেখে বিছানায় উপুড় হয়ে সে খাতায় উল্টোদিক থেকে প্রথম পাতায় কী লিখছে। জরিনা কাছে যেতেই নূরুন্নাহার খপ্ করে কোমর বাঁকিয়ে আধো উঠল। কিছু বলার আগেই কৌতূহল ততক্ষণে জরিনার মুখে কথা এনে দিয়েছে।

কী লুকোলি, আপা ?

সে কথার জবাব না দিয়ে নূরুন্নাহার সোজা তর্জনী দেখিয়ে দেয়।

পালা, পালা শীগগীর। বলে দেব মাকে ? আমার পড়া ডিস্টার্ব করছে ?

বলনা আপা।

না।

বালো।

বলছি—না।

জরিনা আর প্রশ্ন করে না। কিন্তু চলেও যায় না। তেমনি খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কী ভেবে নূরুন্নাহার শরীরের ভঙ্গিটাকে বদলায়, মুখটাকে শিথিল আর মসৃণ করে আনে। উঠে বসে বলে, নাহ, তোর জ্বালায় কিছু করবার যো নেই। তুই ছেলে মানুষ—তুই কী বুঝবি? যখন ক্লাস এইট নাইনে পড়বি তখন।

জরিনা বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। মনে একটু দুঃখও হয় হঠাৎ এই বয়সের পার্থক্যটা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয়ার জন্য। রাগ হয় দেমাক দেখে। কিন্তু রাগের চেয়েও বেশি হয় কৌতূহল আর ঈর্ষা।

নূরুন্নাহার বলে, দাঁড়া পেছন ফিরে। ছাড়বিনে যখন, দেখাচ্ছি। কাউকে বলতে পাবিনে কিন্তু। দাঁড়া শীগগীর--আর একটু ঘুরে। যখন ফিরতে বলব তখন তাকাবি—তার আগে না, খবরদার।

জরিনা পেছন ফিরে শব্দ শুনতে পায় নূরুন্নাহারের খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ভাঁজ করার আওয়াজ। কিন্তু ফিরতে বলল না তাকে। নূরুন্নাহার সমুখে এলো তার। হাতে কাগজটা। বলল, একবার দেখতে পাবি—। এক সেকেণ্ড।

জরিনা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। নূরুন্নাহার ভাঁজ খুলে কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরেই টুক করে সরিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে জরিনার চোখে শুধু কতকগুলো হিজিবিজি লেখা জীবন্ত হয়ে, তরঙ্গ হয়ে উঠেই মিলিয়ে যায়। একটা অক্ষরও সে বুঝতে পারে না।

বলে, কী।

কী আবার ? দেখালাম তো।

তারপরই খপ্ করে জরিনাকে টেনে নিয়ে খাটের উপর বসিয়ে দেয়, কাগজটা আবার পুরোপুরি চোখের সমুখে মেলে ধরে, একেবার পেছন ফিরে দরোজার দিকে দেখে নেয়, ফিসফিস করে বলে, কিছু পড়তে শিখিস নি ? এই দেখ-ভ-এ আকার ভা, ল-এ ওকার লো, ব-এ আকার বা, আর দন্ত্য স-এ আকার সা—ভালোবাসা।

জরিনা পড়তে পারে এবার। অবাক হয়ে দেখে সারাটা কাগজ জুড়ে শুধু ওই একটি শব্দই বারবার লেখা। কেন যেন দুপ দুপ করতে থাকে তার বুক, এত আস্তে এত কানের কাছে মুখ রেখে নূরুন্নাহার কথা বলছে।

জানিস, বাবা মাকে ভালোবাসে।

জরিনার খুব অবাক লাগে। মনে মনে ছবিটা ভেসে ওঠে, বাবা চেয়ার টেবিলে বসে লিখে চলেছেন। বাবা দিনরাত লেখেন। কিন্তু কই, সে গিয়ে পড়লে বাবা তো এমনি করে কাগজ লুকোন না। বাবা কি এমনি সব কাগজে লিখে মা-কে দেন ? মাঝে মাঝে মানুষজন আসে। এসে, সব লেখা কাগজপত্র নিয়ে যায়। বাবা তাহলে ওদেরও ভালোবাসেন।

নূরুন্নাহার হঠাৎ বলে, খবরদার, কাউকে বলবি না, মাকেও না।

না না না।

জরিনা শুধু মুখে বলে না, মাথা নেড়েও উত্তর করে।

চোখ ছুঁয়ে বল্ কাউকে বলবি না— যা পালা শীগগীর।

জরিনার গা কেমন শিরশির করতে থাকে— ঠিক দুপুর রাতে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ অন্ধকার দেখলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

এমনি করে দিনের পর দিন।

কিন্তু একটা দরোজা পেরুলে পরের কামরা যেমন আগের কামরা নয়, ঠিক তেমনি মায়ের এন্তেকালের পর দু'বোনের সম্পর্ক একটা নতুন চক্রে এসে বিকশিত হয়।

আরম্ভটা ছিল এ রকম—

বৃহস্পতিবার রাতে মারা গেলেন জরিনার মা। শনিবারের দুপুরের কথা। শাহ সাদেক আলী আলীজাহ্‌র তার পেয়ে সেইদিনই সকালে এসে পৌঁছেছেন; সেই তখন থেকে তিনি তাঁর স্টাডিতে। অন্য দিনের মতই ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে একগাদা দৈনিক কাগজের স্তূপ তাঁর সমুখে। একের পর এক পড়ে যাচ্ছেন। কখনো পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছেন কোনো খবরে। এতবড় বিয়োগের চিহ্ন বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। কেবল পাশের টিপয়ে যেখানে রুপোর বাটিতে এলাচদানা থাকত আজ সেই টিপয়টা শূন্য।

বাইরের ঘরে একজন হাফেজ বসে পড়ছে পাক-কোরআন। আর আলীজাহ্ এই এতক্ষণে সবে বাথরুমে গেছে গোসল করতে। বেলা প্রায় আড়াইটা।

জরিনাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন তার মামানি। বিধবা মানুষ। সংসারে আপন বলতে আছে একমাত্র ছেলে বুলু। ম্যাট্রিক দিয়েছে এবারে। জরিনার মা মারা যাওয়ার খবর পেয়ে তাঁতিবাগান থেকে বুলুকে সঙ্গে করে এসেছেন কয়েকদিনের জন্য।

জরিনাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। হাত শিথিল হয়ে এসেছে জরিনার মাথার ওপর থেকে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল জরিনার। ধড়মড় করে উঠে বসে চারদিকে তাকিয়ে কেমন সব অচেনা মনে হলো। খুব নিচু গলায় একবার ডাকল—মা। রোদে আর দুপুরের বাতাস। কেউ সাড়া দিল না। তখন এক পা এক পা করে নিচে নেমে এলো জরিনা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী ভাবল খানিক। চারদিকে কেউ নেই। শুধু বাথরুম থেকে শব্দ আসছে পানি ছিটানোর।

সেই শব্দটা উৎকর্ণ হয়ে খানিকক্ষণ শুনে জরিনা এবার একরোখার মতো সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। নেমে বারান্দা পেরিয়ে বসবার পর। হাফেজ একবার তাকিয়ে দেখলেন কী দেখলেন না। তাঁর ক্লান্ত, বিলাপী, করুণ আবৃত্তি পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে। হাঁটতে লাগল হনহন করে।

খপ্ করে কে হাত ধরতেই জরিনা তাকিয়ে দেখে, বুলুভাই। হাত মুচড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুম ঘুম গলায় বলে, ছাড়ো।

কোথায় যাচ্ছিস তুই ?

মার কাছে।

চোখ তুলে বলেই নাবিয়ে নেয় জরিনা। পানিতে টাবুটুবু হয়ে আসে দু'চোখ।

যেতে দাও আমাকে।

কিন্তু বুলু যখন তাকে কোলে তুলে নিল তখন এতটুকু বাধাও দিল না জরিনা। বাসায় ফিরে দেখে নূরুন্নাহার বারান্দায় তাকেই খোঁজাখুঁজি করছে। বুলু তার হাতে জরিনাকে তুলে দিয়ে বলে, কাণ্ড দেখেছ জরিনার ? গোরস্তানে যাচ্ছিল, ভাগ্যিস আমি পথে দেখে ফেলেছিলাম।

নূরুন্নাহার তার কপালে হাত রেখে চিবুক ধরে শুধোয়, তাই নাকি ?

কোনো কথা বলে না জরিনা। তখন তাকে নিয়ে ওপরে নিজের কামরায় উঠে আসে সে। বলে, আয়, আমার পাশে ঘুমুবি।

বলে নিজেই তার ধূলো পা মুছিয়ে দেয়। নিজে শোয়। পরে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পরে শুধোয়, মাকে দেখবি ?

বালিশের নিচে থেকে নূরুন্নাহার মায়ের বাঁধানো ফটো বার করে। দু'জনে তাকিয়ে দেখে। তারপর হঠাৎ ফটো একপাশে সরিয়ে রাখে, জরিনাকে জড়িয়ে ধরে নূরুন্নাহার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। জরিনারও কান্না পায়। ভীষণ কান্না। কিন্তু কাঁদে না। নিজের বুকে অনুভব করে নূরুন্নাহারের কান্না।

প্রায় ছ'মাস পরের কথা।

দোতলার শেষ মাথায় যে গোল বারান্দা তার লাল মেঝেয় বসে রেলিংয়ের ফাঁকে দু'পা ঝুলিয়ে দিয়ে জরিনা খুব এক মনে কিছুই ভাবছিল না। তার পা অবধি প্রায় উঠে এসেছে কচি আমগাছটা। হাতের ডানে বড় নিমগাছে বাতাস কাঁপছে। চারদিকে আসন্ন সন্ধ্যা। আকাশ হয়ে উঠেছে ভারী, ভিজে ভিজে, বেগুনি লাল আর হাতের শিরার মত এখানে ওখানে নীল-নীল। চড়ুইগুলো দিনমান কোথায় কোথায় উড়ে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে তাদের

আমগাছের ডালে। হুল্লোড় বাধাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। আর ওপাশের নিমগাছটায় ডানা ঝাপটাচ্ছে বাসা ফেরৎ কয়েকটা কাক। দূরে ট্রাফিকের শব্দ, ভারী কিন্তু আবছা—একটা মোটা পর্দার ভেতর দিয়ে চুঁয়ে পড়ছে সিরাপের মতো। রাস্তায় জ্বলে উঠেছে বাতি। কিন্তু দিনের আলো তখনো অন্ধকার নয় বলে ম্লান, ছোট ছোট দেখাচ্ছে, রাত হলে আস্তে আস্তে ওরা বড় হবে।

জরিনা চুপ করে এইসব দেখছিল। খুব অস্পষ্ট করে নিজেকে যেন মনে হচ্ছিল অমনি ম্লান, অমনি ছোট ছোট, দূরে দূরে। অই বয়সি অন্য যে কোন মেয়ে এত দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারত না। কিন্তু জরিনা পারে। বরং এইটেই তার ভালো লাগে।

আমগাছে এতক্ষণে চড়ুইগুলো শান্ত হয়ে বসেছে। আর কোনো শব্দ নেই। এই সন্ধ্যার ধূসরে ছোটো একমুঠো শরীরগুলো ওড়াউড়িও করবে না আর। আকাশ থেকে নীল শিরাগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে এক্ষুণি।

শাহ সাদেক আলী মগরেবের নামাজ আ'দা করে বারান্দা দিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ অন্ধকারে আবছায়া পেছনটুকু দেখতে পেলেন জরিনার। বিরক্ত হলেন এদিকে এখনো কেউ বাতিটা জ্বেলে দিয়ে যায়নি বলে। ভাবলেন আলোটা নিজেই জ্বালাবেন। কিন্তু জ্বালালেন না। জরিনাকে হঠাৎ এভাবে বসে থাকতে দেখে কৌতূহলে মনটা তাঁর ভিজে উঠলো। পা টিপে পেছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

নতুন করে মেয়েটাকে যেন চোখে পড়লো তার। নিজের সন্তানকে একেক সময় কত অপরিচিত মনে হয়, এ কি তিনি কখনো জানতেন? মনে হলো, পৃথিবীর দু'প্রান্তে দু'টো দেশ— তাঁরা দু'জনে সেই দু'দেশের অধিবাসী। আকাশে যেমন করে একটা কক্ষচ্যুত তারা অযুত অযুত বছরে একবার হঠাৎ জ্বালিয়ে দেয় বিপর্যয়ের আগুন, ঠিক তেমনি তিনি আজ ছিটকে এসে পড়েছেন দক্ষিণের এই অন্ধকার গোল বারান্দায়। কিছু বললেন না তিনি, শুধু স্তব্ধ হয়ে তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে জরিনার পাশে, নিচু টুলের ওপর বসলেন শাহ সাদেক আলী। মেয়েটা একটু চমকে উঠেই একহাতে আঁকড়ে ধরলো তাঁর জানু আর ঠিক তেমনি তাকিয়ে রইলো সমুখের দিকে। সাদেক বললেন, কী দেখছিস? পাখি?

হ্যাঁ।

কী নাম পাখির?

চড়ুই। —চড়ুই আমাদের ঘরে রোজ কুটো ফেলে যায় জানো আব্বা।

তাই নাকি?

দু'জনে সমুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। কেউ কারো দিকে তাকায় না। তাকাবার প্রয়োজন হয় না। বাবাকে ভালো লাগে জরিনার। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে একটু। সাদেক তখন বলে চলেছেন, ঠিক আমাদের যেমন দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, তেমনি পাখিদেরও। —ঝড় উঠলে ওরা থাকবে কোথায়? তাই আমাদের দালানে এসে খড়কুটো দিয়ে বাসা করে। তাড়িয়ে দিলে আল্লাহ দুঃখ পাবেন, বলবেন—আমার বান্দা একটা অসহায় জীবকে শুধু শুধু কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের পাপ দেবেন।

জরিনার তখন এ কথায় কান নেই। তার মন তখন ঘুরছে অন্য প্রসঙ্গে। চট করে প্রশ্ন করে, আব্বা, পাখিদের নাম নেই?

নাম ?—হ্যাঁ নাম আছে। আমরা ওদের কথা বুঝতে পারি না, তাই। সোলেমান নবী ছিলেন অনেকদিন আগে— তিনি বুঝতে পারতেন ওদের কথা। দুনিয়ার সব জীব-জন্তুর সঙ্গে কথা বলতেন সোলেমান নবী।

আমি পারবো না ?

পারবে বৈকি। যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ নেই— চকোলেট কেনবার পয়সা নেই— খুব কষ্ট যাদের তারা পাখি হয়ে যায়। তখন আর কোনো ভাবনা থাকে না। তাই বাচ্চাদের সঙ্গে পাখিদের এত ভাব।

ও বুঝেছি। তাই বুঝি আমার মাথার ওপরে চড়ুইগুলো বাসা করে, আব্বা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই।

জরিনা কান পেতে থাকে পাখিদের কোনো সাড়া শব্দ যদি জেগে ওঠে। সাদেকও তন্ময় হয়ে থাকেন। কিন্তু আর ওরা ডাকে না। সাদেক জরিনার কাঁধে হাত রেখে নির্বাক হয়ে বসে থাকেন।

এই সন্ধ্যার কথা আজো ভুলতে পারেনি জরিনা। এই সন্ধ্যা তার জীবনে একটা স্বপ্ন জাগরণের মাঝপথে একক বেদনাময় একটি অনুভূতি হয়ে আছে। যে অনুভূতি জন্ম নিয়েছিল সেই সন্ধ্যায়— সেই পাখি, সেই জানু, সেই কণ্ঠস্বর আর কোনদিন ফিরে এলো না। জীবনের দূর-সমুদ্রে সরে যেতে যেতে সেই সন্ধ্যা তার স্মরণে আসে ইস্কুলে পড়া নাম ভুলে যাওয়া এক ইংরেজি কবিতার ঝোড়ো রাত্রিতে বাতিঘরের মতো।

এই সন্ধ্যার কথা প্রথম বড় করে মনে পড়েছিল কলকাতার বাসায় চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে একদিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। তখন নূরুন্নাহারের বিয়ে দিয়েছেন সাদেক। জরিনা তখন সবে এগোরোয় পড়েছে। আর রোকসানা সংসারে এসেছে সপ্তাহ খানেক হলো।

প্রথম রাতে শোবার ব্যবস্থা হল আলাদা ঘরে। পাশের কামরায়। মা মারা যাবার পর এই তিন বছর সে ছিল সাদেকের কাছে। আজ তার মন ভীষণ ম্লান হয়ে গেল। ক্ষুব্ধতা নয়, বিষণ্নতা। বিষণ্নতায় ম্লান হয়ে সে খাবার টেবিলে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তখন রোকসানা তার পাশে এসে দাঁড়াল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল খানিক। বলল, ঘুম পাচ্ছে ?

এক মুহূর্তে তার বিষণ্নতার মেঘ কেটে গেল। হঠাৎ একটা খুশির ঝাপটায় মন হয়ে উঠল রেশমি। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জরিনা বলল, না।

না! এত রাত অবধি জেগে থাকো নাকি তুমি ? ছিঃ। আজ থেকে ঠিক দশটার সময় ঘুমুতে যাবে, কেমন ?

তারপর বড়ো খাটে রোকসানা আর জরিনা গিয়ে শুলো। রোকসানা কত কী বলল, শুধোল— জরিনা যতক্ষণ পারলো উত্তর দিল তার। এই নতুন মানুষটার গাত্রবাস কেমন ছড়ানো ছড়ানো, আবছা। কোনদিন যাকে জানতো না, আজ সে ঠিক তার পাশাপাশি। জরিনা আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল কখন। ঘুমুতে ঘুমুতে মনে পড়লো, হাসপাতালে শেষ দিন যখন সে গিয়েছিল তখন মা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আচমকা ডান হাত মার পেটের ওপর পড়ে গিয়েছিল— কেমন উঁচু আর শক্ত, তাল তাল। লজ্জায় সরিয়ে

আনতে পারেনি। কাঁধ গলা আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল তার। আর সেই অবস্থায় মার কাঁধের ওপর মুখ রেখে ভারী মিষ্টি একটা ঘ্রাণ, মনে করতে পারছে না এমনি কী একটা হারিয়ে ফেলা সুগন্ধ পেয়েছিল জরিনা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে জরিনা প্রথমটা মনে করবার চেষ্টা করে কোথায় আছে সে ? তার নতুন শোবার ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে একটু একটু করে। তারপর ডানে বামে হাত বুলিয়ে দেখে— ফাঁকা। একা সে শুয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্যে ভয় করে তার। কিন্তু তা এক মুহূর্তের জন্যই। জানালা দিয়ে আবছা আলো এসে পড়েছে ঘরে। আর তার ভয় করে না। ভয়ের বদলে আক্রোশ জন্ম নেয়। আস্তে আস্তে উঠে চুপ করে বসে থাকে জরিনা।

তারপর বিছানা থেকে নেবে এসে দরোজার ফাঁক দিয়ে ও-ঘরে উঁকি দেয়। কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল এখানে ওখানে কুয়াশার মতো আলোর পোঁচ। দরোজা একটু ঠেলতেই শব্দ করে ওঠে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জরিনা। বুকের ভেতর ঢিব ঢিব করতে থাকে। আবার উঁকি দেয়। একটু পরে আঁধার সয়ে এলে তার চোখে পড়ে সাদেক আর রোকসানা পাশাপাশি শুয়ে আছে। অনেকটা মিউজিয়মে দেখা মমির মতো। রোকসানার একটা হাত সাদেকের বুকের ওপর বিছিয়ে আছে, এলানো চুলের গভীরে তার মুখ ডুবে আছে। আর সাদেক আধো পাশ ফিরে শুয়ে আছেন রোকসানার দিকে মুখ করে।

মুখ ফিরিয়ে নিল জরিনা। সারা গা শিরশির করে উঠলো জ্বরে পাওয়ার মতো। কুটি কুটি করে ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো রোকসানার পরনে খয়েরি শাড়িটা। ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় তাকে। কী দরকার ছিল রাতের বেলায় তাকে অত আদর করবার ? কেন তাকে সে ঠকালো ? দরোজা থেকে ফিরে এসে ঘরের মাঝখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো জরিনা। রোকসানাকে নিজের চেয়ে অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী, অনেক দূরের মনে হলো তার। বাষ্পের মত ফুঁপিয়ে ওঠা করুণায় কান্নায়, আজ রাতেই মরে যাওয়ার ইচ্ছায় সে বালিশে মাথা রাখলো।

পরদিন ভোরবেলায় নাশতার টেবিলে দু'জনের কারো দিকে তাকাল না জরিনা। কোনো কথা বলল না। কেবল চায়ের পেয়ালটা নিজের দিকে টেনে নিল। আলীজাহ্ বসেছিল তার পাশে। সে বলল, ও-কী! বিস্কুট ডিম এগুলো খাবে কে ?

সাদেক রোকসানাকে বললেন, দাও, ওকে এগিয়ে দাও।

রোকসানা দু'টো প্লেট এগিয়ে দিল। সবাই ব্যস্ত হলো নাস্তায়।

হঠাৎ রোকসানা চোখ তুলে দেখে জরিনা বিস্কুট ছোঁয়নি। চায়ের পেয়ালা দু'হাতে ধরে আছে। শুধালো, খাচ্ছো না যে!

খাবো না।

জরিনা চায়ের দিকে তাকিয়ে উত্তর করে। আরো জোরে চেপে ধরে পেয়ালাটা। গরম লাগে হাতে। তবু কিছুই মনে হয় না। ইচ্ছে হয়, চিৎকার করে বলে ওঠে, খাবো না, না, না। কিন্তু চিৎকার করতেও প্রবৃত্তি হয় না তার। সে বুঝতে দেবে না কী তার হয়েছে, বুঝতে দিয়ে দাম বাড়িয়ে দেবে না রোকসানার।

হাতের তালু অবশ হয়ে আসে।

সাদেক বলেন, আলীজাহ্‌র দিকে তাকিয়ে, অসুখ করেনি তো ?

আলীজাহ, জরিনার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, না—না। আমি বুঝেছি। সেই রবিনসন ক্রুসোর ছবিওয়ালা বাক্সের বিস্কুট চাই জরিনার। তাই না ? দুপুরে এনে দেব।

সাদেক উঠে যেতে যেতে বলেন, উহুঁ, মনে হচ্ছে অসুখ-বিসুখ। তুমি বেরুবার সময় ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেও, আলী।

সেদিন ও স্কুলেও যায়নি। বিকেলে নামলো বৃষ্টি। তখন উঠে এলো ছাদে। বড় বড় গাছ দোলানো, আকাশ নেভানো বৃষ্টি। কেবল দিগন্তের কাছে বলয়ের মতো এক ফালি উজ্জ্বলতা। আর বাতাস। নিম গাছের বড় ডালটায় দু'টো কাক ভিজে ভিজে সারা হচ্ছে। আর চারদিক থেকে কী একটা আয়োজন যেন ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। জরিনাব মনে হলো, এই তার আপন পৃথিবী। কতকাল ধরে সে অপেক্ষা করছে এমনি একটি বৃষ্টির-- যে বৃষ্টি তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে ছাদে, যে বৃষ্টিতে ভেজা যায়, যে বৃষ্টির আড়ালে সাদেক, রোকসানা, আলীজাহ্‌ সবাই দূরে সরে যায়।

চিলেকোঠার দরোজায় দাঁড়িয়ে তখন মনে পড়লো সেই চড়ুই দেখা, বাবার জানুতে মাথা এলানো সন্ধ্যাটার কথা। মনে হলো আজকের জরিনা থেকে অবিকল একটা শরীর, একটা নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, আলাদা হয়ে গেছে এক সময়ে। তাকে সে চিরদিনের মতো রেখে এসেছে সেদিনের সেই সন্ধ্যায়।

জরিনা চিলেকোঠার বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়াল বর্শার মতো তীক্ষ্ণ আর ঠাণ্ডা বৃষ্টিতে। সারা শরীর কন্টকিত হয়ে উঠলো ঠাণ্ডায়। চামড়ার কোমলতা ফেটে ফেটে পড়তে চাইলো বৃষ্টির আঘাতে। প্রথমে তীব্র ব্যথা, তারপর সেই ব্যথা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বার পর আর কোনো বোধ তার রইলো না। একরোখা সে দাঁড়িয়ে রইলো বৃষ্টির আঘাতের ভেতরে। একটা হিংস্র শক্তি যেন আজ তার ভেতরে জন্ম নিয়েছে। আর কোনো কিছু তাকে এখন ফেরাতে পারবে না। সে এখানেই থাকবে।

সেদিন রাতে খাওয়া শেষ হলে পর জরিনা সোজা তার নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। একটু পরেই রোকসানার পায়ের শব্দ কানে আসতেই জোর করে চোখ বুঁজে নিঃসাড় হয়ে থাকলো। শব্দ শুনে বুঝতে পারলো রোকসানা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার লোভ হলো চোখ মেলে তাকে দ্যাখে। কিন্তু না, চোখ সে খুলবে না।

চোখ মেলে দ্যাখে রোকসানা বাতি নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে। জরিনা নিঃশ্বাস ফেলল।

পরদিন রাতেও ঠিক তেমনি। রোকসানা এসে ফিরে গেল তবু চোখ খুলল না জরিনা। ঘুমের ভান করে বালিশে মাথা ডুবিয়ে পড়ে রইলো।

কিন্তু কালকের মতো আজ ঘুম এলো না সহজে। শুয়ে শুয়ে সে শুনতে পেল সাদেক ও ঘরে এসে হাই তুললেন, কথা বললেন রোকসানার সঙ্গে। একবার জরিনার কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন বুক শুকিয়ে গেলো জরিনার। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে এতক্ষণ সরু একফালি আলো এসে পড়ছিল, টুক করে তা অন্ধকার হয়ে গেল।

আলীজাহ্‌ বার থেকে ফিরলো বেশ খানিকটা রাতে। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল, খুট করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো জরিনা।

আলীচাচা।

স্--স্--স। বাবা ঘুমিয়েছে ?

জরিনা ফিসফিস করে বলে ঘাড় কাত করে, হুঁ। সবাই।

যা ঘুমোগে— জেগে থাকে না। বলতে বলতে আলীজাহ্ নিজের কামরায় চলে যায়। তার কালো ট্রাউজার অন্ধকারে একটু পরেই যায় মিলিয়ে, কিন্তু শাদা শার্ট বারান্দার শেষ মোড় অবধি দেখা যায়। জরিনা ঘরে ফিরে যায় না। পা টিপে টিপে এগোয়।

আলীজাহ্ মুখ ফেরাতেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শব্দ করে হেসে ওঠে জরিনা।

উহু— কী দুষ্টুমি হচ্ছে রাত দুপুরে।

না, ঘুম পাচ্ছে না।

বোস তাহলে।

আলীজাহ্ খুব করে জরিনার মাথার চুলগুলো নেড়ে দেয়। তারপর শার্ট খুলে আলনায় ছুঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে বলে, অ্যাকটিং দেখবি ?

অ্যাকটিং করে এলে, না আলীচাচা ?

রিহার্সেল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখব। উহুঁ অত কাছে এসো না, আমার ভয় করে।

আলীজাহ্ একবার তার সমুখে এসে তারপর দু'হাত পেছনে বেঁধে পিছিয়ে যায় কয়েক পা। জরিনা অবাক হয়ে বড় বড় চোখ মেলে অপেক্ষা করে। দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হয়ে থাকে আলীজাহ্র দীর্ঘ দেহের ওপর। আরো দীর্ঘ, আরো দূর মনে মনে হয় হঠাৎ তাকে। হাতের পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে, চ্যাপটা হয়ে প্রায় সেঁটে যায় দু'পাঁজরায়। তীক্ষ্ণ নাসারেখার দু'পাশে হাড় ফুটে উঠতে চায় নিঃশ্বাসরোধের আবেগে। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে ঘুরে আলীজাহ্ হেসে বলে, সম্রাট শাহজাহান। সিংহাসনের লোভে ছেলেরা তাকে বন্দি করে রেখেছে আগ্রা ফোর্টে। বুড়ো হয়ে গেছেন, প্যারালিসিসে একদিক অবশ, সেই তখন—

সঙ্গে সঙ্গে আলীজাহ্র শরীরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দেয়। কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে আসে শরীর, ডান হাত আর ডান পা সেই শরীর থেকে ঝুলতে থাকে অর্কিড লতার মতো। আর ছুরির মতো জ্বলতে থাকে দু'চোখ। কাঁপতে থাকে চোয়াল। আলীজাহ্ দারুণ আক্রোশে সারা মেঝেয় তার দেহ টেনে টেনে চলতে থাকে। সংলাপ বলে। তার কিছুই কানে যায় না জরিনার। সে শুধু আলীজাহ্কে দেখে। আলীজাহ্ তার কাছে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। তখন অস্পষ্ট হয়ে আসে যেন তার মুখ। জরিনার মনে হয় সম্রাট শাহজাহান— দি এমপেরর হু বিলট্ তাজমহল— তার সমুখে অতীত থেকে এসে দাঁড়িয়েছেন। সম্রাট তাকে অবলোকন করছেন ক্লান্ত দু'চোখের পাতা তুলে। হয়ত চিনতে পারলেন না। কিংবা এতই তিনি আত্মমগ্ন যে তার উপস্থিতি তিনি অনুভব করতেও পারলেন না। জরিনা কাঠ হয়ে বসে রইলো। সম্রাট তখন পঙ্গু শরীরটাকে টেনে টেনে দূরে সরে গেলেন।

আলীজাহ্ স্প্রিংয়ের মতো শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে ডান হাত দু'বার ঝেড়ে সমুখে এলো হাসি মুখে। তখন জরিনার শাদা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যেন এতক্ষণ তার হৃদস্পন্দন, তার রক্ত

চলাচল বন্ধ হয়ে ছিল। বলল, ইস,— এত সুন্দর তুমি করতে পারো।

তাই নাকি ?

সত্যি।

হয়েছে হয়েছে। খেয়েছিস ?

নিচে খাবার টেবিলে আলীজাহ্‌র উল্টোদিকে বসে টেবিলে থুতনি লাগিয়ে বসে থাকে জরিনা। আলীজাহ্‌ খেতে খেতে বলে, শাহজাহান কিন্তু ভাত খেত না। পোলাও— দু'বেলা পোলাও, রোস্ট, এইসব। বাদশাহ ছিল কিনা। আসল বাদশাহ্‌, থিয়েটারের না।

জরিনা খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে চায়।

আহ, পানির গ্লাসটা ফেলে দিবি যে।

জরিনা তখন থামে। পানির কথা ওঠায় গ্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপর নিজেই ঢকঢক করে খানিকটা পানি খেয়ে নেয়। একটু হাসে। সারাটা বাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনোখানে কোনো শব্দ নেই। শুধু রাত। জরিনার মনে হচ্ছে যেন আজ হঠাৎ একটা ভারী খুশির খবর মিলেছে তার। আজ যা খুশি সে তাই করতে পারে।

শোবার ঘরে ঘড়িতে একটা বাজার ঘণ্টা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মিলিয়ে গেল।

আলীজাহ্‌ হাত ধুয়ে বলে, একটা বাজলো না দেড়টা ? —মেলা রাত হয়েছে তো। চল চল। চোখ তো টেনে আসছে, তবু বসে আছিস!

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে দু'জন। এতক্ষণে ঘুম পাচ্ছে জরিনার। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠবার সময় কেবলি পিছিয়ে পড়ছে সে। আলীজাহ্‌ তাকে কোলে তুলে নেয়। জরিনা তার গলা জড়িয়ে ধরে থাকে। তখন জরিনার আর কোন অনুভব থাকে না এই অতিবাহনের। মনে হয় এমনি করে দোতলা ছাড়িয়ে, সব দালান ছাড়িয়ে, ক্রমাগত সে কোমল একটা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। আলীজাহ্‌র গলা আরো ভাল করে জড়িয়ে ধরে সে।

এরপর থেকে এমন হলো, রোজ রাতে জেগে থাকতো জরিনা যতক্ষণ না আলীজাহ্‌ ফিরে আসে। তারপর দু'জনে মিলে খাবার টেবিলে গল্প। জরিনার সমস্ত দিনের হাজার কথা আর কাজ, ভাবনা সব বলা চাই আলীজাহ্‌কে। যে কথা সে বলতে পারে না সারাটা দিন আর যে কথা বলা যায় না— তা নির্ভয়ে বলা যায় একমাত্র আলীজাহ্‌কে। দিনের বেলায় যা চাপা থাকে, বিরূপ পৃথিবী থেকে যা সযত্নে লুকিয়ে রাখে জরিনা, রাতের এই মুহূর্তগুলোয় তা বেরিয়ে আসে আকাশের এই অত নক্ষত্রের মতো একে একে, ছোট ছোট, জ্বলন্ত। জরিনা অনুভব করতে পারে একটা নিবিড় যোগসূত্র। আলীজাহ্‌ তার কাছে একান্ত হয়ে ওঠে। কাউকে জানায় না সে রাতের এই মুহূর্তগুলোর কথা। সাদেক, রোকসানা কাউকে না। এ তার একান্ত, নিজস্ব।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন দু'জনে খাবার টেবিলে, মুখোমুখি। মাথার ওপর জ্বলছে বাল্‌ব। আলীজাহ্‌ যখন মুখ নিচু করে খেতে থাকে তার ছায়া এগিয়ে এসে পড়ে টেবিলের মাঝামাঝি। জরিনা একেকদিন, তখন সমুখে ঝুঁকে পড়ে নিজের ছায়া দিয়ে স্পর্শ করতে চায় ঐ ছায়াটাকে— আর কথা বলে। যেন রাত্রির নিবিড় থেকে উঠে এসে তারা দু'জন

একটা গোপন ষড়যন্ত্রে মিলিত হয়েছে। জরিনার তখন মনে হয়, এই টেবিলে এসে মুখোমুখি বসার মুহূর্তে, এখন থেকে যতক্ষণ তারা এখানে বসে থাকবে— এই বসে থাকা, এই ছোট ছোট হাসি, এই কথা, এই উষ্ণতা এটাই বাস্তব, আর সারাটা দিন, দিনের চলাচলে সমস্ত কিছুই স্বপ্ন— মরে থাকা।

আলীজাহ্ সেদিন রাতে ফিরে এসেই বলে, কাল এক জায়গায় যাবি ?

কোথায় আলীচাচা ?

গেলেই দেখতে পাবি।

বলো না।

বলছি, বলছি। পাখাটা ছেড়ে দিই আগে, যা গরম পড়ছে— আমার এক বান্ধবীর জন্মদিন কাল। পার্টি হবে। তোকে নিয়ে যাবো। যাবি ?

হ্যাঁ। ঘাড় কাত করে জরিনা সম্মতি জানায়। পাখার বাতাসে মাথার চুল ফিনফিন করে উড়তে থাকে। মনটাও তার অমনি দ্রুত সচল হয়ে ওঠে। ছাদের ওপর একেকদিন দমকা বাতাসের মুখে জামা-কাপড় পেছনে পত পত করে উড়িয়ে ঠেলে ফেলে দিতে চায়, তেমনি অস্থির এখন তার কল্পনা। দু'চোখে সে স্পষ্ট দেখতে পায় এক অজানা বিরাট বাড়ির সমুখে— বাড়ির রঙ নিশ্চয়ই শাদা— সবুজ ঘাস চুলের মতো করে ছাঁটা লনে পার্টি হচ্ছে। বাবার সঙ্গে সে কয়েকবার কয়েকটা পার্টিতে গেছে। কিন্তু সে সব পার্টি ছিল অন্য রকম। সব ব্যস্তসমস্ত মানুষ শেরোয়ানি পরে, স্যুট পরে ভিড় জমাতো। অদ্ভুত ব্যস্ততা, যেন তাড়া খেয়ে ফিরছে সবাই। আর শক্ত শক্ত কথার ছড়াছড়ি, মুখ কঠিন করে, কপালে ভাঁজ তুলে গম্ভীর সব আলোচনা। একটুও ভালো লাগত না জরিনার।

জরিনা যেন জানে, যদিও সে কোনদিন কোন জন্মদিনের পার্টিতে যায়নি— এখানে থাকবে না ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। থাকবে আলো, রঙিন বাতি আর সুখী, সুগন্ধ ছড়ানো মানুষ— যেমন সে ছবিতে দেখেছে। এমন কি খুব ধূসর করে মনে পড়ল সেই কয়েকটা মহিলার মুখ যারা নূরু আপার বিয়েতে এসেছিল এপাড়া, ওপাড়া থেকে— যাদের কয়েকজনকে কী ভালো লেগেছিল জরিনার। তার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো তাদের কথা মনে করে। সে ভাবলো কাল পার্টিতে তারাও হয়ত আসবে। আবার সে দেখতে পাবে ওদের।

একটু পরে হঠাৎ দপ্ করে সব নিভে গেল। খাবার টেবিলে ম্লান মুখে সে বসে রইল খানিক। তারপর চিবুক তুলে আলীজাহ্‌র দিকে তাকালো। আলীজাহ্ কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে শংকার ছায়া মেশানো কণ্ঠে শুধালো, কী হয়েছে ?

মাঝে মাঝে এমনি নিভে যেতে সে দেখেছে জরিনাকে। জরিনা মাথা নাড়ে। মুখে বলে, কাল কখন যাবে ?

বিকেলে। বিকেল ঠিক সাড়ে পাঁচটায়।

আলীজাহ্ হাল্‌কা গলায় উত্তর করে, এবং চোখে প্রশ্ন নিয়ে তবু তাকিয়ে থাকে জরিনার দিকে।

একটু পরে জরিনাই প্রশ্ন করে, আচ্ছা আলীচাচা, জন্মদিন কেন ?

প্রশ্নটা চট্ করে আলীজাহ্ বুঝতে পারে না। পরে বলে, বয়স একটা বছর বাড়লো সেই কথাটা মনে রাখবার জন্যে। যেমন তুই দিনে দিনে বড় হচ্ছিস, একদিন আর ছোট থাকবি না, তেমনি।

তাহলে সবাই কেন যাবে ?

এ প্রশ্নটাও আলীজাহ্ বুঝতে পারে না। জরিনার দিকে গভীর চোখে খানিক তাকিয়ে থাকে। খুব আস্তে একটু পরে উত্তর করে, তুই আমি সবাই যাবো, সারাটা জীবন যেন তার সুন্দর করে কাটে, এই ইচ্ছে নিয়ে।

তবু তার মনে হলো যেন যথেষ্ট বলা হলো না। তাই সে আবার গোড়া থেকে শুরু করলো, যে মাসের যে তারিখে জন্ম, সেই মাস সেই তারিখ প্রত্যেক বছরে ফিরে আসে। তার মানে আমরা এক বছর বড় হই, একটা বছর পেরিয়ে আসি। এমনি করে সারা জীবন।

আলীজাহ্‌র নিজের কাছেই কথাগুলোর অর্থ খুব স্পষ্ট হয় না। সে ভাবতে থাকে আর কী বলা যেতে পারে। জরিনা অন্যমনস্ক হয়ে শুধোয়, তারপর একদিন মরে যাবে, না ? জন্মদিনে কেউ মরে যায় না আলীচাচা ?

আলীজাহ্ চকিতে চোখ তুলে তাকে দেখে নেয়, পরে দ্রুত সারামুখে হাসি ছড়িয়ে বলে, ও, এইকথা। এইসব ভাবছিলি এতক্ষণ ? মানুষ তো মরে যায়ই, জন্মদিনেও মরে যায়। জন্মদিনে যারা মরে তারা ভাগ্যবান।

কেন ?

হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়ে। তাইতো ? কেন ? বলে, মানে, তাদের আর ভাঙ্গতি হিসেব করতে হয় না। শুধু বছরের হিসেব, তাই। চট্ করে বলে দেয়া যায় এত বছর বয়সে উনি মারা গেলেন। আর অন্যদের কত অসুবিধে। বলতে হবে, কত বছর, কত মাস, ক'দিন। তাই না ?

তুমি কাউকে মরে যেতে দেখেছ, আলীচাচা ?

দেখেছি।

কাকে ?

আলীজাহ্‌র মনে পড়ে জরিনার মার কথা। বলে, তুমি চিনবে না। কেন ?

জরিনা আবার থুতনি টেবিলে নামিয়ে আনতে আনতে বলে, এমনি। মা যখন মরে গেল আমি ইস্কুলে। আমি দেখিও নি। আবছা আবছা জরিনার মনে পড়ে শাদা চার দেয়াল হাসপাতালের কামরা আর মার শরীরে টেনে দেয়া ভারী চাদরটার কথা।

কেমন করে মরে যায় আলীচাচা ?

অসুখে।

তারপর ?

তারপর— মরে যায়। আত্মা আকাশে চলে যায়।

জরিনা একটু ওপরে তাকায়। পরে চোখ নামিয়ে এনে শুধোয়, কেমন করে ? তুমি তো দেখেছ বলো না।

সব কিছু হারিয়ে যেতে থাকে তখন— এই আলো, গাছ, মানুষ— সব কিছু। সবচেয়ে বড়ো

যে হারিয়ে ফেলা, সেটাই জীবন। যখন সময় হয়, তখন মানুষের মন খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সব কিছু দেখতে চায়, ধরতে চায়, ধরে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। আস্তে আস্তে আকাশের আলো সন্ধ্যের মতো হয়ে আসে। বৃষ্টি হলে যেমন দূরের সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়, তেমনি সব ঝাপসা হয়ে মিশে যায়। কাউকে দেখতে পায় না। বুকের ভেতরে নিঃশ্বাস কাঁপতে থাকে। আঙুলের ডগা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তখন খুব ক্লান্ত লাগে। তখন আর কিছু মনে থাকে না। তখন মানুষ মরে যায়।

জরিনা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, মানুষ মরে না গিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না? একটা চারদিক বন্ধ বড় কাচের বেলুন যদি সে পেত, তাহলে তার ভেতরে গিয়ে বসে থাকত, উঠে যেত আকাশের অনেক ওপরে। তাহলে হয়ত সে কোনদিন মরে যেত না। বহুদিন অনেকদিন সে বেঁচে থাকতে পারতো।

আলীজাহ্ উঠে দাঁড়িয়ে রোজকার মতো তার চুলে আঙুল দিয়ে ব্রাশ করে, নাড়া দিয়ে বলে, চল, আমার ঘরে যাবি। আজ ঘুমুলে চলবে না। নতুন রেকর্ড এনেছি, শুনবি চল।

আলীজাহ ওর মনের মেঘ দূর করতে চায়। সিঁড়ির নিচে এসে বলে, দুটো করে সিঁড়ি একবারে। পারবি?

খু-ব।

দেখি তাহলে। কুইক্। হ্যাঁ, ওয়ান— টু থ্রি।

ওপরে উঠে জরিনা হাঁপাতে থাকে। হাতের পিঠ দিয়ে নাক ঘষে দম নিয়ে হেসে ফেলে। নিচে আলীজাহ্‌র দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত নেড়ে বলে, তুমি কিন্তু তিনটে করে আসবে। এসো।

আলীজাহ্ উঠতে থাকে। ভান করে, যেন তার খুব কষ্ট হচ্ছে। জরিনা আবার হেসে ওঠে।

বাড়িটা ঠিক যেমন ভেবেছিল তেমনি শাদা। সমুখে লন। আর মানুষ। আর বাতি খুব কম, এখানে ওখানে। তবু মনে হয়, কোথাও আলোর অভাব নেই এতটুকু।

জরিনা আর আলীজাহ্ যখন গাড়ি থেকে নামলো তখন প্রায় সবাই এসে গেছে। জরিনার পরনে শাদা সাটিনের কামিজ। ক'দিন আগে চুল ট্রিম করা হয়েছে কাঁধ অবধি; মাথার ওপরে একটা লাল টেপ বো করে বাঁধা। বেরুবার আগে আলীজাহ্ চেয়ারে বসে তাকে দু'হাটুর মধ্যে এনে কপালের ওপরে ছোট ছোট চুলগুলো টেনে দিয়েছে, ঝালরের মত এখন তারা চুমু খেয়ে আছে তার চওড়া কপাল। জরিনার চোখ আবেগে উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, আলীজাহ্‌র নিবিড় প্রীতিতে মন নির্ভয়।

লনের মাঝামাঝি চেরা-সিঁথি পথ গেছে বারান্দার দিকে। গাড়ি থেকে নেমে আলীজাহ্ জরিনাকে হাত ধরে নামালো। তারপর কাঁধে তার বিশাল করতল রেখে বলল, স্মিত মুখে, নিচু গলায়, এখানে।

জরিনা আলীজাহ্‌র দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল সমুখে। সমুখে এক দম্পতি— তারাও যাচ্ছিল বারান্দার দিকে, পরস্পর নিবিড় হয়ে। লোকটার বাঁ হাতে মহিলাটির মুঠো। আর তার খোঁপার বন্ধনমূলে চাঁদের মতো আধখানা বেরিয়ে আছে শাদা ফুলের মালা।

জরিনার ভালো লাগল তার চলার ছন্দ। সে একবার চোর-চোখে তাকাল আলীজাহ্‌র দিকে। আস্তে আস্তে কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল আলীজাহ্‌র করতল। তারপর মুঠো করে ধরলো আলীজাহ্‌র তর্জনী আর মধ্যমা।

বারান্দার সিঁড়ির ওপরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল— জরিনা তাকে দূরে থেকেই দেখেছিল— দীর্ঘ, ফর্সা, লাল উজ্জ্বল পাড়হীন শাড়ি পড়া, সে আলীজাহ্‌কে দেখে সুন্দর একটা ভঙ্গিতে এক ধাপ নেমে এসে কলকণ্ঠে বলে উঠল, আসুন, ইস্, এত দেরি। তারপর জরিনাকে দেখে, জরিনার চিবুক স্পর্শ করে বলল, ঝুঁকে পড়ে, কী নাম ?

জরিনা আবছা গলায় উত্তর করল তার।

মেয়েটি মুখ সরিয়ে নিতেই জরিনার এক মুহূর্তের মেঘ কেটে গেল অন্ধকার ঘরে বিজলি বাতি জ্বলে ওঠার মত। যে লাল শাড়ির ঔজ্জ্বল্য খুব কাছাকাছি এসে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল তা অপসারিত হলো। সে তখন সম্পূর্ণ করে তাকে দেখল, মুগ্ধ হলো।

আলীজাহ্ বললা, এরই জন্মদিন। বুঝলি ?

জানি।

আলীজাহ্ তাকে নিয়ে এগিয়ে গেল আরো ভিড়ের ভেতর। আলীজাহ্‌র উপস্থিতিতে হঠাৎ যেন মৌমাছি হয়ে উঠল সবাই। জরিনা তাকিয়ে দেখে। তার গর্ব হয়। তার আলীচাচা, এ যেন তারই অহংকার। আলীজাহ্‌র আঙুল ধরে নিবিড় হয়ে সে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এত সুন্দর মানুষের ভিড়। কাপড়ের, ফুলের, শাড়ির গন্ধ। আর মানুষের গাত্রসৌরভ। আর কণ্ঠস্বর। আর আলো। তার আশ্চর্য লাগে। স্বপ্ন থেকে উঠে আসা কোনো মুহূর্তের মতো মনে হয়।

জরিনাকে গিয়ে আলীজাহ্ নিয়ে বসল একটা সোফায়। আলীচাচাকেও আজ তার কী দীর্ঘ মনে হচ্ছে। চারদিকের এত কোলাহল, গতি, কথা, কিছুই তার চোখে পড়ছে না। কিছুই সে শুনছে না, নিতে পারছে না আলাদা করে কোনো কিছুই। সব কিছু এক হয়ে তার মনের ভেতরে এঁকে যাচ্ছে একটি মাত্র ছবি।

পাশ থেকে নরোম একটা হাতের স্পর্শে জরিনা তাকিয়ে দেখল যার জন্মদিন সেই লাল শাড়ি পরা মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ সে বারান্দা আর ড্রইং রুমের একোণ থেকে ওকোণ অবধি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখন এসে দাঁড়াল তার পেছনে ? মেয়েটি গ্রীবা বাঁকিয়ে সুরেলা গলায় শুধালো, কেমন ?

জরিনা কী করবে ভেবে উঠতে পারল না। ও তাকে এতখানি মুগ্ধ করেছে যে ওর সমুখে কেমন ভেতর থেকে সব কিছু সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

আলীজাহ্ তার কনুইয়ে ঠেলা দিয়ে বলল, যা না।

বাবা, আপনি যা কথক মানুষ আর তার ভাইঝি এমন ?

তাহলে তুমি ওকে চিনতেই পারো নি। আলীজাহ্ বলল জরিনার দিকে মুখ আধো নামিয়ে, আমার সঙ্গে যা গল্প করে তুমি যদি শুনতে।

হবে না। আপনারই ভাইঝি তো।

বাহ্, আগেও দোষ পরেও দোষ। বেশ তো।

মেয়েটি কাচভাঙ্গার অনুকরণে হেসে উঠলো কথা শুনে।

ঠিক তখন কারা দু'জন এদিকে আসছিল আলীজাহ্‌কে দেখে, আলীজাহ্ উঠে দাঁড়াল। কথা বলতে লাগল। নাটকের কথা, ফিল্মের কথা, অনেকের কথা, যাদের জরিনা চেনে না।

জন্মদিন-মেয়েটি তখন তার পাশে এসে বসলো। জরিনাকে কাছে টেনে নিয়ে, এত ভাল লাগল তার তখন, সে বললো, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, কী পড় বললে না ? কোন স্কুলে ?

স্কুলের নাম বলল জরিনা। হঠাৎ হালকা হয়ে গেল তার বুকের ভয়টুকু। সে কথা বলতে লাগল— অনর্গল, দ্রুত, চোখ হাত নেড়ে, নাচিয়ে।

বাহ, চাচার কাছে থেকে তুমিও বেশ কথা বলতে শিখেছ। চাচা তোমাকে অ্যাকটিং শেখাবে না ?

আমি শিখব না। ভালো লাগে না।

তাহলে কী শিখবে ? হোয়াট ইউ'ল বি ?

আলীজাহ্ কথা বলতে বলতে দূরে সরে যাচ্ছে। জরিনা সেদিকে এক পলক তাকিয়ে দেখে উত্তর করল, আপনি পারেন ?

কী ?

অ্যাকটিং।

একটুকুও না।

আলীচাচা এত সুন্দর করতে পারে।

তুমি দেখেছ ?

ক-ত।

আলীজাহ্ আরো দূরে সরে গেছে। হঠাৎ জরিনা প্রশ্ন করে, আপনার জন্মদিন আবার কবে হবে ?

ওমা কেন ?

মেয়েটি বিস্ময়ে ঠোঁট গোল করে আনে। চোখের মণি একটা সুন্দর ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকে।

আমি আসবো।

তুমি এমনি আসবে। রোজ আসবে, কেমন ?

জরিনার লজ্জা করে। ঘাড় কাৎ করে উত্তর দেয়। একটু পরে মেয়েটি বলে, তুমি বসো, আমি এই আসছি।

কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে যায় আর আসে না। মনটা প্রথমে উদগ্রীব হয়ে থাকে, পরে আস্তে আস্তে আস্তে নিভে যায়। তখন ম্লান চোখে দৃষ্টি করে ইতস্তত।

আলীজাহ্‌ও নেই।

একটু পরে জরিনা উঠে দাঁড়ায়। এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে। একটা ছোট্ট দলের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। কারো চোখে পড়ে না। জরিনা এগোয়, এতক্ষণে আলীজাহ্‌কে সে দেখতে পেয়েছে।

দূরে, বারান্দার একেবারে শেষ মাথায়, কয়েকটা সবুজ পাতা গাছের সঙ্গে পিঠ ছুঁইয়ে

আলীজাহ্ দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সমুখে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তিনজন মহিলা। কী কথা বলছে কে জানে। এতদূরে থেকে ওদের হাসি ছড়ানো মুখ শুধু চোখে পড়ে। আলীজাহ্ ঝুঁকে পড়ে ডান হাতের তর্জনী দুলিয়ে একজনকে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলছে। বলা শেষ হলো। হেসে উঠল সবাই।

জরিনা আরো একটু কাছে এসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব। হঠাৎ নিজেকে খুব ছোট মনে হলো তার। আলীজাহ্‌র ওপর রাগ হলো। রাগ হলো ওই তিনটে মহিলার ওপর। মনে হলো, এক্ষুণি সে যদি চিৎকার করে উঠতে পারত— না, চিৎকার নয়— এখন যদি ফিট হয়ে যেতে পারত, তাহলে খুব শাস্তি হতো ওদের। কিন্তু বহুবার জরিনা দেখেছে, যা চাওয়া যায় তা হয় না।

তাই কিছু বলবে না সে ওদের। সরে এসে এদিকের একটা থামের আড়ালে নিজেকে ঢেকে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল জরিনা। দাঁড়িয়ে পা সমুখে টেনে কোমর থেকে গোড়ালি অবধি একটা টান টান আবছা ধনুক সৃষ্টি করে রইলো।

যুদ্ধের দ্রুত কলকাতা।

বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসে জরিনা বলেছিল, এখুনি সে বাসায় ফিরবে না। ঘুরে বেড়াবে। এসপ্ল্যানেড দিয়ে গাড়ি ছুটছে। ড্রাইভ করছে আলীজাহ্ আর জরিনা পাশে বসে।

অন্ধকার আকাশের নিচে কলকাতায় যেন অসংখ্য আলোর নৃত্য চলেছে। চকোলেট, র‍্যাপার, চুয়িংগাম আর ইউনিফর্মড় হোয়াইটস। এত রাতে শহরে সে আর কোনদিন এমনি লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ায়নি। আলীজাহ্‌র উদার দু'হাত থেকে সে আজ মূল্যবান উপহার পেয়ে গেছে।

আর সমস্ত কলকাতা যেন শূন্য, বিস্তৃত, বিশাল একটা পটভূমি— যেখানে এতকাল কিছুই হয়নি; আজ সেই পটভূমিতে নানা রঙের আলোর রেখা—দীর্ঘ এবং বিন্দু বিন্দু— আলোর বৃত্ত অবিরাম জ্যামিতির জ্বলন্ত নক্‌সা এঁকে চলেছে। আর তাই দেখতে মানুষ ভিড় করেছে. অস্থির তাড়া খাওয়া মানুষ এখানে ওখানে ময়দানে, চৌরঙ্গিতে। একটা কটু কিন্তু মিঠে মিঠে জন্মান্তরের চেনা জ্বালাকর ঘ্রাণ বাতাসে গাড়ির দু'পাশ দিয়ে হুহু করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

জরিনা নড়েচড়ে বসলো। আলীজাহ্ শুধালো, কিরে আরো বেড়াবি ?

হুঁ।

মোমাছির গুঞ্জনের মতো হেসে উঠলো আলীজাহ্।

তার পায়ের চাপে দ্রুত উদ্দাম হয়ে উঠল গাড়িখানা। সমস্ত অস্তিত্ব থরথর করে কাঁপতে থাকে যেন আবেগে। জরিনার মন আশ্চর্য রকমে হালকা হয়ে যায়। অপূর্ব একটা খুশিতে টলমল করে ওঠে। আলীজাহ্ তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলে, চল্ দমদমের ওদিক ঘুরে আসি।

জরিনার দুই করতল তালি হয়ে উঠতে চায় আনন্দে, গতিতে, মুক্তিতে। সেই পার্টির কথা এখন তার একটুও মনে পড়ছে না। দিগন্তের আড়ালে দ্বীপের মত তলিয়ে গেছে যেন সবকিছু।

বাসায় যখন ফিরে এলো তখন বেশ রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। কেবল আলো জ্বলছে সাদেকের স্টাডিতে। আলীজাহ্ বলল, আব্বা পড়ছেন। ইস্ মেলা দেরি হয়ে গেল. নারে ?

গ্যারেজের তালা খুলে আলীজাহ্ গাড়িটাকে এগিয়ে পেছিয়ে কাটিয়ে ভেতরে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, কেমন লাগল বল এবার।

ভালো।

কী ভালো ?

জরিনা বুঝতে পারল না তার প্রশ্ন। তাকিয়ে রইল।

জন্মদিনের সেই মেয়েটিকে কেমন লাগল তাই জিগ্যেস করছি। খুব সুন্দর করে সাজতে পারে. কথা বলতে পারে, না ?

হ্যাঁ— জানো আলীচাচা, আমাকে রোজ যেতে বলেছে।

কোথায় ?

আলীজাহ বিস্ময়ে মুখটাকে প্রকট করে তোলে।

ওর ওখানে।

যাবি, বেশতো।

তোমার সঙ্গে যাবো। তোমাকে ওরা সবাই চেনে, না আলীচাচা ?

আলীজাহ্ হাসলো অনেকক্ষণ ধরে।

গাড়ি ততক্ষণে গ্যারেজে ঢুকে গেছে। বেরিয়ে এসে আলীজাহ্ দরোজা বন্ধ করতে লাগল। জরিনা তার দু'হাত দিয়ে দরোজার অন্য পাল্লা টেনে এনে ভিড়িয়ে দিল।

বাহ্, খুব কাজের হয়েছিস তো। হাতে ব্যথা পেলি নাকি ?

নাহ।

পরিশ্রমে, প্রশংসায় লাল হয়ে ওঠে জরিনার মুখ

এই— ছি, ছি, সরে দাঁড়া জরিনা।

জরিনা চকিতে নিচে তাকিয়ে দেখে গ্যারেজের সমুখে সরু নালাটায় একটা ইঁদুর মরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে. জরিনা মনে মনে শিউরে ওঠে— এ র‍্যাট. এ ডেড র‍্যাট। আর এ টি— র‍্যাট।

আলীজাহ, জরিনার হাত ধরে বাসার ভেতর যেতে যেতে বলে, ড্রাইভার কদিন হলো যা ফাঁদ পেতে রেখেছে গ্যারেজের চারদিকে। কটা ময়লো কে জানে ?

বড্ড বিশ্রী, আলীচাচা।

সেদিনের মতোই দু'টো করে সিঁড়ি একসাথে ভাঙতে থাকে জরিনা। আলীজাহ্ একটা তালি দিয়ে বলে, আজ তিনটে করে জরিনা। পারলে তোকে— তোকে একটা শাড়ি কিনে দেব। খুব দামি শাড়ি। লাল টুকটুকে, রেশমি।

জরিনার সমুখে ক্রীমরঙ্গা দেয়ালটা যেন হঠাৎ লাল হয়ে জ্বলে ওঠে— সংগীত হয়ে রিমঝিম করতে থাকে।

এর ঠিক পাঁচদিন পরে আলীজাহ্ বম্বে চলে গেল ছবির কাজ পেয়ে। জরিনার তখন কান্না পেল। তিনদিন ধরে খাতার পৃষ্ঠায় বড় বড় করে চিঠি লিখলো বাঁকা হাতের লেখায়।

তারপর কখন যে সেই পৃষ্ঠাগুলো অনাদরে অযত্নে কোথায় পড়ে রইলে তা জরিনা নিজেও জানতে পেল না।

শাহ্ সাদেক আলী জরিনার কামরার কাছে এলেন। এসে দেখলেন দরোজা বন্ধ। ভেতরে রেডিওগ্রামের ভল্যুমটা এত ওপরে ওঠানো যে ডাকলে তার স্বর গিয়ে পৌঁছুবে কী না সন্দেহ।

মেয়েটি তার এমনি, মনে মনে ভাবলেন তিনি, বিব্রত হয়ে, খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে। কিছু বোঝা যাবে না, নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না তবু যেমন বুঝতে পারলেন তিনি, কোথায় কী একটা ধাক্কা লেগেছে আজ জরিনার মনে যেটা ভুলবার জন্য চলেছে এই আয়োজন।

এমন ছোটখাটো ঘটনা বহু দেখেছেন সাদেক আলী। দেখেছেন জরিনাকে কষ্ট পেতে। দরোজায় করাঘাত করলেন তিনি। কিন্তু সে শব্দ নিজের কানেই শোনা গেল না। আবার তিনি হাত তুললেন। এবারে আরো একটু জোরে। তবু শোনা গেল না। হঠাৎ ভীষণ জোরে আঘাত করলেন দরোজায়। শাহ্ সাদেক আলীর গৌর মুঠিতে রক্তিমতা ফুটে উঠলো। ব্যথা করল।

তখন দরোজা খুলে জরিনা দেখল বাবাকে।

কী বাবা?

জরিনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছেই যেন নিজে লজ্জিত হলেন সাদেক। বললেন, তোর কি শরীর খারাপ করেছে?

নাতো।

জরিনা বাঁ-হাতে চুলের প্রান্তভাগ সামলাতে সামলাতে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল তাঁর দিকে। বলল, কিছু বলবে?

রোকসানা ভল্যুম কমাতে বলেছে, কথাটা বলতে সাদেকের কুণ্ঠাবোধ হলো। পরে হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন— কেননা তাঁর মনে পড়ে গেছে, আলী লাহোর থেকে আসছে আজ। তার করেছে।

কখন?

সন্ধ্যের প্লেনে। যাবি এয়ার-পোর্টে?

বলেই সাদেক আর দাঁড়ালেন না, এমনকি একটু আগে যে মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাবেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সেটাও ভুলে গেলেন বলতে।

জরিনা ফিরে এলো ঘরের মাঝখানে। এক মুহূর্ত তার শ্রুতি বধির হয়ে রইলো— কোনো সঙ্গীত সেখানে তুলতে পারল না তরঙ্গ।

আলীচাচা আসছেন।

যেন পৃথিবীর একটা পরম আশ্চর্য সংবাদ শুনেছে সে। ঠিক তার জীবনের এইসব

মুহূর্তগুলোতেই আলীচাচার মুখ কেন এমনি করে ভেসে উঠবে ? আজ সে ভাবছিল কার কথা ? আলী চাচার কথা। আজ তার একটু আগেই না মনে হচ্ছিল তার এই আপনতম লোকটার কথা ? যার সহানুভূতির অমৃত আঁজলা ভরে সে পান করতে পারে।

জীবনের যে সমস্ত দুঃসময়ে তার মনে হয়েছে নিচে মাটি নেই আর সমুখের দিগন্ত গাঢ় অন্ধকার তখন মরে যাবার কথা মনে হয়নি। মনে হয়েছে তার শৈশবের কথা, কৈশোরের কথা, মায়ের চ্যাপ্টা কাঠপুতুলের মুখ আর আলীজাহ্‌র কথা। আলীজাহ্‌ বলেছে, একমাত্র হৃদয়কে যা স্পর্শ করে তাই-ই সত্য। হৃদয়কে তখন স্পর্শ করতো অতীতের মুখগুলো যা সত্য; হৃদয়কে তখন স্পর্শ করতো নিজের মনোবল যা সত্য; হৃদয়কে তখন স্পর্শ করতো পৃথিবীর অফুরন্ত ব্যঙ্গ— যা সত্য, কিন্তু তেতো।

একবার শুধু তার মনে হয়েছিল আলীচাচার কথা মিথ্যে, যেদিন ঐ ঘটনাটা ঘটেছিল।

কলকাতা থেকে ঢাকা আসছিল ওরা তখন। রেলে গিজগিজ ভিড়। আপার ক্লাশ আর লোয়ার ক্লাশে কোনো তফাৎ নেই তখন। টিকিট একটা থাকলেই হলো। তারপর যে কোনো ক্লাশে ওঠা; গাড়ি পাকিস্তানে যাবে।

ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ করে। আলীজাহ্‌ সাদেককে কলকাতা থেকে ভালো জায়গা করে তুলে দিয়েছিলো। বাঙ্ক রিজার্ভ করা ছিল তাঁর জন্য— একটা ব্রাঙ্কে তিনজন যাত্রী, তবু সুবিধে। আর শেষ অবধি হুটোপুটির ভেতরে, বুক কাঁপানো গাড়ির ঘণ্টার শব্দের ভেতরে, টালমাটাল পায়ে অন্ধের মতো নূরুন্নাহার আর জরিনা গিয়ে উঠেছে তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা কামরায়।

কামরার ভেতরটা যেন লালচে আলোয় বিভৎস হয়ে উঠেছে আরো। একে মানুষ, ট্রাঙ্ক, তৈজসপত্র, বাচ্চা-কাচ্চা- তার ওপরে ভ্যাপসা গরম। বাচ্চাদের চিৎকারে থেকে থেকে বুকের ভেতরে ছাঁৎ করে ওঠে, যেন এখনি মরে যাবে কেউ। এরি ভেতরে বিলাপ করছে কেউ, কী জিনিস-পত্র আগলে আছে রক্তচোখে।

বুকের ভেতরে ভয় ভয় করছিল দুবোনের। জরিনার মনে হচ্ছিল যেন সৃষ্টির আদি থেকে সে এখানে গাড়ির ভেতরে জন্ম নিয়ে এতটা বয়স অবধি পার হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল, এই বর্তমানই সত্য, বর্তমানেই সব। আর পেছনে যে অতীত, সমুখে যে ভবিষ্যৎ দুইই কোনদিন ছিল না, থাকবে না।

তাই তীব্র করে সে অনুভব করতে পারছিল বর্তমানের প্রতিটি তরঙ্গ।

নূরুন্নাহার অনেকক্ষণ জেগে থেকে থেকে এককোণে ঢুলতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ঘুম নেই জরিনার চোখে। যেন ঘুম বলে কোনদিন কিছু তার জানা ছিল না।

একটা করে স্টেশন আসে আর মৃদু গুঞ্জন ওঠে ট্রেনে। ওঠে আরো নতুন যাত্রী। জায়গা নেই, তাতে কী!

একটা রাতের মত ট্রেনের কষ্ট সইতে পারেন না আপনারা ?— জানালা দিয়ে গলা ঢুকিয়ে স্বেচ্ছাসেবকরা অনুনয় করে। আপনাদেরই মা বোন যাচ্ছেন, আপনারা একটু কষ্ট করুন, পাকিস্তান আসবার আর বাকি নেই।

আর বাকি নেই ? আর কত দূর ?

আবার ট্রেন চলতে থাকে।

তখন রাত দুপুর। কী একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। কচি একটা বউ উঠলো তাদের কামরায়— ভীত, সন্ত্রস্ত। সঙ্গে তার ততোধিক ভীত, সন্ত্রস্ত স্বামী। আর একজন বুড়ি— মা হবেন হয়তো।

স্বামীটি নেমে গেল। বুড়ি বসে পড়ল মেঝেয়। আর বউটা ডাগর চোখ মেলে ভয়ে ভয়ে তাকালো। তখন জরিনার চোখ পড়ল তার দিকে। কী সুন্দর তার চোখ; মনে হলো জরিনার, অমন একজোড়া চোখ থাকলে কিছু দরকার নেই আর। শুধু চোখ দিয়েই দেয়া যায়, নেয়া যায়, ভরে ওঠা যায়।

নিজের মুখের জন্য আপশোষের অন্ত ছিল না জরিনার। বসে বসে খুঁত বের করা ছিল তার কৈশোরের একটা সময় কাটানোর উপায়। মনে মনে গাল দিত খোদাকে, যিনি তাকে নিখুঁত চেহারা দেন নি, যিনি কপালটাকে অহেতুক চওড়া করে দিয়েছেন, চোখ যথেষ্ট টানা করে দেন নি, আর চিবুকের নিচে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে না দিয়েই শেষ করে দিয়েছেন, তাই সুন্দর মুখ চোখে পড়লে, জরিনা চিরকাল তার জন্য বুকের ভেতরে টান অনুভব করেছে।

জরিনা বউটিকে ডেকে নিল কাছে। বসবার জায়গা নেই। কোলের কাছে বসালো তাকে। নিজের অসুবিধে হলো, কিন্তু ভালো লাগল। শুধালো, পাকিস্তান যাবেন ?

বউটা তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করলো। মুখে কিছু বলল না। তারপর বউটা জানালার ওপর মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। গতি কেবল এসেছে কী আসে নি, প্লাটফরম তখনো পেরিয়ে যায়নি, আজো স্পষ্ট মনে আছে জরিনার তখন বাইরে অন্ধকারের ভেতর এক ঝলক উষ্ণ তরল কী এসে ছিটকে পড়ল তাদেরই কামরায় তারই জানালা দিয়ে। বউটার চোখে মুখে জরিনার পিঠে এসে পড়েছে। চমকে জরিনা তাকিয়েছে জানালার দিকে। আর বউটা আকস্মিক রকমে চিৎকার করে উঠেছে যন্ত্রণায়, আর্তনাদে খানখান করে ফেলেছে দু'ধারের বয়ে যাওয়া হুহু বাতাস।

ইস্, সে কী বীভৎস দৃশ্য! আজো মনে করলে জরিনার হাড় বরফ হয়ে আসে। কয়েক মুহূর্ত কী করে কেটেছে কিছু মনে নেই তার।

পরের ছবিটা যা মনে পড়ে তা হচ্ছে জরিনা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর বউটা দু'হাতে দু'চোখ ধরে কাটা মুরগির মতো দাপাচ্ছে মেঝেয়। তার চিৎকারে বধির হয়ে আসছে কান। সেই বুড়িটা ছুটে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠেছে কোলের বাচ্চারা। বড়রা বিস্ফারিত চোখে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে। নূরুন্নাহার উঠে দাঁড়িয়েছে।

চুনের গরম পানি ছুঁড়ে মেরেছিল ওরা। এক পলক দেখেছিল জরিনা তিন চারটে নারকী মূর্তি প্লাটফরমে দাঁড়ানো।

বউটা তার ডাগর দু'চোখে কোনদিন আর কিছু দেখতে পাবে না। তার স্বামী এসে দেখবে, তার বউ অন্ধ হয়ে গেছে।

চেন টানো, গাড়ি থামাও। সবাই বলেছিল।

পুলিশ ডাকো। আরেকজন বলেছিল।

আর বউটা তখনো চিৎকার করছে।

জরিনা বলেছিল, না, গাড়ি থামবে না। তারপর বউটাকে দু'হাতে সোজা করে বসিয়ে বলেছে, আপনারা কেউ পানি আনুন।

পানি এলে পরে ধীরে ধীরে তার মুখ চোখ ধুইয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ শান্ত ছিল কী করে সে? কোথা থেকে সে পেয়েছিল এই শক্তি? নূরুন্নাহার, তার মায়ের পেটের বোন, সে পর্যন্ত বিহ্বল; আর সবাই তো এই কেবল সংসার ছেড়ে পৃথিবীতে বেরিয়েছে— তারা তো ভয় পাবেই।

তার গা কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তখন। সারাটা পথ সে আগলে বসেছিল বউটাকে।

আজো চুপ করে বসে থাকলে একেক সময় শ্রুতির ভেতরে সেই বউটার বুক ফাটানো যন্ত্রণার কান্না তাকে দোজখে নিয়ে যায়।

আলীচাচার কথা সেদিন মিথ্যে বলে মনে হয়েছিল তার। মনে হয়েছিল এ পৃথিবীতে স্বর্গ হবে না, যে স্বর্গের কথা আবাল্য তাকে শিখিয়েছে আলীচাচা।

অনেকদিন পরে আলীজাহ্‌কে এই ঘটনাটা লিখেছিল জরিনা; আলীজাহ্‌ তখন লাহোরে।

উত্তরে আলীজাহ্‌ লিখেছিল— তুই একটা বোকা, জরিনা। এ নিয়ে মন খারাপ করবার কী আছে? মানুষ তো পশুই— তাই বলে যারা স্বর্গ সৃষ্টি করতে চায় তারা সে পশুত্বকে দেখে ভয় পাবে কেন? তোর ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। তুই তখন ট্রেন থামাতে বাধা দিয়েছিলি কেন? বাধা দিয়েছিলি এইজন্যে যে, তাহলে পশুদের হাতে নিজেকে তুলে দিতে হতো। একজন যখন পুলিশ ডাকবার পরামর্শ দিয়েছিল, তুই মনে মনে তখন নিশ্চয়ই হেসেছিলি, আমি কল্পনা করতে পারছি। কেননা কী হবে শক্তি ডেকে? শক্তি চিরকালই দুর্বল। শক্তি দিয়ে পৃথিবীর বিহিত করা গেলে, মানুষ আত্মার সাধনা না করে কাঁচা শক্তির সাধনা করত যে।

যে মানুষগুলো চুনের পানি ছুঁড়ে মেরেছিল, ওদের আসনে বসিয়ে বিগ্রহ ছুঁইয়ে সত্যি কথা বলতে বল— *দেখবি ওরা যা করেছে তাতে অন্তরের সায় ছিল না। তবে কেন করেছে?* কেননা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই অন্তরের সায় না নিয়েই কাজ করে। যদি মানুষ একবার ভাবতে পারত তার অন্তরকে কী স্পর্শ করছে, আর কী করছে না, যদি মানুষ সেই ভাবে বাঁচতে পারত, তাহলে এত অন্যায় অসঙ্গতি সব ইতিহাসের পাতাতেই বন্দি থাকত, বর্তমানে এসে বর্ধিত হতো না, ভিড় জমাতো না।

বউটার চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়াকে আমি প্রতীক হিসেবে নিলাম। তুইও তাই নে। মনে কর, দীপ্তি থাকে না বলেই তো দীপ্তির সন্ধান চলছে আমাদের।

আজ এই বৃষ্টির মুহূর্তে নতুন করে তার মনে হলো, আমি তো আলো আমার মুখে নেবার সাধনা করে চলেছি, আমি কেন কাঁদবো? মানুষের নিচতা দেখে হাত-পা সেঁদিয়ে আসবে কেন আমার?

মনে মনে এত মনে পড়ছিল আলীজাহ্‌র কথা। তাই বাবার মুখে আলীজাহ্‌র আসবার খবর পেয়ে সে কী উল্লাস হলো তার। সে সান্ত্বনার হাত যে এমনি অপ্রত্যাশিত এগিয়ে আসবে তা কে ভাবতে পেরেছিল? দুপুর থেকে তো এই কথাই ভাবছিল সে— আজ যদি আলীচাচা থাকত ঢাকায়!

ভাববার কারণ ছিল বৈকি ?

জরিনা উঠে কাপড় বদলালো, চুল বাঁধলো দ্রুত দু'হাত। তারপর বাইরে বেরুবার জন্য চটি পরল— যে চটি বৃষ্টি ভেজা রাস্তা থেকে কাদা তুলে মাখিয়ে দেবে না।

তাকে বেরুতে দেখে অবাক হলেন শাহ সাদেক আলী।

রোকসানা বলল, ওকে গিয়ে বলেছিলেন কী ? রাগ করে বেরিয়ে গেল নাতো।

রোকসানার ভয় হলো বুঝি সাদেক তাকে গিয়ে বলেছে রেডিওগ্রামের ভল্যুম কমাতে তারই নাম করে। নইলে জরিনা একবারও তাকাল না কেন ফিরে ?

সাদেক মৃদু হেসে বললেন, ঐ বয়সে আমরাও অমন করতাম না কি ? আমি অত অবুঝ নই যে গিয়ে তোমার নাম করবো।— আমাকে আর একটু চা দাও।

বলতে বলতে সাদেক টেনে নিলেন সদ্য লেখা বিবৃতিটা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন। চোখের সমুখে যে জলজ্যান্ত একটা মানুষ বসে আছে এবং মানুষটা যে তাঁরই স্ত্রী একথা যেন তিনি সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়ে গেছেন।

রোকসানা তাঁর কাপে চা ঢেলে দিয়ে পেয়ালাটাকে সমুখে রেখে তখন উঠে গেলো। উঠে গিয়ে শোবার ঘরে বসলো। বসে বসে ভাবতে লাগল নতুন বাড়ির কথা। তার সারা জীবনের স্বপ্ন— নিজের একটা বাড়ি। বাড়িটা শেষ অবধি হলো তাহলে। আর ক'দিন পরে যখন তারা গিয়ে উঠবে তখন— সেই তখনের স্বপ্ন লাগল রোকসানার চোখে মুখে।

পথে তো বেরুলো, কিন্তু যাবে কোথায় ? বৃষ্টির পর সারাটা পথ কেমন বিশ্রী হয়ে আছে। কিন্তু আকাশ দেখাচ্ছে অপরূপ— ধোওয়া ধোওয়া, স্বচ্ছ, ভালো। আকাশে অমন সুন্দর রঙটা যেন খোদা এইমাত্র সৃষ্টি করলেন— এমনটি কোনদিন ছিল না, কোনদিন আর আসবে না।

হাসলো জরিনা, মনে মনে। পথটাকে পায়ের নিচে খুব কাছে করে দেখতে পারছি বলেই বিশ্রীটুকু চোখে পড়ছে। আর আকাশটা অনেক দূরে বলে তার ভালোটুকুই চোখে লেগেছে। যদি আকাশে গিয়ে দৃষ্টি করতে পারা যেত এই পথটাকে তাহলে ভালো লাগত তখন— মনে হতো, রেশমি ফিতের মতো পথটা পড়ে আছে শহরের ভেতরে।

মাসুদের আজকের ব্যবহারটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি নিষ্ঠুর। নিজের ওপর আক্রোশ হতে থাকে জরিনার— কেন একটা মানুষের ওপর এত নির্ভর সে করতে গিয়েছিল ? এতটা নির্ভর করেছিল বলেই তো আজ পতন এত বিষম হয়ে বেজে উঠেছে।

কতকাল আগের কথা সব। এত আগের যে আরেক জনের, আরেক জীবনের গল্প বলে সব মনে হচ্ছে।

কর্ণফুলীর পাড়ে তখন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক হচ্ছে, নদী বাঁধ দেয়া হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে। কাগজ তৈরির কারখানা। কাজ চলছে দিনরাত। ডাইনামো আর অন্যান্য যন্ত্রের অবিরাম কানে তালা লাগানো শব্দে নিথর নীরব অরণ্য, নদী মুখরিত, শিহরিত।

নূরুন্নাহার আর হামিদুর রহমানের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল জরিনা। আসলে ছুটিতে এসেছিল চাটগাঁ। দুলাভাই বললেন, চলো কোথাও পিকনিক করে আসি।

প্রস্তাবটা ভালো লেগেছিল জরিনার। যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে রক্ত মাংসের মানুষ— পৃথিবীর এবং পৃথিবী ছাড়িয়ে যা কিছু সবার তুলনায় ছোট, অত্যন্ত ছোট একটা প্রাণস্পন্দিত পদার্থ— কী করে জনপদ গড়ে তোলে তা ভেবে রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়েছিল তার মন। এইতো মানুষের স্বাক্ষর। মানুষ আছে বলেই তো জগৎ আছে। যদি মানুষ না থাকতো তাহলে কি জগৎ থাকতো ? তাই সে রাজ্য গড়ে, দালান ওঠায়, পিরামিড বানায়, গান লেখে। প্রকৃতি যে আজ পৃথিবী দিয়েছে মানুষ তার চেহারা বদলাতে পারে নিজের জন্য, নিজের হাতে— আর কিছু সে নাইবা বদলাতে পারল। আদি সৃষ্টিশক্তি থেকে জাত মানুষ পৃথিবীতে এসেই প্রতিদ্বন্দী হয়ে ওঠে তার উৎসেরই, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজই তো জীবন।

জরিনা অবাক হয়ে গিয়েছিল এসে। পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মনে হচ্ছিল—এ আমি। নিজের দেহ যেন মাটি হয়ে আছে এখানকার, রক্ত যেন ঐ নদী। সকাল থেকে দুপুর, তারপর এক লহমা জিরিয়েই আবার বেরিয়ে সন্ধ্যা অবধি সে ঘুরে ঘুরে দেখেছে। কাজ চলেছে অবিরাম। সেই কাজের প্রতিভা যেন রৌদ্র হয়ে দিনমান জ্বলছে পৃথিবীতে। ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল জরিনার। অকারণ, বাঁধন না মানা, বুঝতে না পারা আনন্দ— যে আনন্দ শুধু আনন্দেই বাঁধা থাকে না, অব্যক্ত বেদনা হয়ে গলার কাছে, বুকের ভেতরে সারাটা শরীরের ভেতরে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

রাতে বসে বসে এক শিট কাগজ চেয়ে নিয়ে এইসব কথা লেখা চলছিল নামহীন কোনো পাঠকের জন্য। যদি উৎসাহ থাকে, তাহলে ঢাকা ফিরে গিয়ে আলীজাহ্‌কে পাঠানো যাবে। আর যদি ভুলে যায়, তাহলে জরিনার আরো অনেক লেখার মতো এটাও অযত্নে কোথাও পড়ে থেকে থেকে বিবর্ণ হয়ে যাবে একদিন।

এটা তার একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে; এই, নিজের মনে যে তরঙ্গ উঠল তা না লিখে কিছুতেই স্বস্তি না পাওয়া ; বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, সব তল থেকে দেখে দেখে একটা ভাবনাকে লিখবে, তবেই স্বস্তি। লিখতে লিখতে শাসন থাকে না আর নিজের ওপর। বেদনা আর আনন্দ বা ঘৃণা, তা সে যে অনুভবই হোক না কেন, যতক্ষণ না নিঃশেষে শেষ বিন্দুটিও নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে শাদা কাগজে ততক্ষণ ভার হয়ে থাক মাথাটা। মাঝে মাঝে বকুনি দিয়ে আলীজাহ্ চিঠি লেখে— যাহ, তোর কিছু হবে না, এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছিস তুই দিন দিন। আমি তোকে শাস্তি দেব ভাবছি। খুব কড়া একটা শাসন।

তখন উত্তরে জরিনা লেখে— শাসন করতে হবে না তোমার। তোমার কাছে লিখি বলেই কি মনে কর সবার সঙ্গে সব কিছুতেই ফিনিক দিয়ে আমাব সেন্টিমেন্ট ছুটেছে ? তুমি বুঝি জানো না আলী চাচা, সেন্টিমেন্ট থাকবেই, আর ওকে বের করে দেয়ার জন্য কিছু না কিছু করা চাই। সেবার তুমি আমার একগাদা লেখা দেখে হো হো করে হেসেছিলে। ওগুলো যে আমার কী উপকার করেছে তা যদি তুমি জানতে ? আমার মনের ময়লা ধরে রেখেছে ওরা। তাইতো এত মায়া লাগে, না পারি ছিঁড়ে ফেলতে, না পারি প্রকাশ করতে। ভালো কথা, তুমি বলেছিলে না আমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি ? দোহাই তোমার একবার ঢাকায় এসে এই কথাটা ছেলেগুলোকে জানিয়ে দাও দিকি। ওরা আমাকে যেন চিড়িয়াখানার জন্তু পেয়েছে। বলে কিনা— পাথর মেয়ে। ইশারা করলে নাচি না, ইনিয়ে বিনিয়ে চলতে পারি না, কথায় কথায় নিজের নারীত্বকে জাহির করি না— যা আর দশটা মেয়ে করে থাকে, এই হচ্ছে আমার অপরাধ। ভাবি, এমন নারীত্ব-বর্জিত মেয়েকে নিয়ে তোমাদের এই সমাজ

চলবে কী করে? নাকি চিরকাল আমাকে তোমাদের অঙ্গনের বাইরেই থাকতে হবে ?

আলীজাহ্ তখন লেখে— কোন অঙ্গনের কথা বলছিস, রিনু ? ওখানে যে তোকে যেতে হবে না, ওরা যে তোকে ডেকে নেবে— এটা কত বড় সৌভাগ্য তোর, তা আরো বড় হলে বুঝতে পারবি। যাসনে কারুর কাছে। একেকটা মানুষ থাকে অমনি। জন্ম থেকে একা— একেলা। তাদের সঙ্গে কারুর মিল হয় না।

ওরা এক বন্ধুর বাসায় উঠেছিল। দুলাভাইয়ের বন্ধু— স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার। দুলাভাই এসে বললেন, কী লেখা চলছে এত ? এখানে এসেও মাথা কিলবিল করছে বুঝি ?

হ্যাঁ করছে। কপট ক্রোধে জরিনা বলে, করছে না ? একটু পরেই উঠে গিয়ে ক্যানাস্তারা বাজাবো ভাবছি। কেমন হয় বলো তো ?

'বাহ চমৎকার। গ্রাণ্ড আইডিয়া।

পরদিন দুপুরের কথা। ওলটানো মাটি রোদে তেতে রুখু হয়ে আছে। ভারী চাকায় গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়েছে খুব। একটু বাতাস পেলেই ঝড়ের মতো উড়তে থাকে।

জরিনা, নূরুন্নাহার, দুলাভাই আর হেড মাস্টার ভদ্রলোকটি বেরিয়েছেন দেখতে। তাঁরা যখন হ্যাঁ করে একটা বিরাট বরগা ওঠানোর রোমাঞ্চ অনুভব করছিলেন তখন জরিনা আপনমনে এদিক ওদিক দেখতে সরে এসেছে অনেক দূর।

আবার সেই বেদনার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আনন্দ আসছে।

হঠাৎ কৌতূহলী চোখ পড়ে একটা মানুষের ওপর। শার্ট, ট্রাউজার পরা ধবধবে, কড়া ইস্ত্রি করা, চোখে চশমা। ধুলোর ওপর চার হাত পায়ে উবু হয়ে কী যেন দেখছে।

কাছে গিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে, আঁকিবুঁকি কাটা বিরাট একটা কাগজের ওপর পেন্সিলের ডগা দিয়ে কী যেন খুঁজে চলেছে ভদ্রলোক আপন মনে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তার পায়ের ধাক্কায় মিহি এক পশলা ধুলো বৃষ্টি হয়ে গেল সেই নক্শার ওপর, তাতে হঠাৎ করে অপ্রস্তুত হলো জরিনা, কিন্তু লোকটার তা নজরেই পড়ল না। জরিনা ভাবলো সরে যায় সেখান থকে। ছি, ছি, কী বিশ্রী ব্যাপার। পায়ের ধুলো মাখিয়ে দিল তার কাজের কাগজে!

কিন্তু তার আগেই লোকটা বলল ঠিক তেমনি আত্মসমাহিত ভাবে নক্শার দিকে চোখ রেখে খুঁজতে খুঁজতে, দাঁড়ান, দাঁড়ান একটু।

জরিনা অবাক হলো। কী বলছেন তিনি!

একটু পরে লোকটার পেন্সিল একটা রেখা ধরে নেমে এসে থেমে গেল দ্রুত। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হঠাৎ। ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ তুলতে তুলতে বলল, এতক্ষণে বুঝেছি এটা যাবে এদিকে দিয়ে— আপনি!

জরিনার দিকে চোখ পড়তেই আমতা আমতা করে থেমে গেল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল দু'হাত ঝাড়তে ঝাড়তে। বলল, মাফ করবেন। বুঝতে পারিনি। কন্সট্রাকশনের লোক মনে করেছিলাম। বেড়াতে এসেছেন বুঝি ?

হ্যাঁ।

আমরা গড়ি, আপনারা দেখেন। গড়বার বিনিময়ে এটাও একটা পাওনা। ফাউ বলতে

পারেন। লোকটা হাসে। বলে, এইতো দেখুন না, গড়ে চলেছি আমরা। শেষ হলে কোথায় যাবো, আবার কী গড়তে হবে কিছুই জানি না। দশ বছর বাদে এখানে এলে, আমাদের কেউ চিনতেই পারবে না, জানবেও না।

জরিনার ভালো লাগল লোকটার কথার ধরন। আর তার কণ্ঠ কী মুক্ত— খোলা আকাশের নিচে, এলোপাথারি ছড়ানো মানুষ আর যন্ত্রপাতির ভিড়ে এমন কণ্ঠই যেন মানায়। বলল, আপনি নিজের দিকটা বড্ডা বেশি করে দেখেন, তাই না ?

কী জানি। কোনকালে তো নিজের দিকে তাকিয়ে দেখিনি। আপনি বলবার পর মনে হচ্ছে হয়ত হতেও পারে।

আপনি এঞ্জিনিয়ার ?

নাহ। সলজ্জ হেসে বলেছিল লোকটা, ফিল্ডে কাজ করি, ব্যাস।

পরে অবশ্যি জেনেছিল যে মাসুদ শুধু এঞ্জিনিয়ারই নয়, আমেরিকা থেকে একটা বড় ডিগ্রিও এনেছে।

সেদিন মাসুদ তাকে সমস্ত এলাকাটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছে।

আসবার সময় মনে হয়েছিল জরিনার, আসাটা খুব সহজ হচ্ছে না। মাসুদও কেমন বিব্রত বোধ করছিলো তখন। বলেছিল, কদিন থাকবেন ?

কাল পরশু, ঠিক নেই।

আপনাদের এখানে ভালো না লাগারই কথা। কী আছে এখানে ? বলে অসহায় চোখে তাকিয়েছিল মাসুদ, আর দু'হাতের আঙ্গুলগুলো সবল একজোড়ে গ্রিপের মতো নাড়ছিল। ভাবটা যেন এমন কিছু এখনি বানিয়ে ফেলা যায় না, যা জরিনাকে আর কটা দিন এখানে ধরে রাখতে পারবে ?

জরিনা যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। তাই সে বলেছিল, আপনারা হলেন এ কালের আলাদিন। আমরা আলাদিনদের কাণ্ডকারখানা দেখার জন্যে এখনো এক পায়ে খাড়া। ভালো লাগবে না কেন ? বেশ লাগছে। ঢাকা যেতে হবে কিনা, তাই যাচ্ছি।

মাসুদ তখন বলেছিল, দেখলেন তো, একটু আগে বলছিলাম না, আমাদের কথা কেউ মনেও রাখে না। নইলে আমার মতো কম কারখানা গড়া মানুষ এসেছে পৃথিবীতে ? অথচ একজনের নামও জানেন না। আলাদিন বলেই বুঝিয়ে দিলেন। বড় ভালো লাগলো আপনাকে দেখিয়ে শুনিয়ে। তৃপ্তি পেলাম সত্যি। নির্লজ্জের মত শোনাচ্ছে হয়ত।

না, একটুও না।

তাহলে আরো একট নির্লজ্জ হতে বাধা নেই, কী বলেন ? আসুন, আমার লাঞ্চ শেয়ার করি। কেমন ?

থাক, থাক। লোভ দেখাতে নেই।

কীসের লোভ ?

বিস্ময়ে, বোধহয় কিছুটা ভয়ে, মাসুদ শুধিয়েছিল।

মুখ গোল করে জরিনা উত্তর দিয়েছিল, খা-বা-র।

ওহো। তবু ভালো। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেঁন।

হেসে উঠলো জরিনা। বলল, তারচে' এক কাজ করুন। সন্ধ্যের সময় ভদ্র হয়ে আসুন, মানে ধুলো কালি মুছে, হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে। আজ রাতটা আমাদের সঙ্গেই খাবেন। নিজে কিছু গড়ার সামর্থ নেই, ইচ্ছে— এতদিনে ইচ্ছেটাও বোধহয় মরে গেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলে দেখি সেটাকে বাঁচিয়ে তোলা যায় কি না।

সেদিন সন্ধ্যের সময় সত্যি সত্যি মাসুদ ধুলোকালি ঝেড়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি চাপিয়ে এসেছিল। ভীষণ সৌখিন কিন্তু কোথাও বাড়াবাড়ি নেই— দেখে এমনি একটা মন্তব্য করা চলে।

এসেই বলেছে, আপনার কথামতো নিজেকে যথাসম্ভব ভদ্রলোক করে হাজির করলাম। এখন বলুন, কত নম্বর দিলেন ফুলমার্কের ভেতর ?

ফেল! ডাহা ফেল করেছেন।

জরিনা তাকে নিয়ে বসালো ওধারের প্রশস্ত বারান্দায়, যেখানে দূরের কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পগুলো চোখে পড়ে। সন্ধ্যে হয়েছে। বিন্দু বিন্দু আলোয় নতুন বউয়ের চন্দন চর্চিত মুখশ্রীর মতো হয়ে উঠেছে আকাশ মাটি মেলানো অন্ধকার। সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিলো মাসুদ।

কী ভাবছেন ?

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া জরিনার মুখের দিকে তাকিয়ে মাসুদ ম্লান হাসলো। বলল, না কিছু না।

ভাবছেন না ? কেন মিথ্যে কথা বলছেন ?

খুব অস্পষ্ট, প্রায় শোনা যায় না, এমনি করে তখন মাসুদ উত্তর করল; মানুষ চুপ করে থাকে ভাবনা কিছু না থাকলেও। আমাকে খুব কি ভাবিত দেখাচ্ছিল ?

হ্যাঁ ভাবছিলেন। হয়ত ভাবছিলেন, গড়ে ওঠার পর যে চেহারা হবে এই মাটির, তাই।

খুব সম্ভব, তাই। একেকদিন রাতে স্বপ্নেও দেখি। দেখি— লক্ষ লক্ষ মানুষের বসতিতে আলো হয়ে উঠেছে কর্ণফুলীর দুই তীর। বলছিলেন না গড়ার ইচ্ছে আপনারও, কিন্তু সামর্থ নেই। কী গড়তে চেয়েছিলেন ?

জরিনা ঘাড় কাৎ করে আনমনে টেবিলে পানির গ্লাশটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবল খানিক। ততক্ষণ মাসুদ নিবিড় একমুঠো অধীরতা হয়ে অপেক্ষা করল তার উত্তরের জন্য। কিছুক্ষণ পরে ভাবনা রেখে জরিনা বলল, না কিছুই না। কিছু মনে করতে পারছি না।

সে কেমন কথা ? নিজেই জানেন না ?

না। নাতো। ভেবে দেখিনি। তারপরে হঠাৎ জোর পেয়ে গেল যেন সে, বলল, ইচ্ছেটাই বা ক'জনের থাকে ?

সত্যি কথা। আমি নিজে, জানেন, বড় ইন্সপায়ার্ড মানুষ। মা বলেন, এটা আমার একটা ম্যানিয়া। আমি তো বলি— ইচ্ছেটাই নেই এখন আমাদের। নইলে প্রতিভা আছে, বুদ্ধি আছে, হাত আছে, চোখ আছে, কাদামাটি আছে, অথচ মূর্তি গড়তে পারি না কেন ? বদলে কাদামাটি দিয়ে কেবল ছোঁড়াছুড়ি করি।

কথাটা ভাল লাগল জরিনার। কোনো আত্মম্ভরিতা নেই, চটক নেই, প্যাঁচ নেই— একেবারে

অন্তর থেকে উঠে এসেছে যেন। কতদিন সে এমন মানুষ দেখেনি যে ঠোঁট দিয়ে কথা বলে না, অন্তর দিয়ে বলে।

কোথায় যেন বাবার সঙ্গে, আলীজাহ্‌র সঙ্গে মিল আছে মাসুদের। জরিনার এটা আরেকটা স্বভাব-- পৃথিবীর সব মানুষকে সে যেন সহজ দু'টো ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। বাবা ও আলীজাহ্‌র মতো কিংবা বাবা ও আলীজাহ্‌র মতো নয়। আলীজাহ্‌ বলতো— তোর নিজের মতো কাউকে খুঁজে নে। বলতো— অবশ্যি খুঁজে পেলেই যে তুই বেঁচে গেলি তা নয়; একটা মানুষ আরেকটা মানুষের কিছু করতে পারে না, তা সে যতই মিল থাক; শুধু সহানুভূতি দিতে পারে-- তা সেটাই বা কম কীসে?

জরিনার মনে হলো এই মানুষটার সহানুভূতি যেন সে আশা করতে পারে। খুব স্পষ্ট করে মনে হওয়া নয় এটা। কেবল একটা ইশারা মাত্র।

মাসুদ একটু পর বলল, গড়তে আপনিও জানেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।

কী?

কেন, এই যে সন্ধ্যেটা। এমন সন্ধে তো জীবনে প্রত্যেকটা দিনই হচ্ছে। কিন্তু আজকের সন্ধ্যেটার বিশেষত্ব আছে। এটা আপনার হাতে গড়া।

একটুও না। কী এমন?

এমনটি কোনদিন ছিল না, কোনদিন হবেও না। তাছাড়া আরো আছে।

আর কী?

জরিনার মৃদু হাসিটা এবারে কেমন বিব্রত দেখালো। তখন মাসুদ ইশারা করলো টেবিলে রাখা বাতিগুলোর দিকে।

এগুলো।

ওহ্‌। এতো ছেলেখেলা। কাজ ছিল না তাই।

তা বাতিগুলো যে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করত বৈকি। বারান্দায় গোটা তিনেক ব্রাউন কাগজের ঠোঙ্গা পড়েছিল। জরিনা সেগুলো তুলে নিয়ে তলা সমান করে বসিয়েছে— ভেতরে ইঞ্চি খানেক ভরে দিয়েছে শুকনো মাটি দিয়ে আর মুড়ে দিয়েছে রিবনের মতো করে খোলা মুখের চারধার। তারপর সেই মাটিতে মোম জ্বালিয়ে বসিয়ে দিয়েছে।

সেই বাতি একটা ছিল টেবিলে; আর দুটো বারান্দার রেলিংয়ে। অনেকটা আকাশ-প্রদীপের মতো হয়েছে দেখতে। স্পষ্ট কোনো আলো হচ্ছে না, তীক্ষ্ণ কোনো ছায়া পড়েনি। যেন এককোণে একটি স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে।

এটা কোনো পরিকল্পনা করে করা নয়। মনে হয়েছে, তাই করেছে। কিন্তু মাসুদ সেটা উল্লেখ করবার পর তার মনে হলো— ও ভাবছে আমি ইচ্ছে করে করেছি। ওর জন্য করেছি।

নিজের ওপরে নিজেই মনে মনে চটে গেল জরিনা। যদি করেই থাকি তাতে কিইবা এমন ক্ষতি হয়েছে। একটা মানুষকে স্বাগতম জানানোর জন্য একটু কিছু করাটা কি অপরাধ?

মাসুদ তখন বলছে, বলছিলেন এগুলো ছেলে-খেলা। খেলাচ্ছলে আর কী করেন আপনি?

জরিনা আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তাকে। প্রশ্নটার গভীরতা আন্দাজ করবার চেষ্টা করল।

পরে বলল, না, সব বানিয়ে বলেছি। খেলার জন্যে কিছুই করি না আমি। যা ভালো লাগে তা-ই করি। তা নিয়ে ঠাট্টা করছেন কেন ?

কই নাতো। ঠাট্টা করিনি তো। আমি ইট কাঠ পাথর লোহা ছাড়া আর কিছু দিয়ে গড়তে জানি না। যারা জানে তাদের হিংসে করি মনে মনে।

তাহলে হিংসে হচ্ছে বলুন।

মাথা দুলিয়ে মাসুদ উত্তর করলে, হ্যাঁ তা বলতে পারেন বৈকি।

গড়তে পারেন, ভাঙতে পারেন না ?

জরিনা হঠাৎ শুধোল। শুধিয়ে গভীর দু'চোখে প্রায় অন্ধকার মাসুদের দিকে তাকিয়ে থাকল। মাসুদ চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। বিস্মিত হল। অপরূপ মন হল তার মুখটাকে। পৃথিবীর অনন্ত জলতল ভেদ করে বিশাল একটা ঝিনুকের মতো জরিনার মুখ উঠে এসেছে যেন।

না পারি না। কখনো পারি না।

আমি পারি। দেখবেন।

ফুঁ দিয়ে বাতিগুলো নিভিয়ে দিল জরিনা। তলিয়ে গেল অন্ধকারে। কোথা থেকে ঝিল্লির মতো মিহি একটা আলো তখন ফুটে উঠল তাদের দু'জনকে ঘিরে। সেই আলোতে মুখ দেখা চলল না। অনুভব করা গেল।

তারপর থেকে এমন হলো, ঢাকা এলেই মাসুদ একবার দেখা করতই জরিনার সঙ্গে।

সেই দেখাটা আস্তে আস্তে ভালবাসার রূপ নিল মাসুদের মনে। আর জরিনা ? জরিনা বুঝতে পারত না তার ভেতরে কী হচ্ছে। যা হচ্ছে তার নামই কি ভালোবাসা ? এই ভালোবাসার কথাই কি এতদিন বলে এসেছে সবাই বই লিখে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে ? এই কি সেই ভালোবাসা যা নূরুন্নাহার অনেকদিন আগে বানান করে শিখিয়েছিল তাকে ?

না, না। প্রথম প্রথম জরিনা ভেবেছে— এ হচ্ছে সহানুভূতি, এ হচ্ছে—। আর কোন নাম মনে আসতো না তার। তখন বিব্রত লাগত নিজেকে। তখন কাগজ টেনে পাগলের মতো আবোল তাবোল লিখত আলীজাহ্‌কে। লিখত— তুমি বলোত, এই ব্যাপারটাই কি ভালোবাসা ?

আলীজাহ্ খুব স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি তার। লিখেছে— ভালোবাসা কি ঐ মেডিক্যাল কলেজে উপুড় করে শোয়ানো কালো হয়ে যাওয়া পিন করে রাখা মরা মানুষের শরীর যে ছুরি কাঁটা দিয়ে কাটা ছেঁড়া করলেই গট গট করে সব বলে দেয়া যাবে ?

তা এই অনুভূতির নাম যা কিছুই হোক, মাসুদকে আমার যেমন করে ভালো লাগে, নিজের মনে করতে ইচ্ছে হয়, তেমন আর কাউকে লাগে না, হয় না— জরিনা ভেবেছে। যদি এটাই ভালোবাসা হয় তো, হোক।

ঠিক বাইরের একটা মানুষকে এমনি করে কোনদিন আর নিজের মনে করতে ইচ্ছে করেনি তার। মাসুদ চাটগাঁয়ে থাকবে, কিন্তু সে কেমন থাকবে না থাকবে তা জানবার অধিকার যেন জরিনার আছে। এই ভাবনাটা এত প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল অল্প কিছুদিনের মধ্যে

যে, হপ্তায় একটা চিঠি না পেলে ভীষণ রাগ হতো। সেজন্য তক্ষুণি বকাবকি করে লিখতে বসতো না বটে, কিন্তু পরে কখনো উত্তর দিতে বসে কিছুটা ঝাঁজ ছড়াতে কার্পণ্য করতো না। এদিকে ফি হপ্তায় মাসুদের চিঠি চাইই আর নিজে লিখবার বেলায় মাসে দু'মাসে একখানা— তাও খুব বেশি হলে আট থেকে বারো লাইন।

মাসুদ ঢাকায় এসে অনুযোগ করলে জরিনা উত্তর করতো, কেন, অনেক তো লিখি। আর কিছু আছে নাকি লেখার ?

কথাটা সত্যি নয়। লিখতো সে — অনেক কিছুই লিখতো, যদি না তার জানা থাকত মাসুদ তাকে ভালোবাসে, আর যদি না নিজের ভেতরেও যা হচ্ছে তা ভালোবাসা বলে সন্দেহ করা হত। এই সত্য আর সন্দেহটাই তাকে যেন বারণ করে বেশি লিখতে, বারবার লিখতে। নইলে যে রাশি রাশি কাগজ তার মনের আকুলি বিকুলি নিয়ে কালিমাময় হয়ে ওঠে তা থেকে একমুঠো তুলে পার্সেল করে পাঠাতেও তার এতটুকু দ্বিধা হবার কথা নয়।

এমনি করেই চলছিল। একদিন কে একজন বলল, কিরে তুই নাকি প্রেম করছিস খুব ?

কী করছি!

আর্তনাদের মত শোনালো জরিনার কণ্ঠ।

আহা, প্রেম। ওতো সবাই করে। তুই বাইরে ঠাট্টা করিস সবাইকে আর ডুবে ডুবে এত ?

মিথ্যে কথা, বাজে কথা। যে বলেছে সে ইতর।

এ ঘটনাকে ভুলেই যেত হয়ত। কিন্তু একদিন জরিনা শুনতে পেল, সে নাকি মাসুদকে বিয়ে করবার জন্যে খেপে উঠেছে, মাসুদই তাকে আমল দিচ্ছে না; তবু কি জরিনা ছাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৈশোর পেরুনো বাচাল একটা ছেলে বা মেয়ের কাছ থেকে শুনলে হয়ত উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু যে বলেছে সে রীতিমত প্রৌঢ় এবং দুলাভাই হামিদুর রহমানের বেশ অন্তরঙ্গ মানুষ। কথাটা দুলাভাইর মারফৎ শোনা।

সেদিন রাতে সে ভাবতে বসলো— কী করে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়ল এমনি করে ?

ভালোবাসা সম্পর্কে তো নিজেই এখনো সন্দিহান, এখনি বিয়ের কথা উঠল ?

ইতিমধ্যে মাসুদের একটা চিঠি এলো। তাতে সে লিখেছে— জানি না, তোমার কানে উঠেছে কিনা, কিন্তু সবাই বলাবলি করছে আমার সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে। তাতে তোমার মনে আঘাত লাগতে পারে ভেবে বড্ড খারাপ লাগছে আমার। ভয় করো না লক্ষ্মীটি। যদি দরকার হয়, আমার বাড়ানো হাত তো রইলোই। আমি তোমাকে ফেলে পালিয়ে যাবো না। কী বল তুমি ?

চিঠিটার ভেতর থেকে একটা প্যাঁচানো উদ্দেশ্য যে ঠেলে ঠেলে ওপরে উঠে আসতে চাইছে। মাসুদ তো কোনদিন এমন ছিল না। যে মাসুদকে সে এতখানি নির্ভরতা আর বিশ্বাস দিয়েছে, যার কাছ থেকে এতকাল সে বিশ্বাস নিয়েছে আর নির্ভরতা খুঁজছে, সে কেন তাকে চাইতে গিয়ে এমন জটিল-কণ্ঠ হয়ে উঠবে ? তার এই ভঙ্গিটার সঙ্গে কিছুতেই যেন সে আপোষ করতে পারে না। কেবলি কে যেন ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে

চায়।

সেদিনই সে জরুরি ডাকে চিঠি লিখল মাসুদকে, অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো বেপরোয়া করে— মানুষের কাছে ভালোবাসার গল্প করার সাহস পেলে কী করে ? আমাকে তুমি মনে কর, অনেক চিনেছো ? অমন মনে করে থাকলে ভুল শুধরে নিও। ভালোবাসার জন্যে এখনো প্রস্তুত নই। তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে তাই ভাবতে পারলাম না।

এই চিঠিটার জবাব আসতে অনেক দেরি হয়েছিল। তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে তার, মাসুদই বলেছে সবাইকে এই বিয়ের কথা, ভালোবাসার কথা। যে কথা সরাসরি বলতে তার বেধেছে, সেই কথা সে লোকের মুখ দিয়ে তাকে শুনিয়েছে।

জরিনার এমন মনে হয়, প্রথমদিন যে মানুষকে সে দেখেছিল, আর আজকের যে মাসুদ— তারা সম্পূর্ণ আলাদা দু'জন।

একে তো জরিনা মাসুদকে লিখত কম, এরপরে লেখাটা যেন প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়াল। শুধু তাকেই নয়, আলীজাহ্‌কেও। মাসুদ অতিষ্ঠ হয়ে একের পর এক চিঠিতে লিখত— কী হয়েছে তোমার ? একবার কি আসবো ?

আলীজাহ্ লিখেছে— সেন্টিমেন্টের আতশগুলো নিঃশেষ পুড়িয়ে ফেলেছিস বুঝি ? নইলে তোর পাগলপাগল চিঠিগুলোর কী হলো ? নাকি মহাকাব্য লেখার পরিকল্পনায় মগ্ন হয়ে আছিস ?

জরিনা লিখেছে— হ্যাঁ আলীচাচা, মহাকাব্য লেখাই চলছে আমার। জীবন-কাব্য। জীবনের কবিতা। জীবনে যে কবিতা নেই সেই কথাটা স্বপ্নচারীর মতো কবিতা করে বলার কথা ভাবছি। অবশ্যি, এ ছাই লেখা হবে না কোনদিন। আমাকে দিয়ে শুধু পরিকল্পনাই চলে, হয়তো আরম্ভ পর্যন্ত, কিন্তু শেষ আর হয় না।

ক'দিন আগে মাসুদের চিঠি পেয়েছিল ও ঢাকা আসছে। মনে মনে রোজই অপেক্ষা করছিল কখন মানুষটা এসে পৌঁছুবে। তখন কী হবে, সে সম্পর্কে কিছুই যদিও সে ভাবেনি, তবু বলা চলে বোঝাপড়া করার একটা সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল।

নিজের কাছে অত্যন্ত সৎ হলে এমনি নির্মম হয় মানুষ। কিন্তু আবাল্য এই শিক্ষাই তো সে পেয়েছে।

হঠাৎ করে বাইরেই আজ দেখা হয়েছে মাসুদের সঙ্গে। সকালে। রিকশায় উঠছিল, পাশ থেকে সবুজ জীপ থামিয়ে গলা বাড়িয়ে মাসুদ বলল, আমি।

তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারল না জরিনা। কিন্তু সেটা এক মুহূর্তের জন্য। পরে খুব সরাসরি তাকিয়ে বলল, তোমার সাথে কথা আছে, এক্ষুণি।

পরে কিন্তু অনুতাপ হয়েছিল খুব— বৃষ্টির সময়ে, নিজের ঘরে। কেন সে অধীর হয়ে উঠেছিল কথা বলবার জন্য ? কী দায় পড়েছিল তার ? এক মুহূর্তের এই অসতর্কতার দরুণ নিজেকে যেন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিল না জরিনা।

মাসুদকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল। জরিনা সরাসরি বলেছিল, কেন তুমি সবাইকে বলতে গেলে এসব ? তাছাড়া আমি তো তোমাকে কোনদিন বলিনি যে ভালোবাসি।

তোমাকে আর বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না।

অভিযোগটা মাসুদ শুনছিল চোখ নাবিয়ে, মুখ নাবিয়ে। যেন এমনি করে থাকলে, তাকে স্পর্শ না করেই তার ওপর দিয়ে কথাগুলো পেছনের দেয়ালে চলে যাবে। ভঙ্গিটা দেখে আরো গা জ্বালা করল জরিনার। এবং এককোণে একটু মমতাও কি ছিল না? ছিল হয়ত।

কী, কথা বলছ না যে?

কী বলব?

আমি ঘৃণা করি— খুব ঘৃণা করি।

কী?

যারা সত্যি কথা বলতে ভয় পায়।

জানি।

নিশ্চয়ই জানো না। জানলে কেন নিজে থেকে কথা বানালে? তোমাকে বিয়ে করবার কথা উঠালো কে?

মাসুদ তবু কিছু বলল না। জরিনা তখন নিজের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করছে। একদিকে, ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে পথের ওপরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে অন্যদিকে ইচ্ছে করছে মমতা দিয়ে ভরিয়ে দিতে। মনে মনে মাসুদকে সে বলল— তুমি সাবধানে উত্তর দিও, তোমার কথার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করছে লড়াইয়ে কোন পক্ষ জিতে যাবে; আমার নিজের কোনো হাত নেই।

মাসুদ হঠাৎ চোখ তুলে বলল, হ্যাঁ বলেছি।

তার কণ্ঠে ঔদ্ধত্য মেশানো। হাসি পেল জরিনার। মাথা দোলালো সে। যেন বলতে চাইলো —না, বন্ধু না।

আবারো বলল মাসুদ, বলেছিলাম— একজন দু'জনকে।

আর আমিই নাকি পাগল হয়ে আছি? তুমি রাজি হচ্ছি না?

কে বলেছে?

সেইটাই জানতে চাই?

যেন কী একটা ভীষণ জিদ চেপে গেছে জরিনার।

মাসুদ তখন খুব অন্তরঙ্গ কণ্ঠে শুধিয়েছে, আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করব?

চোখ দিয়ে নীরবে সম্মতি দিল জরিনা।

আমি বুঝতেই পারছি না, এ নিয়ে এত বিচলিত হবার কী আছে!

কিছু কি নেই?

নিজের কণ্ঠে ব্যঙ্গ শুনতে পায় জরিনা।

কী জানি, তোমার কাছে থাকতে পারে। আমার চোখে পড়ছে না। আমি তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছি, এটা সত্যি। বিয়ের কথা যে ভাবিনি তাও নয়। সেটা দশজনে জানলে কী এমন হয়?

এই হয়, যে আমার ক্ষতি হয়।

কেন ?

বাহ, নিজে যা জানলাম না, বুঝলাম না, তা হঠাৎ করে মানতে যাবো কেন ?

তাহলে—

কী তাহলে ?

তাহলে, এতদিন কী বলেছো তুমি আমাকে ? আমাকে জেনে শুনেও প্রশ্রয় দিলে কেন ? ভালো না বাসলে, ফিরিয়ে দিলে না কেন ? কে তোমাকে বলেছিল, আমার সবকিছু নিষ্ঠুরের মতো, স্বার্থপরের মতো, নিজের করে নিতে ? দিনের পর দিন ?

শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল জরিনা। অতি কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। মুখে শুধু বলল, থাক। আমি চললাম।

মাসুদ উঠে দাঁড়িয়ে, তার দাঁড়ানোর আগেই পথ আগলে বলল, নিজের কথাই বলে গেলে, আমারও কিছু বলার থাকতে পারে।

ভাবলো জরিনা। ভেবে সিদ্ধান্ত নিল— যা বলে বলুক। যে মানুষটা কারণে কিংবা অকারণে অসহ্য হয়ে উঠেছে, সে যা খুশি বলুক তাতে তার কিছু এসে যাবে না।

মাসুদ বসলো না। দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'আমি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম না, কবিতার বই হাতে নিয়েও দিন কাটে না আমার। ফলিত বিজ্ঞানের সেরা ছাত্র ছিলাম— তার মানে, তোমার কাছে একেবারে রস-বিবর্জিত আঁকজোঁকের মানুষ। আমি এসব কিছু বুঝতে পারি না- তোমার মতো নিজের মনকে চিবিয়ে চিবিয়ে রস নেওয়ার মতো রসনা আমাকে আল্লাহ দেননি।

কী— কী বলতে চান আপনি ?

বজ্রপাতের মত শোনাল জরিনার উচ্চারণ— মাসুদের কাছে, এবং তার নিজের কাছেও। মাসুদ বলল, ভালোই হলো। বেশ করলেন। এবারে আপনি যেতে পারেন। তবে যাবার আগে একটা কথার উত্তর দিয়ে যাবেন ? কটা প্রেম করেছেন আরো ?

বিস্মিত হলো জরিনা মাসুদের অপমান করবার নির্ভেজাল ক্ষমতা দেখে। আর আক্রোশ হলো নিজের ওপর। নিজেকে শাস্তি দেয়ার হিংস্র বন্য একটা ইচ্ছেয় ভেতরটা দুলতে লাগল। বলল, অনেক। হিসাব করলে তা এক ডজন হবে বৈকি। আপনার তো মোটে একটা। লাফ গেম খেয়ে থুতু ছিটোচ্ছেন এখন।

জানতাম। নইলে লোকের রটনাকে এত ভয় করে আপনার ? সবার কাছেই মুখোশ খুলবে যে। ধন্যবাদ. আপনার ভ্যানিটি ব্যাগে যে ক'টা ফুল আছে থাক, আমি আর সংখ্যা বাড়াতে চাই না।

তখন উঠে দাঁড়াল জরিনা। বলল, আর কিছু বলার আছে আপনার ?

মাসুদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। জরিনা আবার শুধালো, বলুন যত খুশি সময় চান, দিতে পারি।

তবু মাসুদ কিছু বলল না। তখন জরিনা বেরিয়ে এলো কেবিনের সবুজ পর্দা ঠেলে বাইরে, সেখান থেকে পথে; পথটা ঠিক আগের মতই ব্যস্ত, উদাসীন, চঞ্চল।

সন্ধ্যার পর পরই আলীজাহ্ ঢাকা এসে পৌঁছুলো। ট্যাক্সি থামবার শব্দে রোকসানা বারান্দা থেকে উঁকি দিয়েছিল। দেখতে পেয়ে ফটক অবধি এগিয়ে এসে বলল, কেন, জরিনা এয়ারপোর্টে যায়নি ?

না। নাতো।

আলীজাহ্ও একটু বিস্মিত হয়েছে জরিনাকে এয়ারপোর্টে না দেখে। লাহোরে যাবার পর অন্তত ছ'সাত বার সে এসেছে ঢাকায়। আর প্রত্যেকবারই এয়ারপোর্টে ছোট্ট মেয়েটির মতো জরিনা পায়ের গোড়ালি তুলে, রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে, ফুলঝুরির মতো হাসিমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর একসঙ্গে ফেরা। ফিরেও কি নিস্তার ? সোজা একেবারে জরিনার কামরায় গিয়ে জিরোবে কতক্ষণ, ঝড়ের মতো বলবে, শুনবে, তবে মুক্তি।

এবারে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ব্যতিক্রমটা চোখে পড়লেও খুব একটা কষ্ট হয়নি আলীজাহ্‌র। কেননা যে ম্লান মন নিয়ে সে আজ ফিরে আসছে ঢাকায় তা যে কোনো বিচ্যুতি সহ্য করতে পারে। আজ আলীজাহর সন্দেহ হচ্ছে, আদৌ তার মন বেঁচে আছে কিনা।

আলীজাহ গিয়েছিল লাহোরে। তার আগে প্রায় বছর দুয়েক ঢাকায় থেকেছে। ঢাকায় ফিল্ম স্টুডিও নেই। আলীজাহ্ তাই চেষ্টা করেছে এখানে আপাতত চলচ্চিত্রে না হোক, অন্তত নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলা যায় কিনা। একটা নাটক লিখেছিল তখন। এই হঠাৎ জেলা-সদর থেকে রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া, দ্রুত বেড়ে ওঠা, দ্রুত চেহারা বদলানো জ্বলন্ত, প্রখর অচেনা ঢাকাকে সে রক্তের মতো ব্যবহার করেছিল তার নাটকের জন্য। আর ছিল নতুন মধ্যবিত্তের কয়েকটা মানুষ— প্রধান কুশীলব তারা। আলীজাহর সন্ধানী নির্মম চোখে নগ্নরূপ ফুটে বেরিয়েছিল এই মধ্যবিত্তের- যারা আসলে জাত মধ্যবিত্ত নয় মোটেই। দেশভাগের প্রবল ধাক্কায় নিচতলা থেকে উঠে এসেছে একদল, আরেকদল সীমান্তের ওপারে সব ফেলে এসে নিচে নেবে গেছে। দু'য়ের যে মিলন-মঞ্চ সেটাই তো আজকের মধ্যবিত্তের পনেরো আনা। তাই মেজাজ পায়নি পুরোপুরি কেউই– মিশেল হয়নি – মানুষের চেতনা তো সজীব, তাই নেব্যুলার মতো অন্তস্থলে প্রবল ঘূর্ণমান সংঘর্ষ চলেছে। কে জানে কোন নক্ষত্র, কোন সৌরজগত জন্ম নেবে – ভালো কিংবা মন্দের জন্য। মোটামুটি এই ছিল তার বিষয়। নাটকটি পরিচালনা করেছিল আলীজাহ্ নিজেই। ভূমিকায় জরিনা, নূরুন্নাহার— দু'জনকেই দেখা গেছে। জরিনাকে আলীজাহ্ বলেছিল— তুই যে চরিত্রটা করতে যাচ্ছিস রিনু, সেটা খুব কঠিন। কিন্তু তোর কাছে খুব সোজা হবে। তুই শুধু ঢাকা আসবার পথে ট্রেনে সেই ছুঁড়ে দেয়া চুনের পানিতে বউটার অন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা মনে কর। ঠিক ওই মুহূর্তে তোর মুখটা যেমন হয়েছিল, তোর বিবেক যা বলছিল— ঠিক সেই মুখ, সেই ভাবনাটা আমি চাই।

নাটকের উপস্থাপনাও ছিল তেমনি পরীক্ষামূলক, তেমনি নতুন। গোটা মঞ্চ আলাদা আলাদা উচ্চতায় তিনটে ভাগে ভাগ করা ছিল। আর পেছনে আকাশ থেকে ঝোলানো ছিল ধূসর রঙের ড্রেপারি একটা অর্ধবৃত্ত সৃষ্টি করে। সবচেয়ে নিচের তল ছিল মিহি নীল, মাঝের তল সবুজ আর ওপরের তল গোলাপি আলোয় উদ্ভাসিত। রংটা ঠিক বোঝা যাবে না যতক্ষণ না কোনো শিল্পী এসে দাঁড়াবে। একেকটা দৃশ্য অভিনয় চলছিল একেক তলে। সব শেষের দৃশ্যে তিনটে তলেই একসঙ্গে তিনটে দৃশ্যের সম-উপস্থাপনা করা হয়েছিল।

বিদগ্ধ মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু লক্ষ্য যার চলচ্চিত্র সে তৃপ্ত হতে পারল না নাটকের মাধ্যমে— তা আসুক না খ্যাতি, আসুক না প্রতিষ্ঠা। আলীজাহ্ লাহোরে চলে গেল। বেনামিতে শস্তা কাহিনী, চিত্রনাট্য লেখা চলল, আর অনুসন্ধান চলল এমন এক প্রযোজকের যে আলীজাহ্‌র ইচ্ছে মতো আলীজাহ্‌কে ছবি তৈরি করতে দেবে।

জরিনা বলেছিল, ঢাকায় থেকে যাও, আলীচাচা। লাহোরে গিয়ে মনের মতো ছবি বানালেও তো বানাবে উর্দুতে। তারচে আমার মনে হয় বাংলাতে নাটক লেখা ঢের ভালো।

আলীজাহ্ তখন বলেছে, দ্যাখ, চলচ্চিত্র হচ্ছে প্রথমে প্লাস্টিক আর্ট, তারপরে অন্য কিছু। ভাষা এখানে একেবারেই গৌণ। যে কোনো ভাষাতেই ছবি হোক না কেন, আসলে তা ছবি হওয়া চাই, পূরণ করা চাই প্লাস্টিক আর্টের, চলচ্চিত্র মাধ্যমের শর্তগুলো।

অবশেষে অনেক কাল পরে, অনেক বাজে ছবি লিখবার পরে, আলীজাহ্ মাস চারেক আগে ছবি করবার একটি সুযোগ পেল লাহোরে। সুযোগ মানে, কষ্ট হবে, পারিশ্রমিক মিলবে না, পাই পাই হিসেব করে কাজ করলে তবে ছবি হবে। অর্থাৎ মূলধন অতি সামান্য। ভিক্ষের মত করে প্রায় চেয়ে নেয়া লাখ খানেক টাকা। তিনজনের কাছ থেকে অঙ্কটা এসেছে।

বছরের পর বছর মুখে থুতু উঠিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুঝিয়ে, রাজি করিয়ে যখন মূলধনটা পাওয়া গেল তখন আলীজাহ্ তার যৌবন ফিরে পেল যেন— যে যৌবন, হিসেব করতে বসলে, পৃথিবীর চোখে অনেকদিন আগেই চলে গেছে।

বছরের পর বছর ধরে খেটেখুটে তৈরি করা চিত্রনাট্যটাকে বার করলো। কত রাত গেছে এর পৃষ্ঠা খুলে। কল্পনার পর্দায় নিজের বানানো ছবি তৃষিতের মত সে দেখেছে, একেবারে শুরু থেকে, যেখানে ফেড ইন করছে জরিনার কবিতা থেকে উদ্ধৃতি—

Beneath the black sun
We shall rise in a flame.

এত বিশদ করে, ধারাবাহিকভাবে সে প্রতিটি শট দেখেছে যে বানানোর আগেই তার মনের ভেতরে ছবিটি অনেকদিন আগে বানানো হয়ে গেছে।

সেদিন রাতে সে শাহ সাদেক আলীকে লেখল সুসংবাদ। সাদেক ফেরৎ ডাকেই লিখলেন, সাধনার সিদ্ধি অনিবার্য এ ছিল আমার চিরদিনের বিশ্বাস।

আর জরিনা, সে লিখেছিল— ইস, আমার যে কী খুশি হচ্ছে আলীচাচা তোমার চিঠি পেয়ে। জানো, ভীষণ হিংসে হচ্ছে তোমাকে। পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে পারলে তাহলে। আমি কিন্তু অন্ধকারেই রইলাম। তোমার উদাহরণ আমাকেও খুব সাহস দিচ্ছে। আমি জানি, তুমি যে ছবি করবে তা শুধু ছবি হবে না, হবে সৃষ্টি, তুমি হবে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। জয় হোক তোমার।

ছবি তৈরির প্রায় সবগুলো কাজ এক অমানুষিক ধৈর্য আর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে করে চলল আলীজাহ্। তিনমাসে বইয়ের দু'তৃতীয়াংশের কাজ শেষ হলো। ইতিমধ্যে মূলধন এলো ফুরিয়ে। প্রযোজক হারুণ সাহেব বললেন, আলী, যতটুকু কাজ হয়েছে, এডিট করে কোনো ডিস্ট্রিবিউটারকে দেখাই। নইলে আমাদের পকেট থেকে কামান দাগলেও আর এক আধলা বেরুবে না।

ঠিক এ ধরনের একটা পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না আলীজাহ্। আজীবন প্রতীক্ষার পর হাতের কাছে এসেও বুঝি আকাঙ্ক্ষিত ফিরে যায়। এক মিনিটের জন্য সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো হারুণ সাহেবের বাসায় সাজানো ড্রইংরুমে একটা অতিকায় পুতুলের মতো। পরে বলল, আচ্ছা, তাই হবে।

একজন অবতারের অন্তর ছিল আলীজাহ্র। যে সন্দেহ, যে ভয় সে করেছিল তাই ঘটলো। সেই দু'তৃতীয়াংশের কাজ মোটামুটিভাবে দাঁড় করিয়ে লাহোরের সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটরকে একে একে দেখানো হলো। সবাই এক রোল দেখেই দরোজা খুলে বেরিয়ে গেল। কেউ বলল— সমঝ মে নেহি আতা। কেউ বলল— বাকোয়াস, বাও। আবার কেউ বলল— ডাইরেকটর সাব কঁহি পাগল তো নেহি হ্যায়? পহলা ডকটরকে পাস যাও— ডকটর।

সবার কাছে এই একই কথার নানা রূপ শুনে হারুণ সাহেব আলীজাহ্কে গম্ভীর হয়ে বললেন, এ রকম হলে তো চলবে না। টাকা খাটিয়ে টাকাই যদি না পেলাম, তাহলে টাকাগুলো রাভি নদীর পানিতে ফেলে দেয়াই বেহতর। তাতে তবু সান্ত্বনা থাকবে, সাদকা দিয়েছি, অক্ষয় পুণ্য হবে আমার।

হাল ছেড়ে দিল না আলীজাহ্। বলল, ঠিক আছে আমি করাচি যাচ্ছি, দেখি সেখান থেকে কাউকে পাই কিনা।

হাতে তেমন টাকা নেই; তবু, করাচি গিয়েছিল সে। পুরো পনেরো দিন দরোজায় দরোজায় ঘুরছে। কিন্তু সেই একই উত্তর, একই ব্যবহার মিলেছে। লাহোরে পা দিতেই হারুণ সাহেব বললেন, আলী, এখনো হুঁশ হোক তোমার। ভেবেছ, মাথা নিচু করে বসে থাকলেই সব সমাধান হয়ে যাবে? তা তোমার জন্যে হতে পারে। কিন্তু আমরা কী তোমার নেগেটিভ থেকে নেলপলিশ বানিয়ে বাড়ি ফিরবো?

আলীজাহ বলেছে, কিন্তু ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে। এখন আপনি বা আমি কেউই ছবি ফেলে রাখতে পারি না।

নিশ্চয়ই। ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আমি বলি, তুমি একটা নাচ আর একটা ড্রিম সিকোয়েন্স দাও। শেষ সেটের সিনগুলোতে কমেডিয়ান কাউকে রাখা যায় না? তাহলে দেখবে সব ব্যাটারই ঘর থেকে সুড় সুড় করে টাকা বেরিয়ে আসছে। এটাই করো।

নিজের মাথাটা কেউ পিস্তল দিয়ে উড়িয়ে দিলেও এতটা বিমূঢ় হতো না আলীজাহ্। যে আপোষ সে করবে না বলে এতকাল ভাগ্যের হাতে মার খেয়েছে, সহ্য করেছে, সেই আপোষ কি তাকে শেষ অবধি করতে হবে? কীসের অভাব ছিল তার? ইচ্ছে করলে জনপ্রিয় নায়ক হতে পারত, বহু সংস্করণওয়ালা বইয়ের লেখক হতে পারত, সরকারের সব সেরা পদের বেতনভোগী সেবক হতে পারত, সংসার করতে পারত— বউ ছেলে, মেয়ে, বাড়ি, গাড়ি, সবই হতে পারত তার। তার সঙ্গের যারা তারা তার চেয়ে কম সুযোগ, কম মেধা নিয়েই, বিষয়ীদের চোখে, অনেক 'উন্নতি' করেছে। আর সে? এমনকি বুকের ভেতরে যন্ত্রণাকর একটা বিরাট ক্ষত, আর কেউ জানুক বা না জানুক, এই জিদ থেকেই সে সইতে পেরেছে। জরিনাকে নিয়ে গিয়েছিল যে মহিলার জন্মদিনে, সেও তো বলেছিল— আমি তোমার কথা পুরো বিশ্বাস করি, তুমি আমাকে ভালোবাসো; কিন্তু এ-কী সর্বনাশা নেশা তোমার? শিল্প করবে, কিন্তু না খেয়ে শিল্প? পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আলো-

অন্ধকারের সঙ্গে আপোষ করেই বেঁচে থাকতে হয়। সেটাকে অস্বীকার করে শুধু নিজে কষ্ট পাবে, পৃথিবীর তাতে একটুও এসে যাবে না।

আলীজাহ্‌র ভালোবাসাকেও তাই সইতে হয়েছে বিচ্ছেদ। ক্ষত হয়েছে। তা হোক। ক্ষত আমার ফুল।

না, আলীজাহ্ আপোষ করবে না।

হারুণ সাহেবের কাছ থেকে ফিরে এসে, সেদিন নিজের ঘরের টেবিলে মাথা রেখে, জীবনে এই প্রথম আলীজাহ্ কেঁদেছে।

পরপর চারদিন সে বোঝালো হারুণ সাহবেকে। কিন্তু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে তারো গোঁ। বলেছেন, যা বলছি তাই করো। পাগলামি কোরো না। জানো কিছু — লোকমান সাহেব একলাখ টাকা নিয়ে তৈরি, শুধু দু'তিনটে সিন ঢোকানোর যা ওয়াস্তা। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো, আলী। তোমার জন্যে আমরা ভুখা মরব কেন ?

পৃথিবী জুড়ে শিল্পীর জন্য এই একই জবাব। কোনো বদল নেই, কোনো নতুনত্ব নেই। সেই একই অভিযোগ— তোমার জন্য আমি কেন মরবো ?

অসম্ভব, আমি পারবো না।

তাহলে কী আমাকে অন্য পরিচালক ডেকে বই শেষ করাতে হবে ?

হারুণ সাহেবের কণ্ঠ ছিল শীতল, নিষ্ঠুর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আলীজাহ্ ঘুরে তাকায়নি তার দিকে তখন— মঞ্চে যা সে হয়ত নিজেই নির্দেশ দিত করবার জন্য, যদি এই ঘটনাটা দেখানো হতো মঞ্চে। সেই মহিলার মুখ অস্পষ্ট দেখা যায় যেন স্মৃতির পটভূমিতে। কিন্তু ভালোবাসতে বাসতে চলে আসা যায়, সৃষ্টি করতে করতে সরে যাওয়া যায় না— অন্তত আলীজাহ্ তা পারবে না।

তার আগে আমি আমার নেগেটিভ জ্বালিয়ে দেব। হবে না, আমার ছবি হবে না, আমি ছবি করবো না।

বিলাপের মতো শুনিয়েছে আলীজাহ্‌র কণ্ঠ। বিলাপটা মাথার ভেতরে, বুকের ভেতরে, কয়েকদিন ঝড়ের মতো মাথা কুটে মরেছে তারপর।

পড়ে থাক ছবি, ডুবে যাক তার প্রতিভা, করুন হারুণ সাহেব তাঁর ছবি শেষ, আলীজাহ্ মরে গেছে। মরে গেছে নিজের কাছে, পৃথিবীর কাছেও।

এতদিন ছবি করিনি, তার ছিল জ্বালা। কিন্তু ছবি করতে করতে ফিরে আসা, নিজের সৃষ্টিকে কলঙ্কিত হবার জন্য তুলে দিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া এবং কিছুই করতে না পারা— এ যন্ত্রণা মৃত্যুর, এর প্রাপ্তি অন্ধকার।

ছবি করতে করতে ছবির সঙ্গে তার হৃদস্পন্দন একতারে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। আজ তাই আর মমতা নেই নিজের ওপর। যত নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে সব এখন ডেকে আনা চলে নিজেকে চূড়ান্ত রকমে পীড়িত করবার জন্য; নিজের জন্য যে কোনো অবহেলা যে কোনো ক্ষতি।

শাহ সাদেক আলী বই পড়ছিলেন। বই রেখে বললেন, এসো, এসো

আলীজাহ্ তাঁর সম্মুখে বসলো। তখন সাদেক রোকসানাকে বললেন, ওকে কিছু খেতে টেতে দাও। এখানেই দাও। তারপর আলীজাহ্‌র দিকে তাকিয়ে, জরিনা সেই বিকেলে বেরিয়েছে। বলেছিলাম ওকে। যায়নি বুঝি এয়ারপোর্ট ? তা তোমাকে এত ক্লান্ত দেখছি কেন, আলী ?

শরীরটা বিশেষ ভালো নেই।

উদ্বিগ্ন হলেন সাদেক।

ডাক্তার করিয়েছো ?

এমন কিছু নয়।

সাদেক বইয়ের পৃষ্ঠায় আবার কিছুক্ষণের জন্য মন দিলেন। কিন্তু চোখ থাকলেও মনটা সেখানে রইলো না। মন রইলো আলীজাহ্‌র দিকে – তাঁরই সহোদরের দিকে, বাবার মৃত্যুর পর যাকে তিনি সন্তানের মতো মানুষ করেছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন, বাহু দিয়েছেন। শাহ সাদেক আলী কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না— জরিনার মা সেটা বুঝতো — তাই হাজারো কষ্ট দিয়ে হাজারো জ্বালাতন করেও নিশ্চিন্ত নির্ভর থাকা যেত, যে, মানুষটা তাকে ভুল বুঝছে না। আর রোকসানা ? রোকসানা কোনদিন মুখ ফুটে কিছু না বললেও সাদেক ইন্দ্রিয়বুদ্ধি দিয়ে প্রথম দিনেই জেনে গেছেন, এ হচ্ছে আলাদা জাতের মানুষ। এদের জন্য মমতাব প্রকাশ না হলে ক্ষুণ্ন হয়, অসহায় বোধ করে। তাই সাদেক যথাসম্ভব মাঝে মাঝে রোকসানাকে এ ক্ষুণ্নতা থেকে, এ অসহায়ত্ব থেকে, নিজের মেজাজ অনুযায়ী মুক্তি দিতে চেয়েছেন। নতুন বাড়িটাও ঠিক এমনি একটা প্রকাশ। জরিনার মা হলে দরকারই পড়ত না হয়ত, কিংবা হয়ত সে নিজেই বাধা দিত। বলত— এত খরচ করে এটা না বানিয়ে, ছোটমোট একটা বাড়ি কর, তাতেই চলে যাবে। কিন্তু রোকসানা সেটা বুঝতো না। রোকসানাকে কিছুটা প্রীত করবার জন্য— তার জন্য তো সাদেক কিছুই করেননি— হাতের সবকটা টাকা ঢেলে বাড়িটা বানিয়েছেন তিনি। কতটা কষ্ট হয়েছে তাঁর, সে কথা অনুক্তই রেখেছেন রোকসানার কাছে। আর এই যে তাঁর সম্মুখে বসে থাকা আলীজাহ্ সে ? সেও ঠিক জরিনার মায়ের দলের মানুষ যেন। তার জন্য নিজের গভীর মমতা বোঝাবার মতো চোখে দেখা যায় এমন কিছুই করতে হয় না। ইচ্ছে করলে তো তিনি মন্ত্রী থাকাকালে আলীজাহ্‌র জন্য অনেক কিছু করতে পারতেন— শুধু ব্যবসায়ী, লাখপতি, কোটিপতি কাউকে বলে দিলেই হতো। কিন্তু সেটা হতো তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আদর্শের মুখে কলঙ্ক মাখিয়ে— আলীজাহ এটা বুঝতে পারতো। তাই বছরের পর বছর কষ্ট করেছে, আর্থিক অনটনে নিরন্তর বিব্রত হয়েছে, কিন্তু ক্ষুণ্ন হয়নি সাদেকের ওপর। নিজের বিবেক এবং কর্মকে কলুষিত না করতে পারার মহত্বটুকু আলীজাহ্ মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু আলীজাহ্ তো এ রকম হবেই – শাহ সাদেক আলী মনে মনে এখন ভাবলেন— কারণ ও আমার ভাই। নিজের রক্তের ভেতরে আলীজাহ্‌র জন্য নতুন করে তীব্র একটা টান,একটা জোয়ার অনুভব করলেন শাহ সাদেক আলী।

রোকসানা তসতরিতে কিছু ফল কেটে আর নেবুর শরবৎ নিয়ে ফিরে এলো। এসে আলীজাহ্‌র সম্মুখে টিপয় টেনে সাজিয়ে রাখলো : বলল, খান।

ভাই ?

সাদেক বইয়ের ওপর চোখ রেখেই বললেন, তুমি খাও।

আলীজাহ্ খেতে শুরু করলে তিনি বই নাবিয়ে একজোড়া পূর্ণ চোখ স্থাপন করে তার খাওয়া দেখলেন। ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, তোমার সব খবর ভালো তো, আলী ?

উত্তরে আলীজাহ্ মাথায় ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কী বোঝাইতে চাইলো তা অস্পষ্টই রয়ে গেল। তাতে কিছুটা বিরক্তি বোধ করলেন শাহ সাদেক আলী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এত তাকে অপরের একেকটা এমনি অস্পষ্ট ভঙ্গি থেকে অর্থ উদ্ধার করতে হয়েছে যে পারিবারিক ক্ষেত্রে সেটা তিনি করতে রাজি নন। সেই বিরক্তিটা দমন করতে একটু সময় লাগলো। অবশেষে বললেন, মনে হচ্ছে শারীরিক কুশল। ঢাকায় কি কিছু কাজ ছিল ?

না।

তাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে ?— শাহ সাদেক আলী চোখ তীক্ষ্ণ করে তার মুখ দেখে কারণটা অনুমান করতে লাগলেন। পরিবারের জন্য মায়া আছে তার, কিন্তু আলীজাহ্ কখনো সে জাতের মানুষ নয় যে কাজ ফেলে সেই মায়ার টানে ছুটে আসবে। অনেকটা ঠিক তাঁর নিজের মতো। এছাড়া, জরিনার এয়ারপোর্টে না যাওয়াটাই নিয়মের ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে তাঁর। তিনি তো বিকেল বেলায় নিজে বলেছিলেন জরিনাকে, তাকে বেরিয়ে যেতেও দেখেছেন তিনি, তবু সে গেল না কেন ? তাহলে কি জরিনার সঙ্গে আলীজাহ্‌র এই হঠাৎ করে চলে আসার একটা অনুক্ত সম্পর্ক রয়েছে ? কেমন যেন ওলোটপালোট মনে হয় তাঁর। মনে মনে এই সবের আলোড়ন চলতে থাকে।

কিন্তু বাইরে তা বুঝতে না দেওয়ার জন্য কথা বলতে লাগলেন, বাড়িটা হয়ে গেছে শুনেছ বোধ হয় ? ভালোই হলো তুমি এসেছ। তোমার ভাবী বলছিলেন, নতুন বাড়িতে যাবার আগে তোমাকে একবার আনাতে।

রোকসানা বসে ছিল পাশেই । মাথার ওপরে ঘোমটার ঘের টেনে দিতে দিতে সে তখন যোগ করল, একটা ছোট খাটো কিছু করব ঐদিন।

বলেই সে উৎসুক চোখে সস্মিত মুখে তাকাল আলীজাহ্‌র দিকে। কিন্তু আলীজাহ্ তার জন্য কিছু বলতে পারার আগেই সাদেক প্রশ্ন করলেন, তোমার ছবি কি শেষ হয়ে গেল ?

তখন ঋজু হয়ে বসলো আলীজাহ্। নিঃশেষে চুমুক দিয়ে শরবতের গ্লাশটা নাবিয়ে রাখল টিপয়ে। বলল, না। আমি করছি না। আমি আর ছবি করবো না।

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাউকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে, পেছনে পাথরের মতো দু'টো স্তব্ধ মুখ রেখে, বারান্দায়।

আলীজাহ্‌র এ অসৌজন্যতা একেবারেই আকস্মিক।

তখন থমথম করতে লাগল সারাটা বাড়ি। শাহ সাদেক আলীর মন ভীষণ রকমে বিক্ষিপ্ত, বিস্মিত হয়ে রইলো। রোকসানা না বসতে পারলো তাঁর কাছে, না যেতে পারল আলীজাহ্‌র কাছে। তার মনে হলো, এক মুহূর্তে দু'ভাই তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। দু'ভাইয়ের ভেতর এমন একটা ভাবের বিনিময় হয়ে গেছে, যেখানে সে নিতান্তই বাইরের। তার ভয় করতে লাগল। শোবার ঘরে এসে তখন চুপচাপ বসে রইলো রোকসানা।

শাহ সাদেক আলী স্থাণু হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। অনেক ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি, কিন্তু কোনদিন এতটা দোলা লাগেনি তাঁর আত্মায়। সারাটা জীবনে যে রকমটি দেখা যায়নি তাঁকে, আজ তাই প্রত্যক্ষ করা গেল। বিব্রত হয়ে, বিচলিত হয়ে, স্পষ্ট রকমে নিজের ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করে তিনি আলীজাহ্‌র কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বারান্দার অস্পষ্ট আলোতে দাঁড়িয়ে আছে আলীজাহ্। তার ঈষৎ আনত মুখ, টান টান মেরুদণ্ড আর রেলিংয়ে প্রসারিত দুই বাহু— সব মিলিয়ে একটা অচেনার আভাস সৃষ্টি হয়েছে। মনের চঞ্চলতাকে দমন করে শাহ সাদেক আলী কণ্ঠে আওয়াজ তুললেন, আলী আমার সঙ্গে এসো।

ঘরের ভেতরে আবার দু'জনে মুখোমুখি বসলো। আলীজাহ্‌র চোখের ভেতরে বহুক্ষণ দৃষ্টি রেখে সাদেক যেন সম্মোহিত করলেন তাকে। বললেন, ওভাবে উঠে যাওয়াটা আমি পছন্দ করিনি।

তখন ছবি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সবটুকু ইতিহাস সবিস্তারে শুনলেন সাদেক; শুধোলেন, 'তা এখন কী করবে ঠিক করেছ?

কিছুই না।

এটা হলো অভিমান। সমস্যার সমাধান তো হলো না।

চাইনে আমি।

তাহলে এত লড়াই করলে, সব কি মিথ্যে ছিল?

উত্তরে সাদেকের দিকে বড় সরাসরি তাকাল আলীজাহ্। এমন করে কোনদিন তাকে তাকাতে দেখেননি তিনি। আলীজাহ্ বলল, অল কোশ্চেন আর ডেড টু মি নাও।

বাংলায় বলো, তিরস্কার করলেন শাহ সাদেক আলী। রূঢ় শোনাল হয়ত কিন্তু ওকে সাহস দিতে হবে আমার, বন্ধুর পথে চলার দীক্ষা দিতে হবে— মনে মনে বললেন তিনি। তারপর কণ্ঠে যতটুকু সম্ভব মমতা মাখিয়ে বললেন, লক্ষ্য থেকে যারা সরে যায় তাদের আমি ঘৃণা করি। লড়াই করতে যারা ভয় পায়, হাত পা গুটিয়ে আনে, তাদের মরে যেতে বলি। একটা দেশের কথা ধরো, একটা জাতির কথা ধরো, একটা মানুষের কথা ধরো— সবার জন্যে যে জীবন দিয়েছেন আল্লাহ, তার মূল্য কি তোমার ভয়, তোমার অভিশাপ দিয়ে মাপা হবে? জীবন একটা মহৎ শক্তির নাম। জীবনের সার্থকতা সংগ্রামে। যে মুহূর্তে তুমি সংগ্রাম থেকে হটে গেলে সে মুহূর্তে জীবন থেকেও বঞ্চিত হলে তুমি।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলেন সাদেক। চেয়ারের হাতলে বাঘের থাবার মতো পাঁচটা আঙুল দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আলীজাহ্ প্রায় চিৎকার করে উঠলো, জানি। আমি জানি।

কী! কী জানো তুমি?

ফাঁপা ফাঁপা এইসব কথার কী মূল্য?

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সাদেক। এই কি সেই আলীজাহ্ যাকে তিনি অমিত স্নেহে মানুষ করে তুলেছেন? এই চিৎকার করা, ক্ষুদ্রাত্মা, অজ্ঞান মানুষটা?

আলীজাহ্‌কে তখন যেন ভূতে পেয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলতে লাগল, কানাকড়ি দাম দেব

না আমি আপনার কথার। আপনি নিজে কী করেছেন ? কোথায় গেল আপনার সংগ্রাম ? আপনার লক্ষ্যের জন্য নিষ্ঠা ? নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বলুন আপনি নিজেকে এই কথাগুলো। কেন হাত গুটিয়ে বসে আছেন ? মন্ত্রিত্ব যাবার পর, ইলেকশানে আপনাদের সেই জাতীয় পার্টি হেরে যাবার পর, দিস্তে দিস্তে অসার বিবৃতির বকুনি ছাড়া আর কী করেছেন আপনি ? কোথায় আপনার আদর্শ ? দেশের মানুষ আজ নীলামে যেতে বসেছে, আপনার সাধের পাকিস্তান তার রাজস্ব দিয়ে কতগুলো লোলুপ মানুষের বাড়ি গাড়ি ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স জোগাচ্ছে, মন্ত্রিত্ব মানে আজ টাকা বানাবার গদি হয়েছে— আর আপনি ড্রইংরুমে বসে দুঃখ করছেন। অতিথিদের সঙ্গে আজ দুঃখ করা পর্যন্তই আপনার সংগ্রামের দৌড়। কেন আমাকে বলছেন এই কথাগুলো যা আপনার কাছেই মিথ্যে ?

আলীজাহ্‌র কণ্ঠ কখন উঁচু পর্দায় গিয়ে পৌঁছেছে তা সে জানে না। রোকসানা ছুটে এলো এ ঘরে।

কী হয়েছে ? কী হলো ?

কিছু না।

আলীজাহ্ চুপ করলো। চুপ করে বিসদৃশ রকমে দাঁড়িয়ে রইলো। হাতটা তখনো তার শূন্যে ঝুলছে, যা সে একটু আগেই তুলেছিল শাহ্ সাদেক আলীর দিকে।

রোকসানা তার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরাল সাদেকের দিকে। সাদেক তখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আলীজাহ্‌র দিকে। রোকসানার উপস্থিতি যেন তিনি অনুভবই করতে পারছেন না।

অনুতাপ হলো আলীজাহ্‌র। সংম্বিৎ ফিরে পেলো সে। অনির্দিষ্ট চোখে একবার সাদেকের দিকে তাকাল। কিছু একটা বলতে চাইলো কিন্তু পারল না। বদলে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো। এত আস্তে যেন তার সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

খাবার টেবিলে এলো না আলীজাহ্। তার ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিল রোকসানা, সেটাও পড়ে রইলো।

জরিনা এলো রাত এগারোটা তখন। জরিনাকে ফটক পেরিয়ে আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আসতে দেখে আলীজাহ্ প্রসন্ন হয়ে উঠলো মনে মনে। এতক্ষণে যেন সে অনুভব করতে পারল, সত্যি সত্যি সে ঢাকা এসেছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে আলীজাহ্ জরিনার কাঁধে হাত রাখল, বলল, টমবয় হয়েছিস, না ? এত রাত করে আড্ডা মারতে শিখেছিস।

জরিনা কিছু বলল না। চোখ মাটির দিকে রেখে মাথা নাড়লো, যেন স্প্রিং দেয়া পুতুল। আলীজাহ্ শুধালো, ঘুম পাচ্ছে ?

হুঁ।

চল তোর ঘরে। এয়ারপোর্টে যাসনি যে আজ ?

জরিনার ঘরের দিকে যেতে যেতে পরিহাস কণ্ঠে আলীজাহ্ উচ্চারণ করল। ঘণ্টা কয়েক আগে যে সে বিশ্রী একটা দৃশ্য করেছে, তার লেশমাত্র এখন তার ভেতরে খুঁজে পাওয়া যাবে

না।

ঘরে এসে বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়ল জরিনা। তারপর হেসে ফেলল। সুন্দর, বিলম্বিত হাসি।

এলে তুমি আলীচাচা। আমি মনে করলাম, তুমি বুঝি আসবেই না।

ঠাট্টা করেছি তাহলে টেলিগ্রাম করে ?

হুঁ— উ। নইলে আমার মনে হলো কেন আসবে না ?

আলীজাহ্‌ও হেসে ফেলল তার কথা বলবার ধরন দেখে। আদুরে একটা ছোট্ট মেয়ের মতো পা দোলাতে দোলাতে গলায় টান তুলে কথা বলা জরিনাকে তার ভীষণ ভালো লাগল।

ছিলি কোথায় ?

কোথায় ছিলাম ? এক, বিকেলে নতুন বাড়িতে। খুব বিষ্টি হয়েছিল। তারপর। গিয়ে দেখি সোলেমান সাহেব মেঝেয় পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। কাজে ফাঁকি— বুঝলে ?

কে ?

নতুন বাড়ি সাজানোর জন্যে যে ভদ্রলোক। মজার কাজ।

ও-হো। তারপর ?

খু-ব বকুনি দিলাম। ফ্যালফ্যাল করে তখন, জানো, আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন আমাকে চিনতেই পারছে না।

ফাজলামো রাখ।

বেশ।

গম্ভীর হয়ে গেল জরিনা। তারপর আবার সেই হাসিতে ভেঙ্গে পড়া।

তারপর সেখান থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে বই পড়লাম। খুব শক্ত বই। কী যেন নাম ?

বাজে কথা।

সত্যি। তারপর বেরিয়ে— কী করলাম। বেরিয়ে কী করলাম যেন ?

জরিনা মাথা কাত করে তেরচা চোখে ভাবতে চেষ্টা করল। এ ভঙ্গিটা আলীজাহ্‌র খুব চেনা। ভঙ্গিটি যেন আরো আপনতার একটা নির্ঝর সৃষ্টি করলো তার ভেতরে।

হ্যাঁ, সিনেমা দেখতে গেলাম। দেখতে দেখতে মনে হলো আজ না তুমি আসছো, এতক্ষণ এসে গেছ ?

আলীজাহ্ হঠাৎ তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তুই ড্রিংক করেছিস ?

না, না।

রিনু।

আলীজাহ্ অবাক চোখে তাকাল জরিনার দিকে। কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে কপালে রেখে শুধালো, কতটা খেয়েছিস ?

অল্প একটু।

ছি, ছি। কেন খেয়েছিস ? রোজ খাস।

না।

কে শেখালো?

কেউ না।

তবে?

শুধু আজ। এই একটু। এক্সপেরিমেন্ট করলাম। লোকে বলে না ড্রিংক করলে দুঃখ থাকে না? তোমাদের শরৎবাবু একটা মিথ্যুক। নইলে আমার আরো কান্না পেল কেন?

আলীজাহ্ তাকে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু শোবে না জরিনা।

ইস এত বিশ্রী লাগছে আমার। আমাকে এক্ষুণি সারিয়ে দিতে পারো না? আমি এখন চিৎকার করব কিন্তু।

চুপ, চুপ।

তখন আলীজাহ্ ওকে বাথরুমে নিয়ে মাথায় পানি ঢেলে দিল অনেকক্ষণ ধরে। বলল, গা ছুঁয়ে বল, আর কখনো খাবিনে। তুই যে একটা কী হয়েছিস?

বকছ কেন?

মাথায় পানি ঢালবার পর কিছুটা ভালো লাগে জরিনার। নিজেই তখন তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে থাকে। আর আলীজাহ্ তাকে নতুন করে নতুন চোখে দেখে। নিজের সঙ্গে একটা অলক্ষিতের মিল খুঁজে পায় যেন। মনে হয়, তারই একটা অংশ কোন জন্মান্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, আজ আবার ফিরে এসেছে।

কী আশ্চর্য, জরিনারও তখন এই কথাটা মনে হচ্ছিল। আলীজাহ্‌র এই মাণিকের মতো চোখের তারা দু'টো মাঝে মাঝে কোন এক অজানা দীপ্তির স্পর্শে এমনি বিচ্ছুরিত হয়— মনে পড়ে তার। শিথিল— নদীর একটা ঠাণ্ডা স্রোতের মতো শিথিলতা ছড়িয়ে পড়ল তখন জরিনার শরীরে। মনে মনে উচ্চারণ করল— আলীচাচা।

ব্যক্তিগত, শুভ্র, দীপ্ত একটা শিখার মতো আলীজাহ্‌কে মনে হয় তার। তীব্র একটা টান জেগে ওঠে বুকের ভেতরে। কোন এক অজ্ঞাত অপরাধের কারণে একই আত্মাকে আল্লাহ্ দুটো শরীরে বন্দি করে রাখলেন?— ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত একাগ্রতার ভেতরে ডুবে গেল জরিনা।

আলীজাহ্ জরিনাকে বলল, কাছে আয়। বোস।

জরিনা বসলো। বলল, সামান্য একটু খেয়েছি তাই এত মাশুল দিতে হচ্ছে।

খাসনে— কখনো খাসনে। আজ আমাকে খুব চমকে দিয়েছিস তুই। আমি না এলে কী হতো বলত?

কী হতো আর? বাবা বিশ্বাস করতেন না। আর বাবার স্ত্রী উঠে পড়ে লাগতেন তাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে।

দূর পাগলি।

জরিনা ঝুঁকে পড়ল আলীজাহ্‌র দিকে। বলল, বেঁচে থাকতে হলে, ঘৃণার সঙ্গে আপোস করতে হয়, আলীচাচা?

কেন করবি ? তুই করতে পারবি না।

করতে পারলাম না। কিন্তু দুঃখ হয় যে ?

হোক। তাই বুঝি মদ গিলতে গিছলি ?

জরিনা হেসে ফেলে। বলে, ভুলতে পারছ না। খুব শাসন করতে ইচ্ছে করছে আমাকে ? করো আলীচাচা। আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি।

তোর আজ মতিভ্রম হয়েছে। আজ তুই আবার কথা বললে মার দেব।

কিছুক্ষণ চুপ করে বইলো দু'জনেই। পরে আলীজাহ্ প্রায় ফিসফিস করে শুধালো, মাসুদ লেখে না ?

ইতরটার কথা মনে করিয়ে দিও না তো।

কেন ?

গভীর দু'চোখে জরিনার মুখের দিকে তাকাল আলীজাহ্। আস্তে আস্তে শুধোল, তুই ঠিক বুঝতে পেরেছিস ?

হ্যাঁ।

জানতাম। তুই একা থাকবার ভাগ্য নিয়ে এসেছিস।

জরিনা চোখ বুজে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল আলীজাহ্কে। কত সহজে আলীজাহ্ বুঝতে পাবলো। প্রয়োজন হলো না কোনো ব্যাখ্যার, কোনো বর্ণনার।

ঘুম পাচ্ছে তোর ?

হা। চোখ মেলল জরিনা। ভাবছিলাম।

না, ঘুমো তুই।

উঠে দাঁড়াল আলীজাহ্। জরিনা বলল, শুনবে না আলীচাচা কী ভাবছিলাম ?

বল।

ভাবছিলাম, কাউকে আমার দরকার নেই। যদি কাউকে দিতে হয় নিজেকে তো এমন একজনকে দেব, যে ভালোবাসার কিস্‌সু বোঝে না, জানে না।

হাসলো আলীজাহ্। বলল, মানে, যে ভদ্রলোক তরকারিতে পরিমাণ মতো নুন পেলেই খুশি হবে ?

হ্যাঁ। রসিকতাটুকু জরিনার ভেতেরই সংক্রামিত হয়ে গেল যেন। হাসতে হাসতে সে যোগ করল, আর তা না পেলে যে আমার চুলের মুঠো ধরে নাজেহাল করবে। তাতে অনেক সুবিধে। তাতে মনটা থাকবে আমার— আমার মতো যারা তাদের জন্যে।

আলীজাহ্ চুপ করে ভাবলো খানিক। একটু আগে যে হালকা হাসির রেখা মুখে ছিল তা বিলীন হয়ে গেল। জরিনার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি সব। মানুষ আসলে স্বর্গের মতো হতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই কিছুদূর যাবার পর বড় বিশ্রী পতন ঘটে। তা নিয়ে দুঃখ করবি কেন ?

আর করি না। এখন ভালো হয়ে গেছি। কাউকে লাগবে না আমার। বলতে বলতে আলীজাহ্কে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ কেঁদে ওঠে জরিনা। সে-কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

আলীজাহ্ তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মুখটাকে দু'হাতের ভেতরে নিয়ে কপালে ঠোঁটের স্পর্শ চন্দনের মতো প্রলেপ করে দেয়। বলে, লক্ষ্মী সোনা কী হলো তোর? পারবি, তুই পারবি, কেন পারবি না ? শোন— শোন— দ্যাখ।

আলীজাহ্ তাকে অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকে। নিজের জন্যও যেন সান্ত্বনা মিলছে তার এমনি করে। দু'জনের ভেতরে কখন কী ভাবে একটা সুন্দর সেতু গড়ে ওঠে। জরিনার তখন পরম নিশ্চিন্ত নিরাকুল ঘুম পায়। আলীজাহ্ তখন তাকে বিছানায় শুইয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে চলে যায়।

ঘুম আসে না শাহ সাদেক আলীর।

পাশে রোকসানা শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার মুখখানার দিকে তাকিয়ে আজ আবার জরিনার মায়ের কথা মনে পড়ে তাঁর। কেমন ছিল দেখতে ? চোখ বুঁজে সাদেক ভাবতে চেষ্টা করেন। নাহ্, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে আসছে। কিছুতেই স্পষ্ট করে মনে পড়ে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলি এপাশ ওপাশ করতে থাকেন তিনি। নাহ, তবু কিছু না। শুধু বেদনার মতো একটা অনুভব। তিনি আজ বড় অভাববোধ করলেন জরিনার মার।

রোকসানা চোখ মেলে সাদেকের কপালে হাত রাখে। ঘুম জড়ানো গলায় শুধোয়, ঘুমোননি ?

তুমি ঘুমোও।

রোকসানা তখন আধো উঠে বসে।

আহ উঠলে কেন ?

রোকসানা তবু শুয়ে পড়ে না। তখন সাদেক চাপা কণ্ঠে তিরস্কার করেন, কী হলো তোমার ?

কিন্তু পরক্ষণেই মমতা ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে। রোকসানার বাহু আকর্ষণ করে শুইয়ে দেন। বলেন, এমনিতে ঘুম ভেঙে গেছে হঠাৎ। তুমি ঘুমোও।

তাঁর কণ্ঠের কোমলতা রোকসানাকে আবার ঘুমের ভেতর নিয়ে যায়। আবার সেই ভাবনাগুলো ফিরে ফিরে আসতে থাকে নিশাচর প্রাণীর মতো পায়ে পায়ে, নিঃশব্দে, তাঁর চারদিকে।

আলীজাহ্ ঠিকই বলেছে, কোথায় গেল আমার সংগ্রাম ? অতিথিদের সঙ্গে দুঃখ করা আর বিবৃতি লেখা পর্যন্তই আজ আমার সংগ্রামের দৌড়।

ধিক্কারে ভরে ওঠে মন। ক্ষমা নেই।

আমার ক্ষমা নেই। যে সাহস আমার নিজেরই নেই সে সাহস আমি আরেকজনকে দেব কী করে ? লক্ষ্য থেকে আমি নিজেই দূরে, আমি লক্ষ্যের দিকে আলীকে ফেরাবো কী করে ?

রসুলুল্লাহর সেই কথাটা মনে পড়ল শাহ সাদেক আলীর। নিজে যা অনুসরণ করো না, করতে পারো না— অন্যকে তা অনুসরণ করতে বোলো না।

মনে মনে দরুদ পড়লেন তিনি।

আজ সারা দুপুর ধরে খাদ্য সমস্যার ওপর দীর্ঘ একটা বিবৃতি লিখেছেন। লিখেছেন, কেটেছেন, বাক্যকে আরো শাণিত করে তুলেছেন একেকটা সংশোধনের ভেতর দিয়ে। কই, তখন তো তাঁর মনে হয়নি অসার, অন্তঃসারশূন্য, শক্তিহীন কতগুলো চমক লাগানো কথা তিনি সাজিয়ে যাচ্ছেন ?

আলীজাহ্‌র ঔদ্ধত্যকে আর ঔদ্ধত্য বলে ভাবতে পারছেন না তিনি। ভয় করছেন তার বদলে।

শেষ প্রশ্নের কী জবাব দেব আমি ?

নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সাদেক। বসলেন চেয়ারে। টেবিলের ওপর পানি রাখা ছিল। পানি দেখে তৃষ্ণা পেল তাঁর। হাত বাড়িয়ে শিশুর মতো অনেকখানি পানি খেলেন।

যখন আমি প্রথম রাজনীতিতে নামলাম, তখন আমার পাওনার হিসেব ছিল না— মন্ত্রিত্বের স্বপ্ন ছিল না— প্রয়োজন ছিল না কোনো ক্ষমতার - আজ যার একটাও নেই বলে আমি মনে করছি কাজ করব কী করে ?

কেন, যে করে আমার যৌবন থেকে কাজ করে এসেছি। তখন কোনো কিছুর আশা না করেই কাজ করেছি। আজ দেশে সামরিক শাসন চলছে, মানুষের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, আজো আমার জন্য কাজ করবার আছে। আমার পার্টি ক্ষমতায় নেই বলে কি আমার সব শক্তিও চলে গেছে ?

শাহ সাদেক আলী আত্মার ভেতরে ডাক শুনতে পেলেন—এসো, বেরিয়ে এসো। শাহ সাদেক আলী টেবিলের ওপরে ফাইলের ভেতর থেকে বিবৃতিটা বের করে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললেন।

আবার আমি শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে, মানুষকে দীক্ষা দেব— ঐশ্বর্যে ভরে ওঠার দীক্ষা, সাহসের শিক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সঙ্কল্প।

রক্তের ভেতরে তারুণ্যের জোয়ার ওঠে তাঁর।

আলীজাহ্‌কে তখন আরো আপন মনে হয়। হঠাৎ বুকের ভেতরে মোচড় ওঠে তাঁর।

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না। একবার ঘুমন্ত রোকসানার দিকে তাকিয়ে দেখেন। কাল— হ্যাঁ, কালই তিনি নতুন বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন। টাকা নিয়ে কালই আলীজাহ্‌কে লাহোর যেতে হবে।

ফজরের নামাজ আদায় করে শাহ্ সাদেক আলী আলীজাহ্‌র কামরার কাছে এলেন। দেখা পেলেন না। এত ভোরে ও উঠেছে দেখে আশ্চর্য হলেন তিনি।

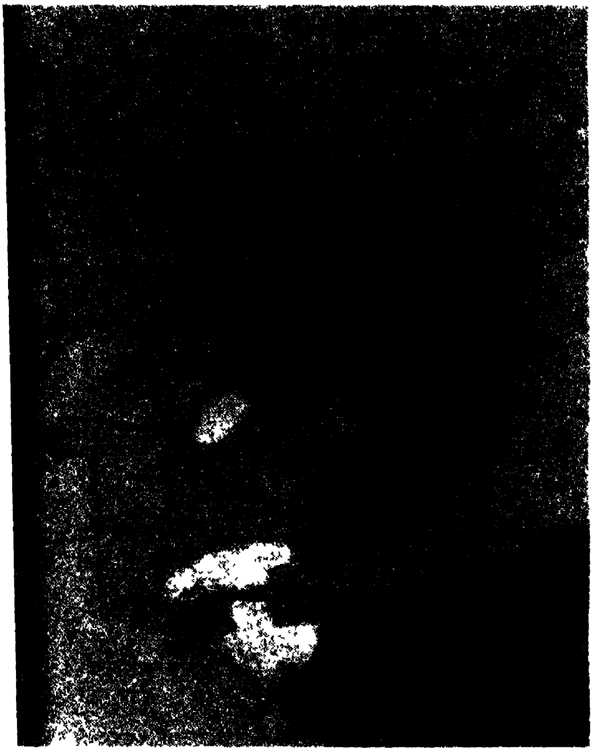
তারপর এদিকের বারান্দা ঘুরে আসতেই চোখে পড়ল— এই ভোর সকালেই আলীজাহ্ আর জরিনা ব্যাডমিন্টন খেলছে মাঠে। অস্পষ্ট আলোর ভেতরে একটা শাদা পাখির মতো কর্কটা উড়ছে, তাড়া খেয়ে ফিরে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। আর ভোরের দিকে সূর্য উঠে আসছে তার রক্তিম রাজকীয়তা নিয়ে। চারদিকের সবকিছু সেই আভায় বহ্নি হয়ে উঠেছে যেন—যে বহ্নির মতো এখনি সব আরো ঊর্ধ্বে উঠে যাবে— এই গাছগুলো, ফটক, বাড়ি,

ল্যাম্পোস্ট সবকিছু। আর ওরা দু'জন হাসছে নির্ঝরের মতো। লাফিয়ে উঠছে মাটি ছেড়ে সেই রহস্যময় পাখিটাকে তাড়া করবার জন্য। যেন ওরাও আরো একটু পরে পাখনা মেলে উড়তে থাকবে।

স্বপ্নের মতো চেনা অথচ অচেনা এই ছবিটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন শাহ সাদেক আলী।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

রচনাকাল : ১৯৬১



রক্তগোলাপ

বছরের এ সময়ে বৃষ্টি হয় কেউ কখনো শোনেনি। এ হচ্ছে এমন একটা সময়, যখন আকাশটা প্রজাপতির পাখার মতো ফিনফিন করতে থাকে রোদ্দুরে, নীল রঙে; যখন উত্তর থেকে নতুন প্রেমের মতো গা-শির-শির-করা মিষ্টি বাতাস বয় কী বয় না তা বোঝাও যায় না; যখন লোকেরা খুব স্ফুর্তির মেজাজে থাকে আর বলাবলি করে— সংসারে বেঁচে থাকাটা কিছু মন্দ নয়; আর ছেলেমেয়েরা কাচের জিনিসপত্তর ভাঙলেও যখন মায়েরা কিছু বলে না; যখন হাট বসতে থাকে বিকেলের অনেক আগে থেকেই আর ভাঙতে ভাঙতে অনেক রাত্তির হয়ে যায়, কারণ বছরের এ রকম সময়ে অনেক রাত্তিরেও মানুষ একা হয়ে যায় না, ভয় করে না, নদীর খেয়া বন্ধ হয় না। এ রকম দিনে বৃষ্টি হয় বলে কেউ কখনো শোনেনি।

কিন্তু আজ কোথা থেকে একখণ্ড কালো মেঘ এসে জমেছিল, ট্রেজারির পেটা ঘড়িতে চারটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাতাস দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার ওপর সবে আধখানা হাট বসেছিল, সবে গিন্নীরা পয়সা বার করে দিচ্ছিল কর্তাদের হাতে, সবে তেলেভাজাওলা তার উনুন জ্বালিয়েছিল, এমন সময় বৃষ্টি। সে বৃষ্টিতে দু'হাত দূরেও কিছু আর দেখা গেল না। কেউ আর বাইরে রইল না। ডাকাত পড়ার মতো একটা শোরগোল পড়ে গেল; যে যেমন পারল রাস্তার দু'পাশে জুতো কাপড় ট্রাঙ্কের দোকানের বারান্দায় ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়াল। এমনকি মসজিদের ভেতরটাও লোকে আর তাদের কাপড় থেকে চুঁইয়ে পড়া পানিতে গমগম সপসপ করতে লাগল; মন খারাপ করে নিমিলিত নেত্রে বসে রইলেন ইমাম সাহেব; আলু পটল কুমড়োর বড় বড় ঝাঁকাগুলো পথের ওপরেই ভিজতে লাগল। একটা খেয়া এপারে এসেছিল বৃষ্টি মাথায় করে কিন্তু আর ফিরে যেতে পারল না। ক্যাশবাক্স গামছা দিয়ে ঢেকে ভিজতে লাগল ঘাটিয়াল। যাকে তাকে খামোকা গালাগাল দিতে লাগল সে। ওপারে ধু ধু পাড়ের ওপর কয়েকজন হাটুরে হতভম্ভ হয়ে কোথায় পালাবে বুঝতে না পেরে যে যেদিকে পারল দৌড়ুল।

সে বৃষ্টি আর থামল না।

এক সময় বাতাসের এক প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল টাউন হলের মাথা থেকে কাঠের ফ্রেমে চটের ওপর সাঁটা বিরাট প্ল্যাকার্ডখানা। তাতে লেখা ছিল—

হৈহৈ কাণ্ড, রৈরৈ ব্যাপার, সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। আর্টিস্টকুলের যুবরাজ মায়াশক্তিসম্পন্ন প্রফেসর নাজিম পাশার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারি যাদুকরের শেষ প্রদর্শনী।

রূপসী মিস চম্পার অপূর্ব ক্রীড়া চাতুর্য।

নয়ন-মন সার্থক করুন।

আসুন, আসুন, আসুন।

প্ল্যাকার্ডের এক কোণে চিত্র ছিল প্রফেসর নাজিম পাশার হাসি ভরা পাগড়ি বাঁধা চেহারার। তার নিচে দু'খানা হাড় ক্রশ করে রাখা। আরেকদিকে, একটা মেয়েকে গলা থেকে হাঁটু অবধি বাক্সে বন্ধ করে করাত দিয়ে দু'খানা করা হচ্ছে, রক্ত পড়ছে। একেবারে নিচে আঁকা, কালো বোর্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো একটা মেয়ে, তাকে, ছোরা তুলে তাক করে আরেকজন।

বসে বসে পোষা পায়রাগুলোকে দানা খাওয়াচ্ছিলেন নাজিম পাশা, এমন সময় প্ল্যাকার্ড ভেঙে পড়ল। হাতের বাটি সরিয়ে রেখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি— চম্পা, চম্পা।

টাউন হলের পেছনেই লাগোয়া দুটো ছোট কামরা আর সাজঘর। কামরা দুটোয় শহরের কর্তারা প্রাইভেট মিটিং করেন। আর সাজঘরটা কালে-ভদ্রে নাটক হলে ধুলো ঝেড়ে চামচিকে তাড়িয়ে ব্যবহার করা হয়। সাজঘরে বসে প্রফেসরের কোটের আস্তিনে লুকোনো পকেট নতুন করে টাকছিল চম্পা। কাল রাত্তিরের শো-এ বড় সাকরেদ জহির উইংসের আড়াল থেকে কালো সুতো— যেটা বাঁধা ছিল আস্তিনের এই গোপন পকেটে লাল রুমালের সঙ্গে— টানতে গিয়ে মটমট করে সেলাই শুদ্ধু খসিয়ে এনেছিল; আরেকটু হলেই দর্শকের সামনে ফাঁস হয়ে যেতো জারিজুরি, ভাগ্যিস প্রফেসর টের পেয়ে তখনই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। চম্পা সেলাই করতে করতে প্রথমে শুনল প্ল্যাকার্ড ভেঙে পড়বার শব্দ, পরক্ষণেই প্রফেসরের ডাক— চম্পা, চম্পা।

নিঃশব্দে এ ঘরে এসে চম্পা দেখল, প্রফেসর নাজিম পাশা দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন— কিন্তু বাতাসের, বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। পায়রাগুলো তাঁর পায়ের কাছে ঘুরছে।

চম্পা অবাক হল না। একটু বিরক্ত হল।

বাবা যখন কাঁদেন, কোন শব্দ করেন না, মনে মনে ভাবল সে। কেবল গোলগাল মোটা শরীরটা একটু একটু কাঁপতে থাকে আর লাল হয়ে ওঠে চোখ, যেমন এখন কাঁপছে। তাঁকে কাঁদতে দেখে চম্পা অবাক হল না, কারণ, বাবা প্রায়ই কাঁদেন, রোজই কাঁদেন, একটা কিছু হলেই কাঁদেন— যা কেউ আশাও করবে না, বিশ্বাসও করবে না। প্রথম যেদিন বাবাকে কাঁদতে দেখেছিল, অবাক হয়েছিল চম্পা। সে তখন বছর ন'য়েকের। মা-কে তো সারাক্ষণ বকে বকে মাথা খারাপ করে রাখতেন বাবা; সেদিন চম্পা কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে বাবার ম্যাজিক দেখাবার রঙিন লাঠিটা মা 'আমার সতীন, আমার সতীন' বলতে বলতে বটি দিয়ে দু'খানা করছেন, আর আশ্চর্য!— বাবা বারান্দায় বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন।

সে বছরই বাবা তাঁর নিজের দল করেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে চম্পা এসে দলের একজন হল। সেই থেকে আজ প্রায় দশ বছর হয়ে গেছে। বাবা যখন স্টেজে গিয়ে দাঁড়ান, চোখ বাঁধা অবস্থায় কালো বোর্ডে অঙ্ক কষে ফেলেন, চম্পা যখন স্টেজে আসে, সবাইকে ঝুঁকে সালাম করে দুটো টুলের ওপর রাখা বাক্সের মধ্যে গিয়ে সেঁধোয় আর তার বাবা আর জহির করাত নিয়ে দু'পাশে দাঁড়ায় তাকে জীবন্ত দু'খণ্ড করবার জন্যে; টুপির ভেতর থেকে বাবা যখন পাঁচটা পায়রা বের করে উড়িয়ে দেন আর ওরা চক্রাকারে হলের মধ্যে ঘুরতে থাকে, অচেনা অন্ধকার দেখে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আবার ফিরে আসে বাবার হাতেই, তখন প্রচণ্ড হাততালিতে হল ফেটে না পড়লে বাবার ভারি কষ্ট হয়। শো ভাঙলে কোট-প্যান্ট শুদ্ধু বিছানায় এসে শুয়ে পড়েন, মিথ্যে করে বলেন, জ্বর এসেছে। চম্পা জানে, বাবা তখন কাঁদছেন। চম্পা বোঝাতে চেষ্টা করে— ঠাণ্ডা পড়েছে, আলোয়ানের ভেতর থেকে সবাই হাত বের করতে চায়নি, তালিটা তাই ফিকে হয়েছিল; কিংবা গাঁয়ের লোক তো!— ব্যাপার দেখে চক্ষু চড়কগাছ, হাততালি দেবে কী! কিন্তু বাবা তা শুনবেন না। কাঁদবেন। এমনকি টিকেট কতো বিক্রি হল, তাও আর সেদিন খোঁজ নেবেন না; সেদিন জহির আর সামাদ ক্যাশবাক্স থেকে কম করে হলেও দু'খানা দশ টাকার নোট সরাবে। চম্পা ও নিয়ে হৈচৈ করতে পারে না, বাবা শুনলে তাদের কিছু তো বলবেনই না, আবার দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে নতুন করে কাঁদতে বসবেন।

একবার কী হল, জহির তাক করে ছোরা ছুঁড়তে জানে, লক্ষ্য ফসকায় না এক চুল। বাবা বললেন, তাহলে একটা বোর্ডে কাউকে দাঁড় করিয়ে জহির তার দিকে তাক করে ছোরা ছুঁড়বে— ছোরাগুলো চারপাশে চোখ-মুখ-গা ঘেঁষে বোর্ডে গিয়ে বিঁধবে। কিন্তু মুশকিল হল জহিরের ছোরার সামনে দলের কেউ বোর্ডে দাঁড়াতে সাহস পেল না। ব্যাণ্ডপার্টির চারজন যারা শহরে বাজনা বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে, আবার শো'র সময় টিকেট বিক্রি করে এসে ম্যাজিকের সঙ্গে বাজনা বাজায়, তাদের চারটে চমৎকার নাম দিয়েছিল চম্পা— খাড়ানাক, বোঁচানাক, পটকা আর চালকুমড়ো। ছোরার কথা শুনে খাড়ানাক চাকরি ছেড়ে দেবার হুমকি দেখাল, বোঁচানাক ক্রমাগত ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়ল, পটকা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল, আর চালকুমড়ো গড়াতে গড়াতে গুম হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

তখন একটা বুদ্ধি করলেন বাবা। খড় মাটি দিয়ে সুন্দর একটা কার্তিক বানিয়ে আনলেন কুমোরদের দোকান থেকে নগদ পনেরো টাকা দিয়ে। সেটাকে বোর্ডে দাঁড় করিয়ে জহিরের হাতে তিরিশটা ছোরা দিয়ে রিহার্সেল নেওয়া হল— দেখা গেল, চমৎকার তাক। একটাও মূর্তির গায়ে লাগেনি— একেবারে গা ঘেঁষে বোর্ডে বিঁধছে। মূর্তিটা যখন সরিয়ে আনা হল, মনে হল, ছোরা গেঁথে গেঁথে কে যেন বোর্ডে আস্ত একটা মানুষের ড্রয়িং করে রেখেছে। এমনকি মূর্তির দু'পায়ের মাঝখানে আধ ইঞ্চি ফাঁক— তার মধ্যেও তিনটে ছোরা বাঁট পর্যন্ত গাঁথা।

রিহার্সেল চলল কয়েকদিন। বায়না ছিল শান্তাহারে রেলওয়ে ইন্সটিটিউটে। সেখানে স্টেজে নাবানো হল মূর্তিটাকে, জহির তাক করে চমৎকার ছুঁড়ে গেল একের পর এক তিরিশটা ছোরা। কিন্তু কেউ তালি দিল না, উল্লাসে চিৎকার করে উঠল না। বরং শোনা গেল, লোকজন পটপট চেয়ারের হাতল ভাঙছে আর বলছে, মাটির মূর্তি দিয়ে ছোরার বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে! হতো জ্যান্ত মানুষ, বুঝতাম কেমন ম্যাজিশিয়ান। দুত্তোর, বাজে, বাজে! সে রাতে আর খেলা জমল না, সবাই হৈচৈ করে বেরিয়ে গেল, টিকেটের দাম ফেরতের জন্যে মহা হট্টগোল বাঁধল, ওদিকে রেলের লোক এসে উনিশখানা চেয়ারের হাতল বাবদ দেড়শো টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসল, বাবা সাজঘরে ট্রাঙ্কের ওপর বসে কাঁদতে লাগলেন— এককোণে, অন্ধকারে।

পরদিন চম্পা এসে দাঁড়াল বোর্ডের সামনে— মিস চম্পা— প্রাচ্যের সেরা রূপসী— যার অঙ্গুলি হেলনে আকাশের বিদ্যুত স্তম্ভিত হয়। পরনে গলা থেকে পা পর্যন্ত সিল্কের আঁটো পোশাক। কোমর, নিতম্ব আর হাঁটুর প্রতিটি ভাঁজে যেন দাঁত কামড়ে বসেছে কাপড়, ওপরে লাল সিল্কের তেমনি আঁটোসাটো খাটো কোর্তা, চক্রাকারে কাপড় সেলাই করে দুটো বুক চাঁদের মতো স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, মাথার চুল সাবান ঘষে ফোলানো, পায়ে নীল সিল্কের জুতো। বাজনা বাজল, চম্পা এসে দাঁড়িয়েছে, জহির ছোরা তুলে তাক করল। বিদ্যুত নেচে উঠল চম্পার চোখে একপলকের জন্যে। জহিরকে— কিন্তু সে কথা ভাববার সময় নেই। দুম্। চোখ না নাবিয়েও চম্পা বুঝতে পারল একটা ছোরা এসে ঠিক তার গালের পাশে গাঁথল। একটা নিঃশ্বাস পড়ল চম্পার— সারা হল এতো নিস্তব্ধ যে, সেটাই তার নিজের কানে শোনাল ঝড়ের মতো। দুম্ দুম্ দুম্। আর নিঃশ্বাস পড়ল না। সাতাশ-আঠাশ-উনত্রিশ-ত্রিশ। সারা হল ফেটে পড়ল উল্লাসিত হাততালিতে। বোর্ড থেকে সরে এসে তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করল চম্পা। জহির তার কোমর জড়িয়ে ধরে মাথা নুইয়ে

আবার লম্বা এক সালাম করল। আবার হাততালি। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। তখন চম্পার মনে হলো জহির ফিসফিস করে বলছে, মন বলছিল, তোকে জখম করে দিই চম্পা। তার ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। কিছু বলতে পারল না সে। জহির বলল, কিরে ভয় পেলি নাকি! ঠাট্টা করছিলাম।

কিন্তু চম্পার এতো করাও শুধু শুধু। বাবার কাঁদতে হলে কারণ লাগে না। একেক সময় তার মনে হয়, বাবার মতো শিশু দ্বিতীয়টি আর নেই। আবার এক সময়ে মনে হয়, ঐ কান্না তার সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রতীক। মনে হয়, দল থেকে পালিয়ে যাই। ওপরের গ্যালারীতে বউ-ঝিয়েরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে এসে বসে ঘোমটা তুলে এ ওর হাত ধরে মাথা কাৎ করে তন্ময় হয়ে দেখে, কোলের ছেলেটা কাঁদলে তার মুখে মাই তুলে দিতে দিতে দেখে— একের পর এক তাস উড়ে যাচ্ছে হাত থেকে, কংকাল নাচতে নাচতে এসে জড়িয়ে ধরছে চম্পাকে, চুমো খেতে চাইছে আবার ভ্রুকুটি করতেই দূরে সরে যাচ্ছে। চম্পা ভাবে, সেও যদি এ রকম ম্যাজিক দেখতে পারতো বিরাট বিস্ময় নিয়ে, কোলে থাকতো খোকা, পাশে বসে ননদ— কাঁধ জড়িয়ে ধরত ভয়ে।

ছোবার সেই প্রথম শো-এর পর থেকে, আজ বছর দুই হবে, চম্পা একটু বিরক্তই হয় বাবাকে কাঁদতে দেখলে। এ এক অদ্ভুত কান্না। এক ফোঁটা পানি পড়ে না, একটু শব্দ হয় না। কাল রাত্তিরেও। কাল জহিরের দোষে আস্তিনের লুকোনো পকেট ছিঁড়ে গিয়ে খেলা প্রায় ফাঁস হয়ে যাবার যোগাড়, জোর সামলে নিলেন বাবা; কিন্তু শো শেষে কিস্‌সু বললেন না জহিরকে, খেতে বসে ঠিক ঐ রকম শব্দহীন কান্না। বাবা যেন ভয় করেন, জহির চলে গেলে দল ভেঙে যাবে— তার বাবা 'মায়াশক্তিসম্পন্ন প্রফেসর নাজিম পাশা।'

বৃষ্টিটা একটুও কমেনি। বরং বুঝি আরো জোর হয়েছে। প্রফেসর দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে শিশিরের মতো সাজ হয়ে পড়েছে তাঁর দু'হাতের পিঠে। চম্পার পায়ের শব্দে পায়রাগুলো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। চম্পা একটু বিরক্তি নিয়েই ডাকাল, কী বাবা?

প্রফেসর চোখ তুলে তাকালেন। হাত আস্তে আস্তে নেবে এলো তাঁর কোলের ওপর। দেখলেন, সন্ধ্যের শো-র জন্যে চম্পা মুখে রঙ মেখে একেবারে তৈরি। বাকি কেবল ড্রেস করে নেয়া। যে জানালা দিয়ে শোনা গিয়েছিল প্ল্যাকার্ড পড়ে যাবার শব্দ, সেদিকে অস্পষ্ট একটা হাতের ইঙ্গিত করে প্রফেসর বললেন, চম্পা, আজ বোধহয় শো হবে না।

তার কথায় সায় দিয়েই যেন কড় কড় দীর্ঘ একটা বিদ্যুত ডেকে উঠল দূরে— দূর থেকে নিকটে।

এতো বিষ্টিতে কে আসবে?

দেখল, বাবার চোখ লাল টকটকে হয়ে গেছে শব্দহীন কান্নায়। হঠাৎ কেমন মায়া হল চম্পার। বলল, তুমি কি জানো, বিষ্টি যেতে কতোক্ষণ? তা ছাড়া আজ এদের হাট। মফঃস্বল থেকে অনেকে আমাদের দেখবে বলে এসেছে। যতো রাতই হোক আসবে।

আসবে?

চম্পা সেদিকে কান না দিয়ে বলল, বরং শো এক ঘণ্টা পিছিয়ে দাও। আর তুমি এক্ষুনি

গিয়ে স্টেজ গুছিয়ে ফ্যাল, ড্রেস করে নাও। সময় কই ?

তার কথায় যেন কাজ হল। উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। পকেট থেকে রুমাল বের করে ফঁ্যাচ করলেন একবার। চম্পা বলল, তোমার কোটের আস্তিন হয়ে গেছে।

ভাল। তারপর চোরের মতো তাকিয়ে হঠাৎ শুধোলেন, প্ল্যাকার্ডটা পড়ে গেল শুনেছিস ?

হ্যাঁ।

আর কিছু না বলে তখন সাজঘরের দিকে চলে গেলেন প্রফেসর। চম্পা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। এতোক্ষণে তার চোখে পড়ল, পাশের দরোজটা খোলা। ওঘরে চৌকির ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে জহির। ঘুমোচ্ছে না, চোখ পিটপিট করে দেখছে চম্পাকে। আর তার পায়ের আঙুল মটকাচ্ছে সামাদ।

প্রফেসর চলে যেতেই তড়াক করে উঠে বসল জহির। বলল, চম্পা, শোন।

কী ?

এদিকে।

চম্পা এলে জহির হাসল। বিরক্ত হয়ে চম্পা শুধোল, কী বলবে ?

যা বৃষ্টি, সব ভেসে যাবে নাকি, অ্যাঁ ?

যাক।

একটু চা হয় না চম্পা ?

বানিয়ে নাও গে। আমি জানি না।

খপ করে হাত ধরে ফেলল জহির। তার কী ইশারা ছিল, সামাদ কেটে পড়েছে।

চম্পা, তোকে পায়রা বানিয়ে রাখতে পারি, থাকবি ?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চম্পা বলল, কোথায় ?

আমার আস্তিনে।

বানাও দেখি কেমন ওস্তাদ!

চম্পার কণ্ঠে বিদ্রূপ ঝরে পড়ে। কিন্তু জহির সেটা বুঝতে পারে না। সে মনে করে, চম্পার মনটাও আজ বৃষ্টিতে হু হু করছে তার মতো। বলে, তাহলে চোখ বন্ধ কর।

করল চম্পা। সে জানে, এ রকম একটা সুযোগ হয় না। ঠোঁট তাই হাসিতে মাখা মাখা হয়ে ওঠে। জহির বলে, হাসছিস যে ?

এমনি।

জহির চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা চম্পার রূপ নিরিখ করে কিছুক্ষণ। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ লাফিয়ে ওঠে তার। সারা শরীরের মধ্যে শুধু ঐ হাসি-হাসি-ঠোঁট ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

প্রায়-চিৎকার করে ওঠে সে। মুখটা নাবিয়ে এনেছিল, চম্পা তার নিচের ঠোঁটে আচমকা দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। রক্ত পড়ছে। আর একটা চড়। খিলখিল করে হেসে উঠল চম্পা।

পায়রা! ইস, ওস্তাদ কতো ? আয়না এনে দেবো, কেমন গাধার মতো দেখাচ্ছে ?

স্টেজে নামবার জন্যে মুখে রঙ মেখেছিল চম্পা, তার খানিকটা লেগেছে জহিরের চিবুকে।

তাই দেখে চম্পা লুটিয়ে পড়ল হাসিতে। হাসতে হাসতেই সে দৌড়ে পালিয়ে গেল সাজঘরের দিকে।

কিন্তু বৃষ্টি কমবার কোন লক্ষণই নেই। আস্তে আস্তে সূর্য অস্তাচলে গেল। তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আরো ভয় করতে লাগল সবার। মনে হল, সমস্ত পৃথিবীকে কোন এক অশরীরি শক্তি দু'হাতে সংকুচিত করে শ্বাসরোধ করতে চাইছে। বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে তার দম্ভ, বৃষ্টিতে তার সংহারের সংকল্প, হঠাৎ নেমে আসা শীতের মধ্যে তার জয়ের উল্লাস লেখা।

হ্যাজাক দু'টো ধরাল সামাদ। একটা সে রাখল স্টেজের ওপর, আরেকটা সাজঘর আর পাশের ঘরের মাঝখানে টুলের ওপরে, যেখানে বসে প্রফেসর একটু আগেই কাঁদছিলেন। হ্যাজাকের ফিনফিনে আলো থেকে ভ্রমরের মতো একটানা একটা গুঞ্জন সারা টাউন হলের ভেতরে ঘুরতে লাগল। প্রফেসর ড্রেস করে খামোকা পায়চারি করছেন খালি স্টেজে। চম্পা ড্রেস করেনি, সে একটা টুলের ওপর বসে অস্বচ্ছ চোখে বাবাকে দেখছে। আর জহির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের নিচে চম্পার দাঁতের দাগ পড়ছে একমনে। ছোট সাগরেদ সামাদ কী করবে বুঝতে না পেরে উবু হয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছে আড়ালে। তার কোন কথা নেই, শো হোক আর না হোক, চম্পা জহিরকেই বিয়ে করুক আর হাতিকেই করুক, মাস কাবারে তার আশি টাকা পেলেই হল।

এমন সময় ভিজতে ভিজতে ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি ভূতের মতো এসে হাজির— খাড়ানাক, বোঁচানাক, পটকা আর চালকুমড়ো। তারা এসে মহা গম্ভীর হয়ে রইল, কাউকে কিছু বলল না। পটকা বারান্দার এককোণে বাতাস বাঁচিয়ে আগুন করল খানিকটা। খাড়ানাক বসে বসে তার ড্রাম দু'টো সেঁকতে লাগল সেই আগুনে। বৃষ্টির পানিতে একেবারে মিইয়ে গেছে খোলটা। কিন্তু পরনের কাপড় ভিজে একসা সে-দিকে চোখ নেই। বোঁচানাক আর পটকা বসে বসে ভিজে হ্যাণ্ডবিলগুলো একটা আরেকটার গা থেকে ছাড়াতে লাগল। আর চালকুমড়ো তার বিউগিল থেকে ঝাঁকিয়ে পানি বার করতে লাগল আর ক্ষণে ক্ষণে চোঙের মধ্যে চোখ লাগিয়ে পরখ করতে শুরু করল। এ যন্তর নিয়ে আবার ভারি মুশকিল। আগুনের আঁচ পেলে সোনালি কলাই উঠে তামা বেরিয়ে পড়বে।

চম্পা এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। এক মুহূর্তে দেখল ওদের কাণ্ডকারখানা। বিশেষ কাউকে লক্ষ না করেই সে জানান দিল, কী রে?

আবার কী? হাটের দিকে যাবো, বৃষ্টি নাবলো। বলল খাড়ানাক। রাগটা তারই বেশি। কারণ ড্রামটা আঁচে ধরতে গিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল তাকে।

চম্পা বলল, এই পটকা, ওর সঙ্গে হাত লাগা না। নবাব হয়েছিস?

সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ড্রাম নাবিয়ে চেঁচিয়ে উঠল খাড়ানাক, থাক, থাক, অমন কাজের কর্তা আমার দরকার নেই। চাই কী খোল শুদ্ধু দেবে পুড়িয়ে।

পটকা চম্পার ডাক শুনে চোখ তুলে তাকিয়েছিল, আবার নিবিষ্ট মনে সে ভিজে হ্যাণ্ডবিল ছাড়াতে লাগল। হি হি করে হেসে উঠল চম্পা। একটা টুল টেনে জুৎ করে বসল তার ওপর। বলল, সবগুলোর মেজাজ একেবারে ছিপ হয়ে আছে। হি হি হি।

চালকুমড়োর একটু বুদ্ধি কম। সে হাঁ করে ভাবল খানিক, পরে জিগ্যেস করল, ছিপ মানে ?

মানে ? — বলছি। বলেই চম্পা একটা সরু ভাঙা ডাল হাতে তুলে নিয়ে এক মাথা ধনুকের মতো টেনে শন করে ছেড়ে দিল, চটাং করে গিয়ে পড়ল চালকুমড়োর পিঠে। তিড়বিড় করে উঠল সে ব্যথায়।

চম্পা বলল, এর নাম ছিপ। বুঝলি ? এই পটকা। পটকা ?

জ্বি।

থাক আর হ্যাণ্ডবিল ছাড়িয়ে কাজ নেই। চাট্টি খিচুড়ি রাঁধবার জোগাড় দেখ গে। আজ আর শো হবে না। আড়মোড়া ভাঙল চম্পা, যেন কদ্দিন ঘুম হয় না তার, আজ একটু ঘুমোবে।

চারকণ্ঠ একসঙ্গে শুধোল, কেন, শো হবে না কেন ?

বোঁচানাক বলল, বারে, আমরা তো বিলি কাগজ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমাদের দোষ কী!

দূর গাধা। চম্পা পা দিয়ে বোঁচানাকের পেটে খোঁচা দিল একটা। দেখছিস না বৃষ্টি, লোক হবে কোত্থেকে ?

ওস্তাদ বলেছে ?

আমি বলছি। না বাপু আর পারি না। এই খাঁদা, এক কেৎলি পানি দে-না চায়ের। বসে বসে খাই। আর আমার বালিশের নিচে একখানা পাউরুটি আছে, আনবি ?

চম্পার ঐ একটা স্বভাব। এই চারমূর্তির সঙ্গে বসলে কথার খই ফুটতে থাকে। এক মুহূর্ত স্বস্তিতে থাকতে দেয় না কাউকে। আজ শো না হলে যে তাদের আসা যাওয়ার খরচই উঠবে না, খাবার পয়সা থাকবে না, সেটা যেন বেমালুম ভুলে গেছে চম্পা। সে ভাবনা করছেন একা স্টেজে পায়চারি করতে করতে প্রফেসর নাজিম পাশা, বারো বছর আগে যিনি তাঁর ওস্তাদ প্রফেসর জে, সি, দত্ত হিন্দুস্থানে চলে যাবার পরে নিজের নাম নাজিমুদ্দি ভূঁইয়া থেকে নাজিম পাশা বানিয়ে দল করেছিলেন।

খাড়ানাক এসে খবর দিল, পাউরুটি বোধ হয় ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে, পাওয়া যাচ্ছে না।

ইঁদুরে না তুই ? তারস্বরে জানতে চাইল চম্পা। বল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ?

জহির এসে বসল চম্পার গা ঘেঁসে আরেকটা টুল নিয়ে। বলল, থাক, আর রাগ করিস নি চম্পা। সিগারেট খাবি ?

চম্পা তাকে কিছু বলল না, বলল খাড়ানাককে। যাক, আজ মাফ করে দিলাম। আর বলতে বলতে জহিরের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে গুঁজল। ম্যাচ জ্বালিয়ে ধরল জহির। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে চম্পা বলল, কী বাজে সিগারেট যে খাও। গন্ধে পেট মোচড়াতে থাকে। আরেকটা টান দিয়ে বলল, ঠাণ্ডাও নেহাত মন্দ পড়েনি।

তার সিগারেটের দুর্নাম শুনে জহির একটু মুখ শুকোল। রাগ ঝাড়ল পটকার ওপর। মাথায় তার চাঁটি মেরে বলল, হারামজাদা, চায়ের পানি বসাতে এতোক্ষণ ?

চারমূর্তির মধ্যে পটকাই সবচে' নিরীহ। কিন্তু তার চোখও জ্বলে উঠল জহিরের মার খেয়ে। অথচ মুখে কিছু বলল না, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে চায়ের পানি আগুনে বসাল দু'খানা ইট পেতে।

ঠিক তখন। একসঙ্গে চমকে মুখ ফিরিয়ে সবাই দেখে, বারান্দার নিচে তাদের পেছনে একটা মানুষ গাছের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে অন্ধকারে। নড়ছে না, শব্দ করছে না। বৃষ্টি আর অন্ধকারে ভাল করে ঠাহরও হচ্ছে না সত্যি সত্যি মানুষ, না আর কিছু।

কে ? কে ওখানে ? টুল থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জিগ্যেস করল জহির। বৃষ্টির এই ঠাণ্ডার জন্যে কি-না কে জানে, তার কণ্ঠ বড় দুর্বল আর ভাঙা শোনাল। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল চম্পা।

লোকটা তখন আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সবাই। কেউ তাকে চেনে না, এর আগে কখনো দেখেনি। ওরা ভাবল, এ শহরের কেউ হবে— হয়তো থানার দারোগার জন্যে দশখানা পাশ চাই, কী কোন কর্তা পাঠিয়েছেন জানবার জন্যে যে চম্পা রাতে নেমন্তন্ন নিয়ে থাকে কি-না। বড় অস্বস্তি বোধ করল চম্পা। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। সবার ভেতরে চম্পাই প্রথম বুঝতে পারল, ওরকম প্রস্তাব নিয়ে যারা আসে তারা দেখতে আলাদা, তাদের চলন অন্যরকম। এ লোকটার পোশাক সাধারণ, কিন্তু কেমন সুন্দর গায়ে-মানানো, চেহারা কিছু না, কিন্তু চোখ ফেরানো যায় না। শ্যাম বর্ণ লম্বাটে মুখের মধ্যে সবকিছু হারানো খোয়ানোর স্থির একটা ছবি যেন। যেন, লোকটা সারাক্ষণ কী ভাবছে তার কোন সমাধান হচ্ছে না, তাই ভারি অন্যমনস্ক।

জহির একবার দ্বিধা করল— তুমি না আপনি ? জিগ্যেস করল, কী চাই ?

লোকটা এবারও কোন জবাব দিল না। তার মোটা পাজামা থেকে পানি নিংড়ে শার্টের খুঁট দিয়ে মুখ মুছল। বড় পরিতৃপ্ত দেখাল তাকে তখন।

ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি তখন থেকে থ'। জহির কিছু বুঝতে না পেরে চম্পার কাঁধে হাত রাখল, চম্পা সেটা সরিয়ে দিল কাঁধ নামিয়ে— কিন্তু দু'জনের কারো মন ছিল না তাতে। তারা দেখছে লোকটাকে। আর লোকটা তখন হাঁটু গেড়ে আগুনের পাশে বসে হাত সেঁকছে একমনে।

আর সহ্য হল না জহিরের। এতোক্ষণ কথার জবাব না পেয়ে মেজাজ সপ্তমে ওঠবারই কথা। হয়তো একটা কিছু করতে যাচ্ছিল, তার আগেই চম্পা হাতের সিগারেটটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধোল, থাকো কোথায় ?

লোকটা ফিরে তাকাল চম্পার দিকে। অস্পষ্ট একটা হাসিতে এক পলকের জন্যে মুখটা আলো হয়ে উঠল তার। এক হাতে বিশেষ কোন দিকে না দেখিয়ে, যার মানে যে-কোন দিকে হতে পারে, বলল, ওদিকে। তার কণ্ঠ শোনায় অদ্ভুত, যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা গম্ভীর মেঘ। সে কণ্ঠ সবাইকে অবশ করে দিয়ে গেল। বিশেষ করে জহিরকে।

লোকটা চম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, বিষ্টিটা এখুনি যাবে। আমি দেখে এসেছি, ওদিকে আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে বলতে কোন্ দিক বোঝাল কে জানে। হঠাৎ সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, এ-কী!— তারা দেখা যাচ্ছে। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই, বাতাস নেই— একেবারে ছবির মতো।

আকাশ থেকে তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল চম্পা। লোকটা তখন একমনে তার জামা শুকোচ্ছে আগুনে। কী একটা বলতে গেল চম্পা, পারল না। লোকটা এমন তন্ময় হয়ে আছে যে সাহস

হলো না।

তাকে সম্ভ্রম করে পটকাও কেৎলিটা নাবিয়ে নিয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। তার পানিও গরম হয়ে গিয়েছিল; সে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল চা বানাতে। আর বৃষ্টি থেমেছে দেখে জহির তাড়াতাড়ি দৌড়ুল সাজঘরের দিকে।

সেখানে গিয়ে প্রফেসরকে সে পেল না। স্টেজে উঁকি দিয়ে দেখে সেখানে তিনি একটা চেয়ারে বসে আছেন, পা দোলাচ্ছেন। তাকে গিয়ে বলল, বিষ্টি তো নেই!

নেই মানে ?

ধরে গেছে।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। জহিরকে ধমক দিয়ে বললেন, তা হ্যাঁ করে আমার চেহারা দেখছো কী ? সামাদ কই, ব্যাণ্ডপার্টি গেল কোন চুলোয় ? বাজনা বাজাক, টিকিট ঘরটা খুলে দিচ্ছে না কেন ? আমি মরে গেছি নাকি, বলে কী এরা, চম্পা— চম্পা।

আবার সেই ডাক। কিন্তু এ ডাক শুনতে পেল না সে এবার। সে তখন কথা জুড়ে দিয়েছে সেই লোকটার সঙ্গে, পটকা চা এনে দিয়েছে, চুমুক দিতে দিতে।

কী নাম ?

আল্লারাখা।

হি হি হি।

আল্লারাখা তখন খাড়ানাকের সঙ্গে ড্রামটা আগুনের ওপর ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গরম করছে। চম্পাকে হাসতে শুনে এক পলক চোখ তুলেই নাবিয়ে নিল। তারপর নিচু গলায় কৈফিয়ত দিল, আমার সব ভাইবোনগুলো হতো আর মরে যেতো। তাই সবশেষে আমি যখন হলাম, মা নাম রাখলেন আল্লারাখা। আমি কী করব ?

হি হি। বাহ্ নিজের নাম কেউ বদলাতে পারে না নাকি ? আমার বাবাও নাম বদলেছে। তুমি বদলাবে ?

লোকটা খুব উৎসাহী হয়ে উঠল। চম্পার দিকে হঠাৎ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধোল, আমাকে তোমরা নেবে ?

নেবো মানে ? হকচকিয়ে গেল চম্পা।

দলে।

না বাপু, আমাদের লোক দরকার নেই।

তাহলে নাম বদলে কী হবে ?'

তখন প্রফেসরের পেছনে এলো জহির। দেখেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

এ লোকটা আছে এখনো ? অ্যাঁ ? চম্পা, এতো হাসি কিসের ?

প্রফেসর কিছু বুঝতে না পেরে একবার চম্পার দিকে একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন। আরো খিলখিল করে হেসে উঠল চম্পা।

বাবা, বলে নাম আল্লারাখা। হি হি হি।

লোকটা আগুনের ওপর ড্রামটা ধরে রেখে আড়চোখে দেখছিল চম্পাকে, তার কপালের

ওপর আধখানা চাঁদের মতো দুলতে থাকা একগুচ্ছ চুল। আর ভাবছিল, সে পারতো, সে এক্ষুনি অবাক করে দিতে পারতো চম্পাকে, যদি চম্পার ঐ চুলের চাঁদ সে একটুখানি স্পর্শ করতে পারতো।

হাসির সঙ্গে সঙ্গে নেচে উঠছিল চম্পার কপালে সেই চুলের গুচ্ছ। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বুঝি আল্লারাখা। হঠাৎ এক অঘটন ঘটল। হাত থেকে ড্রামটা পড়ে গেল গনগনে আগুনে। ভাল করে বোঝার আগেই পটাস করে একটা শব্দ হল খোল ফেটে যাওয়ার, তারপর উঠতে লাগল চামড়া পোড়ার কটু গন্ধ।

হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। বেওকুফের মতো উঠে দাঁড়াল আল্লারাখা। খাড়ানাক আর চালকুমড়ো ড্রামটাকে কোনরকমে তুলে বারান্দার নিচে বৃষ্টির জমা পানিতে ছুঁড়ে ফেলল।

ঝাঁপিয়ে পড়ে আল্লারাখার কলার চেপে ধরল জহির। তোকে ড্রাম ধরতে বলেছিল কে ? বলেই এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল সে, যার টাল সামলাতে অনেকক্ষণ লাগল আল্লারাখার।

প্রফেসর বললেন, চম্পা, আমি বুঝতে পারছি না আমার ওপর এতো গজব কেন ?

কী হয়েছিল, চম্পা থরথর করে কাঁপছিল। প্রফেসর তাকেই ধমকাতে লাগলেন, এখন ড্রামটাও পুড়ল। এইটার দাম কতো জানিস ? আমাকে কাটলেও দশটা ফালতু টাকা বেরোবে না। কোত্থেকে এ উজবুক এলোরে ? চম্পা ?

পানিতে চুবিয়ে ড্রামটা আবার বারান্দায় তুলে এনেছে খাড়ানাক আর চালকুমড়ো। গোলমাল শুনে সামাদ, পটকা আর বোঁচানাকও ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সামাদ বলে উঠল, ব্যাটা মিচকে যেন কিছু জানে না। বোবা নাকি ?

আল্লারাখা ড্রামটার দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর চম্পা আর প্রফেসরকে বলল, ফ্রেমটা বেঁচে গেছে। একটা খোল পেলে আমি ছেয়ে দিতে পারতাম। আশেপাশে সে তাকাল, যেন এখানেই কোথাও এক আধটা খোল পাওয়া যাবে।

হুংকার দিয়ে উঠল জহির, ছেয়ে দিতে পারতাম! শুয়ার কা বাচ্চা। তোর পিঠ থেকে চামড়া তুলে আমি খোল বানাবো আজ।

একটা কিছু নেই এখানে ? আল্লারাখা বিড়বিড় করে বলল, যার অর্থ কেউ বুঝতে পারল না।

প্রফেসর ড্রামের কাছে উবু হয়ে বসে হাত বুলোতে লাগলেন পোড়া খোলের ওপর, যেন এক্ষুনি তিনি যাদুবলে ভাল করে দিতে পারবেন। মন্ত্র পড়ার মতো তিনি বলে চললেন, আমার কাছে বলে একটা পয়সা টাকার সমান। এটাকে ঢোকাল কে এখানে ? কোত্থেকে এলোরে গরুটা। আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেলরে চম্পা।

এতোক্ষণে চম্পার মনে পড়ল কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল তখন থেকে সুড়সুড় করছে। সেটাকে হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে তার চোখে চোখ পড়ল আল্লারাখার। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে চম্পার দিকে।

আবার মেয়েছেলের দিকে চোখ! জহির ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল আল্লারাখার গালে।

যেন আগুন ধরিয়ে দিল কেউ। চোখের ওপর থেকে চম্পার চেহারা মুছে গেল। আল্লারাখা

ঘুরে পড়তে পড়তে কাঠের মোটা থামের সঙ্গে মাথা ঠুকে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল কপালের বাঁ দিক টোম্যাটোর মতো।

প্রফেসর আর্তনাদ করে উঠলেন, চম্পা, ওকে মারিস নে। মরে যাবে যে। আবার সেই শব্দহীন কান্না।

চম্পা বিরক্ত হয়ে বলল, আমি কোথায় মারছি!

আল্লারাখা একবার আকুল হয়ে প্রফেসরকে দেখবার চেষ্টা করল ব্যথা ভুলে। কিন্তু ভয় করল আবার যদি চম্পার দিকে চোখ পড়ে তার। পটকা আর বোচানাক তাকে টেনে তুলল পায়ের ওপর। কপালটা দেখে দু'জনে দাঁত বার করে বলল, মাথা ফাটেনি ওস্তাদ। অ্যাকটিং করছে।

জহির তখন গজরাচ্ছে, মারবে না, শালাকে সোহাগ করবে।

জহিরের মুখের কথা মাটিতেও পড়তে পায়নি, এমন সময় বাইরে একটা প্রচণ্ড হৈচৈ ফেটে পড়ল। অনেকগুলো লোক একসঙ্গে পাগলের মতো চিৎকার করছে আর টাউন হলের টিনের বেড়ায় পড়ছে দমাদম ইট-পাটকেল। আল্লারাখার হাত ছেড়ে দিয়ে পটকা কানখাড়া করে বলল, কী যেন শুনছি? ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেল।

ভয় পাবার কথাই। শ'খানেক লোক কোত্থেকে একসঙ্গে হয়েছে, অন্ধকারে তাদের ভাল করে দেখা যাচ্ছে না, রাস্তাটা ভরে গেছে, শুধু চিৎকার শোনা যাচ্ছে আর ইট-পাটকেল। ভেঙে পড়া প্ল্যাকার্ডটার ওপর কয়েকজন বেদম নাচছে আর লাথি মারছে। আবার কেউ আমলকি গাছ বেয়ে উঠে গেছে ওপরে, সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ল হলের ছাদের ওপর। বিকট একটা শব্দ হল।

বেরিয়ে আয় ম্যাজিকের বাচ্চা! বেরিয়ে আয়। ছুঁড়িটা গেল কোথায়? কোন ভাগাড়ে মরল সব? চালাকির জায়গা পাওনি বদমাশ!— এই রকম সব হাঁকডাক চলছে। কেউ আবার চিৎকার করে উঠছে, 'নাজিম প্যাশা'— সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করছে সবাই 'ধ্বংস হোক।' আরেকবার একজন হাঁক দিল 'কুড়িগ্রাম'— আবার সমবেত চিৎকার ছাড়তে হবে। কে যেন এরিমধ্যে ফোড়ন কাটল, 'যাদু মেরে হাওয়া হয়ে গেল নাকি বাপ!' অমনি দুপ-দাপ পড়তে লাগল ইট। ছাদে যে লোকটা লাফিয়ে পড়েছিল সে উপুড় হয়ে কঁকিয়ে উঠল, আমি ভাই আমি। একটা ঢিল এসে লেগেছে তার। কিন্তু তার কণ্ঠ কেউ শুনতেই পেল না।

জহির উঁকি মেরে ব্যাপার দেখেই ছুট দিল। হাঁফাতে হাঁফাতে প্রফেসরকে গিয়ে খবর বলল, পাবলিক খেপেছে।

হ্যাঁই! পাবলিক খেপেছে? কেন?

কী জানি!

প্রফেসর তিরিশ বছর ধরে ম্যাজিক দেখিয়ে খাচ্ছেন। লোকের নাড়ি-নক্ষত্র তাঁর জানা। কিন্তু তিনিও যেন ঘাবড়ে গেলেন আজ। কারণ, কোন কারণ খুঁজে পেলেন না তিনি কেন ওরা খেপতে পারে। কাল রাতের শো-তো চমৎকার গেছে। আর আজ শো হলই বা কোথায় যে ওরা খেপবে? বেওকুফের মতো তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন দলের সবার দিকে।

চম্পা বলল, জহির তুমি একবার যাও না, দেখে এসো কী ব্যাপার।

প্রফেসর যেন এই সোজা কথাটাই এতোক্ষণ মাথা থেকে বার করতে পারছিলেন না। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হ্যাঁ চম্পা, ও যাক, দেখে আসুক।

দড়াম করে একটা ইট এসে পায়ের কাছে দশ টুকরো হয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি নিমেষে অন্তর্হিত হল ঘরের মধ্যে। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর চম্পার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন, চম্পা, শিগগীর ঘরে যা, খিল দে। পরমুহূর্তেই ফাঁকা হয় গেল বারান্দা।

একা আল্লারাখা দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে, কেউ তাকে লক্ষ্যও করল না। বাইরে যে এতোবড় একটা গোলমাল চলছে তার যেন কোন প্রতিক্রিয়াই নেই আল্লারাখার মুখে। সে নিঃশব্দে তার ডান হাতের আঙুলগুলো চোখের সামনে তুলে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

বাইরে একজন হঠাৎ হৈহৈ করে উঠল, ঐ যে ঐ বেরিয়েছে।

সবাই তখন চোখ তুলে দেখে দোতলার বারান্দায় এক মূর্তি; জহির এসে দাঁড়িয়েছে ওপরতলায় মেয়েদের গ্যালারির পাশে ছোট্ট ঝোলানো বারান্দায়। ক্ষীণকণ্ঠে সে দু'হাত তুলে বলল, শান্ত হোন ভাইসব। ভাইসব, আপনারা শান্ত হোন।

সবাই একটু চুপ করল। এক মুহূর্তের জন্যে। কে একজন বলল, আরে, এটা তো সাকরেদটা। সঙ্গে সঙ্গে আবার গোলমাল শুরু হয়ে গেল।

সাহস থাকে, তোর ওস্তাদকে বেরিয়ে আসতে বল।

মার, মার শালাকে।

আবার উড়তে লাগল থান ইট। জহির কোনরকমে দৌড়ে পালাতে গিয়ে অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নষ্ট করবার মতো সময় নেই। তক্ষুনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গ্যালারির দরোজাটা বন্ধ করে হাঁফাতে লাগল . . .।

সাজঘরে প্রফেসর চম্পাকে জড়িয়ে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন। এ শহরে কি পুলিশ নেই? আইন নেই? তার মনে হচ্ছিল যেন এ যাত্রা বাঁচলেও বিশ্বাস হবে না, বেঁচেছেন। চম্পাকে ডাকাতি করে নিয়ে যাবে নাকি? ভরসা কী! যোয়ান মেয়েছেলে, তার ওপর শো-এর মেয়ে, কোন কর্তার চোখ পড়েছে আল্লা জানে। প্রফেসর বিড়বিড় করে চম্পাকে বললেন, ভয় করিস না চম্পা। ভয় করিস না। দরজা বন্ধ আছে।

কিন্তু চম্পারও ততোক্ষণে ভয় করতে শুরু করেছে। ছাদের ওপর পর পর দুটো ইট এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্কের ওপর বসে পড়ল বাপ আর মেয়ে।

কোলাহল শুনে মনে হল, ওরা এবার হলের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। স্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছে 'নাজিম পাশা— ধ্বংস হোক।' এমনকি স্টেজের ওপরেও দুপদাপ শুরু হয়ে গেছে। চড়চড় করে পর্দাটা ছিঁড়ে পড়ল বুঝি'।

হঠাৎ সব চুপ। বিশ্বাস হল না প্রফেসরের। ভাবলেন, তাঁর কান খারাপ হয়ে গেল নাকি? চম্পার মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, চম্পাও অবাক হয়ে মাথা তুলেছে।

সত্যি, একেবারে নিঃশব্দ। পিন পড়লেও শোনা যাবে। কী ব্যাপার? থেমে গেল কেন সব

? পুলিশ ?

গ্যালারির নিচে লুকিয়ে ছিল জহির, সেও হামাগুড়ি দিয়ে বেরুল। ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি ঘরের খিল খুলে উঁকি দিল।

সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর আর চম্পা।

তারা সবাই দেখল, স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আল্লারাখা। আর জনতা সারা হলে যে যেখানে ছিল স্থাণুর মতো স্থির হয়ে আছে। হ্যাজাকে তেল পোড়ার সুমসুম শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

প্রফেসর কি স্বপ্ন দেখছেন ?

চম্পার কপালের ওপর চাঁদের মতো আবার সেই একগুচ্ছ চুল লাফিয়ে পড়ল।

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল জহিরের।

আল্লারাখা এক হাত তুলল, সময় নিয়ে সবার চোখ বুলিয়ে আনল, তারপর সেই মেঘের মতো কণ্ঠ ধ্বনিত হল সারা হলে।

দেখুন, এটা আপনাদের নিজেদের ক্ষতি। নিজেদের টাউন হল নিজেরাই ভাঙছেন, আপনাদের যা বলবার আছে বলুন, হৈচৈ করবেন না।

কেউ কোন উত্তর দিল না।

বলুন।

কেউ নড়ল না। যেন কারো আর একফোঁটা শক্তি নেই মনে কিংবা শরীরে। এমনকি অনেককে লজ্জিত দেখাল, বিব্রত মনে হল।

তাহলে আপনাদের কিছু বলবার নেই ? আল্লারাখার গম্ভীর কণ্ঠ আবার বৃথাই ঘুরে বেড়াল সারা হলে। তখন সে স্টেজ থেকে চলে যাবার জন্যে মুখ ফেরাল।

জনতার একজন হঠাৎ কথা বলে উঠল। থামল আল্লারাখা।

বিষ্টিতে আমাদের জিনিশপত্র সব ভেসে গেছে। নৌকাডুবিতে মরেছে তেরোজন। মসজিদের ছাদ ভেঙে পড়েছে।

তখন আরেকজন যোগ দিল, শুনছি, রেল লাইন ডুবে গেছে, আজ আর ট্রেন আসবে না।

হাটে যারা দোকান দিয়েছিল, সব ভেসে গেছে— রাস্তার ফকির হয়ে গেছে বড় বড় ব্যাপারীরা।

এবার কয়েকজন একসঙ্গে বলল, এ মওসুমে কোনদিন এমন বিষ্টি হয় না।

আল্লারাখা সবার কথা শুনল। এক বুড়ো এবার ভিড় ঠেলে কাছে এলো তার। চোখে বোধহয় ভাল দেখতে পায় না। চোখ পিটপিট করে সে বলল, এ বিষ্টি তো আসবার কথা না বাবা। যাদুতে কী না হয় ? এ যাদুর কীর্তি। তোমাদের কীর্তি। আমি বাবা অনেক দেখেছি। কাল তোমরা এসেছ, আর অমনি ঝড় তুফান।

সবাই হৈহৈ করে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সব যাদু চলবে না। টাকা দিয়ে যেতে হবে। কই হে, কার কতো বলো।

ভিড় হঠাৎ এগিয়ে আসছিল, আল্লারাখা হাত তুলতে সবাই থেমে গেল। উইংসের আড়াল

থেকে চম্পা ফিসফিস করে বলল, বাবা, লোকটার কথা ওরা এতো শুনছে কেন?

কী জানি। বোধহয় কিছু জানে?

প্রফেসর আর চম্পার দৃষ্টি বিনিময় হল, যার অর্থ একমাত্র যাদুকরেরাই বোঝে।

আল্লারাখা তখন বলে চলেছে, শুনুন, বিষ্টি এনে প্রফেসর নাজিম পাশার কোন লাভ নেই। বরং বিষ্টি হলে তাঁর শো হবে না। বিষ্টি দেখে তিনি নিজেও খুব মন খারাপ করেছিলেন। তাঁরই তো ক্ষতি। আজ হাটের দিন, আজ অনেক দূর থেকে সবাই আপনারা আসবেন, বিষ্টি এনে নিজের শো নষ্ট করে তাঁর কী লাভ?

এ কথার জবাব কেউ দিতে পারল না। এবারে সবাইকে উসখুস করতে দেখা গেল বেরিয়ে যাবার জন্যে। মাথা নিচু করে ফেলেছে জনতা। যে বুড়োটা স্টেজের কাছে এসেছিল সে আমতা আমতা করতে লাগল।

আপনারা বলছিলেন প্রফেসর নাজিম পাশা লুকিয়ে আছেন। মিথ্যে। তিনি আপনাদের সামনেই আছেন। দেখুন।

আল্লারাখা থামবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্টেজে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর। তাঁর পেছনে চম্পা। চম্পার পর জহির, সামাদ, ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি। জনতা হাততালি দিয়ে উঠল একসঙ্গে। হাসিতে ঝলমল করে উঠল প্রত্যেকের মুখ। তরঙ্গের মতো উঠতে পড়তে লাগল হাততালির শব্দ। উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠল টাউন হল।

দেখুন, এটা কী?

গোলাপ। শ'খানেক কণ্ঠ উত্তর দিল একসঙ্গে।

আল্লারাখার হাতে একটা গোলাপ। লাল, তার ভারি সুগন্ধ, বিরাট। এক মুহূর্ত আগে গোলাপটা কোথাও ছিল না, সে একবারও হাত পকেটে ঢোকায়নি, তবু কোত্থেকে তার হাতে এলো কেউ ভাবল না। যেন সারাক্ষণই ওটা তার সঙ্গে ছিল। তখন আল্লারাখা চম্পার কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া আধখানা চাঁদের মতো চুলের গুচ্ছ স্পর্শ করল— আরেকটা গোলাপ বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

হাততালি দিয়ে উঠল জনতা। এবারে আরো প্রবল। চমকে উঠল চম্পা। এ-কী? তার সারা শরীর এক নিমেষে গোলাপের সুবাসে ভরে উঠেছে। বিস্ময় নিয়ে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল আল্লারাখার দিকে।

আল্লারাখা তখন প্রফেসরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। প্রফেসর একবার বিব্রত হয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন। সে বলল, আপনার কাছেও অনেক গোলাপ আছে। দিন এরা অনেক দূর থেকে এসেছে। খুশি হবে। তবেই তো ওরা জানবে, আপনি ওদের ভাল চান। প্রফেসর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলেন। তাঁর পকেটে গোলাপ আসবে কোত্থেকে?

তখন আল্লারাখা 'মাফ করবেন' বলে প্রফেসরের পকেটে হাত ঢোকাল, বের করে আনল একমুঠো গোলাপ। রক্তের মতো টকটকে লাল, তাজা, যেন এইমাত্র বাগান থেকে তুলে আনা হয়েছে। সুগন্ধে ভরে গেল সারা স্টেজ। চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল আল্লারাখার মুখ।

হঠাৎ লোকটা যেন খ্যাপা হয়ে গেলে। পাগলের মতো যেখানে হাত দিল সেখান থেকেই

বেরুল গোলাপ। সে ছুঁড়ে দিতে লাগল গোলাপ জনতার মধ্যে। একশ, দুই শ, তিন শ, শত শত। তার আর শেষ নেই। চেয়ার, টুল, দরোজা, চুল, কান, আস্তিন, মেঝে— সারা হল থেকে বেরুচ্ছে গোলাপ। জনতার মধ্যে নেমে এসে সবার শরীর স্পর্শ করছে আল্লারাখা, আর বেরিয়ে আসছে গোলাপ। সবার হাত ভরে গেল, পকেট উপচে উঠল, সারা হল সুগন্ধে ম'ম' করতে লাগল— তবু শেষ হল না। বিদ্যুৎগতিতে চলছে আল্লারাখার দশ আঙুল, যেন এক সঙ্গে অনেকগুলো পাখির ডানা ঝটপট করছে আর তা থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে রক্তগোলাপ।

সে রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে লোকেরা বলাবলি করল— দু'হাজার। অনেকে বলল, কম করে হলেও চার হাজার গোলাপ। তারা বাড়ি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল দশ হাজারে। সারা রাত ধরে চলল তাদের মধ্যে এই আলোচনা। গর্বের সঙ্গে প্রত্যেকে দেখল তাদের বাড়ি নিয়ে আসা একেকটা গোলাপ। দশ হাজার গোলাপ তারা দেখে এসেছে। কিন্তু একমাত্র আল্লারাখা ছাড়া আর কেউ জানে না, আসলে সে মাত্র সাতশ' ছিয়াশিটা গোলাপ এনেছিল।

লোকেরা কেউ একটা দুটো পাঁচটা যে যেমন পেরেছে গোলাপ নিয়ে এসেছে বাড়িতে তাদের বউকে ছেলেমেয়েকে পড়শিকে দেখাবে বলে। কিন্তু সবাই ভাগ্যবান নয়, সবাই আনতে পারেনি। কেবল যারা প্রথম এসেছিল তারাই পেয়েছে। বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল গোলাপের খবর সারা শহরে, আর দলে দলে লোক চারদিক থেকে এসে ভিড় করেছিল টাউন হলের দরোজায়। সে রাতে প্রফেসর নাজিম পাশাকে দুটো শো করতে হয়েছিল। একেকটা শো ছিল লোকে লোকারণ্য, কতো লোক প্যাসেজে, পেছনে, দরোজায় দরোজায় দাঁড়িয়ে থেকে খেলা দেখে গেছে। ক্যাশ বাক্শ ভরে উঠেছে পয়সায়, চম্পাকে দু'বার এসে ট্রাঙ্ক খুলে ক্যাশ বাক্শ ঢেলে খালি করতে হয়েছে। টিকেট ইসু করতে করতে সামাদ আর পটকার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। সবাই গো ধরেছে— আমরাও গোলাপ চাই।

কিন্তু আল্লারাখা জানে একদিনে সাতশ' ছিয়াশিটার বেশি গোলাপ সে বের করতে পারবে না। স্বপ্ন, বাস্তব, মায়া, বিভ্রম, বস্তু সব কিছুরই একটা সীমারেখা কোথাও না কোথাও আছে। আল্লারাখা বলল, কাল সে আবার গোলাপ দেবে সবাইকে।

লোকেরা তখন চেপে ধরল, কাল শো করতে হবে প্রফেসরকে। কথামতো আজকেই ছিল এ শহরে তাঁর শেষ প্রদর্শনী, কিন্তু তিনি রাজি হয়ে গেলেন। প্রফেসর দত্ত-র দল থেকে বেরিয়ে এসে নিজে দল করে অবধি একরাতে এতো টাকার টিকেট বিক্রি আর কখনো হয়নি। এবার ইসলামপুরে রহমান দর্জির সুট কাটা বাবদ মজুরি তিনি শোধ করতে পারবেন, জিনিসপত্র বানিয়ে আরো কয়েকটা নতুন আইটেম ঢোকাতে পারবেন শো-এ। চম্পাকে আসল সোনার গয়না বানিয়ে দিতে পারবেন। আজকাল সিনেমার পাল্লায় পড়ে ম্যাজিকের মজা কমে গেছে লোকের কাছে। কিন্তু আজকের কাণ্ড দেখলে কে বলবে সে কথা? জনতাই দাবি করছে অতিরিক্ত শো-এর, হলে লোকের কুলান হচ্ছে না, দূর দূর গাঁ থেকে মানুষ পিঁপড়ের মতো আসতে শুরু করছে। আল্লারাখা স্টেজে দাঁড়িয়ে বলল, কাল আবার সবাইকে গোলাপ দেবে সে। লোকেরা শুনে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

জহির নাক কুঁচকে বলল, মেসমেরিজম! সব মেসমেরিজম! এর আবার কেরামতি কী? ছোঃ।

চম্পা পাল্টা আক্রমণ করল, তো হয়েছে কী? হলই বা মেসমেরিজম।

জহির তার ঠোঁটে কামড়ের জ্বালাটা ভুলতে পারেনি তখনো, তার ওপরে চম্পার আল্লারাখার দিকে টেনে কথা বলা! থুক করে সে থুতু ফেলে বলল, তুই তো বলবিই। তোর বাপের ট্যাঁকে পয়সা উঠছে কি-না! বাপের ব্যাটা হয় হাতের গুণে হয়কে নয় করুক, বুঝি তা হলে। মেসমেরিজম করে কারদানি। ও করলে আমিও এক্ষুনি ধানের ক্ষেতে জাহাজ চালাতে পারি।

চালাও না দেখি! চম্পা বিদ্রূপ করে বলল।

তোর কথায় আর কী! ওস্তাদের নিষেধ আছে। বাহাদুর হওতো নিজের দু'খানা হাত দিয়ে খেলা দেখাও। মেসমেরিজম তো ছোট জাতের কারবার। বাপ বেটিতে তাই দেখেই চিত্তির!

কথা বলার ধরন দেখে হি হি করে হেসে উঠল চম্পা। বুঝল, খুব হিংসে হয়েছে জহিরের। একটা কিছু যে তাকে কাবু করতে পেরেছে এইটে মনে করে চম্পার ভেতরটা খুশিতে লাফিয়ে উঠল। তাকে খানিকটা খোঁচাতে, খানিকটা মজা করতে হাত বাড়িয়ে বলল, বুঝলাম। একটা সিগারেট দেখি এবার।

গরগর করতে করতে জহির সিগারেট বার করে দিল। এ রকম আকস্মিক মোড় নেবে কথার, তা সে ভাবতে পারেনি। কেমন আমতা আমতা করতে লাগল। নিজের ওপরেই রাগ হল ভীষণ। তার ওপর ঠোঁটের নিচে দাঁতের দাগ এখনো কালো হয়ে আছে।

আগুন নেভাতে গিয়ে চম্পাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল সে আচমকা। চম্পা নিচু গলায় গর্জন করে উঠল, ছাড়ো। কিন্তু ছাড়ল না জহির। তারা দাঁড়িয়েছিল স্টেজের পেছনে ঝোলান কালো পর্দার নিচে। সেখানে অন্ধকারে দুম করে একটা শব্দ হল শুধু। কাঠের পাটাতনের ওপর ভারি দুটো শরীর পড়ে যাওয়ার শব্দ। জহির তাকে বুকে চেপে ধরে গড়াতে গড়াতে কালো পর্দার ধুলো-ভর্তি ভ্যাপসা-গন্ধ ভাঁজের নিচে সেঁদিয়ে গেল। চম্পার মনে হচ্ছিল পাঁজর ক'খানা যেন গুড়িয়ে যাবে।

ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।

চুপ।

তার মুখ চেপে ধরল জহির। তারপর একটা মাত্র অস্বস্তিকর মুহূর্ত। চম্পার সমস্ত শরীর যেন অবশ আর অচেনা হয়ে গেলে সেই মুহূর্তে। সারা শহর আজ বিকেলের হঠাৎ বৃষ্টিতে যেমন হয়ে গিয়েছিল, অবিকল তেমনি। একবার শুধু জহির দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করল, দ্যাখ, কাকে বলে মেসমেরিজম! চম্পা, তুই আমার বউ হবি?

চম্পা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখল আল্লারাখা প্রফেসরের সমুখে নতমুখে বসে আছে। ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি রান্না করতে লেগে গেছে। আর ছোট সাকরেদ সামাদ বসে বসে জিনিসের লিস্টি মেলাচ্ছে। প্রতি শো-এর পর ওর হচ্ছে এই কাজ। তার কাছে গিয়ে বসল চম্পা। বলল, দে আমাকে, আমি দেখছি।

সামাদ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করল, শুনলাম, ঐ লোকটাকে দলে নেয়া হলো।

কে ?

ঐ যে গোলাপ। ওস্তাদ বলতেই রাজি হয়ে গেল। দল ভাঙাতে এসেছে কি-না বুঝতে পারলাম না।

কেন ?

ফট্ করে রাজি হয়ে গেল কি-না। অনেকে ওরকম খেলা শিখে নিয়ে শেষে বারোটা বাজায়। নিজে দল করে। কাজটা বোধহয় ভাল করলেন না ওস্তাদ।

কিন্তু চম্পা একটুও অবাক হল না আল্লারাখাকে তার বাব্বা দলে নিয়েছেন শুনে। সে যে দল একদিন ভাঙতে পারে সে সম্ভাবনাও তাকে বিচলিত করতে পারল না। সামাদ এ সব বলে কয়ে চম্পার একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে, দলের একজন বলে দুর্ভাবনার দাবি দেখাচ্ছে— সেটাও চোখে পড়ল না চম্পার। সে বসে বসে জিনিসের লিস্টি মেলাতে লাগল। চম্পার মন ছিল না এখানে, কিংবা কোনখানে। নিজে সে জানতেও পেল না, একটা বিরাট হাই তুলল চম্পা।

আল্লারাখা খেল অত্যন্ত অল্প। প্রফেসর খেতে খেতে নিজে তাকে তুলে দিচ্ছিলেন, কিন্তু ফিরিয়ে দিল সে। ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি অবাক হল, একটা মানুষ এতো কম খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে কী করে ? এ যে একেবারে পাখির আধার! তাহোক, বাঁচলে পেট পুরে খেতে পারবে খাড়ানাক, বোঁচানাক, পটকা আর চালকুমড়ো। সবার পরে ওরা খেতে বসবে।

শোবার কিছু সঙ্গে নেই, প্রফেসর তাকে কালো আলখাল্লাটা বিছোতে দিলেন আর একটা বালিশ। চম্পার বদ অভ্যেস, দুটো বালিশ না হলে ঘুমোতে পারে না— তার একটা। একঘরে থাকতো সামাদ আর জহির। সামাদকে ব্যাণ্ডপার্টির সঙ্গে শুতে বলে আল্লারাখাকে তার জায়গায় যেতে বললেন প্রফেসর। কিন্তু সে উত্তর করল, এইটুকু তো রাত। এই বলে সে বালিশ নিয়ে স্টেজের এককোণে শুয়ে পড়ল।

আস্তে আস্তে শেয়ালের ডাকে সাহস ফিরে এলো। তারা দল বেঁধে হাঁটতে লাগল বড় সড়কে— দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে বাঁশবনের এপার ওপার করতে লাগল, যেন এটা তাদেরই রাজত্ব। চোখ জ্বলতে লাগল, যেন কোন জ্ঞানী মানুষ মজার ব্যাপার দেখে হাসছে। রাত-চৌকিদারেরা ঘুমিয়ে পড়ল লাঠি হাতে টর্চ কোমরে গুঁজে পথের এখানে ওখানে বসবার জায়গা খুঁজে নিয়ে। রেলইয়ার্ডে পানির ট্যাঙ্ক থেকে টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ করে পানি পড়তে লাগল। একটা রাস্তা— তার এ মাথায় ঘুম আর ও মাথায় জাগরণ। আল্লারাখা একবার শেষ অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলো এ মাথায়, আবার গেল, আবার ফিরে এলো, মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, আবার চলতে লাগল, গেল, ফিরে এলো, গেল, আবার ফিরে এলো।

বালিশে মৃদু সুবাস। অনেক রাত ধরে পরতে পরতে জমেছে, জড়িয়ে গেছে। দু'একটা দীর্ঘ চুল লেগে আছে এখনো। আল্লারাখার ঘুমন্ত গালের নিচের সেই চ্যুত চুলগুলো শিরশির করে নদীর মতো সচল হয়ে উঠছে। আর সেই সুবাস; বোঝা যায় কি যায় না, হয়তো নেই। কোন ফুল, গাছ, পাতা কারো নয়। বোধহয় এরকম সুবাস থেকে আসে তার গোলাপের সুগন্ধ। আল্লারাখা আবার সেই রাস্তাটা দিয়ে বিহ্বলের মতো চলতে শুরু করল।

চোখ খুলে দেখল মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে চম্পা দাঁড়িয়ে আছে। আর চম্পা দেখল, স্টেজের এককোণে, ধূলোভর্তি পাটাতনে কুকুরের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে লোকটা।

আল্লারাখা তখন তার বালিশের পরতে পরতে জড়ানো সুবাসের কথা জানতে পারল। চম্পার মনে হল লোকটার মতো একা আর কেউ নেই— এ একাকীত্ব এতো নিবিড় যেন একটা জামা, যা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে সে। তাই তার ইচ্ছে করলেও সে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না, স্পর্শ করতে পারল না, কথা বলতে পারল না। চম্পার মনে হল, তার ঘুমের ভেতর থেকে তাকে ডেকে এনেছিল লোকটা, এখন কাজ হয়ে গেছে, এখন সে যেতে পারে। সে চলে গেল। তখন আল্লারাখা হাঁটতে হাঁটতে সেই রাস্তার শেষ মাথায় ঘুমের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সারারাতে আর একবারও ফিরে এলো না।

কুড়িগ্রামে একদিনের বদলে আরো তিনদিন শো করতে হল প্রফেসর নাজিম পাশাকে। এখন তার শো-এর সব সেরা ও শেষ আইটেম রক্তগোলাপ। ডাকবাংলোর রাস্তায় যেতে পড়ে ছবিঘর, সেটা প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় হল। সবাই টাউন হলে আসছে ম্যাজিক দেখতে। রাতারাতি গজিয়ে গেছে চা-পান বিড়ির দোকান। লোক আসছে বন্যার মতো— নাগেশ্বরী, ভোগডাঙ্গা, পলাশবাড়ি, কালিগঞ্জ, কাঠাবাড়ি, রাজার হাট, সিন্দুরমতি— কোন গ্রামের আর কেউ বাকি রইল না। লালমনিরহাটে বায়না হয়েছিল, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনদিনের দিন রওয়ানা হতে হল প্রফেসরকে। পর পর বায়না রয়েছে রংপুর, নীলফামারী, বামনডাঙ্গা, গাইবান্ধা, বগুড়া, শেরপুর হয়ে পাবনা, উল্লাপাড়া আর কিশোরগঞ্জে।

এর মধ্যে চম্পার জেদে নাম পাল্টাতে হয়েছে আল্লারাখাকে। সেই বৃষ্টি বিকেলের পরদিনই। নাম শুনে হি হি করে হেসেছিল চম্পা, নতুন নাম দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল সে। অবশেষে প্রফেসরই বাঁচালেন। দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ জেগে উঠে হাঁকডাক শুরু করে দিলেন, চম্পা চম্পা। হয়ে গেছে।

চম্পা দৌড়ে এসে শুধোল, কী বাবা, কী হয়ে গেছে ?

প্রফেসর বললেন, নাম। ঘুমিয়ে আছি, স্বপ্ন দেখলাম, যেন একটা ভারি সুন্দর জায়গায় চলে গিয়েছি, বুঝলি ? লোকে বলল, এটা বেহেশত। জান্নাত। হঠাৎ দেখলাম একটা বাগান। হাজার হাজার গোলাপ। হাসছে, ঝলমল করছে, লাল রঙটার ভেতর থেকে আলো বেরুচ্ছে যেন। আর কস্তুরীর মতো ঘ্রাণ। চম্পা, এ রকম অবাক কাণ্ড জীবনে দেখিনি। যখন তুই মায়ের পেটে, তখন তোর মা এরকম স্বপ্ন দেখেছিল। বলতে বলতে গাঢ় হয়ে এলো তাঁর কণ্ঠ, উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখ। তিনি বলে চললেন, আমাকে জাগিয়ে তুলে তোর মা বলল, আমি বেহেশতকে ফিরদৌসও বলে কি-না, তাই ও নামটা পছন্দ হয়েছিল তার।

চম্পা বলল, তার বদলে হলাম আমি। মা কী বলল তখন ?

তোর মা'র কি আর মনে ছিল ? বলে, আমারই ছিল না। ফুটফুটে দেখে তোর নাম রাখলাম চম্পা ? হঠাৎ আজ মনে পড়ল। কী আশ্চর্য আল্লারাখার নাম নিয়ে সকালে এতো জল্পনা করলি। নাম রেখে দে ফিরদৌসি। কী বলিস ? ওর খেলার সঙ্গে মানাবে ভাল।

স্ত্রী যে নামটা একদিন পছন্দ করেছিলেন সেটা কাউকে দিয়ে দিতে যেন তাঁর সংকোচ করছে। যেন ঘরের জিনিস না বলে না কয়ে দান করে দিচ্ছেন। চম্পার মুখের দিকে তাই উদগ্রীব হয়ে তাকালেন তিনি। যেন চম্পা বললেই নিজের আর অপরাধ থাকে না। চম্পা

বলল, চমৎকার! কী যে নাম রেখেছিল ওর বাপ-মা, হাসি পায়, না বাবা ?

চম্পা নিজেই গিয়ে খবরটা দিয়ে এলো আল্লারাখাকে। বলল, আজ থেকে ফিরদৌসি বলে সব সময় ডাকা হবে। ডাকলে যেন সাড়া পাই।

আচ্ছা। বেশ নাম। আল্লারাখা তখন কোথা থেকে চামড়া এনে কালকের পুড়ে যাওয়া ড্রাম মনোযোগ দিয়ে মেরামত করছিল।

সে রাতের শো-এ সমস্ত আইটেম যখন শেষ হয়ে গেল, তখন প্রফেসর নাজিম পাশা স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার তালি দিলেন। আরপর ঘোষণা করলেন, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের শেষ আইটেম— রক্তগোলাপ। করতালিতে ভরে উঠল টাউন হল। সাত আসমান আর দো-জাহানের লাখো কুদরৎ-এর এক কুদরৎ রক্তগোলাপ— একটানা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন প্রফেসর নাজিম পাশা— সারা দুনিয়ার বড় বড় যাদুকর, বড় বড় ম্যাজিশিয়ান, বড় বড় কুদরতি কামেল পর্যন্ত এ খেলার সন্ধান জানে না। শত শত বৎসরে একজন— মাত্র একজনকে এই অদ্ভুত মায়া শক্তি দেওয়া হয়। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য রক্তগোলাপ। বাগান লাগে না— গাছ হয়; পানি লাগে না— বড় হয়; দুনিয়ার সাত ভেজালে বাঁধা চোখ দিয়ে সে ফুল দেখা যায় না। সেই ফুল, সেই রক্তগোলাপ দেখাবেন আজ আমার প্রিয় সাকরেদ ফিরদৌসি। ব্যাণ্ডপার্টি প্রবল বিক্রমে শুরু করল বাজনা, শ্বাসরুদ্ধ করে বসে রইল দর্শক, প্রফেসর বাজনার তালে তালে বলে চললেন, ফিরদৌসি— আমার প্রিয় সাকরেদ— রক্তগোলাপ। ভাগ্যবানেরা একটি করে পাবে— বাড়ি নিয়ে যাবেন— খোশবুতে ভরে উঠবে ঘর। বিলাত থেকে লোক এসেছিল, আমেরিকা লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিল, জাপান হাওয়াই জাহাজ পাঠিয়েছিল, তবু আমার সাকরেদ ফিরদৌসি তার দেশ ছেড়ে যায় নাই। বন্ধুগণ, টাকা দিয়ে কেনা যায় না, সাধনা করে পাওয়া যায় না, সাত আসমান আর দো-জাহানের লাখো কুদরৎ-এর এক কুদরৎ রক্তগোলাপ।

স্টেজে এসে তখন দাঁড়াল ফিরদৌসি। নীরবে নত হয়ে সালাম করল। পর মুহূর্তে তার হাত দু'টি রূপান্তরিত হল বিদ্যুতে। ঝড়ের মতো উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল গোলাপ, বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল, ঝর্ণার মতো নাচতে লাগল অসংখ্য গোলাপ। করতালিতে মুখর হয়ে উঠল হল।

কড়িগ্রাম থেকে ডেরা তুলবার আগে প্রফেসর আবার তাঁর প্ল্যাকার্ড আঁকিয়ে নিয়েছেন ওখানকার একমাত্র সাইনবোর্ড লিখিয়ে জীবন রায়কে দিয়ে। এবারে প্ল্যাকার্ড আরো বড় করা হয়েছে। তার মাথায় এবার আঁকা হয়েছে ফিরদৌসি আর রক্তগোলাপের চিত্র। পয়সা নামমাত্র নিয়েছেন জীবন বাবু, পরিবার নিয়ে সামনের সারিতে বসে সেকেণ্ড অফিসার, সার্কল অফিসারদের সঙ্গে শো দেখতে পেয়েছেন ফ্রি পাসে, তাতেই খুশি। ফিরদৌসি তাঁকে একটা বড় গোলাপ দিয়েছিল স্টেজ থেকে নেমে এসে, সেইটে দোকানে রেখেছেন তারপিনের খালি শিশিতে পানি ভরে, জিইয়ে। রাস্তার লোক ধরে ধরে গল্প করলেন ক'দিন, বুঝলে হে। সবাইকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, আমাকে দেখে একেবারে নেমে এসে— দেখছইতো কতো বড়, এতো বড় আর কেউ পায়নি।

লোকেরা তাজ্জব হয়ে দেখে আর মাথা নাড়ে। কেউ কেউ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে। বলে,

একেবারে সত্যি গোলাপ হে! সেইটেই আশ্চর্য। রোজ রোজ এতো গোলাপ আসে কোত্থেকে?

উত্তর দিতে পারে না কেউ। নানারকম গুজব। একেকজনে একেক কথা বলে। কিন্তু কারো কথাই কাজের মনে হয় না। সবাই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সত্যিই তো, এতো গোলাপ আসে কোথা থেকে? যতোই বলুন প্রফেসর নাজিম পাশা, বাগান লাগে না— গাছ হয়, লোকরা মনে মনে কল্পনা করতে থাকে মাইল দু'মাইল জুড়ে এক বিরাট বাগানের।

দলের কাছেও এ এক বিরাট রহস্য। ফিরদৌসির গুণটা কোথায়? প্রথম ক'দিন কেউ তাকে জিগ্যেস করতে সাহস পায় না। সাহস ঠিক নয় সুযোগ হয় না। বলতে গেলে কারো সঙ্গে কথাই বলে না ফিরদৌসি। কখন বসে একটুখানি খেয়ে নেয়। সারাদিন একটা পাতা কী কাঠি কী ফড়িং যা পায় তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে থাকে, যেন এই প্রথম দেখছে। শো-র সময় আরেক কাণ্ড! পোশাক পরবার পর থেকে হাত পা কাঁপতে থাকে। ভীষণ ভয় করতে থাকে তার। ঠোঁট শুকিয়ে যায়। তারপর খেলা দেখিয়ে মরা একটা মানুষের মতো গা হাত পা ছেড়ে শুয়ে থাকে, সংকুচিতভাবে, চোরের মতো, বারান্দায় কী স্টেজের এক কোণায় বিছানা পেতে। একটু ভাল ঘর, বিছানা, খাওয়া দিতে গেলে বা কেউ কথা বললে বিব্রত হয়ে পড়ে, বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ মানুষকে জিগ্যেস করাও ঝকমারি। ক'দিন সবাই চোরা নজরে রাখে ওকে, যদি রক্তগোলাপের হদিশ পাওয়া যায়। তাতেও কোন লাভ হয় না। এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও যায় না ফেরদৌসি, চোখের আড়াল হয় না। সামাদ একদিন সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছে । নাঃ, ঘুম থেকে একবারও কোথাও উঠে যায়নি ফিরদৌসি। জহির, যে জহির প্রথম দিন মেসমেরিজম বলে তুচ্ছ করেছিল, ভাবনায় পড়েছিল সেও। আসলে সেও বুঝতে পেরেছে, এ মেসমেরিজমের কর্ম নয়। তাহলে গুণটা কোথায় ফিরদৌসির?

ক'দিন পরে দলে যখন একটু পুরনো হল সে তখন খুচরা জিগ্যেসাবাদ শুরু হল। কখনো সামাদ, কখনো ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি, কখনো জহির। দলের পশার বেড়ে গেছে ফিরদৌসি যোগ দেবার পর, রোজ নতুন বায়না আসছে, জহিরের এটা সহ্য হয় না। ফিরদৌসির দিকে তার তাচ্ছিল্য তাই দিনে দিনে বাড়ছিল, আর মনে মনে ভাবছিল গুণটা জেনে নিতে পারলে ঘাড় ধরে নাবিয়ে দেয়া যেতো রাস্তায়। জহির একে ওকে লাগায়। তাদের প্রশ্ন শুনে ফিরদৌসি ম্লান হাসে, বিব্রত হয়ে এদিক ওদিক তাকায়। যেন এদের ভাষাটাই সে বুঝতে পারছে না। চম্পার জন্যে মনটা তার কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে, কারণ চম্পা তাকে জিগ্যেস করে না, তার গোলাপ দেখে অবাক হয় না। ফিরদৌসি যেন বুঝতেই পারে না, তার গোলাপ দেখে এতো অবাক হবার কী আছে?

এদিকে আরো ব্যাপারে শান্তিটুকু বলতে নেই জহিরের। সেদিন সেই রাতের পর চম্পা তাকে আর দশ হাতের মধ্যে আসতে দেয় না। হাসতে গেলে মুখ আঁধার করে ফেলে, কথা বললে উত্তর দেয় না। চম্পাকে আর একা পাওয়া যায় না। রক্তে যে আগুন ধরেছে সে রাতে, থেকে থেকে তা জহিরকে এমন করে পোড়ায় যে মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যায়। তখন মোদক দু'চার দলা মুখে না দিলে শরীরটাতে আর ঝিম আসে না। কেন যেন তার সব রাগ গিয়ে আরো বেশি করে পড়ে ফিরদৌসির ওপর।

একদিন প্রফেসরকে বলেই ফেলল জহির, ওস্তাদ, আমরা না হয় ফ্যালনা চ্যালা। আপনাকে

তো সে গোলাপের গুণ বলতে পারে। আমরা না হয় দেমাক সইলাম, আপনাকে যে ব্যাটা অপমান করছে, এটা আমাদের সহ্য হয় না। সাচ্চা সাকরেদ হয়, বলুক সব খুলে আপনাকে।

প্রফেসর তাকে শান্ত করলেন বুঝিয়ে। নিজেও ভাবলেন, সত্যি, আমাকে অন্তত ফিরদৌসির বলা উচিত। পুরনো সাকরেদ জহির, তাঁর দিকে টান আছে বলেই না যে কথা তিনি খেয়াল করেননি, সেটা মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

তখন শো হচ্ছিল নিলফামারীতে। এক রাতে শো শেষে ফিরদৌসিকে নিজের ঘরে ডেকে এনে দোর বন্ধ করে তিনি জিগ্যেস করলেন, তোমার গুণটা আজ আমাকে বলো। আর কিছু না।

ফিরদৌসি অবাক হয়ে চোখ তুলল। যেন এতোদিন ধরে ফিস্‌ফাস্‌ চলছে তার বিরুদ্ধে এইটে সে আজ হঠাৎ বুঝতে পেরেছে।

ফিরদৌসি।

কী?

বলো।

চুপ করে রইল সে। তখন প্রফেসর কাঁধে হাত রেখে অভয় দিলেন, এখানে কেউ নেই। কেউ জানবে না। আমি কসম করছি ফিরদৌসি, কাউকে বলবো না তোমার গুণ। বলো।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন প্রফেসর। তবু কোন জবাব নেই। তখন অন্য পথ ধরলেন, দ্যাখো ফিরদৌসি, আমাকে তুমি ওস্তাদ মানো?

জি।

দলে নেবার সময় তোমাকে হাত ধরে সাকরেদ করেছিলাম?

জি।

ওস্তাদকে না বলা, তার কথার অবাধ্য হওয়া, ভাল?

চৌকির ওপর বসে বসে ঘামতে লাগল ফিরদৌসি। বিছানার ওপর প্রফেসরের যাদুর লাঠিটা পড়েছিল, খামোকা সেটা নাড়তে লাগল। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল তার গায়ে নানা রংয়ের আংটিগুলো। বুক ফেটে যেতে লাগল ফিরদৌসির। কিন্তু কথা বলতে পারল না।

তখন প্রফেসর নিরাশ হয়ে তাঁর শেষ অস্ত্র ছাড়লেন। বললেন, আমার শো-এর সব খেলার গুণ আমার জানা। এ না হলে দল চলে না। জহির, সামাদ, চম্পা— এরা সবাই আমার হাতে গড়া আর্টিস্ট। সবাই আমাকে জানাতে বাধ্য। তোমার বেলায় এতোদিন জানতে চাইনি, ভেবেছিলাম নিজেই বলবে। আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে একদিন। এতোদিন হয়ে গেল, এখনো যদি না বলো আর চলে না। দলের সবাইকে আমি বলবো কী?

উৎকর্ণ হয়ে প্রফেসর জিগ্যেস করলেন, কী, কী বললে?

একটা উত্তর দিয়েছিল ফিরদৌসি। আবার সে বলল, তেমনি অস্ফুট স্বরে, তাহলে, আমি বরং চলেই যাই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রফেসর। বলে কী! চলে যাবে! আর একটা কথা বলতে পারলেন না তিনি। মনে হল, ডান হাতখানা কে কেটে নিয়ে গেল। চোখের সমুখে লাফিয়ে জীবন্ত হয়ে

উঠল আবার সেই ছবি— হলে দর্শক নেই, দু'বেলা শুধু খিচুড়ি, পোশাকে তালির পর তালি পড়ছে, ট্রেনের টিকেটের পয়সা নেই। ফিরদৌসি আসবার পর গত দু'মাসে পশার এতো বেড়েছে, পয়সার ঝনঝন এতো দীর্ঘ হয়ে উঠেছে যে, সে কখনো চলে যাবে, যেতে পারে, এটা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখছিলেন পাকিস্তান যাবেন, ইরান-তুরান যাবেন, বিলাত আমেরিকায় শো করবেন, পাল্লা দেবেন পি.সি. সরকারের সঙ্গে— সব যেন দপ করে নিবে গেল ফিরদৌসির একটা মাত্র কথায়।

ফিরদৌসি আস্তে আস্তে চৌকি ছেড়ে উঠে, দরোজা খুলে, বাইরে মধ্যরাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। অসহায়ের মতো বোবা চোখে সেই অসম্ভব তাকিয়ে দেখলেন প্রফেসর নাজিম পাশা।

চম্পা এ ঘরে এসেছিল, অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। বাবা নিঃশব্দে কাঁদছেন। বসে আছেন চৌকির ওপর, দুটো হাত হাঁটুর ওপর রাখা, কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। বাবাকে আজ কাঁদতে দেখে সত্যি অবাক হল চম্পা। কারণ বাবা গত দু'মাসে একদিনও কাঁদেনি। চম্পা ভুলেই যেতে বসেছিল বাবার ওই শিশুর মতো কান্নার স্বভাবকে। আজ কেন যেন তার অশ্রু ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। বড় দুর্বল মনে হল নিজেকে। মনে হল, তার কেউ নেই। আর দাঁড়াতে পারল না সেখানে, দেখতে পারল না বাবাকে; চৌকাঠের বাইরে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল চম্পা।

পটকা বিছানা বগলদাবা করে শুতে যাচ্ছিল, চম্পাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাঁড়াল। উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করল, কী?

চম্পা তখন ম্লান হেসে উত্তর দিল, নারে কিছু না। তুই ঘুমোগে। বড্ড গরম পড়েছে।

চলে গেল পটকা। তখন আরো একা লাগল চম্পার। আস্তে আস্তে প্রাণহীনের মতো বসে পড়ল সে টুলের ওপর। শেষ হ্যাজাকটা জ্বলছিল শেষ প্রান্তে জহিরদের কামরায়— শো হচ্ছিল হাইস্কুলে আমের বন্ধে— নিভে গেল। যেন লাফিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ চারদিকের ওৎ পেতে থাকা অন্ধকার। স্কুলের সামনে বিরাট জামরুল গাছের পাতা সরসর করতে লাগল। দূরে একটা লিচু গাছে ঢন্ ঢন্ করে বাজতে লাগল বাদুর-তাড়ুয়া টিন। একটা কুকুর রাস্তার ওপর বেরিয়ে এসে চারদিকে দেখল. মাটি শুঁকল তারপর জ্বলজ্বল কোটি কোটি তারার দিকে মুখ তুলে অবিকল মানুষের বাচ্চার মতো কেঁদে উঠল।

ঘুমের মধ্যে জেগে উঠল চম্পা। বালিশ থেকে মাথা তুলে দেখে বাবা তাঁর চৌকিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নিচে মাটিতে রাখা হারিকেন জ্বলছে চোখ বুঁজে। আর কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। কিন্তু তবু কে যেন তাকে ডাকছে, শোনা যাচ্ছে না, বুকের ভেতরে ঠেলে ঠেলে উঠছে নিঃশ্বাস।

স্কুলের প্রায় সবগুলো দরোজাই খোলা। অন্ধকারে তারা হাঁ করে আছে এক অমিত ক্ষুধা নিয়ে। তাদের প্রত্যেকের সামনে বাতি নিয়ে দাঁড়াল চম্পা। এ ঘর সে ঘর খুঁজল, কিন্তু পেল না। লম্বা বারান্দায় কাঠের থামগুলো একের পর এক পেরিয়ে এসে নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। আবার কেঁদে উঠল সেই কুকুরটা। আবার ঠেলে ঠেলে নিঃশ্বাস। আবার খুঁজল চম্পা। তখন পেল। একেবারে মুখের 'পরে মুখ রেখে ফিসফিস করে ডাকল— ফিরদৌসি।

সে শুয়েছিল একা একটা ঘরে, শানের ওপর, বুক অবধি পা দুটো টেনে, জড়সড় হয়ে। মাথা থেকে সরে গেছে বালিশটা।

সেই রাস্তায় ঘুমের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল ফিরদৌসি, হঠাৎ বিহ্বলের মতো চলতে শুরু করল। মাঝপথে এসে থামল, বুঝতে পারল না। কোন দিকে যাবে। ফিরে যাচ্ছিল, আবার থামল। তারপর এ মাথায় এসে দেখতে পেল চম্পাকে, চম্পার নতমুখে একগুচ্ছ চুল। বলল, চম্পা, আমি যাবো না, আমি যাবো না।

তার কপালে হাত রাখল চম্পা। ফিরদৌসি সে হাত ধরে উঠে বসল তখন। বলল, কেন ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে ?

কী ?

আমি যে কিছু বলতে পারি না। আমি যেতে চাই না, চম্পা। বলতে বলতে সে হাত রাখল চম্পার চুলে, সেখান থেকে বেরুল গোলাপ। স্বপ্নের মতো হাসল চম্পা। এক হাতে সেটাকে সে ধরে রইল দু'জনের মাঝখানে। চম্পা বলল, চলো, আমরা যাই। যাবে ?

কোথায় ?

চোখে চোখে তাকিয়ে রইল দু'জনে। নাগর-দোলার মতো তাদের চোখ থেকে চোখে উঠতে পড়তে লাগল আনন্দ, বিষাদ, বাস্তব, বিভ্রম।

ফিরদৌসি তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে চুলের মধ্যে ঠোঁট রেখে বলতে লাগল, প্রথম যেদিন এলাম, তোমার কপালে এসে পড়েছিল চাঁদের মতো কয়েকটা চুল। তোমার মনে নেই চম্পা ? আমার তখন মনে হল, আমি পারি। তোমার চুলের ভেতর থেকে আমি প্রথম গোলাপটা পেয়েছিলাম। না ?

রাস্তার ওপর থেকে কুকুরটা তখন বনের দিকে চলে গেল। পাতার মধ্যে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে রইল রাত্রির বাতাস, যেন সেও উৎকর্ণ হয়েছে শুনবে বলে।

আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে, ঐ তো গোলাপ। ঠিক যেমন তোমাকে দেখছি চম্পা, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। রঙ, গন্ধ, সব। আমি হাত দিই, হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি গোলাপ। তখন আমি চারদিকে গোলাপ দেখতে পাই। আমার মন বলে, হাত দিয়ে ছুঁলেই ওরা আমার হাতে এসে পড়বে। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে ?

চম্পা তার বুকের পরে মুখ রেখেই বলল, না।

তোমার বিশ্বাস হয় না ?

হয়।

তোমার বাবা জিগ্যেস করলেন, আমি বলতেই পারলাম না।

চম্পা মুখ তুলে বলল, চলো, আমরা যাই।

কান্নার মতো করে উঠল ফিরদৌসির মুখ। শুধোল, কেন চম্পা ?

আমার খুব দুঃখ। আমি খুব একা। আমি তো আর কিছু না, আমাকে ওরা আর্টিস্ট ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। বাবাও না। বাবার জন্যে জহিরকে আমি কিছু বলতে পারি না। আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে নিয়ে চলো তুমি।

তখন ফিরদৌসি হাসল। ছিঃ, দুঃখ থেকে পালায় না চম্পা। দুঃখ থেকে আনন্দ আনতে হয়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে চম্পা। আনমনে বাতিটা নিয়ে বড় করে, ছোট করে। ব্যাকুল দু'চোখ মেলে ফিরদৌসি বলে, আমার গোলাপ চম্পা— আমি তো জানি নেই। তবু ভেতর থেকে যখন খুব বিশ্বাস হয়— আছে, তখন হাত দিলেই পাই। পালাবে কেন ? দুঃখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো— ঐ তো, কই দুঃখ ? ঐ তো, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দ্যাখো চম্পা, ঐ তো তোমার সব আনন্দ ফুলের মতো হাসছে। ছিঃ, পালাবে কেন ?

চম্পাকে আবার বুকের মধ্যে টেনে নিল ফিরদৌসি। তখন চম্পার মনে হল, তার আর কোন দুঃখ নেই। তার যাযাবর জীবনে একাকীত্ব নেই, বাবার পেশায় আত্মদানেও বেদনা বা জ্বালা নেই, জহিরের লোভাতুর হৃদয়টাও যেন তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। বেঁচে থাকার প্রবল তাগিদে যে পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চম্পা, বেঁচে থাকার জন্যে যতো মৃত্যুকে তার স্বীকার করে নিতে হয়েছে, সব এই মুহূর্তে ঝলমল করে উঠল এক অখণ্ড গৌরবে, অহংকারে।

ফিরদৌসি বলল, কেউ বিশ্বাস করবে না চম্পা।

চম্পা বলল, হ্যাঁ কেউ বিশ্বাস করবে না।

সেই রাস্তায় ফিরদৌসি দেখতে পেল চম্পা তার পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। এবার আর কোথাও থামল না, একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা দু'জন। বাতাস আবার সরসর করতে লাগল জামরুলের পাতায়। বাদুর-তাড়ুয়া টিন আবার সারারাত ঢন্ ঢন করতে লাগল। বনের মধ্যে পাতায় ছাওয়া নিবিড় একটা বিছানায় ঘুমিয়ে থাকল সেই কুকুরটা।

জহির বলল, আমি নিজে দেখেছি ওস্তাদ। পটকা, বোঁচানাক ওরাও দেখেছে। বাঞ্চোতের সাধুপনা আজ আমি গলায় পা দিয়ে বার করবো। কুত্তা কাঁহি কা।

প্রথমে দেখেছিল বোঁচানাক। ভোরবেলায় উঠে টিউবওয়েলের দিকে যাচ্ছিল, দেখে দরোজা হাট করা। ভেতরে ফিরদৌসির বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে চম্পা।

প্রফেসরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল জহির। চিৎকার করে বেলা মাথায় তুলে ফেলল— আমি আর একদণ্ড নেই দলের সঙ্গে। এ সব আমি দেখতে পারবো না। গোলাপের গুণ এতো করে জিগ্যেস করল তবু বলল না। কতো বড় ওস্তাদ ? এখন আবার ছি ছি কেলেঙ্কারী। এই আমি চললাম। দেখি, কে আমাকে রাখে। ওস্তাদ তো বুড়ো হয়ে চোখের মাথা খেয়েছে। আমি না থাকলে কবে ছত্রখান হয়ে যেতো।

তাকে আর কিছুতেই থামানো গেল না।

প্রফেসর প্রথমে বিহ্বল, পরে ভীত, শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। গতরাত্রে ফিরদৌসির ব্যবহারে এমনিতেই মর্মাহত হয়েছিলেন, আজ এ কথা শুনে আগুন জ্বলে উঠল শরীরে। তার ওপরে বারান্দা থেকে জহিরের ক্রমাগত দল ছেড়ে যাওয়ার হুমকি শুনে পায়ের নিচে এক ফোঁটা মাটি পেলেন না তিনি।

ওদিকে এতো চিৎকারের উৎপত্তি, দু'জন জেগে গেছে। তারা দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল, সে দৃষ্টিতে বিনিময় হল আমরণ বিশ্বাসের এক ক্ষণবিদ্যুৎ।

চম্পা বেরিয়ে এসে বারান্দা ঘুরে, ঘরের মধ্যে প্রফেসর আর বাইরে জহির ও ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তির সমুখ দিয়ে মাথা উঁচু করে, স্মিত মুখে চলে গেল যে ঘরে উনুন করা হয়েছিল।

সেখানে সে ছাই তুলে দাঁত মাজতে লাগল টুলের ওপর নির্বিকার বসে বসে পা দুলিয়ে। পটকা এলো, তার পায়ে পা দিয়ে খোঁচা মেরে বলল, কচ্ছপের মতো আর হাঁটতে হবে না। চা কর শীগগীর, খিদেয় মাথা ঘুরছে। পটকা যেন সে কথা শোনেইনি, চোয়াল ঝুলিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তখন চম্পা তার কান ধরে উনুনের কাছে দাঁড় করিয়ে দিল। হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, কান তো নয়, দুটো আমের আঁটি। কী শক্তরে বাবা!

ফিরদৌসি এসে দেখল পায়রার খোপে পায়রাগুলো ডানা ঝটপট করছে আর তারের জালে ঠোঁট ঘষছে, যেন কেটে ফেলবে। সে চোখ গোল করে বলল, দাঁড়া, দাঁড়া। তারপর একটা একটা করে তাদের বার করতে লাগল আর আঙুল দিয়ে পালকে চিরুনি করতে করতে আদর করল, নকল স্বরে বাক্-বাকুম ডাকল. গালে গলায় চেপে ধরতে লাগল চোখ বন্ধ করে, ঘষতে লাগল।

সে রাতে চম্পাকে জোর করে অঙ্কশায়িনী করবার পর থেকে মনের মধ্যে একটা গ্লানি ছিল জহিরের যেটা কিছুতেই যাচ্ছিল না। চেঁচামেচি করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল গ্লানিটা যেন আর নেই। তখন আরো চিৎকার করতে লাগল সে, জেদি একটা খোকার মতো এক কথাকেই বারবার বলতে লাগল, শেষে তেড়ে গেল ফিরদৌসিকে আজ একচোট শিক্ষা দেবে বলে। আজ একটা সুযোগ, আজকের আগুনেই তাকে জঞ্জাল পুড়িয়ে পথ পরিষ্কার করতে হবে। রোষটা নিভে যেতে দিলে চলবে না।

ওরে বদমাশ, পায়রা আদর করা হচ্ছে। ফিরদৌসিকে দেখতে পেয়েই তিড়বিড় করে উঠল জহির। তার পেছনে এসেছেন প্রফেসর, নিঃশব্দে। জহির বলল, কথার জবাব নেই কেন?

ফিরদৌসি বড় বড় চোখ মেলে তাকাল। বলল, আমাকে কিছু বলছিলে? বলেই সে আবার পায়রার দিকে মনোযোগ দিল।

চিৎকার করে উঠল জহির, তোমার আস্পর্দ্ধা আমি দেখছি। আমার বউয়ের ওপর মেসমেরিজম? তার জাত নষ্ট করা?

তোমার বউ? অবাক হল ফিরদৌসি।

হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল জহির। তারপরই স্বমূর্তিতে ফিরে গেল সে। ঐ একই কথা। বউ না হোক, চম্পার সাথে আমার বিয়ে হবে।

আমি তো চম্পাকে বললাম, পালাতে নেই। তোমাকে বলেনি?

এবার জহিরের অবাক হবার পালা। প্রফেসরও বিস্ময়ে বলে উঠলেন, কে পালাতে চায়?

তেমনি শান্তকণ্ঠে পায়রা আদর করতে করতে ফিরদৌসি জবাব দিল, কেন, চম্পা। বোকা মেয়ে, ওকে বললাম...

জহির প্রফেসরকে বলল, ওস্তাদ, চম্পাকে নিয়ে পালাবার মতলব আঁটছে। এখন ধরা পড়ে মিউ মিউ করছে মেনি বেড়ালের মতো। বটে, পালাতে হলে জানটা রেখে পালাবি হারামজাদা।

বলেই এক ঝটকায় ফিরদৌসিকে টেনে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল জহির। এই আকস্মিকতায় হঠাৎ ফিরদৌসির হাত থেকে পায়রাটা ছাড়া পেয়ে গেল, বিষম ভয় পেয়ে সেটা এক প্রবল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জহিরের মুখে— মুখটাকে একটা কার্নিশ কী গাছের ডাল মনে করে সেখানে বসবার জন্যে দু'পায়ের তীক্ষ্ণ নখর মেলে আঁচড়াতে লাগল।

মুহূর্তে সূতোর মতো অসংখ্য রক্তাক্ত রেখা ফুটে উঠল জহিরের মুখে। বিকট আর্তনাদ করে উঠল সে। দু'হাতে মুখ ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। আর বোকার মতো দাঁড়িয়ে প্রফেসর 'আরে এ-কী' করতে লাগলেন। তখন ফিরদৌসি খপ করে পায়রাটাকে ধরে হাতের এক লম্বা দুলুনি দিয়ে উড়িয়ে দিল জানালা দিয়ে।

তার চিৎকারে ছুটে এলো সবাই। ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি রক্ত দেখে 'খুন খুন' বলে লাফাতে লাগল। সামাদ এসে চেপে ধরল জহিরের হাত। জহির হাঁপাচ্ছিল, তখনো মুখ ঢাকছিল, যদিও পায়রাটা ছিল না। প্রফেসর তাকে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, চুপ চুপ। তার সবচে' বড় ভয়, বাইরের কেউ শুনতে পেলে দলের সুনাম নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। সবার শেষে এসে দাঁড়াল চম্পা।

চম্পা যেন তার বাবাকে আজ আর চিনতে পারল না। রুষ্ট স্বরে, সম্রাটের মতো তাঁর কণ্ঠে আদেশ, এই ওকে ঘরে নিয়ে ওষুধ দাওগো। চম্পা, তুমি যাও, আমার হাত-বাক্সে ওষুধ আছে। সামাদ, বাইরে দাঁড়িয়ে দ্যাখো, বাজে লোক ভিড় করতে দিও না।

আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে গেল ঘর। কেবল প্রফেসর আর ফিরদৌসি মুখোমুখি।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে গেল। যেন এ নিস্তব্ধতা আর কোনদিন ভাঙবে না। হঠাৎ ফেটে পড়লেন প্রফেসর নাজিম পাশা— বেরিয়ে, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

চঞ্চল হয়ে উঠল ফিরদৌসি।

আমি ঢের সহ্য করেছি। কাল রাত্তিরে আমার কথার জবাব না দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলে। এখন বুঝতে পারছি, সাহসটা কোথায়। করো তো বাপু মেসমেরিজম। তাই বলে আমার মেয়ের ওপরেও ? তবে জেনে রাখো, মেসমেরিজম আমিও জানি। আমিও পারি তোমাকে এক পায়ের ওপর সারা জীবন দাঁড় করিয়ে রাখতে, বোবা বানিয়ে রাখতে পারি, কুঁজো বানিয়ে রাখতে পারি, রাস্তার কুকুর করে রাখতে পারি। আমার মেয়েকে নিয়ে পালানোর মতলব ? আমার খেয়ে আমারই শত্রুতা ? ইতর, বদমাশ, বেরিয়ে যাও।

একটা কথার জবাব দিল না, প্রতিবাদ করল না ফিরদৌসি। প্রফেসরকে সে ভক্তি করতো, প্রথম দিন থেকে সবাই তাকে দূরের আর অবহেলার মনে করেছে, একমাত্র প্রফেসর করেননি— তখনই যেন সে কেনা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। সে কথা আজো ভোলেনি ফিরদৌসি। চোখ ফেটে পানি আসতে চাইল। মনে হল, তার বাবা মরে গেলেন এই মাত্র। সবচে' বড় হয়ে বাজল, মেসমেরিজমের অভিযোগ। জহির বলেছে, কিছু মনে হয়নি। প্রফেসর বললেন, আত্মধিকারে ভরে উঠল তার মন। মাথা নিচু করে সে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এসে প্রফেসর যখন দেখলেন চম্পা ওষুধ বার করে দেয়নি, আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে, অন্ধের মতো চড় বসিয়ে দিলেন গালে। চম্পা সে আঘাত সইতে না পেরে একটা হাতল ভাঙা চেয়ারের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। এতোটা হবে ভাবেননি তিনি। কিন্তু হঠাৎ বিচলিত হতেও বাঁধল তাঁর। তাই আরো গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি— তুমি ভেবেছ কী ? আমার চোখের ওপর, এতো সাহস তোমার ? তোকে আমি সাত টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেবো, আজই বিয়ে দেবো তোর। এতো বড় সাহস, আমি মরে গেছি মনে করেছিস ?

পিট্‌পিট্ করে চোখ খুলল জহির। ফিটকিরি দিয়ে মুখ ঘষে দিয়েছিল চালকুমড়ো, কন্‌কন্

করছে, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ, তবু তাকাল জহির। একটু জোরে কঁকিয়ে উঠে জানান দিতে চাইল নিজেকে।

বোধহয় তাতে কাজ হল। প্রফেসর নতুন করে বলে উঠলেন, পালাবার মতলব দিচ্ছে, সে তোরই কপাল ভাঙবার জন্যে।

বাইরে জহির আবার কঁকিয়ে উঠল— চাই না, চাই না আমি কিছু। আমি একমুহূর্ত আর থাকবো না। সব খেলা আমি ফাঁস করে দেবো। দেখি কে আমাকে ঠেকায়! দেখি, কোন শালা শো দ্যাখে। আমি মানুষ না, না ? চম্পা আমাকে অপমান করল সেদিন কিছু বললাম না। আর সহ্য করবো না। বেরিয়ে যাবো। সব ফাঁস করে দেবো। আমি কারো খাই না পরি ?

মহা ফাঁপরে পড়লেন প্রফেসর। জহির দল ছেড়ে চলে গেলে যে একেবারে পথে বসতে হবে তাঁকে। আর তার ওপর যদি একেকটা খেলা সবার কাছে ফাঁস করতে থাকে তো— আর ভাবতে পারলেন না তিনি। চম্পাকে ধমকে উঠলেন, জহিরকে হাতে করে শেখালাম পড়ালাম সে কার জন্যে রে ? আমার কী ? দেখি, আমি মরে গেলে কী খাস ? দেখি, তোর বাড় কদ্দুর।

তারপর ধপ্ করে চৌকির ওপর বসে পড়লেন তিনি। চম্পা ভাবল, বোধহয় নিঃশব্দ আবার কাঁদছেন বাবা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল— না, অপলক তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, প্রফেসর বললেন, তোর বিয়ে দেবো জহিরের সাথে। কোন কথা শুনতে চাই না আমি।

খাঁড়ানাক সে সময়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, ওষুধটা।

ও হ্যাঁ, ওষুধটা। বলে প্রফেসর তাঁর হাত-বাক্স থেকে মলমের কৌটোটা বার করে দিলেন।

ফিরদৌসি যেতে পারল না কোথাও, যদিও যেতে ইচ্ছে করল তার। কাঁদতে পারল না, যদিও কাঁদতে ইচ্ছে করল। স্কুলের পেছনে, পাঁচিলের ওধারে এককালে দালান ছিল, এখন শুধু ভিতটা আছে— সেখানে গিয়ে সে বসল। সারাদিন বসে রইল সেখানে। প্রফেসর তাকে মেসমেরিজমের কথা বলে যে কষ্ট দিয়েছেন, তার কোন পরিমাপ নেই। তবু আঙুল দিয়ে ধূলোর ওপর দীর্ঘ দাগ দিল, ছোট করল, একেবারে মুছে ফেলল, আবার নতুন করে আঁকল সে। আবার, আবারও। সারাদিন। ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি কুলি ছেলেদের ঘাড়ে পোস্টার তুলে হ্যাণ্ডবিলের তাড়া নিয়ে বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেল নিত্যকার মতো শহর পরিক্রমায়। সে বাজনা কানেও গেল না ফিরদৌসির। কেউ তাকে খুঁজতে এলো না। সারাদিনের ক্ষুধা তৃষা কেউ কাছে এলো না। শুধু কেঁপে উঠল ঠোঁট। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে লাগল ফিরদৌসি। আমি কী করেছি ? আমার— আমি— চম্পা, কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি কী করেছি ?

একটা বেড়াল অনেকক্ষণ ধরে ঘুরঘুর করছিল তার সামনে, সবুজ চোখে তাকাচ্ছিল আর চোখ বুঁজছিল। সাহস করে যখন একেবারে কাছে এসে গলা তুলে ডাকল মিহি করে, তখন তাকে কোলে তুলে নিল সে। পেটে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, কিরে হতভাগা ?

এতো নাচ দেখাচ্ছিলি কেন ? পিঠ উঁচু করে পায়ে পায়ে ঘোরাই তোর সার হল। আমার কাছে কিছু নেইরে, কিছু দিতে পারবো না। তখন বিড়ালটা গরগর করে উঠল। ফিরদৌসি বলল, বললাম, আমার কিছু নেই। আচ্ছা এটা নিবি ? বেড়ালটা তার হাতে অতবড় লাল গোলাপটা দেখে ভড়কে গেল, চোখ বুঁজল এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর লাফ দিয়ে তীরের মতো পালিয়ে গেল। আর এলো না। হা হা করে হেসে উঠল ফিরদৌসি। হাসতে হাসতে দম বন্ধ হতে বসল, শরীরটা সামনে ঝুঁকে পড়ল, তবু সে হাসি থামল না। তার দমকে চোখ ভরে গেল পানিতে, ঝর ঝর করে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। তারপর হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল, শুধু পড়তে লাগল পানি।

আবার অভিমানটা সচল হয়ে উঠল বুকের ভিতরে। গুমরে মরতে লাগল প্রফেসরের তিরস্কারগুলো। অবোধের মতো কয়েকবার মাথা নাড়ল ফিরদৌসি। হাতের গোলাপটা দেখল। আনমনে একটা পাপড়ি ছিঁড়ল তার। তারপর আরেকটা। এমনি করে সব কটা। ছিঁড়ে উড়িয়ে দিল বাতাসে। তারা পায়ের কাছে নিঃশব্দে এসে পড়তে লাগল। যখন শেষ হয়ে গেল আরেকটা গোলাপ বার করল সে ভিতের ফাটল থেকে। তারও সব পাপড়ি বসে বসে ছিঁড়ল সে। আরেকটা বার করল। তখন যেন নেশায় পেয়ে বসল তাকে। একে একে সাতশ' ছিয়াশিটা গোলাপ কখন সে বার করল এখানে ওখানে স্পর্শ করে আর তাদের পাপড়ি ছিঁড়ল। পায়ের কাছে পাহাড় হয়ে উঠল রক্তগোলাপের ছেঁড়া পাপড়িতে। আবার যখন হাত রাখল তখন আর গোলাপ পেল না। তখন মনে পড়ল, সাতশ' ছিয়াশিটা হয়ে গেছে, আজ আর আসবে না। তখন মনে পড়ল, কেউ বিশ্বাস না করুক, কেউ তাকে ভাল না বাসুক, একজন তাকে বিশ্বাস করে, একজন তাকে অবহেলা করেনি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল চম্পার কপালে দুলতে থাকা চাঁদের মতো একগুচ্ছ চুল। তখন সে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে সূর্যশেষের অন্ধকার; হাঁটতে লাগল ফিরদৌসি। সে ফিরে আসতে লাগল স্কুলের দিকে।

কাউকে জিগ্যেস না করে বেওকুফের মতো টিকেট ঘরের জানালা খুলে বসেছে পট্‌কা আর চালকুমড়ো। চেহারা ভব্য করে টিকেট বেচাতে শুরু করেছে। বিক্রিও হচ্ছে রমারম। দিয়ে কুলান নেই। অথচ ওদিকে সাজঘর অন্ধকার। দরোজা দিয়ে লোক ঢুকছে। এখানকার যারা বায়না করে এনেছিল তাদের লোক গেটে গেটে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে পথ দেখাচ্ছে। কেউ বলছে, দেখবেন মা বোনেরা, ওখানে একটা গর্ত আছে। —এই ভাগো, ভাগো হিয়াসে। দরোজায় খিল দিয়েছে চম্পা। আর খুলছে না। জহির আর সামাদ ডেকে ডেকে সারা হল, সাড়া পেল না। গলা তুলতে পারল না, দরোজা ভাঙতে পারল না, পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায়।

আর প্রফেসর সেই দুপুর থেকে শুয়ে কাঁদছেন, কাউকে চোখেও দেখছেন না। কথা বলবার শক্তিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। চম্পা তার মুখের ওপর বলেছে, না, এ বিয়ে আমি চাই না।

চম্পা।

না, না, না।

সেই মুহূর্তে যেন প্রফেসর চম্পাকে নতুন করে দেখেছিলেন। মিস চম্পা— প্রাচ্যের সেরা রূপসী— যার অঙুলি হেলনে আকাশের বিদ্যুৎ স্তম্ভিত হয়— সে নয়; তাঁর মেয়ে চম্পা।

তখন বড় ক্লান্ত মনে হল নিজেকে। এক পাঁক গ্লানিতে ডুবে গেলেন তিনি। অপরাধীর মতো মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চম্পা চলে গেল পাশের ঘরে, দৃপ্ত পা ফেলে। গালে তার পাঁচটা আঙুলের ছাপ নীল হয়ে ফুটে রয়েছে তখনো।

ফিরদৌসি! বিদ্যুতের মতো তার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রফেসর নাজিম পাশার— প্রফেসর জে.সি. দত্ত-র সাকরেদ মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন ভূইয়া যিনি বারো বছর আগে নিজে এই দল করেছিলেন, তাঁর। চমকে উঠলেন তিনি। যেন সরে গেল স্টেজের উপর থেকে কালো পর্দা। দেখতে পেলেন নিজেকে, জহিরকে, চম্পাকে। ফিরদৌসি আসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যা ছিল গোপন, সে এলো আর তা বেরিয়ে পড়ল— এক অপরিসীম ক্ষুধা, গ্লানি আর করুণার চিত্র, অন্ধকারে নৃত্যপর কংকাল আর উড়ন্ত রৌপ্যমুদ্রা। সে এক নির্মম আগন্তুক, ফিরদৌসি। হাতে তার রক্তগোলাপ।

বালিশে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন প্রফেসর। যোগ্য মনে হল না নিজেকে যে চম্পাকে ডাকবেন, সাহস হল না জহিরকে সামনা করবেন, ভয় হল খুঁজতে গিয়ে ফিরদৌসিকে যদি আর না পাওয়া যায়।

প্রফেসরকে ডাকতে যাচ্ছিল জহির, এমন সময় যারা বায়না করে এনেছিল তাদের একজন পাকড়াও করল তাকে। কী আপনাদের দেরি কিসের? সাতটা কখন বাজে। পাবলিক আর বসে থাকতে চাইছে না।

জহির কোন রকমে উত্তর দিল, এই এক মিনিট। লোকটা চলে গেলে দৌড়ে। সে প্রফেসরকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল— ওস্তাদ, শো-র টাইম হয়ে গেছে। চম্পা দরোজা খুলছে না। টিকেট বিক্রি হয়ে গেছে। ওস্তাদ। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল জহির। প্রফেসর অস্পষ্টভাবে একটা হাত নাড়লেন। জহির আবার তাঁকে ধাক্কা দিল, ডাকল, ওস্তাদ। পাবলিক বসে আছে। আধঘণ্টা হয়ে গেছে। প্রফেসরের হাতখানা অসাড় হয়ে পড়ে গেল বিছানায়।

ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি শো-র শুরুতে বাজাবার জন্যে একটা গৎ জানতো মিনিট পনেরোর। সেটা দু'বার বাজাল। তবু যখন পর্দা উঠল না তখন ঘাম ছুটল তাদের সারা শরীরে। পর্দার এক পাশে দর্শকদের দিকে আড় হয়ে তারা বসেছিল। তাদের ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখে তারা ঘনঘন তাকাতে লাগল পর্দার দিকে আর ঢোঁক গিলল। গৎটা যখন দু'বার বাজানো হয়ে গেল, থামল, তখন এক মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেল হল। সবাই ভাবল বাজনার এই বিরতি বোধহয় পর্দা ওঠার ইঙ্গিত। কিন্তু তা যখন হল না, তখন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে উঠল তারস্বরে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি কংকাল-নৃত্যের সঙ্গে বাজাবার গৎটা শুরু করে দিল চড়া পর্দায়।

তখন হঠাৎ পর্দা উঠল। লোকেরা অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারল না। ব্যাণ্ডপার্টির চারমূর্তি অবাক হয়ে গেল শো-এর শুরুতে প্রফেসরের বদলে জহিরকে দেখে। তার মুখে পায়রার আঁচলের দাগগুলো পাউডারেও ঢাকে নি। এক অজানা ভয়ে ভেতরটা হিম হয়ে গলে চারমূর্তির, কিছু বুঝতে না পেরে আচমকা বাজনা থামিয়ে দিল তারা।

জহির এগিয়ে এলো না। স্টেজের প্রায় পেছন পর্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে কী বলল শুনতে পেল না কেউ এক বর্ণ। চেঁচিয়ে উঠল সবাই— লাউডার প্লিজ, লাউডার প্লিজ। সেই সঙ্গে একটা

তীক্ষ্ণ শিষও শোনা গেল।

দু'পা এগিয়ে এলো জহির। ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আপনাদের প্রিয় আর্টিস্ট মিস চম্পা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ শো দেখানো সম্ভব হবে না। ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ— দড়াম করে এক পাটি জুতো এসে পড়ল স্টেজের ওপর। যেন কিছুই হয়নি, জহির আবার শুরু করল, গলা চড়িয়ে, 'ভদ্র মহিলা'— এবার সাইকেলের আধাখানা টায়ার আর ইটের আস্ত একখান এসে পড়ল স্টেজে। এ এক অদ্ভুত জনতা। এরা কথা বলে না। এরা হাতের কাছে যা পায় ছোঁড়ে, শিষ দেয়, বাচ্চারা কাঁদে। এরি মধ্যে মেয়েদের অভিভাবকেরা মেয়ে সামলাবার জন্যে চারদিকে ওঠবোস করতে শুরু করেছেন, কেউ কেউ বেরিয়ে আসছেন।

গোলাপের গন্ধ পেল চম্পা। চঞ্চল হয়ে অন্ধকার ঘরে সে উঠে বসল। কোথায় সে ? ঠিক সেই সুগন্ধ। সারা ঘর ম' ম' করছে। উঠে দাঁড়াল চম্পা। সারা দিনের অনাহার পাক দিয়ে উঠল পেটের ভেতরে। মাথাটা বালিশে বেখে শুয়ে পড়তে হল। তখন আর কোন বোধশক্তিও রইল না। শুধু মনে হল, মাথার মধ্যে রামধনুর মতো একটা রঙিন জাঁতা ঘুরছে।

স্টেজে দাঁড়িয়ে জহির আরেকবার চিৎকার করে বোঝাতে যাবে, এমন সময় দেখল, পাশে ফিরদৌসি এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে তার শো-এর পোশাক, চুল আঁচড়ানো, জ্বলজ্বল করছে মুখ। আচমকা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল জহিরের। খপ্ করে ফিরদৌসির হাত ধরে সে দ্রুত স্খলিত কণ্ঠে বলল, গোলাপের খেলাটা শুরু করো। এরা মানছে না!

হলের ভেতরে আরো কয়েকখানা ইট এসে গিয়েছিল, যারা এনেছিল নিঃশব্দে পায়ের কাছে লুকিয়ে ফেলল। কয়েকজন আঙুল তুলে বলাবলি করতে লাগল ফিস্ফিস করে, ঐ যে, ঐ লোকটা— ঐ যে পরে এলো, বাম দিকে। একটা বাচ্চা তখনও কাঁদছিল, সেও থেমে গেল, মা-র দুধ আবার মিঠে মনে হল তার।

তাকে কোন কথা বলতে না দেখে জহির চাপা গলায় হিস্ হিস্ করে উঠল— ফিরদৌসি! যাও, সামনে যাও! হ্যাঁ করে থেকো না। বলতে বলতে সে ঠেলে দিল তাকে সামনে।

লোকেরা তখন নড়ে বসল। কেউ কেউ হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, আমাদের গোলাপ দেবে।

এক মুহূর্তে ফিরদৌসির মনে পড়ল সব। কুড়িগ্রামে সেই বৃষ্টির সন্ধ্যে, চম্পার সঙ্গে রাত, প্রফেসরের তিরস্কার। বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যে সে দেখতে পেল নিজেকে। তাকে বেছে নিতে হবে। এখন। এই মুহূর্তে। হলের অন্ধকার ছাদে সে দেখতে পেল রক্তগোলাপের চিত্র। সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল তার। কেউ বিশ্বাস করবে না, চম্পা। চম্পা, পালাতে নেই। ছিঃ।

আজকের সাতশ' ছিয়াশিটা গোলাপ সে নিঃশেষ করে ফেলেছে। তবু সে আবার একাগ্র করে আনল তার সমস্ত বিক্ষিপ্ত মন। বিড়বিড় করে বলল, আছে, আছে, আসবে, আমি আনতে পারবো, আজ আরেকবার আমাকে দাও। দর্শকদের দিকে তাকাল সে পূর্ণ দু'চোখ মেলে। অপলক তাকিয়ে আছে তারা। প্রত্যাশায় তাদের চোখ কোমল হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন শোনা যাচ্ছে হৃৎস্পন্দন— আমি সবাইকে দেবো। কেউ শূন্য হাতে

ফিরে যাবে না। কেউ বিশ্বাস না করুক, আমার কি তাতে এসে যাবে ? ওদের হাতে, প্রত্যেকের বাড়ি নিয়ে যাওয়া গোলাপের সাথে, আমি প্রত্যেকের বাড়ি যাই। দর্শকের ওপর থেকে তার চোখ ফিরিয়ে আনল সে। জহিরকে বলল, শো বন্ধ থাকবে না। রোজ যেমন যে আইটেম দিয়ে শুরু হয়, তেমনি হবে।

শান্ত স্তব্ধ প্রতীক্ষায় অধীর দর্শকের সামনে এগিয়ে এলো ফিরদৌসি। মেঘের মতো সুদূর গম্ভীর কণ্ঠে সে ঘোষণা করল, আমার ভাই-বোনেরা, হতাশ হবেন না। বহুদূর থেকে এসেছেন আপনারা আশা নিয়ে, শো হবে।

করতালিতে ধ্বনিত হয়ে উঠল হল।

অন্ধকার ঘরে স্বপ্নের মধ্যে প্রফেসর যেন শুনতে পাচ্ছেন দর্শকের করতালি, প্রতীক্ষা, আবার করতালি, ব্যাণ্ডের আওয়াজ। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। শো হচ্ছে। ঐতো ওরা আনন্দে আবার করতালি দিয়ে উঠল। ঐ, ঐতো। উঠে দাঁড়িয়ে চম্পার কামরায় এলেন। অবাক হলেন দরোজা বন্ধ দেখে। তা হলে চম্পা স্টেজে যায়নি। কিন্তু এইমাত্র তিনি যে শুনতে পেলেন সেই বাজনা, যে বাজনা বাজে চম্পা যখন বোর্ডে গিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় আর তিরিশটা ছোরা হাতে জহির একের পর এক ছুঁড়তে থাকে। ঐতো সে বাজনা শুরু হল।

চম্পা, চম্পা। পাগলের মতো প্রফেসর স্টেজের দিকে ছুটলেন। কিন্তু প্রত্যেকটা দরোজায় এতো ভিড় ঢুকতে পারলেন না। সবাই বিরক্ত হয়ে তাঁকে কনুই দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল। কেউ ফিরেও তাকাল না তাঁর দিকে। কেউ চিনতে পারল না। তখন পেছনের দরোজা দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করলেন। সে দরোজাও বন্ধ। দমাদম আঘাত করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু শোনা গেল না। প্রবল বাজনার অতলে তলিয়ে গেল প্রফেসর নাজিম পাশার করাঘাত। আজ তিনি বাইরে। তাঁকে বাইরে থাকতে হচ্ছে। আজ আর ঢুকতে পারবেন না তিনি। কোন দরোজা খোলা নেই তাঁর জন্যে।

বোর্ডে পিঠ ঠেকিয়ে ফিরদৌসি হাসল। হাসল না তো যেন একখণ্ড স্মিত বিদ্যুত স্থির হয়ে রইল তার ঠোঁটে। আধখানা বৃত্ত আঁকল ডান হাত দিয়ে জহির তার পেছনে, তারপর বৃত্তটাকে চোখের পলকে প্রসারিত করে দিল সমুখে, সরল রেখায়।

থরথর করে সারা হলে ফেটে পড়ল গোলাপের সুগন্ধ। এক পশলা গোলাপে ভরে গেল সামনের সারি। করতালি আর উল্লাসে বধির হয়ে গেল শ্রবণ। প্রথমে বিহ্বল পরে নিজের কৃতিত্বেই মুগ্ধ হয়ে গেল জহির। দ্রুত সে দ্বিতীয়টি হাতে নিল। নেশার মতো এক সব-বোধ অন্ধ করা অনুভূতিতে মাতাল হয়ে উঠল তার হাত।

দরোজার খিল খুলে ফেলল চম্পা। এতোক্ষণ তার ঘরে যে সুগন্ধ ছিল গোলাপের, হঠাৎ এক বাতাসের দমকে যেন তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কী হল ? এতো করতালি কেন ?

সারা হলে তখন পশলার পর পশলা গোলাপের বৃষ্টি হচ্ছে। ফোয়ারা থেকে শীকরের মতো উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে গোলাপ, গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে সুগন্ধ। ভারি হয়ে আসছে বাতাস। এক আশ্চর্য যাদুর সন্ধান পেয়ে লোকের কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে অভিনন্দন।

সাতাশ-আটাশ-উনত্রিশ-ত্রিরিশ— শেষ ছোরাটা জহিরের হাত থেকে যখন উড়ে গেল তখন গোলাপ ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না সারা হলে। যেন গোলাপের ঝড় উঠেছে।

রাশি রাশি গোলাপ উড়ছে, ছিটকে পড়ছে ডুবিয়ে দিচ্ছে— গোলাপ আর গোলাপ। এমনকি সারা স্টেজেও আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু অগণিত গোলাপের রঙ আর সুগন্ধ।

সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসের মতো করতালির মধ্যে নেমে এলো পর্দা। দৃশ্য আড়ালে চলে গেল, আর দেখা গেল না, তবু সে করতালি থামল না। থামল না সপ্তমে ওঠা ব্যাণ্ডপার্টির সুর। থামল না প্রফেসরের অবিশ্রান্ত করাঘাত। চম্পা জানতেও পারল না সাতশ' ছিয়াশিটা গোলাপ ফুরিয়ে গেলেও ফিরদৌসি আজ আবার গোলাপ আনতে পেরেছে।

পর্দার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড থেকে ফিরদৌসি আস্তে আস্তে বসে পড়ল তার পায়ের ওপর, যেন সিজদা দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ দ্রুততা এলো তার ভঙ্গিতে, যেন এক মুহূর্ত সময় আর নেই। গোড়ালির ওপর বসবার আগেই মাথা নত হয়ে এলো তার। সেখানে নিজের রক্তের স্রোতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রক্তগোলাপের যাদুকর ফিরদৌসির প্রাণহীন দেহ।

মাউরেণ্ডার রেস্তোরাঁ, ঢাকা

রচনাকাল ১৯৬৩



খেলারাম খেলে যা

দু' একজনের কাছে জিগ্যেস করতেই বাসাটা খুঁজে পেল বাবর। কাজী সাহেব তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

আরে আপনি! কখন এলেন ? কীভাবে এলেন ? আসুন, আসুন।

চলে এলাম। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ এমন কী দূর! গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম।

পরক্ষণেই বাবরের মনে হলো আসবার কারণ কিছু না বললে উপস্থিতিটা শোভন হচ্ছে না। তাই সে যোগ করল, এখানে একটা কাজ ছিল।

দু'হাত নেড়ে কাজী সাহেব বলে উঠলেন, কাজ পরে হবে, আগে বিশ্রাম করুন। কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা, আগে ভাল করে গল্প-টল্প করি।

আজ সেরেই এসেছি। এখন আর কাজ নেই। ভাবছি আজই ঢাকায় ফিরে যাব।

যেতে দিলে তো! কাল যাবেন।

কাল ?

হ্যাঁ কাল। অসুবিধে কী!

না, অসুবিধে কিছু নেই।

আলাদা বিছানার ব্যবস্থা আছেই। শুধু পেতে দিলেই হলো। একটু বসুন, ভেতরে খবর দিয়ে আসি। সিগারেট খান। আপনার তো এ ব্র্যাণ্ড চলে না বোধহয়। আচ্ছা, আমি এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি।

সে-কী! না, না।

আপনি বসুন তো। চা না কফি ? দুটোই আছে।

চা।

কাজী সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। বাবর পা জোড়া সামনে ঠেলে আরাম করে বসল। কয়েক ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে পা যেন জমে গিয়েছে। মাথায় কয়েকটা চুলের গোড়া ব্যথা করছে, পেকেছে বোধহয়। বয়স তো কম হলো না। গত মার্চে আটত্রিশ পেরিয়ে উনচল্লিশে। চুল উঠতেও শুরু করেছে কিছু কিছু। পরাজিত সৈন্যদলের মত কপাল থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে তারা। গত সপ্তাহে মেকাপম্যান কামাল তার মুখে রং লাগাতে লাগাতে বলছিল, একটু যত্ন নিন স্যার। চুলের গোড়ায় কালো পেন্সিল বুলিয়ে আর কতকাল চালাবেন ? গত সপ্তাহে তার টেলিভিশন প্রোগ্রামটা বেশ ভাল হয়েছিল। সবাই খুব প্রশংসা করেছে। কাগজেও লিখেছে। প্রোগ্রামটা কি লতিফা দেখেছে ? এ বাসায় ঢোকার আগে দেখা উচিত ছিল বাড়ির মাথায় এন্টেনা আছে কি-না। ময়মনসিংহে তো টেলিভিশনের ছবি ভালই আসে সে শুনেছে। কী বোকা সে! এতক্ষণ তার চোখেই পড়েনি টেলিভিশন সেটটা। বসবার ঘরে এক কোণায় স্যাঁতস্যাঁতে আঁধারিতে কার্পেটের ওপর সামনের দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটটা। তাহলে প্রোগ্রামটা লতিফা নিশ্চয় দেখেছে।

লতিফা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। পরনে কালো পাজামা, শাদার ওপরে কালো সবুজ বর্ডার আঁকা কামিজ। লতিফার সতের সুন্দর একজোড়া স্তন নিঃশব্দে ওঠানামা করছে, প্রায় বোঝা যায় কী যায় না।

নিঃশব্দে হাসল বাবর। কিন্তু লতিফা হাসল না। বাবর তখন একটু অপ্রতিভ হলো।

একদৃষ্টে বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে লতিফা।

কাজী সাহেব এসে মেয়েকে বললেন, যা চা-টা নিয়ে আয়।

লতিফা চলে গেল।

একটা চেয়ার টেনে জুৎ করে তার সামনে বসলেন কাজী সাহেব। বললেন, আজ তো যাওয়া হবে না। কালও যেতে দিই কি-না সন্দেহ।

কাল না গেলে অসুবিধে হবে খুব।

কী এমন অসুবিধে? আমাদের মত তো চাকরি করতে নেই আপনার।

তা নেই সত্যি।

বেশ আছেন। আপনার প্রোগ্রাম মাঝে মাঝে টেলিভিশনে দেখি। খুব ভাল লাগে। চমৎকার হয়।

ধন্যবাদ।

শুধু টেলিভিশন নিয়েই আছেন, না অন্য কিছু?

ব্যবসা আছে।

কীসের?

ইনডেনটিং।

ভাবছি, আমিও চাকরি থেকে রিটায়ার করে একটা ব্যবসা-ট্যবসা করব। বড় ছেলেটা আর্মিতে এখনও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। তারপরে লতিফা। ওর বিয়েটা দিলেই থাকে আরেক ছেলে।

আপনার আর চিন্তা কী তবে? বেশ গুছিয়ে এনেছেন।

কই আর? আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?

বাবর অবাক হলো কাজী সাহেব জানেন না যে সে বিয়েই করেনি। লতিফার একবার কলেজের ছাত্রীদের প্রোগ্রাম করতে টেলিভিশনে এসেছিল, সেখানে আলাপ। তখন ঢাকায় ছিলেন কাজী সাহেব। তারপর বদলি হয়ে এলেন ময়মনসিংহে। ঢাকার বাড়িতে বেশ কয়েক দিন গিয়েছিল বাবর। দু' একবার রাতে খেয়েছেও। না, সেই আলাপে বাবরের নিজের কথা কিছু ওঠেনি। বাবরকে প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই দেখে কাজী সাহেব ধরেই নিয়েছেন তার সংসার আছে।

বাবর মিথ্যে করে বলল, ছেলেমেয়ে দু'টি।

তবে যে লতিফার কাছে শুনেছিলাম তিনটি।

বাবর ভাবল, দুষ্টু মেয়ে, কীভাবে মিথ্যে কথা বলেছে দেখ। মুখে সে বলল, ভুল করেছে, এক ছেলে এক মেয়ে।

লতিফা আপনাকে কিন্তু খুব শ্রদ্ধা করে। বলে বাবর চাচার মত মানুষ হয় না।

বাড়িয়ে বলে।

কী যে বলেন। আপনারা হলেন আমাদের গৌরবের বস্তু। আর মেয়েকে আমি আজীবন সেই

শিক্ষাই দিয়েছি, মানীজনকে সম্মান দেওয়া। সতের বছর বয়েস হলে কী হবে লতিফার, বুদ্ধিতে, বিবেচনায়, নিজের মেয়ে বলে বলছি না, যে কারো সাথে পাল্লা দিতে পারে।

আমি জানি। এবার তো আই.এ দিল।

হ্যাঁ, দিয়েছে। ভাবছিলাম বি.এ পর্যন্ত পড়াব।

তা কী হলো ?

একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসে গেল।

বিয়ে দিচ্ছেন লতিফার ?

অবাক হয়ে গেল বাবর। এজন্যেই কি তাকে কোনো খবর না দিয়ে ঢাকা থেকে চলে এসেছে লতিফা ? ওভাবে তার হঠাৎ অন্তর্ধানের কোনো কারণ খুঁজে না পেয়েই বাবরের এতদূর আসা। আসার ঝুঁকিটাও কম ছিল না। যদি কাজী সাহেব সহৃদয় ব্যবহার না করেন ? যদি তিনি কিছু সন্দেহ করে বসেন ? কিম্বা লতিফাই যদি কঠিন হয় ?

লতিফা চা নিয়ে এলো। চায়ের সঙ্গে নানা রংয়ের পাঁপড় ভাজা।

ভাল আছেন বাবর চাচা ?

তার অপূর্ব সেই উজ্জ্বল মুখখানা সৃষ্টি করে লতিফা বলল। বলে মাথা কাৎ করে চা বানাতে লেগে গেল। কোনো কিছুতে মনোযোগ দিলেই লতিফার মাথাটা কাৎ হয়ে আসে। ভঙ্গিটা বাবরের ভারি চেনা।

হ্যাঁ, ভাল আছি। তুমি ? তুমি কেমন ?

ভাল। চায়ে কতটা চিনি ?

এই ছলনাটুকু ভাল লাগল বাবরের। লতিফা জানে বাবর চায়ে কতটা চিনি খায়।

এক চামচ। ব্যাস। ওতেই হবে।

বাবা, তোমাকে কতটা চিনি ?

বাড়িতে তো থাকিস না জানিসও না। চায়ে আমি চিনি খাই না।

ও, মনে ছিল না।

কাজী সাহেব প্রীত মুখে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, জানেন বাবর সাহেব, আমার এই মেয়েটাকে আমি কত ভালবাসি।

যেন তোমার আরো দু'পাঁচটা মেয়ে আছে। ঠোঁট গোল করে লতিফা বলল।

বাবর জিগ্যেস করল, তুমি চা খাচ্ছ না ?

না, এইমাত্র খেয়ে উঠেছি।

বিকেল চারটেয় ভাত খেয়েছ ?

আর বলবেন না, মেয়েটা যদি কোনো কথা শোনে। শুধু অনিয়ম করবে। এইতো সারা দুপুর বাথরুমে বসে বসে পানি ঢেলেছে।

বলেছে তোমাকে!

তা নয়তো কী ?

আচ্ছা আপনিই বলুন বাবর চাচা, চুল ঘষতে, শ্যাম্পু করতে সময় লাগে না ? বাবা কিছু বুঝে না।

কিন্তু ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হতে পারে।

জ্বর আমার হয় না।

সে-কী!

জিজ্ঞেস করে দেখুন না বাবাকে, কবে আমার জ্বর হয়েছে।

কেন, '৬৬ সালে দেশে গিয়ে এক ঝুড়ি কাঁচা আম খেয়ে যে জ্বর বাঁধালি। সেটা বুঝি জ্বর না!

মফঃস্বলে অমন রোদে গায়ে করে তা অভ্যেস নেই। তাই গা গরম হয়েছিল একটু।

হা হা করে হেসে উঠলেন কাজী সাহেব। বললেন, লতিফার সঙ্গে কারো পারবার উপায় নেই।

সত্যি কথা বলি বলেই পার না।

লতিফার গলায় একটু ঝাঁঝ, একটু তিক্ততা টের পেল বাবর। কেন ? কেন এই উষ্মা ? কার ওপর ? একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ কাপ পিরীচের শব্দে জেগে উঠল। লতিফা ট্রে গুছিয়ে ভেতরে যাবার উদ্যোগ করছে।

বাবর বলল, বাপ মায়ের কাছে এসে তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে।

ছাই হয়েছে।

তুই কী বুঝিস ? অ্যাঁ তুই বুঝিস কী। কাজী সাহেব হাসতে হাসতে তিরস্কার করে উঠলেন মেয়েকে। বুঝলেন বাবর সাহেব, হোস্টেলে থেকে থেকে খাওয়া দাওয়াই ভুলে গেছে মেয়েটা। এক টুকরোর বেশি দু'টুকরো মাংস দিলে তেড়ে ওঠে এখন।

হ্যাঁ খাইয়ে খাইয়ে আমাকে একটা হাতি বানাও।

শুনছেন, কথা শুনছেন ওর। রাতদিন এই বলবে আর না খেয়ে থাকবে। আচ্ছা বলুন তো কী এমন মোটা ও ?

মোটেই না।

আপনাদের ও দুটো চোখ, না বোতাম ? বলে লতিফা হাসতে হাসতে ট্রে নিয়ে চলে গেল। তার পেছনটা দুলে উঠল নরোম একটা ছোট্ট শাদা জন্তুর মত। ময়মনসিংহে এসে স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে লতিফার। গাল দুটো লাল হয়েছে। শরীরে একটা তরঙ্গ এসেছে।

আপনার মেয়েটি চমৎকার। অসাধারণ বুদ্ধিমতি। মাথা অত্যন্ত পরিষ্কার। ওর সায়েন্স পড়া উচিত ছিল। ডাক্তার হতে পারত।

কিন্তু অংকে বড্ড কাঁচা বলেই তো দিইনি।

অংকে কাঁচা নাকি ?

ম্যাট্রিকে মাত্র চল্লিশ পেয়েছিল। তাছাড়া কী জানেন, আমিও আগেই বুঝেছি লেখাপড়া বিশেষ ওর হবে না।

এটা আমি স্বীকার করলাম না।

কাজী সাহেব বলে চললেন, আমি ওকে শুধু ভাল হাউস-ওয়াইফ হতে যা দরকার তাই করে দিচ্ছি। যেন কোনো অবস্থাতেই অপ্রতিভ না হয়।

অবশ্যি এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি; কিন্তু আমি সমর্থন করি না।

মৃদু হাসছিলেন কাজী সাহেব তখন থেকে। এবার হাসিটা আরো স্পষ্ট দেখাল। বোধহয় কিছু বলতে চান। বাবর উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

কই সিগারেট খান।

কাজী সাহেব তার ব্র্যাণ্ড বাড়িয়ে দিলেন।

আপনার ব্র্যাণ্ড আনতে দিয়েছি।

কেন আবার কষ্ট করতে গেলেন?

না, না, কষ্ট কীসের। আপনি এসেছেন, কত যে খুশি হয়েছি। মনে মনে আপনার কথাই ভাবছিলাম ক'দিন থেকে। আপনি খুব ভাল সময়ে এসেছেন। খুব ভাল হয়েছে।

কী ভাল হয়েছে জানতে পারার আগেই কাজী-গৃহিণী এলেন। চট করে একটা ধোয়া শাড়ি পরে মাথার চুল গুছিয়ে গাছিয়ে এসেছেন।

উঠে দাঁড়াল বাবর।

আদাব ভাবী। ভাল আছেন।

জি ভাল। বসুন। ছেলেমেয়ে সব ভাল?

ভাল।

কাজী-গৃহিণী হাসলেন।

মিথ্যেটার জন্যে বাবর একটু অস্বস্তি বোধ করল। বিয়ে সে করেনি, এই কথাটা এদের আর জানাবার উপায় নেই।

আপনাকে টেলিভিশনে মাঝে মাঝে দেখি।

বিজ্ঞানের এই এক অবদান। নিজে না আসতে পারলেও কেমন দেখা হয়ে যাচ্ছে।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই অনাবিল উপভোগ করলেন রসিকতাটুকু।

আজ থেকে যেতে হবে কিন্তু।

কাজী ভাইকে তো বলেছি থাকব।

কাজী সাহেব 'ভাই' সম্বোধনে খুব প্রীত হলেন, উৎসাহ পেলেন, কৃতার্থ বোধ করলেন। বললেন, কয়েক দিন থাকলে সত্যি খুব খুশি হতাম।

আরেকবার এসে না হয় থাকব।

তখন তো বাড়ি খালি হয়ে যাবে। বিষণ্ন স্বরে কথা ক'টি উচ্চারণ করলেন কাজী সাহেব। বাবর ঠিক বুঝতে পারল না অর্থটা। জিজ্ঞেস করল, মানে?

লতিফার বিয়ে দিচ্ছি যে।

কানে শুনেও যেন কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারল না বাবর।

বিয়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ। একটা ভাল ছেলে পেয়ে গেলাম।

শুকনো গলায় বাবর জিজ্ঞেস করল, কবে ?

দিন তারিখ ঠিক হয়নি। তবে খুব শিগগির। পাকা দেখা হয়ে গেছে।

ছেলে কী করে ?

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে বিলেতে যাচ্ছে এ বছরে। লতিফাকে নিয়ে যাবে।

বিলেত যাবার এতদিনের স্বপ্নটা তাহলে সত্যি হবে লতিফার— ভাবল বাবর। চুপ করে রইল সে।

কাজী গৃহিণী বললেন, পাত্র আমারই খালাতো বোনের ছেলে। লতিফাকে দেখে ওর খুব পছন্দ। আমি পড়ানোর পক্ষে। ছেলে বলল, বিয়ের পরেও তো পড়তে পারে। বিলেতে পড়াশুনা আরও ভাল হবে।

তা হবে।

মনটা যেন কোথায় এক চিলতে খারাপ লাগছে। কিন্তু কেন, বাবর তা বুঝতে পারল না। বাহ লতিফার কোনোদিন বিয়ে হবে না নাকি ? সে নিজেই তো কতদিন লতিফাকে বিয়ের কথা বলেছে। বলেছে, বিয়ে হলে তার বাড়িতে যাবে। কী খেতে দেবে লতিফা ? থাকবার জন্যে জোর করবে না ? স্বামীর সঙ্গে কী বলে আলাপ করিয়ে দেবে তাকে ? — আরো কত কী! আর, লতিফার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এদিকে, অথচ কিছুই সে জানে না। এ জন্যেই কি হঠাৎ ঢাকা থেকে সে চলে এসেছে কোনো খবর না রেখে ? কই লতিফার সঙ্গে তার যখন শেষ দেখা হয়েছে তখন তো কিছুই বোঝা যায় নি। অথচ কতদিন বাবরকে বলেছে, কোনো কিছুই তার কাছে সে গোপন করে না।

কাজী-গৃহিণী বললেন, সন্ধ্যে হয়ে এলো। আমি রান্না ঘরে যাই।

ভাল করে রান্না করো কিন্তু।

সে তোমাকে বলতে হবে না। ওঁর মত লোক আসা ভাগ্যের কথা।

কী যে বলেন। সলজ্জ শোভন হবার চেষ্টা করল বাবর। কী এমন মানুষ আমি।

বাপরে বাপ! টেলিভিশনে এত সুন্দর প্রোগ্রাম করেন। আপনার ধাঁধার আসরগুলো এত মজার হয়। লোকজনকে যখন বলি উনি আমাদের চেনা, তারা বিশ্বাসই করে না।

মনে করে আমরা গল্প করছি। গৃহিণীর সঙ্গে যোগ করলেন কাজী সাহেব।

ভাল কথা, উনি তো শিল্পী মানুষ— কাজী-গৃহিণী স্বামীকে বললেন, লতিফার গয়নার ডিজাইনগুলো ওঁকে দেখাও না। বাবরকে বললেন, আপনি দু' একটা পছন্দ করে দিন, কেমন ? আমি ডিজাইনের বইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কবিতা লেখে না, গল্প লেখে না, অভিনয় করে না, ছবি আঁকে না, গান গায় না— টেলিভিশনে শুধু ধাঁধার আসর পরিচালনা করে বাবর। আর এরা কি-না তাকে শিল্পী বলছে। মনে মনে হাসল বাবর। নিজের সম্বন্ধে অহেতুক উচ্চ ধারণা কোনো সময়েই তার ছিল না। তবু কেমন যেন খুশিও হলো 'শিল্পী' বিশেষণটা শুনে।

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও। না, আমি নিজেই নিয়ে আসছি।

বাবর আরো খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল। লতিফার চেহারাটা ঠিক মনে করতে পারছে না সে। মনে করতে পারলে কল্পনায় মিলিয়ে নেয়া যেত কোনটা তাকে মানাবে। ছোট ছোট আয়তক্ষেত্র একটা করে আংটা দিয়ে ঝুলানো— এমনি একটা নকসা চোখে ধরল বাবরের। তাকিয়ে দেখল কাজী সাহেব উন্মুখ হয়ে আছেন চশমার ভেতর দিয়ে।

বাবর বলল, এটা কেমন ?

এইটা ?

হ্যাঁ। কিম্বা আরো দেখতে পারি। দাঁড়ান দেখছি।

আরো কয়েকটা পাতা ওল্টাল বাবর। আবার প্রথম থেকে দেখল। কিন্তু কোনো নকসা চোখে ধরল না তার। তখন সে প্রথমে যেটা পছন্দ করেছিল সেটাই আবার বের করল।

আমার মনে হয় এটাই ওকে মানাবে। চমৎকার। খুব আধুনিক। অথচ জমকালো নয়।

বলেই বই থেকে চোখ তুলে দেখে কাজী সাহেবের পেছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে লতিফা। ঠাণ্ডা স্থির চোখে তাকে দেখছে। বেড়ালের মত সরু তার চোখের তারা।

এক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না বাবর। টেলিভিশনে অমন তুখোর অমন সপ্রতিভ কথা বলিয়ে যার খ্যাতি সেই বাবর একেবারে বোবা হয়ে গেল। তার চোখে শুধু অর্থহীনভাবে খেলা করতে লাগল লতিফার ভিজে ভিজে চুল যা ঘাড়ের উপর মৃদু হাওয়ায় উড়ছে। একটু লালচে। গোড়ার দিকে একটু কুঞ্চিত। ঢাকাতে এ রকম খোলা চুল কখনো দেখেনি সে লতিফার। নিত্য নতুন বাঁধনে আবদ্ধ তার চুল বাবরকে প্রীত করেছে। আজকের এই খোলামেলা ছেড়ে দেওয়া চুলের রাশ লতিফাকে যেন কন্যারূপে তুলে ধরেছে।

কিন্তু টেলিভিশনে আসর পরিচালনা করে বাবর খ্যাতিমান। যে কোনো অবস্থায় সপ্রতিভ হয়ে থাকাটা তার প্রতিভা। এখনও তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মুহূর্তে সপ্রাণ হয়ে উঠে সে বলল, বাতিটা জ্বালো লতিফা। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

হ্যাঁ, আরে তাইতো, বাতি জ্বাল মা, কখন সন্ধ্যে হয়েছে। কাজী সাহেব ব্যস্ত গলায় বললেন। মেয়ের সামনে মেয়ের গয়নার নকসা তাঁকে অপ্রস্তুত করে ফেলেছে।

বাবার মত আপনিও একটা চশমা নিন না। বাতিটা জ্বালাতে জ্বালাতে লতিফা বলল।

চমশাতে কি আর অন্ধকার আলো হয় ?

তা হয় না, তবে বয়স হলে চশমাটা মানায়।

ও-কী কথা! কাজী সাহেব শাসন করেন মেয়েকে।

বাবর হেসে বলল, পাগল মেয়ে একটা।

হঠাৎ লতিফা বাবার কাঁধে হাত রেখে বলল, বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তুমি এখনো ঘরে! কী যে বুড়ো হয়েছ, যাও একটু বেড়িয়ে এসো।

বারে, তোর বাবর চাচা এসেছেন যে!

তা তাকেও নিয়ে যাও। তাকে কি রেখে যেতে বলছি! আর আসবার পথে একটা টম্যাটো কেচাপের বোতল নিয়ে এসো।

আচ্ছা, আচ্ছা।

গৃহিণীর সাথে সাথে কাজী সাহেবও ভেতরে চলে গেলেন।

ভেতরে একা একা লতিফা কী করছে ? কেন সে আসছে না ? বাবরের কপাল কুঞ্চিত হলো। লতিফা কী তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে ? অসুখী হয়েছে সে আসাতে ? হয়ত সেজন্যেই কথায় অত ঝাঁঝ ছিল তার। বাবার উপরেও নিশ্চয়ই খুব চটে যাচ্ছিল তাঁর অমন সহৃদয়তা দেখে। লতিফার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হতো। বাবর তাকে জিগ্যেস করত এভাবে ঢাকা থেকে হঠাৎ তার গা ঢাকা দেবার অর্থটা কী ? সে কেন সেদিন কথা দিয়েও আসেনি ? বাবর তার জন্যে সারা দিন বসবার ঘরের পর্দা টেনে টেপ রেকর্ডার ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করেছিল।

অপেক্ষাটা এখনো বড় অসহ্য মনে হচ্ছে। সামান্যক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে লতিফা গেল কোথায় ? কাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করবে বা ডেকে দিতে বলবে, কেমন সঙ্কোচ হলো। এমনিতেই এভাবে এসে পড়ে অবধি অপরাধ বোধটা যাচ্ছে না। পাছে ওরা কেউ টের পেয়ে যায়। ময়সনসিংহে আদতেই তার কোনো কাজ ছিল না এক লতিফার খোঁজ নেয়া ছাড়া।

গয়নার একটা ছোট বই আর চশমা নিয়ে কাজী সাহেব ঘরে এলেন। বসলেন চেয়ার টেনে ঘন হয়ে। মেলে ধরলেন বই।

আপনি চশমা ব্যবহার করেন নাকি ?

সলজ্জ হেসে কাজী সাহেব উত্তর করলেন, ঐ পড়ার সময়। বয়স তো কম হলো না।

কত আর হবে ?

এই নভেম্বরে চুয়াল্লিশ পড়বে।

বেশ অল্প বয়সেই তাহলে বিয়ে করেছিলেন!

অল্প আর কোথায় ? আমার তখন বাইশ কী তেইশ। বড় খোকা এখন কুড়িতে। ছেলেবেলায় বাবা মারা গিয়েছিলেন তো, তাই ঝটপট সংসারী হতে হয়েছিল।

আমার চেয়ে মাত্র চার সাড়ে চার বছরের বড়, ভাবল বাবর। তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, দু'দিন বাদে নানা হবেন, আর সে এখনও বিয়েই করল না। সময় হলো না সংসারী হবার। বিলেতে একবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বছরখানেক জয়েসির সঙ্গে বাস করেছে। মাখনের মত রং সেই তার নগ্ন শরীরটা এখনো চোখে ভাসে বাবরের। বিছানায় চমৎকার সাড়া দিত মেয়েটা। বিয়ের জন্যে শেষ দিকে বড্ড ঝুল ধরেছিল। তাকে কোনোক্রমে সোবহানের ঘাড়ে এবং ঘরে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছিল সে। বিয়ের কথা কিছুতেই ভাবতে পারত না। কল্পনা করতে পারত না স্বামী হিসেবে। মানুষ কী করে সংসার করে, বাবা হয়, শ্বশুর হয়, নানা-দাদা হয় কে জানে ?

প্রথমে গলার হার দেখুন। এইটেই জরুরি। এর সঙ্গে মিলিয়ে কানে আর হাতে। দেখুন।

ডিজাইনের চলচ্চিত্র সরে যেতে থাকে বাবরের চোখের সম্মুখে। পাতার পর পাতা উল্টে যান কাজী সাহেব।

কোনটা পছন্দ ?

আপনারা কোনটা পছন্দ করেছেন ?

আগে আপনি পছন্দ করুন, তারপর বলব।

লতিফা বাবরের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল। চলে গেলে কাজী সাহেব হেসে বললেন, বুঝলেন না মেয়ের লজ্জা হয়েছে।

কেন ?

বিয়ের গয়না পছন্দ করছি যে আপনাকে নিয়ে।

হুঁ, তাই। বাবর যোগ করল, মেয়েদের এই লজ্জাটা স্বাভাবিক।

কাজী সাহেব উত্তরে বললেন, আজকাল অবশ্য অনেক নির্লজ্জ মেয়ে দেখবেন। আমার মেয়েকে আমি সব রকম আধুনিকতা শিখিয়েছি, কিন্তু তাই বলে কোনোদিন নির্লজ্জ হবার শিক্ষা দিই নি।

আপনি অনেক ভাবেন দেখছি।

হ্যাঁ ভাবি। অনেকের অনেক রকম উচ্চাশা থাকে। আমার একটি মাত্রই অ্যাম্বিশন, আর তা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা। তারা শিক্ষিত হবে, আধুনিক হবে, আবার ভয়ভক্তি থাকবে। গোঁড়া হবে না।

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আপনি সফল।

লতিফাকে দেখে বলছেন তো ? তবুও বেয়াড়া, মেজ কি-না তাই। দেখতেন আমার ছেলেটাকে।

কী যেন নাম ?

ডাকি বড় খোকা বলে। ভাল নাম কাজী আসাদুল্লাহ। ওর কম্যাণ্ডিং অফিসার ভারি পছন্দ করে খোকাকে। কুমিল্লা ক্যান্টে আছে। যদি কখনো যান খোঁজ করবেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয় করব। আমি সব সময়েই ঘুরে বেড়াই। যেমন আজ এই হঠাৎ ময়মনসিংহে আসতে হলো।

এসেছেন খুব খুশি হয়েছি। কুমিল্লায় গিয়ে বলবেন ব্রিগেডিয়ার সাহেবের এডিসি-র কথা। আমার ছেলেই এখন এডিসি। দেখলে আলাপ করলে বুঝতে পারবেন ছেলেমেয়েকে কোন শিক্ষায় আমি মানুষ করেছি।

হ্যাঁ, আলাপ করব। বোধহয় সামনের মাসে যাব কুমিল্লায়।

এটাও একটা মিথ্যে। এক মিথ্যের জন্য কত মিথ্যে যে বলতে হয়। ময়মনসিংহে আসাটা যে নেহাতই ব্যবসার কাজে সেই মিথ্যেটার সমর্থনে এখন কুমিল্লা যাবার প্রতিশ্রুতি এমনকি সম্ভাব্য সময়ও দিতে হলো।

চলুন বেরোই। ময়সনসিংহে এসেছেন কখনো এর আগে ?

না।

তাহলে প্রথমে শহরটা একবার ঘোরা যাক, কী বলেন।

না, না এসেছি কাজে, কাজ শেষ হয়েছে, আপনাদের দেখা পেলাম। শহর দেখার চেয়ে আপনাদের সাথে বসে দুটো কথা বলার ইচ্ছে। মনের মত মানুষই আজকাল পাওয়া যায় না যে কথা বলবেন।

চলুন তাহলে ক্লাবে যাওয়া যাক। সেখানে বসে গল্প হবে। কাজী সাহেব গাড়ি বের

করলেন। বাবর বলল আমার গাড়িটাই নিতাম।

সারাদিন চালিয়ে এসেছেন ঢাকা থেকে। এখন বিশ্রাম দরকার।

আমার না গাড়ির ? বাবর একটু রসিকতা করল।

দু'জনেরই। তাছাড়া আপনাকে নিয়ে যাব এত আমার সৌভাগ্য।

খাঁটি ভদ্রলোক কাজী সাহেব। বোধহয় খুব একা থাকেন। একা থাকলে অনেক সময় মানুষ এ রকম আগ্রহ হয়ে উঠে কারো উপস্থিতিতে। বাবর লক্ষ করল, কাজী সাহেব গাড়ি খুব চালান না। তার একটু ভয়ই করল যখন তিনি গেট দিয়ে গাড়ি বের করার সময় দেয়ালের সঙ্গে প্রায় লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। ওদিকে পথে পড়েই একটা রিকশাকে বাঁচাতে গিয়ে এমন জোরে ব্রেক করলেন যে বাবরের মাথাটা উইণ্ডশিল্ডে প্রায় ঠুকে গেল।

কাজী সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে একটু হাসলেন। বললেন, ব্রেকটা একটু ট্রাবল দিচ্ছে।

বাবর ভাবছিল লতিফার কথা। একটু অন্যমনস্ক ছিল।

কী ভাবছেন ?

না, কিছু না।

নিশ্চয়ই কোনো প্রোগ্রামের কথা।

প্রোগাম মানে টেলিভিশন প্রোগ্রাম। বাবর ভাবল, এঁরা বাইরে থেকে মনে করেন আমরা একেকটা প্রোগ্রামের জন্য সারাক্ষণ চিন্তা করি। ভুলটা সংশোধন করবার লোভ হলো তার, কিন্তু করল না। বাবর তার প্রোগ্রাম নিয়ে কখনোই আগে থেকে কিছু ভেবে রাখে না। সে মুহূর্তের প্রেরণায় বিশ্বাসী। প্রোগ্রাম রেকর্ড করবার ঘণ্টাখানেক আগে খানিকটা সুরা পান করে এবং একা থাকে। তার যা কিছু করণীয় বা বক্তব্য সেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বের করে ফেলে সে। তারপর সোজা চলে যায় ক্যামেরার সামনে রেকর্ড করবার জন্যে। যতক্ষণ রেকর্ড না হচ্ছে অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর থাকে বাবর। আয়েশা বলে যে মেয়েটা, সে একবার বলেছিল, বাবর যখন সঙ্গম করে তখন এত গম্ভীর থাকে যে মনে হয় অংক করছে।

নিন, সিগারেট নিন।

আপনি শুধু শুধু কিনলেন। আমিই নিতাম।

ও একই কথা। কোনদিকে যাব বলুন ?

যেদিকে ইচ্ছে।

শহর দেখবেন ?

না। ক্লাবে যাবেন বলছিলেন।

ঘড়ি দেখলেন কাজী সাহেব। বললেন, ক্লাব খোলার এখনো মিনিট কুড়ি বাকি আছে। আচ্ছা চলুন।

গাড়ি ক্লাবের দিকে ঘোরালেন কাজী সাহেব।

বাবর বলল, আমার কিন্তু ঐ ডিজাইনটা ভারি পছন্দ। লতিফাকে মানাবেও। ওটারই একটা সেট বানিয়ে দিন।

লতিফা অন্য একটা পছন্দ করেছিল।

কোনটা ?

ঐ যে একটার মধ্যে ছোট ছোট সার্কল— ক্রমে বড় হচ্ছে যত নিচে নামছে, — ঐটা, মাঝে পাথর বসানো।

মনে পড়েছে। ওটাও ভাল।

আসলে বাবরের মনে পড়েনি। কোন ডিজাইনের কথা কাজী সাহেব বলছেন কে জানে। বাবর বলল, বানাতে দেয়া হয়ে গেছে ?

না, হয়নি। আজকেই দোকানে যাবার কথা ছিল। আপনি এলেন—।

আমার জন্যে কী ছিল। তাহলে আমিও যেতাম।

কাল যাওয়া যাবে। কাজী সাহেব একটু পর আবার বললেন, আপনি যেটা পছন্দ করছেন সেটাও খুব ভাল। আমারও খুব মনে ধরেছে। ভাবছি, ওটাও এক সেট বানিয়ে দেব।

হ্যাঁ, একই মেয়েতো আপনার।

হ্যাঁ, ঐ একটাই মেয়ে। বড় আদরে যত্নে ওকে মানুষ করেছি বাবর সাহেব। মেয়ের বাপ হবার ট্রাজেডি কী জানেন ? নিজ হাতে মানুষ করে তাকে অন্যের কাছে দিতে হয়। এই যে এত আপন, সব মিথ্যে, পর হয়ে যাবে। আপনার মেয়ে বড় হোক তখন বুঝবেন।

বাবর চুপ করে রইল।

আপনার মেয়ের নাম কী রেখেছেন ?

চমকে উঠল বাবর। আরো একটা মিথ্যে কথা বলতে হবে তাকে। সে বলল, বাবলি।

বাবলির কথাই একটু আগে সে ভাবছিল।

বাহ, ভারি সুন্দর নাম। ভাল নাম কী ?

বাবলি বাবর।

অবলীলাক্রমে সে বানিয়ে ফেলল নামটা। বানিয়ে ভারি পছন্দ হয়ে গেল! তাই আবার সে উচ্চারণ করল, বাবলি বাবর। আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি।

খুব সুরেলা নাম। ক'বছর যেন বয়েস হলো ?

এখন পাঁচ।

যাক, আরো অন্তত বছর পনের কাছে পাবেন। তার পরই মেয়ে আপনার পর।

বিয়ে দিলেই মেয়ে পর হয় ?

কী জানি, আমার যেন তাই মনে হয়। আমি কিন্তু আপনার পছন্দ ঐ ডিজাইনেরও একটা সেট বানিয়ে দেব।

নিশ্চয়ই।

ক্লাবের সামনে এসে পড়ল তারা। কাজী সাহেব গাড়ি একটা মনমত কোণে রাখতে রাখতে বললেন, সাধারণত ক্লাবে আসি না। অনেকদিন পরে আজ আসছি। তা প্রায় মাস তিনেক হবে।

শুধু শুধু তাহলে এসে কী দরকার ছিল ?

শুধু শুধু কেন ? আপনি আছেন যে। মনের মত লোক না পেলে এখানে এসে দু'দণ্ড বসা যায় না। ছোট শহর। বসলেই পরচর্চা আর চাকরির গল্প, ভাল লাগে না সাহেব। পরচর্চার মত সুস্বাদু আর কিছু নেই যে।

খুব ভাল বলেছেন পরচর্চা যারা করে তাদের আমি এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারি না।

ক্লাবটা ভারি সুন্দর। নিচু একতলা লম্বা দালান। সামনে পেছনে বাগান। খেলার জায়গা। বসবার কোণ।

বাইরে বসবেন, না ভেতরে ?

বাইরের বসি।

বাইরে বেশিক্ষণ বসা ঠিক হবে না।

কেন ?

ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে যে! ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

আপনাদের বাথরুমটা কোথায় ?

এতক্ষণ একবারও যাবার সুযোগ হয়নি। পেটটা ফুলে রয়েছে। লতিফাদের বাসাতেই লেগেছিল কিন্তু ভদ্রতা করে বলেনি।

ঐ তো বাঁ ধারে, সোজা চলে যানে। সুইচ ঠিক দরোজার বাইরেই আছে। যান।

বাবর গেল। বাতি জ্বালিয়ে ভেতরে ঢুকল। আয়নায় নিজেকে দেখল খানিক। অহেতুক মাথায় পাকা চুলের সন্ধান করল সে। থাকলেও রাতে তা চোখে পড়ল না। গালের দু'পাশে ডলল কয়েকবার। সেভ ঠিকই হয়েছে। ট্রাউজারের বোতাম খুলল সে। ঘণ্টা সাতেক প্রস্রাব করা হয়নি। হলুদ হয়ে গেছে রং। যন্ত্রটাও বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় ভীমাকার ধারণ করেছে। ভারমুক্ত হবার পর এত আরাম লাগল যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সে একটা হাসি উপহার দিল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এলো বাইরে।

এদিকে আসুন। বলে একটা দরোজার দিকে হাত তুলে ইশারা করলেন কাজী সাহেব। বাবর চোখ তুলে দেখল দরোজার মাথায় সবুজ রংয়ে লেখা BAR.

সে-কী!

অভ্যেস আছে তো ?

তা আছে।

তবে আর কী ? আসুন, আসুন। অনেকদিন আমি নিজেও বসি না।

কী দরকার ?

রেখে দিন তো দরকার। আসুন।

কাজী সাহেব তাকে ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এক কোণে কাউন্টার। কাউন্টারের সামনে উঁচু কয়েকটা টুল। ওদিকে কয়েকটা নিচু চেয়ার। হালকা বাতি জ্বলছে। কাজী সাহেব বললেন, বার খোলার সময় হয়নি। বেয়ারাকে ধরে এনে খোলালাম।

একটু না হয় অপেক্ষাই করতাম।

কী খাবেন ?

আপনি ?

আপনার পছন্দ বলুন।

হুইস্কি।

আমারও ঐ। দাও, দুটো বড়। সোডা ?

না, সোডা না, পানি।

আমি আবার সোডা ছাড়া পারি না।

সোডা শেষ পর্যন্ত আপনার পেটের ক্ষতি হবে।

তাই নাকি ? তাহলে আমি পানি দিয়েই।

দুটো গেলাশ সামনে রাখল বেয়ারা। ওরা টুলে পা ঝুলিয়ে কাউন্টারে ঠেস দিয়ে বসল।
চিয়ার্স।

চিয়ার্স। আপনাকে যেন মাঝে মাঝে পাই।

ধন্যবাদ।

কিছু বলুন না ? বাবর নীরবতা ভঙ্গ করল।

আপনি বলুন। আপনাদের কাছ থেকে দুটো ভালমন্দ শোনা তো ভাগ্যের কথা।

হঠাৎ কেমন রাগ হলো বাবরের। লোকটা নিজেকে এত হীন ভাবতে ভালবাসে কেন ? এ কোন ধরনের আনন্দ। অথচ সত্যি সত্যি আমি যদি তাকে বলি, আপনি তুচ্ছ, আপনি সাধারণ, আমার কথা শুনুন, আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাহলে বোমা বিস্ফোরণ হবে। এই অতি ভদ্র অতি বিনয়ী লোকটাই হিংস্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। মানুষ কেন এ অভিনয় করে ?

ভাবতেই চমকে উঠল বাবর। সে নিজেও কি একজন শক্তিশালী অভিনেতা নয় ? না, না ও কথা থাক। ও কথা এখন ভাবতে চায় না বাবর। ভাবনাটাকে ভাসিয়ে দেবার জন্য সে ঢক ঢক করে এক সঙ্গে বেশ খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল।

আপনি যে হঠাৎ এভাবে আসবেন, তা ভাবতেই পারিনি।

আমিও না।

ভাবছিলাম. আজকের সন্ধ্যেটা খুবই খারাপ কাটবে। দৈবের কী কাজ দেখুন, আজকের সন্ধ্যেটাই এমন হলো যে আমার অনেকদিন মনে থাকবে।

আমারও।

আপনাকে অনেকে তাকিয়ে দেখছে।

দেখছে নাকি ?

দেখবে না ? আপনাকে টেলিভিশনে দেখে। ওরা অবাক হয়ে গেছে, আপনি কী করে এখানে এলেন।

আর বলবেন না, ঢাকাতেও এই কাণ্ড। কোনোখানে যেতে পারি না, বসতে পারি না, একটু একা থাকতে পারি না— লোকে চিনে ফেলে।

লতিফার কাছে শুনেছি ঢাকায় খুব পপুলারিটি আপনার। ও তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বলে বাবর চাচার মত প্রোগ্রাম আর কেউ করতে পারে না।

বলে নাকি ?

বলে। আপনি আছেন বলে আমার ভরসাও কম নয়। মেয়েটা একা একা ঢাকায় থাকে। জানি, কিছু একটা হলে আপনি আছেন, দেখতে পাবেন, খবর পাব।

তাতো নিশ্চয়ই।

তাছাড়া আমি জানি, আপনিও ওকে খুব স্নেহ করেন। আপনার ওখানে যায় তো মাঝে মাঝে ? যায় না ?

হ্যাঁ, যায়।

আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম, ঢাকায় কোথাও যেতে হলে বাবর সাহেবের বাসায় যাবি। আর কোথাও না। বোঝেন তো বার-বাড়ন্ত মেয়ে। সব জায়গায় যেতে দিতে নেই। আমার নিকট সম্পর্কেরও দু'জন আত্মীয় আছেন, আমি তাদের বাসায় পর্যন্ত লতিফাকে যেতে দিই না।

কেন ?

নিজের মেয়ে বড় হোক তখন বুঝবেন। ভাবছি হোস্টেলে গিয়ে আপনার নাম ভিজিটারদের খাতায় তুলে দিয়ে আসব।

কিন্তু যে বললেন লতিফার বিয়ে দিচ্ছেন। বিলেত যাচ্ছে।

ওহো! এই দেখুন। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। বলে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলেন কাজী সাহেব। বাবর বুঝতে পারল হুইস্কি কাজ করতে শুরু করেছে। কাজী সাহেব নেশার আমেজে কী বলতে কী বলছেন। কাজী সাহেব বললেন, আমার জামাইটা খুব ভাল হচ্ছে।

নিশ্চয়ই।

নিজের জামাই বলে বলছি না।— এ-কী আপনার গ্লাস খালি, বেয়ারা জলদি দাও।

আপনি ?

আমিও নেব। কী বলছিলাম ?

বলছিলেন আপনার হবু জামাইয়ের কথা।

দুটো ছোট ছোট দ্রুত চুমুক দিয়ে কাজী সাহেব বললেন, হবু বলছেন কেন ? জামাই হয়েই গেছে। বড় ভাল ছেলে। অমন ব্রিলিয়েন্ট ছেলে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আমার অনেকদিন থেকেই চোখ ছিল ছেলেটার ওপর।

আপনার তো আত্মীয়ের মধ্যেই ?

জি, আমার এক কাজিন শালীর একমাত্র ছেলে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে যাচ্ছে। লতিফাকেও নিয়ে যাবে।

বাবর অত্যন্ত সাবধান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, লতিফা কী বলে।

ওতো বিলেত যাবার নামে ওড়ে।

না, বিলেতের কথা বলছি না।

তবে ?

এত অল্প বয়সে— মাত্র তো সতের— বিয়ে হচ্ছে, তাই বলছিলাম।

তা বিয়ের জন্যে বয়েসটা একটু কম। সেজন্য আমিও ঠিক সাহস পাচ্ছিলাম না। কামাল ওর মাকে বলেছিল—

কামাল কে ?

কেন, আমার জামাই!

ও, বলুন।

কামাল ওর মাকে বলেছিল বিয়ে করলে লতিফাকেই করবে। ওর মা বিলেত যাবার আগে ছেলের বিয়ে নিয়ে চাপাচাপি করেছিলেন কি-না তাই।

তারপর ?

কাজী সাহেব আরেকটা বড় চুমুক দিলেন গ্লাসে। মুখটা মুছলেন। তারপর চোখ স্তিমিত করে বললেন, অনেকদিন পরে খাচ্ছি কি-না তাই কেমন কেমন লাগছে।

সে-কী, মাত্র দু'পেগ তো খেয়েছেন।

আমি খাই-ই কম। আপনি নিন।

নেব। এটা খালি হোক। এখানে চিপস-টিপস কিছু--

বেয়ারা, চিপস।

সে বলল, চিপসের তো ব্যবস্থা নেই।

যেখান থেকে পার ব্যবস্থা কর। প্রায় হুংকার দিয়ে উঠলেন কাজী সাহেব। তার এ মূর্তি বাবর দেখেনি। উনি যে কাউকে ধমক দিতে পারেন সেটা একেবারে অচিন্তনীয়। অপ্রস্তুত হয়ে গেল বাবর। বলল, থাক না, আমি এমনি বলেছিলাম।

না, থাকবে কেন ? ড্রিংসের সঙ্গে চিপস নেই। সেক্রেটারীর কাছে কমপ্লেন করব। আবার কেমন বেয়াদপ, মুখের উপর কথা বলে। তুমকো হাম দেখ লেগা।

আরে, করছেন কী ?

এই তুমহারা বাড়ি কাঁহা ? কাজী সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন আবার।

জি, রাজশাহী।

রাজশাহী।

রাজশাহী কাঁহা ?

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, হুজুর।

চল, তব ঠিক হ্যায়। বলে তাকে রেহাই দিলেন কাজী সাহেব এবং মুখ ফিরিয়ে বাবরকে বললেন. আমার দেশেরই লোক কি-না, তাই ছেড়ে দিলাম।

বেশ করছেন। আপনারা তাহলে রাজশাহীর ?

হ্যাঁ। আপনি ?

বর্ধমান।

পার্টিশনের পর ঢাকায় এসেছেন ?

ঠিক পার্টিশনের পর নয়। ১৯৫৪ সালে।

খুব অবাক কাণ্ড।

অবাক কীসের ?

আরে, চাকরি নিয়ে আমার প্রথম পোস্টইং যে ছিল বর্ধমানে।

তাই নাকি ?

তবে আর বলছি কী! খোকার জন্ম হয় বর্ধমানে।

আর লতিফার ?

চাটগাঁয়ে।

আর ছোটটি ?

মন্টুর কথা বলছেন ? ওটি খাস ঢাকাইয়া। আপনি বিয়ে করেছেন কোন ডিস্ট্রীক্টে ?

সত্যি মিথ্যের চাষ যাকে বলে আজ তাই হচ্ছে। বাবর একটু স্মিত হেসে সলজ্জ হবার অভিনয় করে সময় নিল। তারপর বলল, ঢাকাতেই।

তাহলে এক হিসেবে আপনিও ঢাকাইয়া। কী বলেন ?

ভারি আমোদের একটা কথা যেন তিনি বলেছেন এমনিভাবে দুলে দুলে হাসতে লাগলেন কাজী সাহেব। বেয়ারা তার গ্লাশটা ভরে দিল। আর সে বকুনি খাবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

কিন্তু বাবরের এখনও জানা হলো না, বিয়েটা ঠিক হলো কী করে ? আর লতিফার প্রতিক্রিয়াই বা কী ? বাপ মা কি তাকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে ? খুব সম্ভব তাই। কারণ, লতিফা এই সেদিনও বলছিল, বিয়ে সে জীবনে করবে না। এই এক মাসের মধ্যে এমন কী হয়ে গেল ?

কথাটা কীভাবে তোলা যায় ভাবতে লাগল বাবর। চারদিকে তাকাল সে। একেবারে নীরব নিঝুম সারা ক্লাব। ভেতরে শুধু তারা দু'জন। বাইরেও কেউ নেই। বাবর জিজ্ঞেস করল, বিশেষ কাউকে দেখছি না।

দেখতেন। আগে এলে দেখতেন কী জমজমাট থাকে।

এখন কী হয়েছে ?

চারদিকে যেমন আন্দোলন চলছে সাহেব, সবাই সন্ধ্যের পর ঘর থেকে আর বেরোয় না। বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীরা। তাদের কীর্তির তো অন্ত নেই সাহেব। ভয়ে, স্রেফ ভয়ে বাসায় বসে থাকে।

ও।

হাসল বাবর। লতিফার কথাটা তোলা যায় কী করে ? একটু পর সে আবার চেষ্টা করল, মেয়েরা আসে না ক্লাবে ?

ব্যবস্থা তো আছে। মেয়েদের জন্যে আলাদা একটা কামরাও রাখা আছে। কিন্তু সপ্তাহে এক আধদিন ছাড়া আসে না। আর সময় কই বলুন ? ঘর সংসার ছেলে মেয়ে সবারই তো এক অবস্থা।

এবারে আশার আলো দেখতে পেল বাবর। বলল, ছেলেমেয়েদের আপনি খুব ভালবাসেন,

না ?

ছেলেমেয়েরাই আমার সব। লতিফাকে তো চেনেন, ওকে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কী আদরে ওদের বড় করেছি আমি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কাজী সাহেব। তারপর গ্লাশের দিকে চোখ রেখেই তন্ময় কণ্ঠে বললেন, বিয়ে দিলেই মেয়ে পর হয়ে যায়। তবুও বিয়ে দিচ্ছি। ভাবতে এখনই আমার খারাপ লাগছে।

আর কিছু দিন পর না হয় বিয়ে দিতেন।

ছেলেটা ভাল। তাছাড়া, ক'দিনই বা বাঁচব। বেঁচে থাকতে থাকতে সব বিলিব্যবস্থা করতে পারলে শান্তিতে মরতে পারব।

এটা স্বার্থপরের মত বলছেন।

তা আপনি বলতে পারেন।

তাহলে কেন দিচ্ছেন ?

আমাকে স্বার্থপর বললেন, না ?

আপনি ভুল বুঝবেন না।

না, না ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার কেন যেন কিছুদিন থেকে কেবল মনে হচ্ছিল লতিফার বিয়ে দেওয়া দরকার।

হঠাৎ গলার কাছে কেমন দলা পাকিয়ে এলো বাবরের। অত্যন্ত সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল সে, কেন এ রকম মনে হচ্ছিল ?

জানি না। ঠিক আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। গত ছুটিতে দিন কয়েকের জন্য বাড়িতে এসেছিল লতিফা—

বাবরের মনে পড়ল, সে তাকে গাড়িতে করে ইস্টিশনে দিয়ে গিয়েছিল। শখ করে লতিফা সেদিন একটা শাড়ি পরেছিল গাঢ় নীল রংয়ের। বাবর বলেছিল, সকাল বেলার এই চড়া রদ্দুরে গাঢ় নীলটা চোখে লাগছে, তার উত্তরে লতিফা বলেছিল, চোখে লাগাবার জন্যেই তো পরা।

দিন কয়েকের জন্যে বাড়িতে এসেছিল লতিফা; ও যখন আসে আমি তখন অফিসে। বাসায় ফিরে দেখি মেয়েটা শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে। সেই তখনই কথাটা চমক দিয়ে গেল মনে। লতিফার বিয়ে দেওয়া দরকার।

তবু স্পষ্ট বুঝতে পারল না বাবর। সে আরো কিছু শোনার প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার মাথাতেও সুরার ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কাজী সাহেব অনেকক্ষণ আর কিছু বললেন না বলে বাবরই সরব হলো।

তখনই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন বুঝি ?

সুস্থ অবস্থায় থাকলে এ রকম একটা হাস্যকর কথা না বক্তা বলতে পারত না শ্রোতা শুনতে পারত গাম্ভীর্য না হারিয়ে। কাজী সাহেব উক্তিটা বিবেচনা করে উত্তর দিলেন, না ঠিক তখনই ব্যবস্থা করা যায় নি। তবে ওর মাকে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম।

ভাবী কী বললেন ?

তিনি বললেন মেয়ের বয়স কম। আমি বললাম, রাখ বয়স। আগের দিনে সতের বছরে চার ছেলের মা হতো। আমার মা পনের বছরে আমাকে পেয়েছিলেন। আপনার মা ?

সুরাপানে বাবর অভ্যস্ত। তাই সে অবিরাম এতক্ষণ পান করার পরও কোনোক্রমে বুঝতে পারল কাজী সাহেবের বেশ নেশা হয়েছে। শেষ প্রশ্নটা তার প্রমাণ।

আপনার মায়ের কত বছরে আপনি হয়েছিলেন বলুন তো ? কাজী সাহেব এবারে বিশদভাবে প্রশ্নটা করলেন।

আমার মনে নেই।

হাঃ হাঃ হাঃ। আপনার মনে থাকবে কী করে ? আরে, আপনার তো তখন জন্মই হয়নি। হাঃ হাঃ হাঃ।

বাবর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, বলল নয়, বলে টের পেল সে বলে ফেলেছে, লতিফাকে আমি পছন্দ করি।

লতিফাও বলে বাবর চাচা আমাকে খুব স্নেহ করে।

বলেছে আপনাকে ?

কতবার বলেছে। বিশ্বাস না হলে বাসায় ফিরে আপনার সামনেই জিজ্ঞেস করব। নিজ কানে শুনে যাবেন।

আপনার মেয়ের মত মেয়ে আমার চোখে পড়েনি, জানলেন কাজী ভাই।

দোয়া করবেন।

তা সব সময়েই করি।

বাপের মনতো, বেশি প্রশংসা শুনলে মনটা ভয় পেয়ে যায়।

না, না কী যে বলেন ও সব কুসংস্কার।

আপনি আরো নিন। বেয়ারা!

আপনি ?

ব্যাস, আমি আর না।

সে হয় না।

আচ্ছা বলছেন যখন, আরেক পেগ নিচ্ছি। বেয়ারা, সাবকে দুটো দাও। দাও, দাও এক সঙ্গে ঢেলে দাও।

স্যার, দশটা বাজে, এখন বনন্ধ করতে হয়।

চুপ হারামজাদা।

স্যার, সেক্রেটারী সাহেবের অর্ডার।

ফের কথা।

বেয়ারা চুপ করল।

বাবর বলল, চলুন, গ্লাশটা শেষ করেই উঠা যাক। ভাবী ওদিকে রান্না করে বসে আছে।

আরে আপনি আছেন বলে আমি নিশ্চিন্তে আছি। যত রাতই করি না কেন, কিছু বলতে পারবে না। হাঃ হাঃ। তবে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে ভয়।

লতিফা ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একটাই তো আমার মেয়ে। ওর মা বুঝলেন কোনোদিন আমাকে শাসন করে জুৎ করতে পারেনি, আর সেদিনের মেয়ে, আমারই পেটে হলো, আরে কী বলছি, আমারই ইয়েতে, মানে আমারই মেয়ে, বুঝতেই পারছেন কী বলছি—

হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

সেই মেয়ে আমাকে এমন শাসন করে— হাঃ হাঃ। আপনার মেয়ে আছে তো, বুঝবেন, নিজেই বুঝতে পারবেন, মাশআল্লা বড় হোক। কী যেন নাম আপনার মেয়ের ?

তাইতো কী যেন একটা বানিয়ে বলেছিল বাবর ভারি মুশকিল হলো তো! কিন্তু বানিয়ে কথা বলা আর কথা বিক্রি করে খাওয়া বাবরের পেশা। সে পাল্টা বলল, লতিফার বিয়ে তাহলে আপনিই ঠিক করলেন। কী করে কথাটা পারলেন ওর কাছে ?

আরে বাবর সাহেব, সেই কথাই তো বলছি। মেয়ে আমার বাড়িতে এসেই মাকে বলে, বিয়ে টিয়ে দেবে না আমাকে ? শুনুন কথা।

লতিফা নিজে বলেছে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনে দেখবেন আপনার ভাবীর কাছে।

অবাক হয়ে গেল বাবর। লতিফা নিজে বলেছে, যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। তার মুখ দিয়ে একটা শব্দ গড়িয়ে পড়ল।

আশ্চর্য।

জানি, জানি, আপনি অবাক হবেন। কিন্তু মেয়েকে আমি সে শিক্ষা দিইনি যে, মনের কথা মনে পুষে রাখবে। আমরা বাবা মা চিরদিন ওকে বুঝিয়েছি যে আমরা তোর বন্ধু, সবচে' ভাল বন্ধু। তাই যে কথাটা আর দশটা মেয়ে বলতে লজ্জায় হার্টফেল করত, সে কথা আমার মেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলতে পেরেছে।

তারপর ?

তারপর আর কী ? বিয়ে দেবার কথা আমিও ভাবছিলাম। ঐ যে বললাম, তাছাড়া আপনি বললেন, আমি স্বার্থপর। মেয়েকে পর করে নিশ্চিন্ত হতে যাচ্ছি। সেটাও আছে। লিখে দিলাম কামালের মাকে চিঠি। আপনাকে দাওয়াত করব। আসতেই হবে। আপনি না এলে লতিফার বিয়েই হবে না।

আসব, আসব।

আসব বললে হবে না, আসতেই হবে।

আসব। কেন আসব না ? এই যে না বলে না কয়ে হঠাৎ চলে এলাম।

সত্যি কী যে খুশি হয়েছি।

এক চুমুকে গ্লাশ শেষ করল বাবর। কিছুতেই এ বিস্ময় তার যাচ্ছিল না যে লতিফা নিজে বিয়ে করতে চেয়েছে। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে লতিফার মুখ। লম্বা ডিমের

মত। লাল লাল ফর্সা। একটা নীল শিরা, কোথায় যেন সুন্দর একটা কাঁথায় নীল সুতার মত। লতিফাকে একবার চোখে দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে বাবরের।

বাবর বলল, চলুন।

আর একটু খান।

আর না। সত্যি একটু বেশিই হয়ে গেছে।

এই বলে বাবর পকেট থেকে টাকা বের করল। খপ করে তার হাত ধরে ফেললেন কাজী সাহেব।

আরে, আরে করছেন কী ? মাথা খারাপ ? এখানে সব সইয়ের কারবার বলে বেয়ারার হাত থেকে মেমো নিয়েই সই করে দিলেন কাজী সাহেব। বললেন, চলুন।

বাইরে বেরিয়ে তিনি বললেন, ভাবছেন, মাতাল হয়ে গেছি, না ? গাড়ি চালাব কী করে ?

কী যে বলেন ?

চলুন, এমন আরামে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব যে, জানতেও পারবেন না। তারপর হঠাৎ আচমকা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কাজী সাহেব বললেন, আমার জীবনটা খুব কষ্টে গেছে, জানেন ? খুব দুঃখে মানুষ হয়েছি।

আর কিছু বললেন না তিনি। বাবর কোনো উৎসাহ পেল না যে প্রশ্ন করে। তার মাথায় এখন লতিফার নাম, আর চোখে লতিফার ছবি। লতিফা নিজে বিয়ের কথা বলেছে, আশ্চর্য।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট নিল। অ্যাকসেলেটারে হঠাৎ বেশি চাপ পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। বাবর সে কথা তুলে তাঁকে আর লজ্জা দিল না।

পরে হঠাৎ বাবরের মনে পড়ল তার মেয়ের নাম সে বলেছিল বাবলি বাবর। নিজের কাছেই খুব মিষ্টি লাগছে নামটা। বাবলির সাথে নিজের নাম যোগ করার ফলে সুন্দর একটা সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে যেন। বাবলি বাবর। ঢাকায় ফিরে বাবলির সঙ্গে দেখা করতে হবে। অনেক দিন দেখা হয় না। নাকি সেও এব মধ্যে লতিফার মত না কয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে ? আজকাল এই সব তরুণী মেয়েদের তাল বুঝতে পারে না সে। বয়সের দু'যুগ ব্যবধান। কুড়ি বছর। কুড়ি বছর আগে কলকাতায় ছিল। সে আরেক জীবন। আর এক জগৎ।

এর আগে এতটা কোনোদিন ভাবেনি বাবর। লতিফার হঠাৎ চলে আসা তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে কোথায়। না, ও কিছু না, সে ভাবল। আমি আজ খানিকটা বেশিই সুরা পান করে ফেলেছি। অতিরিক্ত সুরা পান করলে কখনো কখনো এ রকম রিক্ত পরাজিত মনে হয় নিজেকে।

ভাবনাটাকে পাশ কাটাবার জন্য কাজী সাহেবের দিকে মনোযোগ ফেরাল বাবর। দেখল, মিটমিট করে হাসছেন তিনি, চোখ পথের উপর স্থির নিবদ্ধ।

হাসছেন যে।

এমনি। আজ সন্ধ্যেটা বেশ কাটল।

চমৎকার।

আপনাকে খুব ভাল লাগে আমার। ঢাকায় আসুন না ছুটি নিয়ে। জমিয়ে গল্প করা যাবে কয়েকদিন।

আসব। এলে আপনাকেই প্রথম ফোন করব।

আপনি তখন আমার মেয়ের নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন না ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী যেন নাম ?

বাবলি বাবর।

বাসার কাছে এসে গেল তারা। সদর ফটক বন্ধ। বাবর বলল, দাঁড়ান, আমি নেমে খুলে দিচ্ছি।

হাতঘড়ি আলোর দিকে ধরে কাজী সাহেব শীস দিয়ে উঠলেন।

এ-গা-র-টা বাজে। আমার আবার ভোরে অফিস কি-না। তাই দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ার অভ্যেস।

সন্তর্পণে ফটকের ভেতর দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে গ্যারেজে রাখলেন কাজী সাহেব। বাবর সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কাজী সাহেব কাছে এলে বারান্দার দিকে এগুল তারা। ওঠার সিঁড়িতে পা দিতেই নিশ্চল হয়ে গেল বাবর।

লতিফা দরোজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢিলেঢালা জামা পাজামা পরনে। আধা স্বচ্ছ নীল রং। চোখে ঘুমের ভাব। রোঁয়া ফোলান আদুরে বেড়ালের মত দেখাচ্ছে মুখটা। দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি।

বাবর নিঃশব্দে একটু হাসল। তার কোনো জবাব দিল না লতিফা। তখন সে বলল, এই যে, জেগে আছ।

কাজী সাহেব বললেন, তোর মা কোথায় ?

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে একরোখা গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমরা গিয়েছিলে কোথায় ?

বাবর সাহেবকে শহর দেখিয়ে আনলাম। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তাই না বাবর সাহেব ?

জি।

দরোজা ছেড়ে দিল লতিফা। ওরা ভিতরে ঢুকল। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। এখানে একটা বড় শেড দেয়া বাতি জ্বলছে মৃদু আলো ছড়িয়ে। ঐ কোণে চৌকি পাতা হয়েছে। তাতে কালো শাদা নকসা করা বেড কভার। বাবরের ভাবতে ভাল লাগল বিছানাটা লতিফা নিজ হাতে করেছে। সেদিকে তাকিয়ে সে বলল, অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে।

বিছানা আমি করিনি, মা করেছেন। বলে লতিফা বাবাকে বলল, খাওয়া হয়েছে তোমাদের ?

নাহ্। বলে একটা সোফার ওপর ধপ করে বসে কাজী সাহেব জুতো খুলতে লাগলেন।

কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা সরসর করে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। সেটাকে ঘায়েল করার জন্য বাবর একবার হাসবার চেষ্টা করল। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল জং ধরা একটা মেশিনের

মত।

নাক সরু করে লতিফা বাবার মুখের কাছে মুখ এনে ঘ্রাণ নিল।

তোমরা মদ খেয়েছ?

নাতো। না। এই একটুখানি। বলে অনাবিল হাসবার ভঙ্গি করলেন কাজী সাহেব।

লতিফা বলল, তোমাদের ভাত দেয়া আছে। খাবে এসো।

লতিফাকে দেখে মনে হচ্ছে বাবর যেন এ ঘরে নেই।

খাওয়া শেষে লতিফা জিজ্ঞেস করল, এতক্ষণ পর এই প্রথম বাবরকে, চা খাবেন? না, খেলে আপনাদের নেশা ছুটে যাবে?

সে যে একটা কথা অন্তত বলেছে এতে বড় স্বচ্ছন্দ বোধ করল বাবর। বলল, রাতে তো একবার চা খাওয়া আমার অভ্যেস কিন্তু তোমার যে কষ্ট হবে।

নিঃশব্দে চায়ের পানি গরম করতে গেল লতিফা।

কাজী সাহেব বললেন, আপনি কিন্তু বিয়েতে আসবেন।

আসব, আসব না কেন? লতিফার বিয়েতে আসব।

বাবর নিজেই টের পেল হুইস্কির ওজনে 'স' গুলো সব 'শ' হয়ে যাচ্ছে জিভেয়। চোর চোখে একবার সে তাকাল লতিফার দিকে। কিন্তু তার মনোযোগ কেতলি কাপের দিকে।

নিঃশব্দে চা খেলো ওরা। কাজী সাহেব মাঝখানে কী একটা প্রসঙ্গ তুলতে গেলেন কিন্তু নিজেই কী বুঝে আর তুললেন না।

লতিফা বাবরকে দ্বিতীয়বার কথা বলল, আপনি তো ক্লান্ত, শুয়ে পড়ুন।

বাবা ঘরে চল।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। এত তাড়া দিচ্ছ কেন?

রাত কত তার খেয়াল আছে?

আছে, আছে। বলতে বলতে কাজী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আচ্ছা আপনি ঘুমোন তাহলে। সকালে দেখা হবে। বাঁ পাশের দরোজা দিয়ে বাথরুম।

আর লতিফা যেতে যেতে তাকে বলল, শোবার সময় বাতি নেভাতে ভুলবেন না।

শূন্য ঘরে একবার মনে হলো বাবরের, লতিফা কথায় এত বিষ ব্যবহার করছে কেন? তারপর ভারি ক্লান্ত উদ্যমহীন মনে হলো নিজেকে। সে শুয়ে পড়ল।

শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল ঘরের শ্যাওলা পড়া ছাদ, শেড দেয়া বাতি থেকে উর্ধমুখে বেরুনো আলোর চক্র, পর্দা টানা জানালাগুলো। কানের ভেতরে অতি উচ্চগ্রামের কিছু শব্দ তোলপাড় করতে লাগল অবিরাম। এ শব্দ কীসের? কোত্থেকে আসছে? ও, লতিফা বাতির কথা বলছিল। বাবর বাতি নিভিয়ে দিল।

একবার মনে হলো তখন, সে জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছে, যেমন গতবার চাঁটগা থেকে করাচি গিয়েছিল। আরেকবার ভাবল সে ঢাকায় তার নিজের ঘরেই আছে। কোনটা সত্যি ভালো করে স্থির করার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমিয়ে পড়ল না চৈতন্য হারাল সেটাও বিতর্কের বিষয়।

২

জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছিল বাবর। জাহাজটাই ডুবে গেল। নিঃশব্দে। নিমেষে। সে এখন পানির অতলে অবিরাম নামছে, নামছে।

নামতে নামতে গতিটা হঠাৎ থেমে গেল। স্থির হয়ে রইল বাবর। আর তার চারদিক দিয়ে বয়ে যেতে লাগল নীল শীতল অগাধ পানি। একটা বড় রূপালি মাছ এলো কোথা থেকে। সে তার ঈষৎ গোলাপি লেজ দিয়ে মৃদু চাপড় মারতে লাগল বাবরের তলপেটে।

তখন চোখ মেলে তাকাল বাবর।

দেখল, অন্ধকারে তার কোলের কাছে মৃদু সুগন্ধ ছড়ান একতাল সাদা। স্পর্শ করতেই মনে হলো তা কোমল এবং উষ্ণ।

বাবর উচ্চারণ করল, লতিফা ? তারপর আবার বলল, লতিফা তুমি ? এবং উঠে বসতে চেষ্টা করল সে।

লতিফা তার কনুইয়ের উপর চাপ দিয়ে বলল, আস্তে চুপ, কেউ জেগে উঠবে।

বাবর অবাক হয়েছিল। অবাক হয়েছিল এভাবে চোরের মত মাঝ রাতে লতিফা এসেছে বলে নয়। মনের কোনো এক কোণে যেন মনে হচ্ছিল লতিফা আসবে এবং সেটা এখন বাস্তবে মিলে যাচ্ছে।

তার হাত মুঠো করে ধরল বাবর। ঠাণ্ডা নরম স্বাস্থ্যভরা পাঁচটা আঙুল। এমনকি শুধুমাত্র স্পর্শ দিয়ে তার এক পিঠে গোলাপি আরেক পিঠে বাদামি রংটা টের পাওয়া যাচ্ছে। আঙুলগুলো পরমুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে লতিফার কাঁধে হাত রাখল বাবর। তরুণ একটা গাছের ডালের মত নিটোল নমনীয় সেই কাঁধ। কাঁধের পরেও স্থায়ী হলো না। হাতটা সে পাঠিয়ে দিল লতিফার পিঠে। দীর্ঘস্থায়ী একটা সুখস্বপ্নের মত পিঠ। মাঝখানে মেরুদণ্ডের নদী। সেই নদীপথে হাতটা একবার খেলা করল। তারপর স্থায়ী হলো কোমরের ওপরে, যেখানে বিরাট একটা বর্তুলের মত স্পন্দমান নিতম্বের শুরু। বাবরের আরেকটা হাত তৎক্ষণাৎ আবরিত করল লতিফার বাম স্তন। এবং নিজের কাছে নিবিড়তর করতে চাইল সে তাকে।

ধাক্কা দিয়ে লতিফা তাকে সরিয়ে দিল। যেন এতক্ষণ বাবর একটা সুদৃশ্য চকচকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র লাগাচ্ছিল, এখন সুইচ টিপতেই শক দিয়েছে।

কী হলো ? খসখসে গলায় প্রশ্ন করল বাবর। এবং উঠে বসে লতিফাকে চুমো দেবার জন্যে গলা জড়িয়ে ধরল তার। লতিফা মুখ সরিয়ে নিতেই একরাশ শ্যাম্পু করা সুগন্ধ জড়ান অশান্ত চুল ছেলেবেলার ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আচ্ছন্ন করে দিল বাবরের সারা চেহারা। অবাক হয়ে গেল সে। লতিফা তো কোনোদিন এমন করে না।

লতিফা পরক্ষণে মুখ ফিরিয়ে হিসহিস করে বলল, কেন তুমি এসেছ ?

কেন এসেছি জান না ? তোমার জন্যে।

মিথ্যেবাদী।

শোন লতিফা। বলে বাবার আবার তাকে চুমো দিতে চেষ্টা করল।

না শুনব না। কেন তুমি এসেছ ?

বললাম তো, তোমার জন্যে।

মিথ্যুক।

লতিফা শোন।

বাবর তার পিঠে হাত রেখে সুদক্ষ সেনাপতির মত তড়িৎবেগে আরেকটা হাত গুঁজে দিল লতিফার দুই উরুর ভেতর। দপ দপ করে উঠল সেখানে। প্রবল দু'হাতে লতিফা তার মুঠি সরিয়ে কোনোক্রমে কেবল বলতে পারল, না।

না কেন ? আমি এর জন্যে মরে যাচ্ছি।

তুমি তো এই-ই চাও।

চাই। আগেও তো দিয়েছ।

না।

দাওনি ?

লতিফা চুপ।

বাবর তখন বলল, কতদিন না চাইতেই দিয়েছ। আসবার কথা ছিল না। হঠাৎ সকালে স্কুটারের শব্দ শুনে উঠে দেখেছি, তুমি। সকালে কী ওসব করা যায় ? তবু তুমি চেয়েছ বলে তৈরি করেছি নিজেকে। আজ না কেন ?

বলে আবার সে হাতটা লতিফার উরুর ওপরে রাখল। সেখান থেকে একটা আঙুল কেন্দ্রের ওপর চেপে ধরল। আর্তনাদ করে উঠল লতিফা।

পশু, একটা পশু তুমি।

নিঃশব্দে হাসল বাবর। বলল, তুমি বড্ড রাগ করেছ।

রাগ করব তোমার ওপর ? তুমি কী বোঝ রাগের ? একটা পশু হলেও সে বুঝতো। তুমি তাও নও।

বাবরের এবার রাগ হলো হঠাৎ। কিন্তু মুহূর্তে সেটা কবর দিয়ে হাসল। বলল, অথচ একটু আগেই তুমি বলেছিলে আমি নাকি পশু।

বলেছি, বেশ করেছি। আবার বলব। একশ' বার বলব। তোমার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক ?

সম্পর্ক নেই ?

না, নেই।

নেই ?

হ্যাঁ, নেই। তুমি মনে করেছ আমি তোমার জন্যে মরে যাব, না ?

তোমার আগে যেন আমার মরণ হয়। বাবর বলল। বলেই ভাবল, এ রকম কথা নভেলে লেখা থাকে, স্ত্রী বলে স্বামীকে। কথাটা কী মেয়েলি শোনাল ? সন্দেহে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল বাবর। পরে বলল, বল, আর কী বলবে ?

তোমাকে কিছু বলতে চাই না। তুমি এতবড়— এতবড় ভণ্ড।

পশু থেকে ভণ্ড ? প্রমোশন দিলে না ডিমোশন করলে ? বলতে বলতে সন্ধানী তর্জনীটাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দিল বাবর। লতিফা বাধা দিল না। কিম্বা বাধা দেবার কথা মনে হলো না তার। তখন আরেকটা হাত বাবর রাখল লতিফার নিতম্ব বেষ্টন করে। ক্রমসঞ্চারিত বাসনা এবং সাহসে তার হাত ফুলে উঠতে লাগল। লতিফা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না।

কিন্তু তোমাকে চাই। কাছে চাই। সারাক্ষণ চাই।

মিথ্যে কথা।

সত্যি। তুমি নিজেই জান যে সত্যি।

মিথ্যুক।

একেবারে নিজের কাছে আমার করে তোমাকে চাই।

ভণ্ড।

কোনোদিন তোমাকে হারাতে চাই না।

আমি জানি।

জান ?

জানি; জানি, তুমি কী চাও।

বাবর তাকে টেনে বুকের মধ্যে লুকিয়ে খাটো চুলের নিচে গোলাপি ঘাড়ের ওপর চুমো দিল। চুমোটা শুকনো লাগল। তখন মুখের ভেতরটা ভিজিয়ে সেই জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট চাটল এবং আবার চুমো দিল। মনে হলো শিশির ভেজা একটা ছোট্ট পাতা ছাপ রেখে গেল লতিফার শরীরে।

লতিফা সেভাবেই পড়ে থেকে বলতে লাগল, তুমি যদি আমাকে ভালবাসতে তাহলে— তাহলে— তাহলে—

বাবর তাকে ছেড়ে দিল।

কী তাহলে, বল ?

লতিফা মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের রাশ বশে আনতে আনতে উত্তর দিল, তাহলে তুমি বাবার সঙ্গে বসে গহনার ডিজাইন পছন্দ করতে পারতে না।

বাবর নিঃশব্দে হাসল।

হ্যাঁ পারতে না। অমন দাঁত বের করে বাবাকে খোশামোদ করতে পারতে না।

বাবর আবার তেমনি হাসল।

আমার কাছে এসেছ কেন ? যাও বাবার কাছে যাও।

বাবর বলল, আমি কোথায় এলাম, তুমিই তো এসেছ।

না, আসিনি। বলে চট করে উঠে দাঁড়াল লতিফা। তারপর কী ভেবে বলল, হ্যাঁ এসেছি। কেন এসেছি— একটা— একটা—

বলতে বলতে, হাঁপাতে হাঁপাতে লতিফা বাবরের গালে তীব্র একটা চড় বসিয়ে দিল।

লাফ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বাবর চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, লতিফা! লতিফা,

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তার মনে হলো লতিফাকে সে খুন করে ফেলে, দু'হাতে গলা টিপে তার শেষ নিঃশ্বাস নিংড়ে বের করে নেয়। মনে হলো, লতিফাকে চড় মারতে মারতে অবসন্ন করে নিজের পায়ের নিচে নেতিয়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তার বদলে বাবর লতিফাকে একটা নিষ্ঠুর চুমো দিল। চুমোটা উত্তেজনায় নাকের নিচে প্রোথিত হলো। তারপর তাকে ছুঁড়ে দিল বিছানায়। এবং নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। এক হাতে পাজামার ইলাস্টিক ব্যাণ্ড আলগা করে টেনে নাবিয়ে আনল হাঁটু পর্যন্ত এবং একই সঙ্গে নিজের পাজামার সমুখের পথ ছিঁড়ে প্রসারিত করে বিদ্যুদ্বেগে প্রচণ্ড একটা চাপ দিল।

ভুল হলো। গন্তব্যে পৌঁছল না সে। হাঁপাতে লাগল। আর তার নিচে জাহাজের একটা মোটা কাছির মত অতিদ্রুত পাকাতে লাগল লতিফার শরীর। আবার লক্ষ্যস্থান সন্ধান করার জন্যে বাবর ধনুকের মত বাঁকা হতেই লতিফা তাকে ঝটকা দিয়ে ফেলে দিল। অর্ধ উলঙ্গ বাবর দেখল লতিফা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হিস হিস করে বলছে, শয়তান, জোচ্চোর, পশু।

লতিফার হাঁটু পর্যন্ত নাবানো পাজামা। তাকে হঠাৎ এমন হাস্যকর মনে হলো বাবরের যেন একটা কার্টুন দেখছে সে। চলে যাবার জন্যে লতিফা এক পা ফেলতেই নিজের নাবানো পাজামায় বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, এক মুহূর্তে সামলে নিল, সরসর করে টেনে তুলল পাজামা। তখন আরো হাসি পেল বাবরের।

লতিফা চলে গেলে বাবর একা অন্ধকার ঘরে হাসল। বিছানার ওপর হিজ মাস্টারস ভয়েসের কুকুরের মত বসে থেকে হাসল বাবর।

৩

পরদিন উল্কার মত গাড়ি চালিয়ে ঢাকায় ফিরল বাবর। পরদিন লতিফার সঙ্গে আর দেখা হয়নি তাঁর। ভোর রাতে ক্রমবর্ধমান অথচ অপূর্ণ, প্রতিহত সেই বাসনাকে নিজ হাতেই বইয়ে দিতে হয়েছে। সেই থেকে কোথায় যেন একা জ্বালা, একটা আক্রোশ, একটা প্রায় দৃশ্যমান স্তব্ধতা বড় হতে হতে জগৎ সংসার গ্রাস করবার উপক্রম করেছে।

ঢাকায় ফিরে ঘরের তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পেল ভেতরে টেলিফোন বাজছে। অদ্ভুত যোগাযোগ তো! আর এক মিনিট পরে পৌঁছলেই টেলিফোনটা সে পেত না। কে হতে পারে?

হ্যালো। হ্যালো। কে?

চিনতে পারছেন না?

তারপর হাসির একটা তরঙ্গ।

বাবর ভেবে পেল না কে হতে পারে? মেয়েদের হাতের লেখার মত তাদের কণ্ঠস্বরও সবার কেমন এক মনে হয় বাবরের। চট করে ঠাহর করতে পারে না। কারো চিঠি এলে ওপরে ঠিকানা দেখেও এ রকম হয় তার। অনেক সময়, যখন মেজাজ খুব ভাল থাকে, নিজের সঙ্গেই বাজি ধরে সে— যদি অমুক হয় তাহলে আজ আবার দেবব্রতের রেকর্ডটা বাজাব

আর না হলে শাস্তি হিসেবে বাথরুমের বালবের দিকে তাকিয়ে থাকব যতক্ষণ না চোখে পানি আসে।

টেলিফোনে বাবর সপ্রতিভ সুরে বলল, পারছি, নিশ্চয়ই চিনতে পারছি।

পারছেন ?

হ্যাঁ। আপনার মুখে কিন্তু আপনার নাম ভারি সুন্দর শোনায়।

তাই নাকি ?

ভদ্র মহিলা প্রীত হলেন। বললেন, আমি মিসেস নফিস।

উচ্চারণটা শোনাল যেন— ইস্ ইস্ ইস্। এবারে বাবর চিনতে পেরেছে।

আরে হ্যাঁ তাইতো! মিসেস নফিসের গলাই তো।

সে বলল, কেমন আছেন ?

ভাল। সকালে ঘরে ছিলেন না ?

না। কেন, টেলিফোন করেছিলেন ?

হ্যাঁ, একবার দু'বার। কী ব্যাপার, দেখাই নেই ?

বাবর মিথ্যে করে বলল, একটা জরুরি কাজে চিটাগাং যেতে হয়েছিল। ট্যাক্স বেশি ধরেছিল, সেইটে কমাতে।

আবার হঠাৎ আক্রোশটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বাবরের ভেতরে। আর লতিফাকে যে কাল রাতে পায়নি তার জ্বালাও টগবগ করে উঠল সারা দেহে।

মিসেস নফিস বললেন, বেশ আছেন, লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছেন।

আপনি কি ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ নিয়েছেন ?

নিইনি। তবে যদি বলেন তো তাদের জানিয়ে দি। — না, না, এত বড় শত্রুতা আপনার করব না। নিশ্চিন্ত থাকবেন।

আপনাকে নিয়ে আমার ভয় নেই।

সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি।

কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি আমাকে ভয় করেন।

কেন বলুন তো ?

নইলে আমাকে একবার দেখতে আসতেন।

কেন, কী হয়েছে আপনার?

কিছু না হলে কি দেখতে আসতে নেই ?

নিশ্চয় আছে। আমি, টেলিফোনে হাত দেখা যাচ্ছে না, তবু আপনাকে কল্পনা করতে বলছি, আমি এই করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

রিনটিনটিন হেসে উঠলেন মিসেস নফিস। বললেন, নাহ, কথায় আপনার সঙ্গে পারবার জো নেই। টেলিভিশনে কাজ করেন তো! কথা খুব বলতে পারেন।

বাবর বলল, শুধু কথা নয়, কাজেও।

তাহলে আজ প্রমাণ দিন। নইলে বিশ্বাস করব না।

আচ্ছা, আজই আসব। আসলে আমি ভাবছিলামও আজ আপনার বাসায় যাব। তাহলে আজ যাচ্ছি। কেমন? রাখি।

অবলীলাক্রমে মিথ্যে বলতে পারে বাবর। সেটা সে নিজেও জানে তবু প্রতিবারই একটা মসৃণ মিথ্যে বলে নিজেই চমৎকৃত হয় সে। যেমন এখন হলো।

বাথরুমে যাচ্ছিল বাবর, আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

আমি মিসেস নফিস বলছি। কখন আসবেন বললেন না তো?

ও, বলিনি? চারটে?

সাড়ে চারটে।

ঠিক, সাড়ে চারটেই আসব। রাখি?

আচ্ছা।

বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রস্রাব করল বাবর। এখনও রংটা গাঢ় হলুদ। কাল থেকে এই রকম। একটা অ্যালক্যালি মিকচার আনা দরকার। বেরিয়ে এসে ওষুধটা এনে কয়েক চামচ খেল সে। কেমন টকটক ঝাঁঝাল। কিন্তু বেশ লাগল খেতে। তারপর শাওয়ার খুলে গোসল করে লম্বা হয়ে পড়ল বাবর। ঘুম এলো সঙ্গে সঙ্গে। ঘুমের ভেতরে সে দেখল তার দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে লতিফা। তার পরনে একটা সুতো পর্যন্ত নেই। কিন্তু একটুও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। চোখে পুরু কাজল। কাজল গলে অশ্রুর ধারা নামছে।

আরে তুমি, দেখি, দেখি কী হয়েছে?

তাকে আদর করতে করতে ঘরে নিয়ে এলো বাবর। আর ভেতরে দেখল তারই বিছানায় এক হাঁটু পিরামিডের মত তুলে শুয়ে আছেন মিসেস নফিস। তার ঠোঁটে স্থির একটা হাসির বিদ্যুৎ। বাবরের এ রকম মনে হলো লতিফা যেন মিসেস নফিসের মেয়ে। সে খুবই লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হলো। পরক্ষণে সারা শরীর হিম হয়ে গেল তার। পা কাঁপতে লাগল। পালাবার জন্যে দৌড়ে বাথরুমের দরোজাটা খুলতেই শাওয়ারের তীব্র ছটা এসে তাকে ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

ধরমর করে উঠে বসল বাবর। সম্মুখে তাকিয়ে দেখল বাবলি দাঁড়িয়ে আছে। নিজের চেহারায় হাত রেখে টের পেল সেখানে পানি। জিগ্যেস করল, মানে?

এত ঘুম আপনার?

কখন এলে?

এইমাত্র। নাম ধরে ডেকেছি। পায়ে শুড়শুড়ি দিয়েছি। শেষে মুখে পানি ছিটাতে হলো। এ সময় কেউ ঘুমায়?

শরীরটা ভাল নেই।

বলে বাবর আবার শুয়ে পড়ল। ভেবেছিল বাবলি এসে পাশে বসবে। তারপর— তারপর আজকেই হয়ত প্রথম সেই সময় আসবে; বাবলি যখন ফিরে যাবে তখন অন্য মানুষ। কত

দীর্ঘ দিন সে এর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। একটু একটু করে এগুচ্ছে বাবলির অন্তরঙ্গতার দিকে।

কিন্তু বাবলি তার পাশে তো বসলই না, তার শরীর খারাপ বলে কোনো উদ্বেগও দেখাল না। তার বদলে সরাসরি বলল, এখন একটা ব্যবস্থা করুন।

আচ্ছা, একে কী বলে ?

বাবর বাবলির কালো পাজামার দিকে আঙুল তুলে জিগ্যেস করল।

কেন, পাজামা ?

আহা, একটা নাম আছে তো ?

বেল বটম। — আমার কথাটা শুনুন না ?

শুনছি। তোমার সব কথা শুনব। তার আগে একটা কথা বল। বাবর উঠে বসে কোলে একটা বালিশ জড়িয়ে বলে চলে, বেল বটম বলতে তোমাদের একটু কেমন, লজ্জা করে না ? বেল বটম পাজামা ?

কেন ? ওমা সে-কী!

অবাক হয়ে বাবলি একটা মোড়ার ওপর ধপ করে বসে পড়ল।

লজ্জা করবে কেন ?

মিটমিট করে হাসতে লাগল বাবর।

বলুন না, কী ?

তুমি ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ছ না ?

হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে ? আমি তো এখন বাংলা শিখছি।

আহা সে কথা নয়। সে তো আমি জানিই। তুমি এখন কী সুন্দর অ·আ ক খ পড়তে পার।

যাহ, আপনি ঠাট্টা করছেন। কী বলবেন তাই বলুন আর নইলে আমার কথা শুনুন। খুব বিপদে পড়েছি।

বিপদ ?

বাবর ভাল করে বাবলির দিকে তাকাল। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল। মাথায় অসংখ্য চুলের চাঁদ এলাপাতাড়ি হয়ে আছে। শ্যামল লম্বাটে মুখটায় গালের ওপর উঁচু হাড়, অনেকটা বিদেশিনীদের মত। চিবুকটা পেস্ট্রীর প্রস্থের মত সরল ও চওড়া। চোখ সব সময় নাচ করছে যেন এইমাত্র মুখ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। বিজ্ঞাপনের মত ঝকঝকে একসারি সুন্দর দাঁত সারাক্ষণ একটি হাসিকে ফ্রেম করে রেখেছে। এখানে কৈ, বিপদ তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না ?

বাবর আবার জিগ্যেস করল, বিপদ ? কোথাও প্রেম ট্রেম করছ নাকি ?

যাহ!

বাবর বুঝতে পারে না, প্রেমের উল্লেখমাত্রে মেয়েরা এমন লজ্জিত, অপ্রতিভ হয়ে যায় কেন ? তার আরো আশ্চর্য লাগে, সে দেখেছে, মেয়েরা যখন প্রথম নগ্ন হয়, যখন প্রথম তাদের সেই অভিজ্ঞতা হয়, পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদের যে লজ্জা তা এর চেয়ে

অনেক কম। তখন লজ্জার বদলে তাকে শংকা, থাকে শিহরণ, থাকে মিনতি, থাকে সম্মোহন। কিন্তু লজ্জা ? না। লতিফার কথা মনে পড়ে। প্রথম দিন, সেটা ছিল বিকেল, লতিফাকে এতটুকু লজ্জিত হতে সে দেখেনি। লতিফা ছিল চোখ বুজে। তার ঠোঁট জোড়া শাদা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত শরীরকে পাথর করে একটা হাত দুই উরুর মাঝখানে শক্ত করে চেপে লতিফা বিছানায় আড়াআড়ি পড়েছিল একটি আয়তক্ষেত্রের নিখুঁত কর্ণের মত।

বাবর বলল, প্রেম নয়, তবে ?

কী যে বলেন!

কার সঙ্গে কিছু হয়েছে ?

আর কী হবে ?

মানে, ডাক্তার দেখাতে হবে নাকি ?

আমি চললাম।

বাবলি উঠে দাঁড়াল। বাবর তাকে আটকে বলল, যাওয়া অত সোজা নাকি ? বসো। লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপ করে এখানে বসো। বলে তাকে প্রায় শূন্যে তুলে খাটের কোণায় বসিয়ে দিল বাবর। জিগ্যেস করল, চকোলেট খাবে ? বিলেত থেকে এক বন্ধু দিয়েছে।

আপনি এখনো ঠাট্টা করছেন ?

মোটেই না।

জানেন, আমি এই এপ্রিলে উনিশে পড়ব ?

জানতাম না, জানলাম। তাতে চকোলেট খাবার বয়স চলে যায়নি। বরং চকোলেট টকোলেট খেলে একটু মোটা হবে। দেখতে ভাল হবে।

দেখতে আমি এমন কী খারাপ শুনি ? আপনি যে লতিফার প্রশংসায় একেবারে গলে যান, তার চেহারা তো আমার চেয়েও বাজে। আর যা ধুমসি!

ভালুকের মত।

মুখে বলছেন কিন্তু মন থেকে স্বীকার করেন না।

বাবর এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে চকোলেট এনে বাবলির কোলে ফেলে দিল। বলল, খাও। সব তোমার। এবার শুনি কী বিপদ ?

বিশটা টাকা হবে ? বাবলি ডান হাত তুলে আঙুলগুলো নাচাল, যেন নিজের দিকে সে কয়েকটা অদৃশ্য সুতো টেনে নিল তাঁতিদের মত।

বিশ টাকা! সে তো মেলা টাকা।

হবে কি-না বলুন।

হবে।

দিন। চটপট দিন। আবার সামনের মাসে ভাইয়ার কাছ থেকে হাত খরচা পেলেই শোধ করে দেব।

ভাল কথা, তোমার ভাইয়া কোথায় ?

কেন, অফিসে ?

তাকে বল ফারুক এসেছে ঢাকায়।

ফারুক কে ?

ও তুমি চিনবে না। আমরা ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। তোমার ভাইয়া হতো ফার্স্ট, ফারুক সেকেন্ড আর আমি বরাবর—

তাকে বাধা দিয়ে বাবলি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, টাকাটা পাব ?

পাবে, পাবে।

আসলে বাবর চাইছিল বাবলি যেন চলে না যায়। ঐ যে তার মনে হচ্ছিল, আজকেই হয়ত সেই প্রথম দিন বাবলির সাথে, সেই সম্ভাবনাটা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কিন্তু এটাও সে জানে এই মেয়েরা যৌবনে পা দিলেও, মনে মনে এখনো কিশোরী। তাদের কথা চটপট শোনা শেষ পর্যন্ত ভাল ফল দেয়।

বাবর টাকাটা বের করে দিল। খটাস করে ভ্যানিটি ব্যাগ বন্ধ হয়ে গেল। পায়ে স্যান্ডেলজোড়া ফের উঠে এলো। বাবলি বলল, ধন্যবাদ, যাই।

যাবে তো। যাবে তো বটেই। চকোলেটগুলো শেষ করে যাও।

পথে খাব। যেতে যেতে খাব।

ওটি হবে না। এখানে সব খেতে হবে।

কেন ?

খেয়ে এক গ্লাস পানি খাবে। তারপর যাবে। নইলে দাঁতে পোকা লাগবে।

বাব্বা। আপনার সঙ্গে পারি না।

বাবলি আবার বসল। চিবোতে লাগল চকোলেট। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খয়েরি রং লাগল। তখন যেন তাকে আরো সুন্দর দেখাল। বাবলিকে এখনই যেতে দেয়া যায় না, বাবর ভাবল। কিন্তু কী করে ? বাবর জিজ্ঞেস করল, টাকাটা কী হবে ?

বলব না। সিক্রেট।

বল।

না।

বল।

বললাম তো, সিক্রেট।

এত সিক্রেট রাখতে নেই। এক আধজনকে বলতে হয়। তাতে সিক্রেট আরো জমে ভাল।

দূর।

বাবলি চকোলেট চিবোতে চিবোতে পা নাচাতে নাচাতে বলল।

তা হলে আমি রাগ করলাম।

বাবলি এবার আড়চোখে বাবরকে দেখল। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল হঠাৎ। বলল, বলছি, বলছি। এমন কিছু সিক্রেট না। সেদিন কলেজ থেকে চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম আমরা চারজন।

ছেলে না মেয়ে ?

মেয়ে সাহেব, মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে আমি মোটেই বেরোই না। আমি ওদের হেট করি।

আমাকেও ?

আপনি কী ছেলে ?

তার মানে ?

আপনি তো কত বড় ? ভাইয়ার বন্ধু।

ও তাতো বটে, তারপর ?

ভাইয়ার বন্ধু শুনে বাবর যেন একটু থেমে গেল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

তারপর সবাই মিলে তো রাক্ষসের মত খেয়েছি। সবাই ভেবেছি সবার কাছেই টাকা আছে এক আমার কাছে ছাড়া। বিল দিতে গিয়ে মাথায় বাজ। পুরো সাতাশ টাকা বার আনা— আর সবার কাছে সব মিলিয়ে এগার টাকা সাতষট্টি পয়সা।

মাথা খারাপ! ঐ ভাবে খেতে যায় ?

মজা শুনুন না। সবার মুখ তো শুকিয়ে এতটুকু। পাশে এক বুড়ো বসে খাচ্ছিল। বণি বলল, ওর কাছে চল ধার করি।

বণি কে ?

আপনি চিনবেন না।

চিনিয়ে দিয়েছ নাকি যে চিনব ?

আচ্ছা, একদিন নিয়ে আসব। তারপর বুড়োর দিকে আমরা চারজন এক সঙ্গে তাকালাম। বুড়ো হঠাৎ চোখ তুলে দেখে ড্যাবডেবে আটটা চোখ। সে বেচারা স্বপ্নেও ভাবেনি এ রকম করে আমরা তাকিয়ে থাকব কেন ? তাই দেখে তার গলার কাছে ঝুলঝুলে চামড়াটা থির থির করে কাঁপতে লাগল। আর আমাদের হাসি পেয়ে গেল।

সত্যি ?

আমরা এক সঙ্গে হেসে উঠতেই বুড়ো আর পালাবার পথ পায় না। একবার এক চেয়ারের সঙ্গে, আরেক বার টেবিলের সঙ্গে— ধাক্কা! হাসতে হাসতে পেটের সব হজম।

খুব অন্যায়। বুড়োটার খাওয়া মাটি করে দিলে।

বারে, আমাদের কী দোষ। আমরা শুধু তাকিয়েছি— তার গলার চামড়া ওরকম নড়তে শুরু করল কেন ?

তারপর বেরুলে কী করে ?

বেয়ারাকে তিন টাকা বকশিস দিলাম। কাউন্টারে চীনে ব্যাটা ঝিমোচ্ছিল। তাকে আট টাকা দিয়ে বললাম, কুড়ি টাকা কাল দিয়ে যাব। বলে চারজন লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে এলাম।

চীনেটা কিছু বলল না ?

বলবে কী ? তার বলবার আগেই আমরা দরোজার বাইরে।

ছি ছি ছি।

কী ছি ছি ? আমরা তো টাকা মেরে দিচ্ছি না ? এক্ষুণি যাবার পথে এই কুড়ি টাকা তার মুখের ওপর ফেলে দিয়ে আসব।

আমাকে একটা টেলিফোন করলেই তো হতো।

তা হতো। আপনার কথা মনেই হয়নি।

তা হবে কেন ? আমার কথা তো মনে হবে না। বলে বাবর লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে চোখ বুজল। ভান করল যেন মনে খুব লেগেছে তার কথা মনে হয়নি বলে। হঠাৎ সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। বাবলি তার পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে টানছে।

এই যে, কী হলো ? —শুনুন। —আচ্ছা এরপর কখনো এ রকম হলে নিশ্চয় ফোন করব। — কই, শুনুন।

চোখ মেলে মিষ্টি করে হাসল বাবর। নিঃশব্দে। তারপর বাবলির একটা হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, তুমি মনে করেছ, আমি রাগ করেছি, না ? পাগল মেয়ে, আমার কি সে বয়স আছে ? —একেক সময় কী ভাবি জান?

কী ?

বাবর লক্ষ করল বাবলির গলা অত্যন্ত সূক্ষ্ম তারে যেন কেঁপে উঠল। এতে সে খুশিই হলো মনে মনে। বলল, ভাবি, আমার বয়স দশ বছর কম হলো না কেন ? কিংবা তুমিও তো আরো দশ বছর আগে হলে পারতে।

বাবলি মাথাটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অনির্দিষ্ট চোখে একবার তাকিয়ে হঠাৎ বলল, তখন বেল বটমের কথা কী বলছিলেন ?

মনে মনে হাসল বাবর। বাবলি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইছে। বাবর আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খেলা করল বাবলির আঙুল নিয়ে। তার কড়ে আঙুলটা আলতো করে মুচড়ে দিল। কেমন লাল হয়ে উঠল আঙুলটা এক পলকের জন্যে।

লাগছে বাবলি ?

বাবলি মাথা নেড়ে জানাল— না। তখন আবার এমনি করে দিল বাবর।

বললেন না, বেল বটমের কথা ?

বাবর সন্তর্পণে হাত রাখল, বাবলির ঊরুর ওপর। তারপর এক চিমটি পাজামা তুলে সে বলল, এর নাম বেল বটম পাজামা ?

বাবলি মাথা নাড়াল— হ্যাঁ।

বেল বটমের বাংলা জান ?

নাতো।

মানে, যার নিচ দিকটা ঘণ্টার মত।

গোল ঘন্টা ?

হ্যাঁ।

বলতে বলতে বাবর করতল দিয়ে বাবলির হাঁটুর নিচে গোড়ালি পর্যন্ত স্পর্শ করে বলল, এই পাজামার নিচের দিকটা চওড়া তো, অনেকটা ঘণ্টার মত, তাই বেল বটম বলে।

জানি।

কিন্তু ইংরেজিতে বটমের আরেকটা মানে আছে।

কী ?

বলেই বাবলি লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলল। এক মুহূর্তে অর্থটা তার মনে পড়ে গেছে। আর সে জানতে চায় না। কিন্তু বাবর ততক্ষণে তার পেছনে করতল দিয়ে ব্রাশ করতে করতে বলছে, বটম মানে এটা। বাংলায় একটা সুন্দর শব্দ আছে। নি-ত-ম্ব। মানে বটম। তাই বলছিলাম, বেল বটম বলতে একটু লজ্জা করে না তোমাদের ?

কোনো উত্তর দিতে পারল না বাবলি। নিঃসাড় নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। কিন্তু হাত আর সরিয়ে নিচ্ছে না বাবর। অনেকক্ষণ। অথচ ওঠাও যাচ্ছে না।

বাবর তার পেছনে দুটো মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, তুমি খুব সুন্দর হয়েছ। বলে সে তাকে কাছে টানল। মুরগির তুলতুলে একটা বাচ্চার মত বাবলি তার বুকের মধ্যে পড়ে হাঁফাতে লাগল চোখ বুজে। এইটুকু কাছে পাওয়া যতটা শক্ত হবে বলে বাবর ভেবেছিল তার চেয়ে সহজে হয়ে গেল। বহুবার বাবর এটা দেখেছে, আসলে একটু সাহস করলেই হয়, হয়ে যায়, তবু বারবার, প্রথম বার, এত কঠিন মনে হয়, যেন এর চেয়ে বাঘের বাসায় যাওয়া অনেক সোজা।

বাবর তাকে চুপচাপ বুকে নিয়ে শুয়ে রইল। এতটুকু নিজেকে সে নড়াল না। বাবলি অনেকক্ষণ পড়ে থেকে বলল, এখন যাই।

না। আরো একটু থাক।— তোমাকে একটু দেখি। বলে সে তার মুখ তুলে ধরল। খুব আস্তে একটা চুমো দিল তার চোখে। বলল, চোখ বুজে থাক।

চোখ বুজেই ছিল বাবলি, কিন্তু এই কথা শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বাবরের হাতের ওপর দিয়ে। সেইভাবে থাকতে থাকতে কী হলো তার, হঠাৎ বাবলি বাবরকে ঠোঁটে দ্রুত একটা চুমো দিয়ে বুকের মধ্যে মুখ লুকাল।

বাবর বলল, ভয় কী ? আমি তো তোমার। এখন থেকে তোমারই। সব সময়ের জন্যে।

এবার বাবরই তাকে চুমো দিল, দীর্ঘক্ষণ ধরে পাতলা দুটি ঠোঁট সে সুখাদ্যের মত খেল। তারপর কামিজের একটা বোতাম খুলে বাবলিকে উপুড় করে তার পিঠে ঠোঁট রাখল। ঠোঁটে সুড়সুড়ি দিতে লাগল বাবলির পিঠের প্রায় অদৃশ্য পশমগুলো।

বাবলি বলল, যাই।

না, থাক। তোমার পিঠে তিল আছে ?

হ্যাঁ।

একটা চুমো দিই তিলে ?

বাবলি কিছু বলল না। বাবরকে তার ইচ্ছে রাখতে দিল। বাবর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, আরো তিল আছে ?

হ্যাঁ।

দুটো বোতাম একসঙ্গে খুলে ফেলল বাবর। প্রায় কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে

কই আর তো দেখছি না ?

বাবলি চুপ করে রইল।

কই, আর তিল কই ? তুমি বললে যে আছে ?

এখানে নেই।

তাহলে সামনে ?

বলে বাবর তাকে সামনে ফেরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু উপুড় হয়ে শক্ত করে নিজেকে ফেলে রাখল বাবলি। মাথা নেড়ে মুখে শুধু বলল, না।

তখন জোর করে তাকে ফেরাল বাবর। ফেরাতেই শাদা কাঁচুলির ভেতরে অপুষ্ট একজোড়া স্তন কেঁপে উঠল। বাবর তাদের আবরণ সরিয়ে সেখানে মুখ রেখে ধীরে ধীরে আরোহণ করতে লাগল যেন ছিপছিপে একটা পেয়ারা গাছে। যাখন সম্পূর্ণ সে পেল তাকে তার নিচে, সে চুপ করে রইল। নিঃশব্দে স্ফীত হতে লাগল। কিন্তু আজ নয়। প্রথম দিনে নয়। বাবর সময় নিতে ভালবাসে। সময় নেবার পর যখন পাওয়া যায় তখন আর সময় নেয় না। তখন তার মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিঃশেষ হয়ে ফিরে আসে।

শেষ একটা চুমো দিয়ে এবার বাবর নিজেই বলল, বাড়ি যাও, কেমন ?

বাবলি উঠে বসে বোতাম লাগাল কামিজের। কোনো কথা বলল না। বাথরুমে গেল। ফিরে যখন এলো, মুখ সাবান দিয়ে ধুয়েছে, একটু পাউডার দিয়েছে। কিন্তু মুখে একটা নতুন ছাপ। কেমন এলানো, মন্থর, নিঃশব্দ। সে বেরিয়ে আসতেই বাবর একটু হেসে বলল, পৌঁ-ছে দেব ?

না আমি নিজেই যেতে পারব।

রিকশা ডাকিয়ে দি।

আমি নিয়ে নেব।

যাবার সময় আমাকে একটা চুমু দিয়ে যাও।

বাবলি চুপ করে রইল।

এসো।

বাবলি নড়ল না। তাকিয়ে রইল অপলক চোখে বাবরের দিকে।

এসো। বাবলি।

বাবলি হঠাৎ এসে বাবরের কানের কাছে মুখ রাখল আলতো করে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। দরোজার দিকে যেতে যেতে শুধু বলল, আপনার তো কোনো ক্ষতি নেই। ক্ষতি শুধু আমার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বাবর চমকে উঠল। পাঁচটা বাজে।

৪

মিসেস নফিস বললেন, যাহোক আসা হলো তাহলে ?

আপনি কী ভেবেছিলেন ?

সত্যি বলব না মিথ্যে ?

আপনি যা বলবেন তা-ই আমি সত্যি বলে মেনে নেব।

যদি সত্যি বলি, ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না। আর আপনি যে আসবেন, সেটা মিথ্যে মনে হচ্ছিল।

বাবর হাসল, টাইয়ের নট ঠিক করল আন্দাজে, বিরল হয়ে আসা চুলের ভেতরে হাত চালাল খানিক, হাসল আবার, একটা সিগারেট বের করল এবং বলল, আমি তো এলাম। বলে সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করল, আপনি কখনো সিগারেট খেয়েছেন ?

এ-কী জিগ্যেস করছেন ?

বলুন না।

যদি বলি খেয়েছি।

যদি বলি কেন ? খেয়েছেন তো খেয়েছেন : এখনো খান ?

কী করে বুঝলেন ?

হঠাৎ মনে হলো।

আপনি মানুষের মন পড়তে পারেন ?

পারি না। পারলে দাবি করা হতো মন পড়ার বিজ্ঞান আছে। আসলে কিন্তু নেই। মনের কোনো হিসেব হয় না। মন মনের মত চলে। নফিস সাহেব কোথায় ?

হাসপাতালে।

প্রায় লাফ দিয়ে উঠল বাবর। বলল, কই আমাকে আগে বলেননি তো। কী হয়েছে তার ? কবে থেকে ?

তার কিছু হয়নি। তার মামার আজ অপারেশন। চোখের।

ও, তাই বলুন।

ফিরতে রাত হবে।

বাবর তার দিকে চোখ গভীরতর করল। ঘন সবুজ শাড়ি পরেছেন মিসেস নফিস। একই রংয়ের ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। পায়ের স্যান্ডেলে সবুজ ফিতে। হাসছেন যখন, মনে হচ্ছে দাঁতেও সবুজের একটু আভা দিচ্ছে।

তাকিয়ে আছেন যে।

না, একটা সিগারেট খাবেন ?

থাক, ইচ্ছে করছে না।

আচ্ছা, আপনি মদ খেয়েছেন কখনো ?

মদ ?

হ্যাঁ মদ। লিকার।

না, খাইনি।

খাবেন একদিন ?

নিমন্ত্রণ না পরামর্শ ?

খানিকটা নিমন্ত্রণ তবে অনেকটা পরামর্শ।

হঠাৎ এ পরামর্শ দিচ্ছেন ?

তাহলে ভাল হতো।

কী ভাল হতো ?

মনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পেতেন।

আপনি বুঝি তাই খান।

হ্যাঁ, তার জন্যেই খাই। কিন্তু উদ্দেশ্যটা শেষ পর্যন্ত গুলিয়ে যায়। মাতাল হয়ে পড়ি। ঘুম পায়। পরদিন মাথা ধরে। তখন মনে হয় অসুস্থ হবার জন্যেই খেয়েছিলাম।

তাহলে খান কেন ?

খাই কেন ? শরীরটা বেয়াড়া রকমে সুস্থ। মাঝে মাঝে অসুস্থ হওয়া, এভাবে হওয়া, মন্দ কী ? অসুস্থ হলে সুস্থতা কী, তা ভাল বোঝা যায়।

অর্থাৎ আপনি ভালকে জানতে মন্দের আশ্রয় নেন।

হ্যাঁ, নিই।

আপনি পাপ করতে পারেন ?

পারি। পাপীই জানে পুণ্য কী!

সব পাপী তো জানে না।

জানে না। কারণ পাপী দু'রকমের। শুধু পাপী আর জ্ঞান-পাপী।

আপনি তাহলে জ্ঞান-পাপী।

হ্যাঁ, তাই।

আপনি এখন মদ খেয়ে আসেননি তো ?

না। হ্যাঁ, খেয়েছি বলতে পারেন।

সেটা কী রকম ?

ধরে নিন খেয়েছি।

বাবর মনে মনে ভাবল, মিসেস নফিস কী জানবেন, এই কিছুক্ষণ আগে সে কোন নেশা করে এসেছে ? বাবলি যতক্ষণ ছিল বুঝতে পারেনি। চলে যাবার পর বাবরের মনে হচ্ছিল সে যেন কয়েক পেগ কাঁচা হুইস্কি গিলেছে।

মিসেস নফিস বললেন, আমি ঠিকই ধরেছি, এই বিকেল বেলায় আপনি হুইস্কি গিলে এসেছেন। কেন ওসব খান ?

শরৎচন্দ্রের পরামর্শে খাই না। নিজেকে ডাইলান টমাস মনে করেও খাই না।

ডাইলান টমাস কে ?

কবি।

আপনি কবিতা লেখেন না কেন ?

এটা প্রশ্ন হলো না। আমি কেন তাহলে রাজনীতি করি না, কেন আমি গান গাই না, কেন আমি বিয়ে করি না—

সত্যি, কেন বিয়ে করেন না ?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাবর জের টেনে চলল, কেন আমি সাংবাদিকতা করি না, এ রকম পৃথিবীর এক লক্ষ একটা কাজ কেন করি না— এর কোনো জবাব নেই।

মিসেস নফিসের একবার মনে হলো, লোকটা বড় রূঢ়। তিনি আনমনা হলেন। বাবর জিগ্যেস করল, আপনার বড় ছেলে কই ? কী যেন নাম ?

হাসু। সাইকেল চড়া শিখতে গেছে। আপনার টিভি প্রোগ্রামের খুব ভক্ত।

আমি জানি।

আচ্ছা, সেদিন যে ধাঁধাটা দিলেন তার উত্তরটা কী ?

কোন ধাঁধা ?

ঐ যে বললেন, এক মহিলা, দুটো ট্রাঙ্ক, একটা বেডিং, কয়েকটা হাঁড়ি, একটা মাটির উনোন আর কী কী নিয়ে, কোলে একটা বাচ্চা, হাসিমুখে ট্রেনে চড়ছে। সে বাপের বাড়ি থেকে আসছে না যাচ্ছে ? বলুন না, কী উত্তর হবে ?

সামনের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তখন আমিই টিভিতে বলে দেব।

বারে, তাহেল আপনার সঙ্গে আলাপ থেকে লাভ ?

আমার সঙ্গে শুধু ধাঁধার উত্তর জানা পর্যন্তই সম্পর্ক ?

না, তা নয়। কী যে বলেন। তা কেন হবে ?

তাছাড়া এখন উত্তর বলে দিলে নিয়ম ভঙ্গ করা হবে। নীতি বলে একটা কথা আছে তো ? কত লোক উত্তর পাঠাবে, সঠিক উত্তরগুলো থেকে লটারি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। এখন উত্তর বলে দিলে আমার নিজের কাছেই খারাপ লাগবে।

আপনি উত্তর বললে তো আর আমি টিভিতে পাঠাতে যাচ্ছি না ; আর পাঠালেও আমার নাম লটারিতে কোনোদিনই উঠবে না।

কী করে বলছেন ?

আমি জানি। আমার ভাগ্যে হঠাৎ কিছু পাওয়া নেই।

বাবর তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। পরে বলেল, এ কথা কেন বলছেন ?

এমনি বলছি। কিছু না। আপনাকে চা দিই। কতক্ষণ এসেছেন।

চা থাক।

ও ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি ড্রিংক করে এসেছেন।

বাবর তার ভুল ভাঙ্গাবার উৎসাহ পেল না। বরং পা দুটো সামনে লম্বা করে দিয়ে আয়েশ করে বসে মিসেস নফিসের অনুমানের অভিনয় করে যেতে লাগল।

মিসেস নফিস হঠাৎ নিঃশব্দে হাসলেন। অনেক সময় অনেকে এটা আমন্ত্রণ হিসেবে ব্যবহার করেন; অর্থাৎ আমাকে প্রশ্ন কর আমি কেন হাসছি। বাবর সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না। তার

সমস্ত মন এবং চোখ আচ্ছন্ন করে আছে বাবলির শ্যামল ছিপছিপে দেহ। যা কিছুর ঘ্রাণ নিচ্ছে তার অন্তঃস্থল থেকে বাবলির ঘ্রাণ পাচ্ছে।

মিসেস নফিস বললেন, চুপ হয়ে গেলেন যে!

এমনি। আপনার বসবার ঘরটা ভাল। সুন্দর।

ধন্যবাদ।

নফিস সাহেব কোথায় ?

বললাম না হাসপাতালে ?

ও ভুলে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা আপনি তো টিভিতে কাজ করেন, ওদের বলতে পারেন না প্রোগ্রামগুলো একটু ভাল করতে ?

পারি না।

কেন ?

আচ্ছা ওখানে কাজ করি না। ওদের চাকরি করি না। ওরা কী প্রোগ্রাম করবে না করবে সেটা আমাকে জিগ্যেস করে না।

বাহ, সবাই তো আপনার বন্ধু। ওদের না হয় বন্ধু হিসেবেই পরামর্শ দিলেন।

আমার কী মনে হয় জানেন ?

কী ?

বন্ধুত্ব এ যুগের সবচে' বিরল বস্তু। বন্ধুত্ব নেই বলেই যত্রতত্র আমরা বন্ধু শব্দটা ব্যবহার করে থাকি।

আজ কতটা হুইস্কি খেয়েছেন বলুন তো!

আপনি তো খান না, কাজেই শুনে আন্দাজ করতে পারবেন কি ?

আন্দাজ না করতে পারলেও শুনতে ক্ষতি কী ?

ও, তা বটে।

এই যে সেদিন চাঁদে মানুষ নামল, কত কী রিপোর্ট বেরুল, সবটা কী বুঝতে পেরেছি ? না কেউ পেরেছে ? তবু মানুষ শোনার জন্যে রাত জেগে রেডিও-র পাশে বসে থাকেনি ?

থেকেছে। থেকে তারা এটুকুই শুনেছে মানুষ চাঁদে নেমেছে। আপনিও তো শুনেছেন, আবার না হয় শুনুন, আমি আজ মধ্যপান করেছি।

কথায় আপনার সঙ্গে কে পারে ?

বাবর হাসল।

মিসেস নফিসের তখন রাগ হলো আরো বেশি। তিনি বললেন, কথা বলে আপনি পয়সা পান। খামখা এত ভাল ভাল কথা বিনি পয়সায় ছাড়ছেন কেন ?

এটা টিভি স্টুডিও নয়।

যাক, বাঁচা গেল। আমি তো ভাবছিলাম আপনি এটা টিভি স্টুডিও মনে করে বসে আছেন।

হা হা করে হেসে উঠল বাবর।

হাসলেন যে!

এমনি।

না, বলতে হবে কেন হাসলেন।

হাসি সব সময় মানসিক কারণে হয় না। কখনো কখনো শুদ্ধ শারীরিক কারণে, পেশি নার্ভ ইত্যাদির অকারণ সহসা কোনো নতুন সংস্থাপনেও হাসি পায়।

আপনি এরপর টিভিতে শরীরটাকে ভাল রাখুন প্রোগ্রামও করবেন নাকি?

করতে পারি। অন্তত আমার কোনো আপত্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ঐ ডাক্তারদের চেয়ে অনেক সরস করে বলতে পারব।

এখান থেকে ফিরে গিয়ে আবার হুইস্কি খাবেন?

বলতে পারি না।

আপনার তো সব কিছুই আগে থেকে হিসেব করা থাকে। কেন বলতে পারবেন না? বলতে সংকোচ হচ্ছে?

সংকোচ শব্দটা আমার অজানা।

আর কোন কোন শব্দ আপনার অজানা শুনি?

আরো অনেক আছে। যেমন, শোক, বিবাহ, ভালবাসা।

কাউকে কখনো ভালবেসেছেন?

হ্যাঁ বেসেছি।

বেসেছেন?

হ্যাঁ।

নাম বলতে আপত্তি আছে?

না, নেই।

কে সে?

আমি নিজে।

বাবর রসিকতা করল কি-না বুঝতে পারলেন না মিসেস নফিস। তিনি অনির্দিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইলেন প্রথমে বাবরের মুখে, তারপর তার হাতের দিকে, যে হাত দুটো ম্যাচের শূন্য খোল নিয়ে খেলা করছিল।

বাবর জিগ্যেস করল, নফিস সাহেব কোথায়?

বললাম না হাসপাতালে?

সত্যি আমি দুঃখিত। ভুলে যাচ্ছি।

আমার কী মনে হয় জানেন, নফিসকে আপনি ঠিক পছন্দ করেন না।

কেন?

অবশ্যি আমিও ওকে ঠিক পছন্দ করি না, করতে পারি না, এই তের বছরেও ঠিক পেরে উঠিনি।

তের বছর বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?

হ্যাঁ, উনিশ শো ছাপ্পান্নতে বিয়ে হয়েছিল। তেরই তো হলো।

হ্যাঁ তের হলো। বিয়ে ঢাকাতেই হয়েছিল ?

ঢাকাতেই।

আচ্ছা, আমি এখন চলি।

সে-কী, এখুনি যাবেন ?

কাজ আছে।

তবে যে বললেন আজ আর কাজ নেই।

বলেছিলাম নাকি ?

ভেবে দেখুন।

বোধহয় বলিনি। কিংবা বলেছি। চলি।

বাবর উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়ালেন মিসেস নফিসও। কী ভেবে বাবর আবার বসল। বলল, না হয় এক পেয়ালা চা দিন। চা খেয়েই যাই।

খাবেন ?

না, না, চা খেলে নেশা নষ্ট হবে না।

মিসেস নফিস উঠে গেলেন চা করতে। আর বাবর বসে বসে ভাবতে লাগল বাবলির কথা। কাজী সাহেবকে সে বলেছিল, তার মেয়ে আছে, মেয়ের নাম বাবলি বাবর। চাঁদের মত একটা হাসি তার ঠোঁটে জন্ম নিল। বাবলিকে কাল আবার আসতে বলতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে বাবলিকে একবার দেখতে গেলে হয়। যাবে সে।

চা নিয়ে এলেন মিসেস নফিস।

এমন সুন্দর চায়ের জন্য ধন্যবাদ।

এই চা পাঠিয়েছিল শ্রীমঙ্গল থেকে ওর এক বন্ধু। একেবারে বাগানের। ভারি সুন্দর ঘ্রাণ।

আরেক কাপ দিই ?

না। — চলি। আবার আসব।

বাবর মিসেস নফিসকে একা ফেলে বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে গাড়ির চাবিটা ঝনাৎ ঝনাৎ করে বাজাতে বাজাতে। শব্দটা আগুন ধরিয়ে দিল মিসেস নফিসের সারা দেহে। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে একবার উচ্চারণ করলেন, রাস্কেল। তারপর তার কান্না পেল। তিনি মানসিকভাবে কাঁদলেন।

বাইরে বাবরের গাড়িটা অট্টহাস্যের মত কয়েকটা শব্দ তরঙ্গ তুলে অনেক ধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

৫

গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন বিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল সে। একবার মনে হলো তার ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়া দরকার। কিন্তু উৎসাহ পেল না। কোন হোটেলে বসবে, অর্ডার দেবে,

অপেক্ষা করবে, খাবার আসবে— বড় দীর্ঘ মনে হলো ব্যাপারটা। ইন্টারকন্টিনেন্টালের মোড়ে একটা লোক রঙ্গীন তুলোয় তৈরি সিংহ বিক্রি করছে।

কত দাম ?

আপনার জন্যে দশ টাকা।

একবার ভাবল, কেনে। আবার ভাবল, কিনে কী হবে ? ট্রাফিকের নীল বাতি জ্বলে উঠল। বাবর বেরিয়ে গেল।

কোথায় যাবে সে ? বাবলিকে কাল একবার আসতে বলা দরকার। কিন্তু এখুনি ওদের বাসায় যাওয়াটা খুব সমর্থনযোগ্য বলে মনে হলো না।

ঢাকা ক্লাবের সামনে ভেতরে অসংখ্য গাড়ি। মিষ্টি একটা বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গতি শ্লথ করল বাবর। বড্ড একা লাগছে। কোথাও কাউকে পেলে হতো। অনেকদিন এমন একা মনে হয়নি।

কেন একা লাগছে ?

বয়স হয়ে যাচ্ছে তার ?

না, তাও তো নয়।

নিজের সঙ্গেই কথা বলে বাবর। মনে মনে। আবার আপন মনেই হাসে। এইতো এখনো একেবারে কালকের কথা মনে হয়, সে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে বই বগলে ইস্কুলে যাচ্ছে। মহিতোষ বলে এক দুর্দান্ত ছেলে ছিল, দুক্লাশ ওপরে পড়ত। তার পেছনে কী লাগাটাই না লেগেছিল মহিতোষ। খারাপ খারাপ কথা বলত। ইস্কুলের পেছনে ভাঙ্গা পায়খানায় নিয়ে প্যান্ট খুলতে চাইতো তার।

ছেলেবেলায় দেখতে বোধ হয় আমি গোলগাল সুন্দর ছিলাম, ভাবল বাবর। নিজের অজান্তেই এক হাতে নিজের চিবুক নিয়ে খেলা করতে লাগল সে। তোপখানার মোড়ে আবার লাল বাতি। আর একটু হলেই সামনের গাড়িতে ধাক্কা লাগত। গাড়ির ট্যাক্স দেবার সময় হয়ে এসেছে। কাল মনে করতে হবে।

আবার সেই ভাঙ্গা পায়খানার ছবি ভেসে উঠল তার চোখে। মনে পড়ল ছেলেবেলায় সেই ভাঙ্গা পায়খানায় গেলেই কেমন গা শিরশির ছমছম করে উঠত। দেয়ালের লেখাগুলোও স্পষ্ট দেখতে পায় সে।

বাবুল+মন্টু।

মন্টু যেন কে ছিল ? কিছুতেই মনে করতে পারল না বাবর।

৮০ তবে। B-দায়।

মৃদু হাসি ফুটে উঠল বাবরের ঠোঁটে।

আবার আর এক দেয়ালে কয়লা দিয়ে একটা বিরাট সঙ্গম উদ্যত শিশ্নের রেখাচিত্র। চিত্রকর যত্ন করে অন্ডকোষ আর কেশ পর্যন্ত এঁকেছে। একটি অণ্ডকোষে লেখা 'মালতি', আরেকটিতে 'বাবাগো'। তার নিচে দ্বিতীয় কেউ মন্তব্য করে রেখেছে 'শালা'।

বাবর কিছুতেই মনে করতে পারল না সেই ভদ্রলোকের নাম যিনি লণ্ডনের বিভিন্ন শৌচাগার আর দেয়ালের ছবি তুলে 'দেয়ালের লিখন' নামে একটা অ্যালবাম বের করেছিলেন। তাতে

কত রকম মন্তব্য! রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, দাম্পত্য যৌন-বিকার সম্পর্কিত— কী না বাদ গেছে। ও রকম একাকী জায়গায় মানুষ তার ভেতরের সত্তাটিকে বের করে আনে। গা শিরশির করে। হাত নিসপিস করে। লেখা হয়ে গেলে এমন একটা তৃপ্তি হয় যেন পরম আকাঙ্খিত কোনো গন্তব্যে পৌঁছুন গেছে।

বাবর নিজেও তো এ রকম করেছে। দেয়ালে লিখেছে। একবার সেক্রেটারিয়েটের বাথরুমে গিয়ে দেখে 'বাঞ্চোৎ' লেখা। সিগারেট টানছিল বাবর। প্রথমে সিগারেটের ছাই দিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু লেখা গেল না। তখন চাবি দিয়ে সে 'বাঞ্চোৎ'-র পাশে একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকল। নিচে লিখল, কে ? তুমি, না তোমার বাবা ? আরেকবার এয়ারপোর্টের বাথরুমে দেখে কে লিখে রেখেছে লাল পেন্সিল দিয়ে বড় বড় হরফে— 'খেলারাম খেলে যা'।

বাক্যটা আজ পর্যন্ত ভুলতে পারেনি বাবর। যে লিখেছে জগৎ সে চেনে। যে লিখেছে সে নিজে প্রতারিত। পৃথিবী সম্পর্কে তার একটি মাত্র মন্তব্য বাথরুমের দেয়ালে সে উৎকীর্ণ করে রেখেছে— 'খেলারাম খেলে যা'।

কতদিন বাবর কানে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে কথাটা।

হা হা করে হেসে উঠল কারা যেন। বাবর তাকিয়ে দেখে সে ডিআইটি বিল্ডিংয়ে এসে গেছে। আসতে চায়নি, অবচেতন মন তাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। সামনের বাগানে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে কয়েকজন জটলা করছে। ঐ হাসির উৎস ওখানেই।

গাড়ির দরোজা ভাল করে বন্ধ করে বাবর নামল। এসে যখন পড়েছে তখন টেলিভিশন স্টুডিওটা একবার ঘুরে যাওয়া যাক।

সিঁড়ির ওপর মনে হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিড়। আজ বোধহয় ওদের প্রোগ্রাম ছিল। উত্তেজিতভাবে ওরা হাত নাড়ছে, কথা বলছে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। একজন বাবরকে সালাম দিল।

কী ছিল আপনাদের ?

বিতর্ক।

ভিটিআর হলো ?

হ্যাঁ, এইমাত্র শেষ করলাম।

কেমন হয়েছে ?

ছেলের দল সলজ্জ হেসে নীরব রইল।

আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

বাবর যেতে যেতে শুনল পেছন থেকে ওদেরই কে মন্তব্য করল, ডাট দেখিয়ে গেল, বুঝলি ?

রিসেপশনে দাঁড়িয়ে বাবর জিগ্যেস করল, আমার কোনো চিঠি আছে ?

আছে, এই এক গাদা।

প্রায় শ'খানেক চিঠি ভদ্রলোক বের করলেন। বাবর বলল, এগুলো তো সব ধাঁধার জবাব।

আমার নিজের নামে কিছু নেই ?

বলতে বলতে সে চিঠিগুলোর ঠিকানা দ্রুত দেখতে লাগল। না, তার ব্যক্তিগত নামে কোনো চিঠি নেই। একই হাতের লেখায় তিনটে খাম। বোধ হয় উৎসাহটা বেশি, যে করেই হোক সঠিক উত্তর একটা করতেই হবে। হ্যাঁ, এই যে তার নামে একটা চিঠি।

চিঠিটা সে আলাদা করে নিয়ে বাকি চিঠিগুলো ফেরত দিল।

নীল খাম। মেয়েলী হাতের লেখা। ভেতরে পুরু কাগজে লেখা চিঠি। ওপর থেকেই খস খস করছে। চিঠিটা বের করল বাবর।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার 'মারপ্যাচ' নামক ধাঁধার অনুষ্ঠানটি আমাদের খুবই ভাল লাগে। আমি এতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। গত সপ্তাহে আমার উত্তর সঠিক হয়েছিল কিন্তু আপনি আমার নাম ভুল উচ্চারণ করেছেন। আমার নাম মোফসেনা নয় মোহসেনা। আশা করি এবারের অনুষ্ঠানে নামটি শুদ্ধ করে দেবেন। তসলিম। মোহসেনা খাতুন। এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।'

হেসে চিঠিটা পকেটে রেখে দিল বাবর। নামের জন্য মানুষের কী দুর্বার মোহ। না হয় একটু ভুলই হয়েছে, তার জন্যে কী জগৎসংসার থেমে গেছে ? কাজ করছে না ? কিন্তু এমন ভুল হলো কী করে তার ? প্রোগ্রামের আগে তো সে তেমন মদ্যপান করে না যে সব 'হ' 'ফ' হয়ে যাবে!

স্টুডিও করিডরের দরোজা ঠেলতেই এক পাল বাচ্চা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে পড়ল বাবর। তাদের পরনে সিল্কের রঙ্গিন ঘাগরা। মাথায় রূপালি সোনালি ফিতে। মুখে মেকআপের গোলাপি প্রলেপ।

তোমরা নাচবে নাকি ? বাবর জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। 'পরীর দেশে' নাচ আছে আমাদের। ফুটফুটে একটা মেয়ে সুন্দর জবাব দিল তার। ভারি ভাল লাগল বাবরের।

তোমার নাম কী ?

হেসে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটা।

বারে নাম জিজ্ঞেস করলে হাসতে আছে নাকি ?

আরো হাসতে লাগল এবার।

তাহলে তোমার নামই নেই। তাই না ?

তখন আরেকজন ওর হয়ে উত্তর দিল, ওর নাম রুনু। আপনি ধাঁধার আসর করেন না ?

নাতো! বাবর মুখ গোল করে বলল, কে বলল আমি ধাঁধার আসর করি ? আমি তো নাচ দেখাই টেলিভিশনে দ্যাখোনি ?

যাহ।

সত্যি। এরপর যেদিন আমার প্রোগ্রাম আছে, দেখ আমি নাচ করি কি-না। বলে সে স্টুডিও-র ভেতর ঢুকল। সেখানে আর্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা দৃশ্যপট তৈরি করছে। ঝুলিয়ে দিচ্ছে মেঘ। মেঘ থেকে বৃষ্টির আভাস হিসেবে রূপালি জরি ঝলমল করছে। আর দশ মিনিট

পরেই 'পরীর দেশে' শুরু হবে। প্রযোজক ছুটোছুটি করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার শূন্যের উদ্দেশে 'বাচ্চাদের মেকআপ হয়েছে ?' প্রশ্নটা থেকে থেকে ছুড়ে দিচ্ছেন। কারো অন্য কোনোদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ নেই।

বাবার চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে রইল। এক নতুন ঘোষিকা এরই মধ্যে ঘোষণাপত্র হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে মুখস্থ করছে আর হাঁটছে। বাবরের দিকে একবার তার চোখ পড়তেই সে হাসল। উত্তরে প্রশস্ততর হাসি আঁকল বাবর। ঘোষিকা হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছুটে গেল তার বুথের দিকে।

বাবর বেরিয়ে এলো।

আজ বড্ড একা লাগছে তার। অনেকদিন এ রকম মনে হয়নি। মনে হচ্ছে, তার ভীষণ একটা কিছু হতে যাচ্ছে; সেটা ভাল না মন্দ তা বোঝা যাচ্ছে না।

করিডরের দরোজার কাছে প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাহেবের সাথে দেখা।

এই যে বাবর সাহেব।

কেমন, ভাল ?

এসেছেন, ভালই হলো। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

অপেক্ষা করি ?

হ্যাঁ, আমার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি দু'মিনিটে আসছি।

বাবর তার ঘরে গিয়ে বসল। কমলা রংয়ের সরাসরি লাইন টেলিফোনটা জ্বলজ্বল করছে একরাশ কাগজপত্রের ভিড়ে। করবে নাকি একটা টেলিফোন বাবলিকে ? বাবর সিগারেট ধরাল। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। বাবলির পিঠের তিলটা হঠাৎ চোখে ভেসে উঠল তার। আর সেই সঙ্গে অস্পষ্ট গুরু একটা সুগন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অভিভূতের মত টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল বাবর।

হ্যালো। কে ?

অপর পক্ষের গলাটা এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল বাবলির। কিন্তু পরক্ষণেই টের পেয়েছিল, না বাবলির ভাবী।

আমি বাবর বলছি। সেলিম কই ?

এইতো এখানেই, দিচ্ছি।

সেলিম টেলিফোন ধরল।

কিরে ? কোত্থেকে ?

টেলিভিশন থেকে।

খুব গ্যাঁজাচ্ছিস, না ?

দূর। একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম দেখি তুই বাসায় আছিস নাকি ?

আসবি ?

দেখি।

আয় না, অনেকদিন তোকে দেখি না।

কেন, টেলিভিশনে তো দেখিস।

বাবর একটু পরিহাস করবার চেষ্টা করল। তার উত্তরে সেলিম বলল, নে নে আর বাহাদুরি করতে হবে না। আসবি কি-না বল?

আচ্ছা, আসছি।

কতক্ষণে?

এই একটু পরেই। বলেই বাবর লোভ সামলাতে পারল না, বাবলির উল্লেখ করতে গিয়ে একটু দূর থেকে আরম্ভ করল, ভাল আছিস তো?

আছি।

তোর বৌ?

সেও ভাল।

বাবলির পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

কী জানি। পড়াশুনা করছে নিশ্চয়ই।

এই কি ভাইয়ের মত কথা? একটু খোঁজ খবর নিতে হয়।

সত্যি রে, একেবারে সময় পাই না। মনেও থাকে না ছাই।

বাবর হাসল। প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাহেব ঘরে এসে ঢুকলেন।

সেলিম হাসল।

আচ্ছা, আমি আসছি।

আয়।

টেলিফোন রেখে বাবর একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, বড় ব্যস্ত মনে হচ্ছে?

ব্যস্ত তো বটেই। একটা ইমপরট্যান্ট ইন্টারভিউ রেকর্ড হবে কাল। আমাদের নতুন সিরিজটার জন্যে।

ও। আমাকে কী বলবেন বলছিলেন।

বলছি, বলছি। চা?

খেতে পারি।

বেল টিপে চায়ের জন্যে ফরমাশ করলেন তিনি। তারপর কয়েকটা কাগজ এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে, অনাবশ্যকভাবে টেলিফোনের বইটা খুলে একবার দেখে, হঠাৎ বাবরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার প্রোগ্রামটা বাবর সাহেব—

বাবর উদ্বিগ্ন চোখে তার দিকে তাকাল।

আপনার প্রোগ্রামটা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

কেন, খারাপ ছিল না তো সিরিজটা!

না, তা নয়, সিরিজটা খুবই ভাল, আপনি করেছেনও চমৎকার।

বাবর ঠিক বুঝতে পারল না লোকটা সত্যি সত্যি ভাল বলছে, না প্রোগ্রাম উঠিয়ে দেবে বলে

তেতোর উপর মিঠে প্রলেপ লাগাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

তিনি বললেন, আপনার পরিচালনা খুবই ভাল, কিন্তু আমরাই ঠিক করলাম কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাক।

কেন?

জানেন তো, টিভি প্রোগ্রাম যখন খুব ভাল হতে থাকে, তখনই বন্ধ করতে হয়। তাতে পরে আবার যখন সিরিজটা শুরু হয় তখন দর্শক উৎসাহ নিয়ে দেখে। এতে আপনারই লাভ।

তাতো বটেই।

বাবর চেষ্টা করেও প্রফুল্ল থাকতে পারল না। কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল তার নিজেকে।

প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাহেব চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, অনেক দিন তো করলেন, মাস তিনেক বিশ্রাম নিন। আবার শুরু করবেন। আরে, আপনারাই তো আছেন। আপনাদের ছাড়া আমরা কাদের নিয়ে স্টেশন চালাব? নিন, চা খান।

আজ যেন তাঁর কোনো কথাই বিশ্বাস করতে পারছে না বাবর। তার টিভি সিরিজ যে এভাবে শেষ হয়ে যাবে সে ভাবতেও পারেনি। তার ধারণা ছিল আরো অন্তত তিন মাস চলবে, আগামী মার্চ পর্যন্ত।

তাহলে এই সামনের দুটো প্রোগ্রামই শেষ প্রোগ্রাম?

হ্যাঁ। শেষ প্রোগ্রামটা একটু জমিয়ে করবেন। ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রাম তো! নতুন কিছু করতে পারবেন না? নতুন ধরনের কোনো প্রেজেন্টেশন?

ভেবে দেখব। আচ্ছা উঠি, আমার আবার এক জায়গায় যেতে হবে।

বাবর উঠে দাঁড়াল। প্রোগ্রাম ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে বললেন, আপনার অবশ্য একটু আর্থিক লোকসান হলো।

না, না ঠিক আছে। আমি তো টাকার জন্যে প্রোগ্রাম করি না।

সে জানি। আপনার অন্য মেলা সোর্স আছে ইনকামের। সেই জন্যেই সরাসরি বলতে পারলাম।

চলি।

আচ্ছা, দেখা হবে।

বিমূঢ়ের মত বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল বাবর। দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ও কথা সে সত্যি বলেছে, প্রোগ্রাম টাকার জন্যে করে না। প্রোগ্রাম তার কাছে নেশার মত অনেকটা। এই যে যখন সে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছে এক সঙ্গে এত হাজার হাজার লোক তাকে দেখছে, এর একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। টাকা দিয়ে তার পরিমাপ করা যায় না।

টাকা তো সে ইনডেন্টিং থেকে কম রোজগার করে না। কিন্তু সেখানে এই যাদু, এই সম্মোহন নেই।

তাছাড়া, তাছাড়া এই প্রোগ্রামের জন্যেই তো সে প্রথম জানতে পেরেছিল লতিফাকে।

ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল বাবর। বেরিয়ে গাড়িতে বসল। প্রচণ্ড শব্দ তুলে স্টার্ট করল ইঞ্জিন।

আপন মনেই বলল, 'খেলারাম খেলে যা'। তারপর রওয়ানা হলো বাবলিদের বাড়ির দিকে

৬

পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল, সেলিমের সামনে বাবলি একগাদা বইপত্র নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছে। বাবরকে দেখে দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল বাবলি। এলোপাতাড়ি একটা বই ওল্টাতে লাগল।

সেলিম বলল, আয়। তোর কথা শুনে বাবলিকে নিয়ে বসেছিলাম পড়াশুনা দেখতে। হোয়াট ইজ ইকনমিকস তাই বলতে পারল না।

তাই নাকি বাবলি?

বলতে বলতে বাবর বসল।

তবে আর বলছি কী? এ নির্ঘাত ফেল করবে। কিছু পড়েনি। শুধু ঘোরাফেরা. হৈচৈ, চুল আঁচড়ানো, সিনেমা দেখা।

বলেছে তোমাকে? ক'টা সিনেমা দেখেছি গত মাসে?

বাবলি প্রতিবাদ করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে কালো ক্রুর একটা চাহনি দিল বাবরকে। কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল বাবর, যা সে সাধারণত হয় না। সেলিম ওকে বলতে গেল কেন যে সে তার পড়াশোনার খোঁজ নিতে বলেছে? একটা গাধা! গর্দভ।

বল না ক'টা সিনেমা দেখেছি? বাবলি মরিয়া হয়ে জের টেনে চলে, সত্যি করে বল! রিচার্ড বার্টনের এত সুন্দর বইটা সবাই দেখে পচিয়ে ফেলল, আমি দেখেছি? তারপর ওমর শরিফের পিটার ও টুলের 'নাইট অব দি জেনারেল'?

সিনেমা না দেখলেও নাম তো সব মুখস্থ দেখছি! সেলিম বলল।

নাম পড়তে পয়সা লাগে নাকি? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি, তাই বলি।

কাগজে সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু পড়ার থাকে না বুঝি?

বাবর এবার এগিয়ে এলো বাবলিকে উদ্ধার করতে।

আচ্ছা হয়েছে। ইকনমিকসের ডেফিনেশন পরীক্ষায় আসে না। এলেও থাকে পাঁচ নম্বর। যাও, তুমি পড়তে যাও।

একটা ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাবলি গ্যাট হয়ে বসে রইল। ভাবখানা যেন, আপনার কথায় পড়তে যাব নাকি? বাবর তাকিয়ে দেখল, এই প্রথম সে লক্ষ করল, তখনকার জামা কামিজ এখনো বাবলি ছাড়েনি। এর আগে কতদিন সে দেখেছে এই পোশাক। কিন্তু আজ অন্য রকম মনে হচ্ছে। ঐ তো সেই বোতামগুলো, পিঠের পরে, যা সে খুলেছিল। কোমরে রবারের ব্যাণ্ড দাঁত কামড়ে বসে আছে নিশ্চয়ই তার মসৃণ তলপেটে। একটা তুলতুলে বাচ্চার মত পেটটা তখন উঠছিল নামছিল। করতল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ওপর ঘষতে ভারি ভাল লাগছিল বাবরের।

সেলিম বলল, যা এখন। দু'দিন বাদে সব পড়া ধরব।

দুম দুম করে তখন উঠে গেল বাবলি।

হেসে উঠল বাবর। একবার সেই কারণে বাবলি পেছন ফিরে তাকিয়েছিল। সে চলে গেলে বাবর বলল, তোরও তো তেমনি মাথা খারাপ। পড়াশুনার কথা বলছি বলে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে হয়?

না, তুই ঠিকই বলেছিস। ও মোটে পড়াশুনা করছে না।

আমি কোথায় বলেছি, পড়াশুনা করে না? বলেছি, খোঁজ টোজ নিস আর তাছাড়া মানুষের মন কি সব সময় এক রকম থাকে? অনেক সময় জানা জিনিসও টপ করে বলা যায় না।

ঐটুকু মেয়ে তার আবার মন মেজাজ!

নে বাদ দে। ছেলেমেয়েরা ওরকম একটু হয়েই থাকে। ফারুক এসেছে শুনেছিস?

বলেই বাবর শংকিত হলো। বাবলি কি এসে বলেছে তার ভাইয়াকে যে ফারুক এসেছে? যদি বলে থাকে তাহলে সেলিম জানে তার সঙ্গে বাবলির দেখা হয়েছিল। অথচ টেলিভিশন থেকে যখন ফোন করেছিল তখন সে এমনি ভাব করেছিল, যেন অনেকদিন দেখা হয়নি।

না, শুনিনি তো। কবে এসেছে?

যাক্ বাঁচা গেছে, মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বাবর। বলল, এইতো সেদিন।

কোথায় উঠেছে?

শ্বশুর বাড়িতে। আর কোথায়? বলছে, পলিটিকস করবে।

পলিটিকস?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পলিটিকস। বলছে, আওয়ামী লীগে ঢুকবে।

তাতো ঢুকবেই। এখন আওয়ামী লীগের দিন।

তা ঠিক। সবাই এখন শেখ সাহেব বলতে পাগল। বাবর বলল, শেখ সাহেবের পাশে একটু বসতে পারলে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। অথচ এরাই জানিস, শেখ সাহেব যখন আগরতলা মামলার আসামি ছিলেন তাঁর নাম পর্যন্ত মুখে আনতেন না ভয়ে।

হা হা করে হেসে উঠল সেলিম।

ঠিকই বলেছিস। দুনিয়াটাই ও রকম। আচ্ছা, তোর কী মনে হয়, শেখ সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন এবার?

হতেও পারেন। পলিটিকস আমি বুঝি না।

ফারুক কী বলে?

ওর সাথে কথা হয়নি।

ফারুক যখন আওয়ামী লীগে যেতে চাচ্ছে তখন কী আর এমনি যেতে চাচ্ছে? এক নম্বর সুযোগ সন্ধানী ছেলে। বরাবর। মনে নেই, কী করে ফার্স্ট ক্লাস বাগাল এম.এ-তে?

আছে, আছে। মনে থাকবে না?

কই গো দ্যাখো বাবর এসেছে, কিছু খেতে টেতে দাও।

ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

সেলিমের বৌ এসে বলল, ভাল আছেন ?

আছি। আপনি ভাল তো ?

এই যা দেখছেন। চিংড়ির কাটলেট খাবেন ?

নিশ্চয়ই। আমার খুব প্রিয়।

তাহলে একটু দেরি করতে হবে।

করব। যেমন আদেশ করবেন।

হেসে চলে গেল সুলতানা।

সেলিম বলল, তুই আর বিয়ে টিয়ে করবি না ?

কেন, পাত্রী আছে নাকি ভাল ?

খুঁজে পেতে কতক্ষণ ? তুই করলে তো! আচ্ছা, নাকি, তুই সত্যি বলতো, তোর কোনো ব্যারাম ট্যারাম নেই তো ? মানে— এই আর কী—

বাবর অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ল।

থাকতেও তো পারে। একটা যন্ত্র দু' এক বছর ফেলে রাখলেও বিকল হয়ে যায়, আর তো মানুষের শরীর। তুই ডাক্তার দেখা।

তুই দেখছি ধরেই নিয়েছিস আমারটা অকেজো হয়ে গেছে।

তাহলে বিয়ে করিস না কেন ?

বাদ দে বিয়ের কথা। বিয়ে করব চুল টুল যখন শাদা হবে তখন।

চুল কী এখন কালো আছে তোর ?

তা সত্যি। বুড়োই হয়ে গেছিরে। আর এখন মেয়ে দেবেই বা কে, বল ? তাছাড়া দেশের যা অবস্থা।

দেশের অবস্থার সঙ্গে তোর বিয়ের যোগটা কী শুনি ? করবি তো ভারি— একটা বিয়ে। ইচ্ছে নেই সেই কথা বল।

রেখে দে। বুড়ো কালে আর এসব ভাল লাগে না। তোর মেয়ে কই ?

আছে ভেতরে।

নিয়ে আয় না ? একটু দেখি— এই দ্যাখো, কিছু আনিনি ওর জন্যে। বাসায় চকোলেট ছিল। একেবারে বিলিতি জিনিস।

সেলিম মেয়েকে আনতে ভিতরে গেল। বাবরের মনে পড়ল বাবলি যখন চকোলেট খাচ্ছিল তার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খয়েরি রংটা দেখাচ্ছিল ভারি মিষ্টি।

ফিরে এসে সেলিম বলল, নারে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভারি সুন্দর হয়েছে তোর মেয়েটা। কার চেহারা পেয়েছে বলতো ?

ওর মায়ের।

তোর চোখই নেই। অবিকল তোর মত হয়েছে দেখতে। কেবল রংটা ওর মায়ের।

তার মানে, বলতে চাস, আমি কাল ?

কাল ফর্সা দিয়ে এখন আর কী করবি ?

কেন, বিয়ে করেছি বলে চান্স আর নেই নাকি ?

তোদের শুধু মুখে মুখে। চিনিস এক অফিস, আর বৌয়ের আঁচল।

বলেছে তোকে ?

তোরা খুঁজবি চান্স ? যাহ!

কীসের চান্স? বলতে বলতে সুলতানা ঘরে এলো।

বলে দিই ? বাবর দুষ্টুমি করতে শুরু করল।

ভাল হবে না বলছি।

তবে এই যে বীরপুরুষের মত বলছিলি ?

আমি ভীতু নাকি ?

থাক, তুমি আর বল না। টেবিলে গ্লাশ সাজাতে সাজাতে বলল সুলতানা, জানেন ভাই সেদিন রাতে কী একটা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন, তাও যদি সত্যি হতো, আমাকে ঘুম থেকে তুলেছে। তার নাকি ভয় করছে।

সেলিম বলল, আচ্ছা তুই বল, ঘুমের মধ্যে কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা সত্যি অতশত মনে থাকে ?

হা হা করে হেসে উঠল বাবর।

খুব ভাল বলেছিস, কথাটা টিভি প্রোগ্রামে যুৎসই মত লাগাতে হবে।

বলেই বাবরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, একটু আগেই সে শুনে এসেছে, তার প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এ মাসেই। সামনের মাস থেকে আর কেউ তাকে দেখবে না, পথে পথে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠবে না কারো চোখ, নামটা শুদ্ধ করে বলার জন্যে নীল চিঠিতে আসবে না কোনো অনুরোধ, নতুন কোনো লতিফার সঙ্গে আর আলাপ হবে না। বাবর খুব ভাল করে জানে সিনেমা টিভি আর খেলার মাঠ এক সমান। যতক্ষণ পর্দায় আছ, যতক্ষণ গোল দিচ্ছ, ততক্ষণই লোকে মনে রাখে। তারপর কেউ ফিরেও তাকায় না। একটা হাত কেটে নিলেও এত ব্যথা হয় না যতটা হয় পাদপ্রদীপের আলো থেকে বঞ্চিত হলে।

সেলিম কী সব পাগলের মত বলে যাচ্ছে, হাসছে, গম্ভীর হচ্ছে, প্রশ্ন করছে, সুলতানা কাটলেট এনে রেখেছে, বাবর দু' একটা নিজেও কী বলেছে, কাটলেট খাচ্ছে, ঘড়িতে ঢং করে একটা আওয়াজ হলো কোথায়— কিছুই তার কানে যাচ্ছে না। অভিভূতের মত বাবর বসে একটা ছবি দেখছে— সে ছবি তার নিজের। এই তো দেখা যাচ্ছে সে প্রোগ্রাম ভিটিআর করবার দিন ভাল করে শেভ করে বিশেষ স্যুট পরে, গাড়িতে নয় যেন পাখা মেলে দিয়ে ডিআইটি বিল্ডিংয়ে এসে থামল। হাসি বিলিয়ে দিল একে তাকে। প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলল এমন একটা গুরুত্ব নিয়ে যেন ডাঃ বার্নার্ড কারো দেহে হৃৎপিণ্ড সংযোজন করতে যাবার আগে পরামর্শ করছেন। ঐ তো সে দরোজা ঠেলে মেকআপ রুমে ঢুকল। তার মুখে পরতের পর পরত রং লাগছে। নাকের দু'পাশে ঘষে দিচ্ছে লাল। ভ্রূ শুধরে দিচ্ছে পেন্সিল দিয়ে। সে বিরল হয়ে আসা চুলের গোছা টান টান করে ধরে বলছে, গোড়ায় একটু পেন্সিল বুলিয়ে দাও, নইলে টাক চোখে পড়ে বড্ড। তারপর যত্ন করে সময় নিয়ে সিঁথি সেরে

হেয়ার স্প্রে লাগাচ্ছে সে। প্রযোজক এসে বলছে, সেট রেডি। আসুন। সে বলছে, আর এক মিনিট। বাবর সেটে ঢুকছে যেন সদ্য তৈরি নতুন রাজধানীতে প্রথম পা রাখছে কোনো তরুণ সম্রাট। কে যেন কোথায় বলছে, একটু দাঁড়ান, আলোটা দেখে নিই। ক্যামেরার পেছন থেকে কানে হেডফোন লাগানো কে এবার সাড়া দিয়ে উঠল দু'হাত তুলে— স্টুডিও স্ট্যাণ্ডবাই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে একবার টাইয়ের নট বুলিয়ে নিল বাবর। চোখ তার মনিটারের দিকে। শোনা গেল, 'ভিটিআর রোলিং'। কয়েক সেকেণ্ড পর মনিটারে পর্দা দুধসাদা হয়ে উঠে একটি লেখা ফুটিয়ে তুলল 'মারপ্যাঁচ'। তারপর সেটা মিলিয়ে গেল। এবারে এলো তার নাম— 'পরিচালনা বাবর আলী খান'। বাবর মনিটার থেকে চোখ নামিয়ে ক্যামেরার লেন্সের দিকে রাখল। ঠোঁটে সৃষ্টি করল হাসির পূর্বাভাষ। তারপর, ক্যামেরার মাথায় লাল বাতিটা জ্বলে উঠতেই সে সহাস্য ঝুঁকে উচ্চারণ করল, শুভেচ্ছা নিন, বাবর আলী খান বলছি মাবপ্যাঁচের আসর থেকে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ। দেখি আপনারা কতজন আমাকে বোকা বানাতে পেরেছেন। আমি গেলবারে মোট আটটি ধাঁধা পেশ করেছিলাম, এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত-আটটি ধাঁধা, আপনারা উত্তর পাঠিয়েছেন, দু'হাজার তিনশ' সাতান্ন, তার মধ্যে সঠিক হয়েছে একুশ জনের।—

বাবর উঠে দাঁড়াল। বলল একটু বাথরুম থেকে আসি।

বসবার ঘর থেকে বেরুতে হয় পেছনের বারান্দায়, তার শেষ প্রান্তে একটা বাথরুম আছে। দুটো ঘর পেরিয়ে যেতে হয়। প্রথমটা খাবার ঘর। তারপরে বাবলির। দ্রুতপায়ে বাথরুমে ঢুকে দরোজাটা বন্ধ করতে করতে তার মনে হলো বাবলিকে যেন দেখা গেছে জানালার কাছে বই নিয়ে বসে আছে। চলার তোড়ে তখন লক্ষ করেনি, থামার কথাও মনে হয়নি। কিন্তু ছবিটা চোখে লেগে গেছে। সমুখের ল্যাম্প থেকে আলোর আধখানা বৃত্ত বাবলির চিবুক স্পর্শ করেছে মাত্র। দুটো হাত বইয়ের ওপর। আলোকিত হাত দুটোকে অচেনা একটা ফুলের মত দেখাচ্ছিল। পিঠটা অন্ধকাব। দূরে সবুজ চাদর পাতা বিছানা অন্তরঙ্গ করে তুলেছে জালানা দিয়ে হঠাৎ দেখা ছবিটা।

বাথরুমে এসে কিছুই করল না বাবর অনেকক্ষণ। বাতি জ্বালিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখল। বলল তার ঠোঁট দুটিকে, তুমি আজ কাকে চুমো খেয়েছ?

আলতো করে নিজের ঠোঁট আদর করল সে। তারপর জামার কয়েকটা বোতাম খুলে দেখল, কোনো চুল পেকেছে কি-না! না, এখানে এখনো শুরু হয়নি। নিজের লোমশ বুকে হাত ঘষতে ভাল লাগল তার। কিছুক্ষণের জন্যে তাই করল সে। তারপর জামার বোতাম তাড়াতাড়ি লাগিয়ে প্যান্টের বোতাম খুলল বাবর।

কমোডে এই যে একটানা সরসর শব্দ হচ্ছে এখন, বাবলি কি শুনতে পাচ্ছে? দ্রুত হাতে সে ট্যাপ খুলে দিল। ট্যাপ থেকে পানি পড়ার শব্দে ডুবে গেল ঐ শব্দটা।

বাথরুমের তাকে একটা তুলোর রোল। কে ব্যবহার করে? বাবলি? তুলোটা একবার বুলিয়ে দেখল সে। তারপর চারদিকে তাকাল। একটা তোয়ালে ঝুলছে। ওপাশে চিলতে হয়ে আসা সাবান। দুটো টুথব্রাশ। পাজামার একটা ফিতে জড়িয়ে আছে ফ্লাশ হ্যাণ্ডেলের সাথে। বাবলির পাজামায় তো রবারের ব্যাণ্ড। এটা কার? ভাল করে সে দেখতে লাগল সব। না, বিশেষ করে বাবলির এমন কিছুই চোখে পড়ল না। বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ

দরোজার গায়ে দেখল পেন্সিল দিয়ে লেখা— 'বাবলি'। ইংরেজিতে। কবে লিখেছিল ? কেন লিখেছিল ? লেখাটা ছুঁয়ে দেখল বাবর। তারপর ঠোঁট বাড়িয়ে স্পর্শ করল অক্ষরগুলো। প্রথমে একসঙ্গে সব ক'টা অক্ষর। পরে একটা একটা করে— বি এ বি এল আই। সন্তর্পণে দরোজা খুলে বেরুল বাবর। নিঃশব্দে বাবলির জানালার কাছে এসে থামল। ডাকল, এই। বাবলি মাথা তুলল না। বাবর দেখল রংটা সে ভুল দেখেছে। চাদরের রং নীল। সে বলল, রাত ঠিক এগারটায় আমাকে টেলিফোন কর।

কথা বলল না বাবলি। গলা আরো নামিয়ে আনল বাবর।

আচ্ছা, আমিই করব। টেলিফোনের পাশে থেকো।

না।

তুমি করবে ?

না।

চকিতে চারদিকে দেখে বাবর চাপা গলায় হিস হিস করে উঠল, কথা শোন। আমি টেলিফোন করব। রাত ঠিক এগারটায়। বলেই সে লম্বা লম্বা পা ফেলে বসবার ঘরে এসে ঘোষণা করল, ভুলেই গিয়েছিলাম। এখুনি বাসায় যেতে হবে। একজন আসবে।

৭

একজন আসবে বলেও তক্ষুণি বেরুন সম্ভব হয়নি। আরো কিছুক্ষণ বসতে হয়েছে। বসেছে সে। বারবার তার মনে হচ্ছিল বাবলি একবার এ ঘরে আসবে। এলে কী হবে তা সে জানে না। কিন্তু প্রতীক্ষা করেছে উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত।

ঝুঁকির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার প্রবল একটা আকর্ষণ চিরকাল অনুভব করেছে বাবর। বিপদ তার স্বাভাবিক পরিবেশ। উদ্বেগ তার পরিচ্ছেদ। এই দুয়ের বিহনে সে অস্বস্তি বোধ করে, মনে হয় বিশ্বসংসার থেকে সে বিযুক্ত। তাই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, স্বাভাবিকতার প্রয়োজনে, সে অবিরাম সৃষ্টি করে বিপদ আর ঝুঁকি।

বাবলি এলো না।

সুলতানা বলল, আরেকদিন আসবেন।

আসব। তার জন্যে বিশেষ করে বলতে হবে না।

আচ্ছা, সবসময় টিভির মত কথা না বলে বুঝি আপনি পারেন না ?

সুলতানার ঐ হঠাৎ মন্তব্যে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল বাবর। তারপর হেসে ফেলে বলল, দেশে যখন টিভি ছিল না তখনও আমি এমনি করেই কথা বলতাম। আচ্ছা, চলি।

বেরিয়ে এসে দেখল এগারটা বাজতে এখনো অনেক দেরি। বাবলিকে হঠাৎ এগারটা সময় দিতে গেল কেন ? না, ভেবে চিন্তে দেয়নি। এমনিই বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে। বোধহয় এগারটা শুনতে ভাল, বলতে গেলে জিহ্বার এক রকম তৃপ্তি হয়। এ-গা-র-টা। বাবলির স্তনের ঘ্রাণটা অস্পষ্টভাবে আবার নাকে এসে লাগল হঠাৎ। নিজের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া

করল বাবর যে আঙুলে সে তার শরীর সন্ধান করেছিল আজ বিকেলে।

বাসায় ফিরে যাবে?

আজ বড় একা লাগছে বাবরের। আজ নয়, কাল থেকে একা লাগছে। কিন্তু কেন লাগছে তা এখনও বুঝতে পারেনি।

ধুত্তোর ছাই। খেলারাম খেলে যা।

এক নিমেষে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল তার। ভিআইপি স্টোরে গাড়ি থামাল সে। কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। ব্লেড ফুরিয়ে গেছে, শেভিং লোশনও তলানিতে এসে ঠেকেছে। আরো কী কী যেন ফুরিয়েছে চট করে মনে পড়ল না তার।

স্টোরে ঢুকে বলল, একটা টেলিফোন করতে পারি?

টেলিফোনে বাসায় খোঁজ নিল, কেউ এসেছিল কি-না। না, কেউ আসেনি। মান্নান জিগ্যেস করল রাতে খাবে কি-না? না, সে খাবে না। বাইরে খাবে। আবার জিজ্ঞেস করল কেউ আসেনি? কেউ ফোন করেনি? না। হ্যাঁ, না।

বিশেষ কারো কথা ভেবে বাবর জিজ্ঞেস করেছে কি? না, তা করেনি? ওটা তার স্বভাবের অন্তর্গত। তার কেবলই মনে হয় কেউ যেন তাকে খুঁজছে। বাসা থেকে বেরুলেই মনে হয় কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। তখন বাসায় ফেরবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। আবার বাসায় ফিরলে মনে হয় বাইরে, শহরে, কী যেন হয়ে যাচ্ছে যা সে জানতে পারছে না।

শো কেসে লাল সবুজ নীল রংয়ের মেলা। লোশন, সাবান, শ্যাম্পু, ক্রীম, পাফ, কত কী! হ্যাঁ, শ্যাম্পুও দরকার। ওটা নিতে হবে। —ব্লেড দিন দু'প্যাকেট, সাবানটা কী রকম? নতুন বেরিয়েছে? ভাল? দিন। বাহ, চাবির রিংটা তো সুন্দর। কত দাম? সাত টাকা? না, থাক। ওটা কী? মিনি লাইট? দেখি দেখি, কী রকম? সুন্দর প্যাস্টেল নীল রংয়ের এতটুকু একটা টর্চ। মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে এত ছোট। পকেটে রাখা যায় স্বচ্ছন্দে। দিন একটা। বাবর পছন্দ করল প্যাস্টেল গোলাপি রং। কয়েকবার নেড়েচেড়ে দেখল লাইটটা। সুন্দর। মনটা খুব খুশি হয়ে উঠল তার। আর, দু'প্যাকেট সিগারেট দিন। লাইফ ম্যাগাজিন এটাই নতুন এসেছে? দিন এক কপি। পনির দেবেন হাফ পাউণ্ড। এক বোতল টমাটো কেচাপ। আর— আর কী? আর কিছু না।

প্যাকেটটা নিয়ে গাড়িতে বসল বাবর। বাসায় ফিরবে পৌনে এগারটায়। তারপর ঠিক এগারটায় ফোন করবে বাবলিকে। এখনো ঘণ্টা দু'য়েক সময় আছে। বরং খাওয়াটা সেরে নেয়া যাক। কোথায় খাবে?

ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাবর এসে ঢুকল। বইয়ের দোকানে দেখল চমৎকার সব নতুন বই এসেছে। বই দেখল কিছুক্ষণ। কিন্তু কিনল না। আজ বই কেনার মুড নেই তার। শুধু দেখতে ভাল লাগছে।

হঠাৎ তার পিঠ স্পর্শ করল কেউ। বাবর ঘুরে দেখল আলতাফ। তার বিজনেস পার্টনার।

আলতাফ বলল, আমি তোমাকে গরুখোঁজা করছি।

বাজে কথা: বাসায় এইমাত্র খবর নিয়েছি, কেউ আসেনি।

মানে, বাসায় এখুনি যেতাম।

এই তোমার গরুখোঁজা ?

চল কোথাও বসি, জরুরি কথা আছে।

কী ব্যাপার ?

এমন কিছু নয়। চল।

তোমার পারিবারিক কিছু ?

না, না।

ব্যবসা ?

হ্যাঁ, ব্যবসার।

চল, খেয়ে নিই। খেতে খেতে শুনব।

সে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে বারে চল। কুইক দুটো হয়ে যাবে।

চল।

বারে এসে অর্ডার দিয়ে আলতাফ বলল, শুনেছ বোধ হয় সরকারি কিছু বড় অফিসার সাসপেণ্ড হচ্ছে ?

হ্যাঁ, শুনেছি। আমাদের বন্ধুবান্ধব কে কে গেল ?

এখনো পুরো খবর পাইনি। সবাই তো আল্লা আল্লা করছে।

ভালই তো।

তবে, একজনের একেবারে পাকা খবর।

কে ?

আমাদের হতরন সাহেব।

বল কী ? লাফিয়ে উঠল বাবর। সত্যি ?

হ্যাঁ, সত্যি।

যার কথা তারা বলছে তিনি ব্রিজ খেলায় এক্সপার্ট। কিন্তু হতরন বলতে পারেন না। বলেন হতরন। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেছে হতরন সাহেব।

মুশকিলের কথা।

বাবরকে চিন্তিত দেখাল।

হতরন যাচ্ছে তাহলে ?

ইয়েস, স্যার। পাকা খবর। সেই জন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম।

এইমাত্র কিছুদিনের কথা, হতরন তাদের একটা বড় কাজ পাইয়ে দেবে বলেছে, যার কমিশনই হবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। শর্ত ছিল এই হতরনের বড় মেয়ের বিয়ে সামনে, গহনার সম্পূর্ণ টাকা দেবে তারা। গহনার অর্ডারও দেয়া হয়ে গেছে। কথা ছিল, গহনা নিয়ে যাবেন হতরন সাহেব, টাকাটা ওরা জুয়েলারকে দিয়ে দেবে।

বাবর জিজ্ঞেস করল, গহনা নিয়ে গেছে ?

হ্যাঁ, আজই সকালে নিয়েছে। আমি টেলিফোন করেছিলাম।

আমাদের কাজটা।

সাসপেণ্ড হলে তো কাঁচা কলা পেলাম।

তা বটে।

আর সাসপেণ্ড না হলেই বা কী ? এই সময় হতরন কেন হতরনের বাবাও কাজ দিতে সাহস করবে না।

তাইতো।

আলতাফ তাকে একবার ভাল করে দেখে বলল, মনে হচ্ছে তুমিও আজ খুব মনোযোগ দিতে পারছ না।

চমকে উঠল বাবর। বলল, না, তা কেন ?

আমার যেন মনে হচ্ছে। আসল কথা কী জান ? কথা হচ্ছে, গহনার টাকাগুলো। কাজ দশটা আসবে, একটা পাব, একটা পাব না।

তা কী করবে ?

তুমি আজ সত্যি কিছু চিন্তা করতে পারছ না। কী হয়েছে ?

কিছু না।

বুঝেছি। চল এবার গহনার দোকানে যাই।

গিয়ে কী হবে ?

আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বল তো ?

বাবর এবার সত্যি বিরক্ত বোধ করল। এক ঢোকে সবটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, চল গহনার দোকানে যাই।

গহনার দোকানে গিয়ে জানা গেল মোট দাম ন'হাজার সাতশ' চুরাশি টাকা। সাড়ে ন'হাজার দিলেই চলবে।

আলতাফ বলল, দামটা আপনারা ওঁর কাছ থেকেই পাবেন।

কিন্তু কথা তো ছিল আপনারা দেবেন।

হাত কচলে অনাবিল একটা হাসি দিয়ে দোকানদার নিবেদন করল।

আলতাফ বলল, না, সে রকম কথা ছিল না।

মানে ? বাবর চমকে উঠল। কিন্তু আর কিছু বলার আগেই নিজের হাতের উপর আলতাফের চাপ অনুভব করল সে।

আলতাফ এবার জোর দিয়েই বলল, আপনারা ভুল করছেন, সে রকম কোনো কথা ছিল না। দাম উনিই দেবেন। গয়না উনি নিয়ে গেছেন ?

তা, নিয়েছেন।

তবে আর কথা কী ?

কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন—

আপনি তখন ঠিক বুঝতে পারেননি। কথা ছিল, উনি গয়না নিয়ে যাবেন, যদি দাম নিয়ে

গোলমাল হয়, তবে জিম্মা আমরা রইলাম।

কী বলছেন স্যার ?

হ্যাঁ আপনারা যান তার কাছে। টাকা চান।

দোকান থেকে বেরিয়েই বাবর বলল, এটা কিন্তু ঠিক হলো না ?

কী ঠিক হলো না ?

এভাবে মিথ্যে বলাটা। দাম তো আমরাই দিতে চেয়েছিলাম।

আলতাফ গাড়িতে বসতে বসতে বলল, হঠাৎ এমন নীতিবাগিশ হয়ে উঠলে যে।

না, এটা নীতিবাগিশ টাগিশ কিছু না। কাজ পাচ্ছি না বলে ভদ্রলোককে তার মেয়ের বিয়ের সময় বিপদে ফেলাটা কিছু কাজের কথা নয়।

কী বলতে চাও তুমি ?

ভদ্রলোকের কাছ থেকে অতীতে অনেক উপকার পেয়েছ। দু' বার দু' দুটো কাজ দিয়েছিলেন।

তখন তাকে টাকাও দিয়েছি।

দিয়েছ, কিন্তু সেই দুটো কাজে কম লাভ আমরা করিনি। না হয় তার থেকে এই নয় সাড়ে নয় হাজার টাকা দিলামই।

বুঝলাম না, আজ তুমি এই সাধারণ কথাটা বুঝতে পারছ না কেন। এই টাকাটা একেবারে পানিতে ঢালা হবে। অফিসার হিসেবে হি ইজ ডেড, ডেড ফর গুড। কিম্বা তোমাদের ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডেড আজ এ ডোর নেইল।'

আলতাফ ইংরেজি একটু কম জানে বলে বাবরকে ইংরেজি নিয়ে মাঝে মধ্যে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না।

বাবর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তবু আমার মনে হয়, গহনার দামটা আমাদের দিয়ে দেয়া উচিত।

কী ব্যাপার, হতরনের বড় মেয়েকে দেখেছ নাকি ?

দেখেছি, কেন ?

চোখ টোখ ছিল নাকি তোমার ?

বাজে কথা বল না।

কী জানি। তবে যাই বল, টাকা দেওয়ার বিরুদ্ধে আমি।

বাবর কিছু বলল না। অস্বাভাবিক একটা নীরবতার আশ্রয়ে সে বসে রইল। এ রকম বসে থাকা বাবরের স্বভাব নয়। কথা সে ভালবাসে। কথা না বলতে পারলে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবি খায় সে।

আলতাফ বলল, চল হোটেলে যাই।

যেখানে তোমার খুশি।

তুমি রাগ করেছ ?

মোটেই না।

এই জন্যেই মাঝে মাঝে তোমার ওপর আমার ভীষণ রাগ হয়। আলতাফ বলে চলল, তুমি সাধারণ একটু রাগও করতে পার না।

একেবারে মেয়েদের মত কথা বলছ। হা হা করে হেসে উঠল বাবর। বলল, ব্যবসা করতে গেলে রাগ করলে চলে না। ব্যবসা প্রেম নয়।

প্রেম তো তোমার কাছে বিছানায় যাবার রাস্তার নাম।

আবার হা হা করে হেসে উঠল বাবর। হাসতে দেখে আলতাফ আশ্বস্ত হলো। মনে করল, টাকা দেয়া না-দেয়া সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তটাই বাবর মেনে নিয়েছে শেষপর্যন্ত। কিন্তু বাবরের সঙ্গে এতদিন ব্যবসা করলেও বাবরকে সে চেনে না, এইটে তার অজানা।

পরপর কয়েকটা হুইস্কি খেল বাবর। খুব দ্রুত সেরে নিল রাতের আহার। তারপর বলল, আলতাফ, আমি একটু অন্যখানে যাব। কাল দেখা হবে।

কাল কোথায় দেখা হবে ?

কেন, অফিসে ?

ভুলে গেছ, কাল রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছি।

ওহো তাইতো।

সেই জন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম। চল আমার বাসায়। কাগজপত্র নিয়ে একটু বসব। কমার্স সেক্রেটারির সঙ্গে সেই ফাইলটা নিয়ে--

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। চল।

আলতাফ তাকে বাসায় এনে আবার একটা হুইস্কি দিল।

আবার কেন ?

খাও না ? ভাল জিনিস। জাপানের।

বাহ, বেশ চমৎকার তো।

বোতলটা শেষ করবে নাকি আজ ?

তুমি ফাইল বের কর।

ফাইল নিয়ে ডুবে গেল বাবর। কয়েকটা এস্টিমেট দু'জনে বসে আবার দেখল। না, যা করা হয়েছে, ঠিকই আছে। এই ড্রাফটা ভাল করে লেখা হয়নি। নতুন করে আবার লিখে দিল বাবর। কয়েকটা সই বাকি ছিল, সই করল। তারপর বলল, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফিরছ কবে ?

তা এক সপ্তাহ লাগবে।

পারলে একবার করাচি ঘুরে এসো। জাহাজের সেই—

হ্যাঁ, মনে আছে। ওটা তদ্বির করতে হবে।

এবারে একটা ফাইন্যাল কিছু করে আসা চাই-ই।

দেখি। মনে হয় করতে পারব।

আমি চললাম। গুড লাক।

বোতলটা নিয়ে যাও।

না, থাক।

আরে জাপানি জিনিস।

থাক। ফিরে এসো এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।

আলতাফ ফটক পর্যন্ত এলো। বলল, আর শোন হতরন টেলিফোন করলে নিজে বলতে না পার বল আলতাফ না আসা পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না।

আচ্ছা।

সাড়ে ন'হাজার খুব কম টাকা নয়।

আমি জানি।

আচ্ছা দেখা হবে।

বাবর তীব্রবেগে গাড়ি ছুটিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর গাড়ি থামিয়ে পকেট থেকে নোটবুক বের করে দেখে নিল হতরনের বাড়ির ঠিকানা। বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। দরোজায় বিজলী বোতাম টিপল সে। একজন এলো। তাকে বলল, সাহেবকে ডেকে দাও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তিনি। বাবরকে দেখেই বিস্ময়ে স্খলিত গলায় বলে উঠলেন, আপনি?

হ্যাঁ, আমি।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বাবরের হাত চেপে ধরলেন। আমার কথা শুনেছেন সব?

হ্যাঁ শুনেছি।

আপনার কী মনে হয়, আমার বাড়ি ওয়াচ করছে ওরা?

ভয় পাবেন না। গাড়ি দূরে পার্ক করেছি। আমি এসেছি কেউ জানবে না।

আমি, আমি কিন্তু গয়নাগুলো নিয়ে এসেছি।

জানি।

আপনাদের কাজটা করে দিতে পারলাম না। এদিকে এই বয়সে দেখুন দিকি, একটা কিছু হলে লজ্জায়— সামনে মেয়ের বিয়ে— অথচ জানেন, বহু অফিসার যারা রিয়ালি কিছু করেছে, তারা দিব্যি আছে, তাদের নাম পর্যন্ত কেহ করছে না।

আপনি শান্ত হয়ে বসুন।

বসছি, বসছি। এখন কী হবে। বলতে পারেন?

কী আর হবে? যা হবার তাই হবে। ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

না। ঘাবড়ে আর কী হবে। চা খাবেন?

থাক, কষ্ট করবেন না। আলতাফের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

না।

টেলিফোন করেছিল?

না। কেন বলুন তো ?

আপনার মেয়ের বিয়ে কবে ?

সামনের বারো তারিখে।

কেনাকাটা সব হয়ে গেছে ?

জি, এক রকম সবই হয়েছে। যদি লিস্টে আমার নাম বেরোয় তাহলে কী করে যে বিয়ের দিন সবার সামনে দাঁড়াব। আচ্ছা, আপনি আলতাফ সাহেবের কথা জিগ্যেস করলেন কেন ? উনি হাই সার্কেল থেকে কিছু শুনেছেন নাকি ? আমার নাম আছে ?

সত্যি, আপনি ছেলে মানুষের মত করছেন।

ভদ্রলোক তখন দু'হাতে মাথা চেপে শূন্যদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। এক আধবার চেষ্টা করলেন শুকনো ঠোঁটজোড়া জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিতে। কিন্তু সে শক্তিটুকু তার দেহে অবশিষ্ট নেই। জিভটা বেরিয়েও যেন বেরুল না। দেখে হাসি পেল বাবরের। কিন্তু না, হাসলে নিষ্ঠুরতা করা হবে।

ভদ্রলোক হঠাৎ চোখ তুলে কিছু একটা বলার জন্যেই যেন বললেন, আপনি এলেন বাবর সাহেব, খুব ভাল করেছেন। সারাদিন ঘরের মধ্যে ছটফট করেছি। রোজা ছিলাম। তারাবির নামাজ পর্যন্ত পড়তে যাইনি। আমার এই বড় মেয়েটা বুঝলেন বাবর সাহেব খুব আদরের। ছেলেটাও ভাল পেয়েছি। এ রকম ভাল পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা। এবার এমআরসিপি করে ফিরেছে। আলতাফ সাহেব এলেন না ?

কী বলতে কী বলছেন ভদ্রলোক। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাচ্ছেন ঠিক যেন একটা চড়ুই। না, উপমাটা ঠিক হলো না। মাথার ভেতরে হুইস্কি কাজ করতে শুরু করেছে। বাবর দেখেছে, একটু বেশি সুরা পান করলেই এ রকম হাস্যকর কথা সব তার মনে পড়তে থাকে।

হতরন সাহেব আবার নীরব হয়ে গেলেন। আবার তার ঠোঁট শুকিয়ে এলো। আবার তিনি জিভ দিয়ে তা ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। এবারে তিনি বাবরের দিকে ভীত কিন্তু গভীর চোখে তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা কলেন কেন সে এসেছে। তার ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। কেন লোকটা বলছে না তার আসার আসল উদ্দেশ্য কী ?

কিন্তু বাবর নিজে যে কেন চুপ করে আছে তা সে নিজেও বলতে পারবে না। একবার তার মনে হচ্ছে, সে গভীর ভাবে কী ভাবছে, আবার মচ্ছে, না ভাবছে না। শূন্যতা, অসীম এক শূন্যতার মধ্যে বিনিসুতো ঝুলে আছে সে।

সোয়াতের গিরিশৃঙ্গগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যেমন নীল শূন্যতা, শীতল শূন্যতা, স্তব্ধ শূন্যতা— এ যেন তেমনি। বাবর একবার মনোযোগ দিয়ে দেখছে— হতরন সাহেবের পা জোড়া যেন সেখানে কোনো দুর্বোধ্য লিপিতে কিছু লেখা আছে। আবার সেখানে থেকে চোখ ফিরিয়ে ভদ্রলোকের গালে কাটা জায়গাটা দেখছে। দেখতে দেখতে সেই দাগটা এত বড় হয়ে গেল যে তাতে আবৃত হয়ে গেল দৃশ্যমান সব কিছু। কোথায় যেন ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। ঝরে যাচ্ছে। আশা, উদ্যম, বর্তমান, ফোঁটায় ফোঁটায় নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে।

বাবরের হাতে সিগারেট পুড়ছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ছাই। আস্তে আস্তে বাঁকা হয়ে

যাচ্ছে ধনুকের মত। বাবর উদ্বেগ নিয়ে এখন তাকিয়ে দেখছে কখন খসে পড়বে ছাইটুকু। এই বুঝি পড়ে। এই বুঝি পড়ল। না, এখনো কিছুটা শক্তি, কিছুটা আকর্ষণ অবশিষ্ট আছে। বর্শির মত বাঁকা হয়ে এসেছে, তবু ধূসর সুগোল দীর্ঘ ছাইটা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না সিগারেট থেকে।

হতরন সাহেব বলে উঠলেন, বাবর সাহেব ?

বাবর সচকিতে তাকাল তার দিকে। অভ্যাসবশত এক টুকরো হাসিও ফুটে উঠল তার সমস্ত মুখে।

বলুন।

বাবর ছাইটা নিজেই ঝেড়ে ফেলে দিল।

আমি এই এত বছর চাকরি করলাম, মনে করতে পারেন লাখ লাখ টাকা বানিয়েছি। সবাই তাই মনে করে। গভর্ণমেন্টও তাই মনে করছে। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, আমার ব্যাংকে একটা পয়সাও নেই। বড় কষ্ট করে জীবনটা চালিয়ে এলাম। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পেরেছি, ঐ যা। কিন্তু একটা বাড়ি বলুন, এক টুকরা জমি, বেনামিতে টাকা— কিছু না। শুনি, আমাদের কোনো কোনো সাহেবের ফরেনে টাকা পয়সা আছে—

থাক ওসব। নাইবা বললেন।

না, না, বলছি এই জন্যে যে, আপনাদের কাজটা করে দিতে চেয়েছিলাম বলে মনে করবেন না, আমি যে আসে তার জন্যেই করি। আপনারা মানে আপনাকে আমি অন্য চোখে দেখি। আপনিও রিফিউজি, আমিও আমার পৈতৃক বাড়িঘর জমিজমা সব মুর্শীদাবাদে ছেড়ে এসেছি। মেয়েটার বিয়ে যে কষ্ট করে দিতে হচ্ছে তা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না— আপনারা আমার মেয়েকে নিজের মনে করে কিছু দিতে চেয়েছিলেন— বলতে বলতে ভদ্রলোক উদগ্রীব চোখে তাকালেন বাবরের দিকে। কথা শেষ করতে পারলেন না। ভয়, পাছে বাবর তার প্রতিবাদ করে। কে জানে হয়ত সে জন্যেই এত রাতে সে এখানে এসেছে কি-না।

বাবল বলল, আমি সেই ব্যাপারে এসেছি।

কেন, কিছু— অন্য রকম কিছু— মানে— বলুন।

গয়নার টাকাটা আমরা দেব বলেছিলাম।

সে আপনাদের দয়া।

বাবরের হঠাৎ রাগ হলো ভদ্রলোকের দীনতা দেখে। এরা পৃথিবীতে বাস করে কী করে ? তার সামনে বাবর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে ঈশ্বরের মত মনে করতে বাধ্য হচ্ছে। বাবরের হাতে তার সব কিছু নির্ভর করছে এখন— অথচ বাবর মোটেই তা উপভোগ করতে পারছে না। তাই সে চুপ করল।

ভদ্রলোক বললেন, গয়না আমি নিয়ে এসেছি। এখন—

জানি। টাকাটা দেব বলেছিলাম।

হ্যাঁ।

টাকাটা চেকে দিলে অসুবিধে হতো। আপনার নাম জানি না লিস্টে আছে কি-না। কিছু চিন্তা

করবেন না। টাকাটা নগদ কাল আপনি পেয়ে যাবেন। আমি দিয়ে যাব।

ভদ্রলোকে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। এক মুহূর্তে তার চেহারাটা আলো হয়ে উঠল। তিনি কিছু শব্দ খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। শেষে বললেন, একটু চা খান।

না, আমি চলি। এই কথাটা বলতে এসেছিলাম।

অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে কী আর বলব।

আর শুনুন, আলতাফ যেন না জানে।

আমার মেয়ের বিয়েতে আসবেন না ?

আসব। চলি এখন।

কিছু খেলেন না ?

আবার কোনোদিন।

আচ্ছা, আমার নাম কী লিস্টে আছে বলে মনে করেন ?

আমি খবর পাইনি। ভয়ের কি আছে। বিপদ তো পুরুষ মানুষের জন্যেই। ভয় করলেই ভয়।

তবু, এই বয়সে মান সম্মান।

আমি যাচ্ছি। কাল টাকা পাবেন।

ভদ্রলোক বাবরকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার শক্তি পর্যন্ত পেলেন না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মাঝখানে।

ঘরে এসে শুতে যাবে হঠাৎ বাবরের মনে পড়ল বাবলির কথা। দৌড়ে সে টেলিফোনের কাছে গেল। রিসিভারটা তুলল। নামিয়ে রাখল। নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে স্পষ্ট। হাতঘড়িটা খুঁজল। বাথরুমে খুলে রেখেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত শরীর যেন পাকিয়ে উঠল একটা দীর্ঘ স্ক্রুর মত। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজে। সে বলে এসেছিল, বাবলিকে, এগারটায় তার টেলিফোনের অপেক্ষা করতে। বাবলির দুটো স্তন আবার সে দেখতে পেল ঘড়ির ডায়ালে। আর নাকে সেই অস্পষ্ট সুঘ্রাণ। ধীরে, যেন স্বাস্থ্যস্বচ্ছল খোকা মায়ের কোলে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তেমনি নড়ে চড়ে উঠল তার শিশ্ন। বড় হতে লাগল। উত্তাপ বিকিরণ করতে শুরু করল। উত্তাপে, আয়তনে, সে তার দেহের চেয়েও বিশাল হয়ে উঠল যেন। তারপর আবার হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। শীতল হয়ে গেল। অস্তিত্ব অবলুপ্ত হলো তার। বাবর টেলিফোনের কাছে এলো।

এখন ডায়াল করবে বাবলিকে ? এই মাঝ রাতে, যখন ওদের বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারদিক। গভীর রাতে টেলিফোনের আওয়াজ বড় উচ্চগ্রামে বাজে। যদি সবার ঘুম ভেঙ্গে যায় ? যদি বাবলির ভাই টেলিফোন ধরে ? যদি বাবলিই ধরে আর পাশের ঘরে কান খাড়া করে থাকে তার ভাবী ?

হাসি ফুটে উঠল বাবরের ঠোঁটে। খেলারাম, খেলে যা। মন্দ কী ? বাবর প্রলুব্ধ হলো বিপদের সামনা করতে। বিপদ যদি আসেই দেখা যাক না আমি কী করে সামলাই। রিসিভারটা তুলে নিল বাবর। ধীরে, একটার পর একটা নম্বর ঘোরাল সে। শুনল অন্য দিকে

বেজে উঠল টেলিফোন। কিম্বা এত দ্রুত যে, বেজে ওঠার আগেই কেউ রিসিভার তুলল।

কিন্তু অপর পক্ষ কোনো সাড়া দিল না।

গাঢ় হিংস্র একটি স্তব্ধতা।

তখন বাবর বলল, হ্যালো।

সে স্তব্ধতা আরো বিকট হয়ে উঠল।

বাবর আবার বলল, হ্যালো।

তবু সেই স্তব্ধতা হত্যা করে কেউ উত্তর দিল না। কিন্তু আশ্চর্য, বাবরের মনে হলো স্তব্ধতা এখন তার হিংস্র নখরগুলো গুটিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ঘুমিয়ে পড়ছে। বাঘের সুবর্ণ পিঠে ধীরে ধীরে সূর্যোদয়ের আলো এসে পড়ছে। নির্মল বাতাস বইতে শুরু করেছে দিগন্তের দিক থেকে।

বাবর অত্যন্ত কোমল প্রশান্ত কণ্ঠে প্রায় ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল, হ্যালো।

অপর দিক থেকে জবাব এলো, এখন পৌন একটা বাজে।

বাবলি! বাবলি! বাবলি!

নামটা বারবার উচ্চারণ করেও তৃপ্তি হলো না বাবরের। যেন এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে টেলিফোনের তারের ভেতর দিয়ে তার ঈষৎ কম্পিত দুটো হাত বাবলির শ্যামল মুখটাকে আদর করতে লাগল।

বাবলি তুমি জেগে আছ ? কী করছ বাবলি ? কোন ঘরে টেলিফোন ? বাবলি, তুমি রাগ করেছ ? আমি এগারটায় টেলিফোন করেছিলাম।

মিথ্যে কথা।

তুমি টেলিফোনের কাছে ছিলে ?

বাবলি তার উত্তর করল না।

ছিলে তুমি টেলিফোনের কাছে ?

আপনি মিথ্যে কথা বলেন।

হাসল বাবর। বলল, হ্যাঁ মিথ্যে বলেছি। তোমাকে মিথ্যে বলে দেখলাম কেমন লাগে। তুমি আমাকে বকবে না বাবলি ? বকো না ? আমি খুব খারাপ। আমি খুব খারাপ লোক। তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।

জি না, আমি আপনার জন্যে বসেছিলাম না।

টেলিফোন তোমার ঘরে ? ঘুমুচ্ছিলে ? আজ জান, সারাক্ষণ তোমার কথা মনে পড়েছে। মনে হয়েছে জীবনের সবচে' ভাল একটা দিন আমার আজ। এই দিনটার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছিল। বাবলি! তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। কাল আসবে ?

না।

এসো না কাল ?— আচ্ছা, পরশু সকালে। কলেজ যাবার পথে।

না।

তুমি খুব রাগ করেছ। এত রাগ করতে নেই। আমি তোমার ভাল চাই। তুমি কত বড় হবে।

কত নাম হবে তোমার। তোমার বিয়ে হবে। আমি তোমার বাড়িতে বেড়াতে যাব। আচ্ছা, আমি গেলে আমাকে কী খেতে দেবে ? —বল। বল ? বাবলি ? —না, তুমি সত্যি রাগ করেছ। আমাকে একবার বকে দাও। বাবলি ? সত্যি একটা জরুরি কাজে এমন আটকে গেলাম, তাছাড়া টেলিফোনটাও খারাপ ছিল, এই একটু আগে ঠিক হয়েছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে। বিশ্বাস কর।

আপনি মনে করেন, আমি ছেলে মানুষ, না ?

যাক, কথা বললে তাহলে। আমি ভাবলাম, আর কোনোদিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

আপনি মনে করেন, আমি কিছু বুঝি না ?

তা কেন ? তুমি সব বোঝ। তুমি সব বোঝ বলেই না আজ তোমাকে এত আদর করলাম। আসবে না কাল ?

টেলিফোন আপনার খারাপ ছিল না।

তুমি রিং করেছিলে নাকি ?

না।

তাহলে কী করে বুঝলে ?

হ্যাঁ, করেছিলাম।

আমি বাসায় ছিলাম না এই তো ? বাইরে আটকে গিয়েছিলাম। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সাহেব এসেছেন তার সঙ্গে কিছু আলোচনা ছিল। উনি কালকেই ইয়োরোপ যাচ্ছেন। আবার দশদিন পর ঢাকায় আসবেন। তোমার জন্যে একটা মজার জিনিস আনতে দিয়েছি তার কাছে।

চাই না আমি আপনার জিনিস।

কেন ? এত রাগ করলে আমি কোথায় যাব বলতে পার ?

যেখানে আপনার খুশি। আপনার কত জায়গা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিন্তু তারা আমার আপন নয়।

আমিও আপনার কেউ না।

তুমি আমাকে টেলিফোন না করার জন্যে যে শাস্তি দেবে তাই নেব।

আমি আপনাকে টেলিফোন করতে বলিনি।

আচ্ছা শোন, এসব টেলিফোনে হয় না। কাল তুমি এসে আমাকে খুব করে বকে দিয়ে যাও। আসবে না ?

কোনোদিন আর আসব না।

কেন ?

জাহেদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

কবে ?

আজ।

আমার এখান থেকে যাবার পর ?

হ্যা।

কেমন আছে ও ?

মিথ্যেবাদী। আপনার সঙ্গে ওর সোমবারেও দেখা হয়েছে।

তাই বলে কেমন আছে জিগ্যেস করতে নেই আজ ?

আপনার চিঠি দেখলাম।

হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এলো বাবরের। বলল, দেখলে ?

হ্যাঁ।

ও দেখাল ? জাহেদা তোমাকে দেখাল ?

যে ভাবেই হোক, আমি দেখেছি।

তারপর ?

ঘটনার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বাবর বলল, তারপর কী ?

আবার কী ? আপনি কোনোদিন আমাদের বাসায় আসবেন না। যদি আসেন ভাইয়াকে সব বলে দেব।

বেশ, আসব না।

আপনি, আপনি একটা ইতর। আপনি মানুষ না। আপনি সব পারেন। টেলিফোন রাখার শব্দ শুনল বাবর।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। তাকিয়ে রইল বাতির দিকে। কেমন একটা অস্পষ্ট রামধনু বাতিটা ঘিরে স্থির হয়ে আছে। কোথায় যেন সে শুনেছিল, এটা একটা ব্যাধি— বাতির চারদিকে এই রামধনু দেখাটা। কালকেই একবার চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এই যে মাঝে মাঝে মাথাটা একটু টিপ টিপ করে এটাও বোধহয় এই চোখেরই জন্যে। কিন্তু সে তো সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পায়। পড়তে পারে। নাকি, বর্ণকানা হয়ে যাচ্ছে ?

বাবর হাসল। বর্ণকানা ? মন্দ কী ? লালকে বেগুনি দেখবে। সবুজকে নীল। আমরা কি বর্ণের সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা এই দুটো চোখ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি ? আমি একটা গাছের পাতাকে যতটুকু সবুজ দেখি, যে সবুজ দেখি, আরেকজন কি ঠিক তাই দেখে ?

আজ হুইস্কিটা একটু বেশি হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, পরপর দু'দিন দুটো মেয়ে প্রায় একই কথা বলল। বাবর কোনো কারণ খুঁজে পায় না, কেন লতিফা তাকে ঐ কথাগুলো বলেছে। কেন সে লেখাপড়া ছেড়ে বিয়ের কনে হতে চলেছে ? আর জাহেদাই বা কী রকম ? চিঠিটা বাবলি দেখল কী করে ? কী লিখেছিল সে চিঠিতে ? কথাগুলো মনে আছে ? না। বক্তব্যটা মনে পড়ছে, শব্দগুলো মনে নেই। বাবলি দেখেছে চিঠিটা। দেখেছে ? না, জাহেদা দেখিয়েছে ? জাহেদা কেন হঠাৎ দেখাতে যাবে ? তাহলে জাহেদা কি তার সাথে যাবে না ? জাহেদা তো বলেছিল, যাবে। তারা দু'জন এক সঙ্গে উত্তর বাংলা যাবে।

খেলারাম, খেলে যা। বাবলি জেনেছে, জানুক। কাল যদি বাবলি তার বাসায় আসে তাতেও

আশ্চর্যের কিছু নেই। ঐ বয়সের মেয়েরা বরং আসব না বলেই আসে। না বলে হ্যাঁ করে। বাবলি এলে, কাল তাকে আর সে ছাড়বে না। শুধু আদর নয়, চুমো নয়, কথা নয়। বাবলিকে সে কাল সোজা বিছানায় নিয়ে যাবে।

বাবর শুধু এই কথাটা ভুলে গেছে, বাবলি স্পষ্ট বলে দিয়েছে, সে আসবে না। বোধহয় হুইস্কির জন্যে তার এখন বিশ্বাস করতে কোনো বাধা হচ্ছে না যে বাবলি কাল আসবে।

বাবর টের পায় আবার তার দু'পায়ের মাঝখানে উত্তাপ বাড়ছে। বড় হচ্ছে। তার দেহকে ছাপিয়ে উঠছে আয়তনে। বাবর উপুড় হয়ে শুল। শাসন মানল না। তবু বড় হতে লাগল। উত্তাপে উত্তেজনায় যেন সেখানে ছোট ছোট ড্রাম বাজানোর কাঠিতে বাড়ি পড়তে লাগল। সৃষ্টি হতে লাগল একটা দ্রুত লয় ছন্দের। লয়টা দ্রুত থেকে আরো দ্রুত হতে লাগল। চোখের ভেতরে বাবলিকে সে দেখতে পেল স্পষ্ট। নির্বাক। নগ্ন। কাছে, আরো কাছে। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তাকে অনুভব করতে লাগল বাবর।

আরো কাছে।

বাবলি এখন তার দেহের সঙ্গে এক। আর যুগলে যেন বাজছে সেই ছোট ছোট ড্রাম। দোকানে দেখা খেলনা ড্রাম। নীল রং চারদিকে। মাঝখানে একটা উজ্জ্বল লাল রেখা। বৃত্তাকারে ঘুরছে নীল, লাল, নীল। আবার নীল, আবার লাল, আবার নীল। ঘুরতে ঘুরতে রং দুটো একাকার হয়ে গেল। বাজনার দ্রুত লয় যেন বাবরের অস্তিত্বকে অতিক্রম করে এখন হঠাৎ শেকলকাটা পাখির মত উড়ে গেল ঊর্ধ্বে আকাশে, শূন্যে। উজ্জ্বল রোদে পুড়ে যেতে লাগল বাবরের চোখ। সে দু'হাতে সজোরে চেপে ধরল তার উত্তপ্ত অধীর দ্রুত স্পন্দিত শিশ্ন। এবং তৎক্ষণাৎ এক বহু আকাঙ্ক্ষিত, মন্ত্রোচ্চারিত, খরচৈত্রের বৃষ্টির আবেগে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে নেবে এলো অন্ধ, অজস্র শাস্ত্রে বর্ণিত চল্লিশ দিন-রাত্রির প্রান্তর পাহাড় ডোবান মুখর জলধারা। বাবর ভেসে যেতে লাগল স্খলিত একটা সবুজ পাতার মত।

দিনের প্রথম কাজ ব্যাংকে যাওয়া। হতরন সাহেবের মেয়ের গহনার দরুন সাড়ে ন' হাজার তুলতে হবে। চেক কাটতে ভুলে সাড়ে দশ হাজার লিখে ফেলল বাবর। ভুলটা আর সংশোধন করল না। সাড়ে দশ হাজারই তুলল। এক হাজার নিজের কাছে থাকবে। এত টাকা এক সঙ্গে সাধারণত নিজের জন্যে রাখে না, আজ রাখল। বাবর ঘটনাচক্রে বিশ্বাস করে। কে জানে, কখন কী হয়, কোন কাজে লাগে। নোট নেবার সময় বাবর পুরনো নোটই পছন্দ করল। কিন্তু এমনভাবে পুরনো নোট সে চাইল যেন কারো সন্দেহ না হয়। হতরন সাহেবকে পুরনো নোট দেয়া তার জন্যে, বাবরের জন্যে, উভয়ের জন্যেই নিরাপদ। কেবল নিজের নোটগুলো নতুন দশ টাকায় নিল সে।

ম্যানেজার সাহেব জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার বাবর সাহেব। এক সঙ্গে হঠাৎ এত টাকা ক্যাশ দরকার পড়ল?

একটা জমি কিনব। আজ বায়না হচ্ছে।

তাই নাকি? কোথায়?

বনানীতে।

মোনায়েম খাঁর বাড়ির পাশেই নাকি? বলে ম্যানেজার খ্যা খ্যা করে হাসলেন, উচ্চাঙ্গের

একটি রসিকতা করছেন। বাবরও তার জবাবে তারই মত খ্যা খ্যা করে হাসল ইচ্ছে করে। ম্যানেজার তা দেখে আরো সুধা ঢেলে উচ্চগ্রামে এবার খ্যা খ্যা করে উঠলেন। বাবর ব্যাংক থেকে বেরুল।

হঠাৎ মনে হলো, খবরের কাগজে কি হতরন সাহেবের নাম বেরিয়েছে? মোড় থেকে কাগজ কিনে তন্নতন্ন করে দেখল সে। তা, সাসসপেণ্ড অফিসারদের নামের লিস্ট আজও বেরোয়নি। তার মানে আর একটা দিন ভদ্রলোক এই রোজার দিনে দারুণ উৎকণ্ঠায় ভুগবেন। এ হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরের নাটক। বাবর হাসল।

হতরনের বাড়ির সামনে এসে তাকিয়ে দেখল চারদিক। না, সন্দেহজনক কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। টাকাটা খবরের কাগজে মুড়ে সে তরতর করে সিঁড়ে বেয়ে উঠে কলিং বেল টিপল। অপেক্ষা করল। কেউ সাড়া দিল না। আবার বেল বাজাল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দরজা খুলল না কেউ। বেলটা আবার টিপতে যাবে দরজা ফাঁক হলো। দেখা গেল হতরন সাহেবের নিশিজাগা চেহারা।

বাবর বলল, এই যে। এবং খবরের কাগজের মোটা মোড়কটা হাতে তুলে দিল তাঁর। বলল, এতে আছে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ফিরে এলো গাড়িতে। আবার চারদিকে দেখল। একটা লোক গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে দূরে। আই বি-র লোক? আচ্ছা, দেখাই যাক। বাবর একটা সিগারেট বের করে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াবার ভাণ করল। তারপর লোকটার কাছে গিয়ে বলল, দেশলাই আছে?

লোকটা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। দেশলাই বার করে দিল বাবরের হাতে। না, গোয়েন্দা হলে এতটা কৃতার্থ হতো না। বাবর সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে ফিরে গেল, আয়নাটা একটু ঘুরিয়ে দিল যাতে লোকটাকে দেখা যায়। খুব ধীরে গাড়ি চালাল সে। কিছু দূর গেল। দেখল লোকটা এবার চারদিক দেখে গাছতলায় বসল প্রস্রাব করতে।

যাঃ বাবা। এই ব্যাপার? সেই জন্যে লোকটাকে অমন উসখুস করতে দেখা গিয়েছিল? বাবর গাড়ির গতি বাড়িয়ে পলকে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল তখন।

ঘড়ি বলছে, দশটা দশ। জাহেদা নিশ্চয়ই এখন হোস্টেলে নেই। ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার। প্রথমত, বাবলি কী করে তার চিঠি দেখল। দ্বিতীয়ত, উত্তর বাংলায় জাহেদা যেতে রাজি কি-না। এই দুটো ব্যাপার পরিষ্কার করা দরকার।

হোস্টেলের দারোয়ানকে সে জিগ্যেস করল জাহেদার কথা।

আচ্ছা দাঁড়ান, দেখে আসি।

শিগগির।

আরেকটা সিগারেট ধরাল বাবর। পায়চারি করল খুব ছোট পরিসরে। গাছপালার মাথায় আলোর নাচন দেখল। তখন ফিরে এলো দারোয়ান।

রুমে নেই।

ও। আচ্ছা। এলে তাকে বলবে— না থাক, আমি আবার আসব। বাবর এয়ারপোর্টে এলো। সকালে ঘুম থেকে এত দেরি করে উঠেছিল যে, নাশতা খাবার সময় ছিল না। খিদেও ছিল

না তেমন। এখন প্রচণ্ড খিদে করে উঠল। সে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসল। আলতাফের প্লেন সকাল পৌনে আটটায় ছেড়ে গেছে। আলতাফ কি কাজগুলো ঠিক মত গুছিয়ে আসতে পারবে ? ভ্রুকুঞ্চিত করে ভাবল খানিক বাবর। এখন সময় খুব সুবিধে যাচ্ছে না। হুতরন সাহেব কাজটা দেবেন বলেছিলেন, তিনি নিজেই এখন কাৎ। এর আগে একটা কাজে বিশেষ কিছু থাকেনি। আজ সাড়ে ন'হাজার টাকা অমনিই চলে গেল। না দিলেও পারত। আলতাফ না দিতেই বলেছে। কিন্তু তার যে কী হলো, হঠাৎ মনে হয়েছিল টাকাটা না দেয়া খুব বড় রকমের অন্যায় হবে।

অনুতাপ বাবরের স্বভাববিরুদ্ধ। যারা অনুতাপ করে তারা এগোয় না। অনুতাপ একটি শিকলের নাম। কী করলাম সেটা বড় নয়, কী করছি সেটাই বিবেচ্য। বিলেতে থাকতে একটা নাটক দেখেছিল বাবর। তার একটা কথা এখনো মনে আছে তার। মেয়েটি জিগ্যেস করেছিল, আমি কোথায় ? ছেলেটি তার উত্তরে বলেছিল, অতীত এবং ভবিষ্যতের মাঝখানে, যেখানে তুমি আগেও ছিলে, এখন আছ এবং পরেও থাকবে। অসংখ্য বর্তমানের গ্রন্থনা আমাদের জীবন।

রুটির ওপর পুরু করে মাখন লাগাল বাবর। আবার সন্তর্পণে সমস্ত মাখন চেঁছে তুলে ফেলল। এমনিতেই মোটা হয়ে যাচ্ছে সে। এত মাখন খাওয়া কাজের কথা নয়। পোচ করা ডিম দুটিকে মনে হলো যেন কোনো সর্পনারীর স্তনযুগল। বাবর কাটার আঘাতে তা ভাঙলো। গড়িয়ে পড়ল গাঢ় হলুদ রস, যেন এক জণ্ডিস রোগাক্রান্ত মানুষের বীর্য যা শীতল রক্ত মানুষের জন্ম দেবে।

এই উপমাটা আলতাফকে একদিন সে নাশতা খেতে খেতে বলেছিল। তারপর থেকে সপ্তাহখানেক নাকি আর আলতাফ ডিমের পোচ মুখে তুলতে পারেনি।

আলতাফ বলেছিল, তোমার একটা বড় দোষ কি জান ? তুমি সেক্স ছাড়া কিছুই ভাবতে পার না। সর্বক্ষণ ঐ এক কথা ভাবছ, সব কিছুতেই ঐ এক জিনিস দেখছ।

কেন নয় ? মানুষের জীবনে বড় সত্য কী বল ?

আলতাফ বলেছিল, তুমি বল।

আসলে আলতাফ অতশত বোঝে না। হিসেবটা বোঝে। আসবাব-পত্রের শখ আছে। আর মা বলতে অজ্ঞান।

বাবর বলেছিল জীবনে একটা ঘটনাই সত্য। তা হচ্ছে মৃত্যু।

বলে যাও।

মৃত্যু কীসে সম্ভব ?

সব কিছুতেই। অসুখে-বিসুখে, ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে আত্মহত্যায়, আর কত কিছুতে।

আমি তা বলছি না। মূলত মৃত্যু দু'প্রকারে আসতে পারে। এক ক্ষুধায়। আর এই কাজটা যাকে ভাল বাংলায় যৌনসঙ্গম বলে, তার অভাবে।

ক্ষুধায় না হয় মানুষ মরে স্বীকার করি, কিন্তু ঐ কাজ না করলে মানুষ মরবে কেন ? বহু চিরকুমার আছে। পথে ঘাটে।

আমি ব্যক্তিবিশেষের কথা বলছি না। মনে কর যদি কোনোক্রমে আজ গোটা মানুষের মধ্যে যৌনসঙ্গম বন্ধ করে দেয়া যায়, তাহলে ? নতুন মানুষ জন্মাবে না। এক পুরুষ পরে পৃথিবীতে মানুষ নামে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে না।

তোমার সব অদ্ভুত কথা।

অদ্ভুত শোনালেও অবাস্তব নয়। আমি বলছিলাম ক্ষুধা আর যৌনজীবন মানুষকে যুগ থেকে যুগ বংশ থেকে বংশ আবিষ্কার থেকে আবিষ্কারে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার দুটি শক্তির নাম। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো শক্তি নেই। আমি যেমন ক্ষুধাকে জয় করবার জন্যে কাজ করছি, তেমনি ঐ দ্বিতীয়টার জন্যেও সময় দিচ্ছি।

বাবর পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

আহার্যে সে আজকাল আর আগের মত স্বাদ পায় না। ক্ষুধা হয় কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে না। খেতে বসে কিন্তু ডিশ পছন্দ হয় না। আগে কত অল্প সময়ে মেনু দেখে বলে দিতে পারত— এইটে খাবে। এখন মেনু নিয়ে দীর্ঘ সময় কেটে যায়, মনস্থির করা যায় না। আগে এমন হতো ক্ষুধা বোধ হবার মুহূর্ত থেকে স্পষ্ট দেখতে পেত, চোখের সমুখে খাদ্যের ছবি। কল্পনায় উত্তপ্ত সুঘ্রাণ এসে নাকে লাগত তার। এমনকি পরিবেশটাও ভেসে উঠত চোখে— টেবিল, সাদা চাদর, সবুজ ন্যাপকিন, ঝকঝকে প্লেট, বুদবুদ জড়ান ঠাণ্ডা পানি। এখন সেই প্রখর মনটা আর নেই। কোনো রেস্তোরাঁই পছন্দ হয় না তার। কোনো সার্ভিসই যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক বলে মনে হয় না। বকশিস দেয়াটা বাহুল্য বোধ হয়।

এখন সে মাত্র একটি সিকি বকশিস করেছে।

আবার সে এলো জাহেদার হোস্টেলে। দারোয়ান তাকে দেখে এগিয়ে এলো। বলল, আপা এখনো ফেরেনি।

আমি জানি।

হোস্টেলের সঙ্গেই কলেজ। বাবর গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে কলেজের মাঠে গিয়ে থামল। এই কাঠবাদাম গাছটা তার ভারি পছন্দ। কেমন শান্ত, সহনশীল, শীতল, ছেলেবেলার বন্ধুর মত। বাবর একটা সিগারেট ধরাল। তাকিয়ে রইল অজস্র সচ্ছল ডালপালার দিকে। আলতাফ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো কাজ নেই। পিণ্ডি থেকে কাজ ঠিক মত গুছিয়ে আনতে পারবে কি-না ও, তাই বা কে জানে। বরং সে নিজে গেলেই পারত। কিন্তু যাতায়াতটা বেশি পছন্দ করে আলতাফ, হোটেলে থাকা, ট্যাকসিতে করে ছুটোছুটি করা ফেরার সময় বাড়ির জন্যে জিনিসপত্র কেনা। বাবরের জন্য গতবার ও সুন্দর একটা স্কার্ফ এনেছিল। লাল জমিনের ওপর সবুজ কলকে তোলা। ঠিক এই বাদাম গাছটার মত সবুজ। আর সবচে' বিস্ময়কর যে, কোনো গাছে এক মাত্রার সবুজ থাকে না, অসংখ্য মাত্রার সবুজ মিলে একটা বর্ণের সৃষ্টি হয়। কাছে এলে, একটা একটা করে পাতা লক্ষ করলে তবে বোঝা যায় প্রকৃতির এই কারিগরিটা। এদিক থেকে মানুষের সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিল আছে। অমিলও কি নেই ? কাছে এলেও মানুষের সব রং তো চোখে পড়ে না।

আমাকে কে কতটুকু জানে ? বাবর ভাবল এবং হাসল। বাবর কি সেই জন্যেই এমন একেকটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যাতে আরো অচেনা হয়ে যায় অপরের কাছে ? এতে সে মজা পায়। মনে মনে হাসার সুযোগ হয় আরো। নিজেকে এক নির্বোধের পৃথিবীতে

চতুর কোনো যাদুকর বলে মনে হয় তার।

আমি জীবনের যাদুকর এক নির্বোধ পৃথিবীতে।

বাক্যটা নিজের কাছেই খুব চমকপ্রদ মনে হলো বাবরের। তার কবরের ওপর লিখে দিলে হয়। বাবর যেন চোখেই এখন দেখতে পেল তার কবর, তার মাথার মার্বেলে লেখা ঐ পরিচিতি, ঐ ঘোষণা, ঐ শব্দ সমূহের অন্তরালে প্রবহমান অট্টহাসি।

আরেকটা সিগারেট ধরাল সে। সিগারেটেও আজকাল আর তেমন স্বাদ নেই। কত রকম ব্রাণ্ড বদলেছে, দেশী, বিদেশী, কিন্তু কোনোটাই তাকে তার ক্রীতদাস করতে পারেনি। এখন সে যে সিগারেট খাচ্ছে তার নাম একজন জলদস্যুর নামে রাখা, যে নিউইয়র্ক শহরের পত্তন করেছিল বলে জানা যায়।

কোথায় একটা ঘণ্টা বাজল। নড়েচড়ে বসল বাবর। চোখে কালো চশমা পরে নিল। হাত দুটো জড় করে রাখল স্টিয়ারিংয়ের ওপর।

না, জাহেদাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে টুপটাপ করে পড়তে থাকা ফুলের মত মেয়েরা সবুজ মাঠটাকে ভরে ফেলল। কেউ দাঁড়াল। কেউ হাসল। কেউ কেউ একজোট হবার জন্যে হাত টানাটানি করতে লাগল। কেউ অন্য ক্লাশে ঢুকল। এর মধ্যে জাহেদা কই ? বাবরের চোখের সমুখে লাল নীল সবুজ হলুদ বেগুনি সাদা কালোর নৃত্য চলছে অত্যন্ত মন্থর তালে। জাহেদা আজ কী রংয়ের জামা পরেছে কে জানে ? জাহেদার একটা নীল জামা আছে তার ভারি পছন্দ। আজ যদি সেই নীল জামায় তাকে দেখা যায়, বাবর নিজেকেই একটা শর্ত দিল, আজ তাহলে সে ঠিক এগারটায় জাহেদার কথা মনে করতে করতে ঘুমুতে যাবে।

আবার সব ফাঁকা হয়ে গেল। মেয়েরা আবার তাদের পরের ক্লাশে গিয়ে বসল। আবার শুধু রইল সে। তার সিগারেট আর কাঠবাদাম গাছটা। ছেলেবেলার মত আবার একা হয়ে গেল সে।

সে না হয় জাহেদাকে দেখতে পায়নি। জাহেদাও কি তাকে দেখেনি ? দেখে এগিয়ে এলো না কেন ? রাগ হলো তার। ক্রমশ এই বিশ্বাসটা হতে লাগল যে, জাহেদা তাকে দেখেও কাছে আসেনি।

তখন আর বসে থাকা গেল না। চাপা আক্রোশটাকে প্রচণ্ড গতিতে রূপান্তরিত করে সে বেরিয়ে গেল কলেজ থেকে। শুনুক জাহেদা তার গাড়ির শব্দ, শুনুক ক্লাশে বসে থেকে। জাহেদা তার গাড়ির শব্দ চেনে। কতদিন এমন হয়েছে হোস্টেলে গাড়ি রাখতে না রাখতেই ছুটে এসেছে সে।

আপনার গাড়ির আওয়াজ পেলাম।

পৃথিবীর সমস্ত শব্দ শহরের এই বিভিন্ন গ্রামের কোলাহল সমুহ এখন ছাপিয়ে উঠুক তার গাড়ির শব্দ, বধির করে দিক যে দেখেও কাছে আসে না, বইয়ের পাতায় চোখ রেখে যে নিস্তব্ধ ক্লাশে বসে থাকে এবং নীল জামা পরে চিত্ত হরণ করে।

খেলে যা, খেলারাম খেলে যা।

আপিসে এলো বাবর। এয়ারকন্ডিশন করা নিজের কামরায় ঢুকতেই শরীরটা যেন স্বচ্ছন্দ

ঝরঝরে হয়ে গেল, তার ভারি আরাম বোধ হলো। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কফি বানাতে বলল।

কোনো টেলিফোন ?

না।

কেউ এসেছিল ?

না।

ডকুমেন্টগুলো সব ফটোস্ট্যাট করা হয়ে গেছে ?

জি।

একতাড়া ডকুমেন্টের ফটো-নকল নিয়ে এলো রহমান। প্রত্যেকটা ভাল করে দেখল। তারপর নিজ হাতে আলমারিতে বন্ধ করে রাখল। জিগ্যেস করল, আলতাফ একটা করে কপি নিয়ে গেছে তো ?

হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে অ্যাটাচিতে তুলে দিয়েছি।

আজকের কাগজগুলো দিন।

কফি খেতে খেতে প্রত্যেকটা কাগজ দেখল বাবর। কাগজ দেখা মানে দেশ বিদেশের খবর দেখা। ওটা দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় পর্যায়ের জিনিস। প্রথমে সে দেখে দু'য়ের পাতায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপন। কোথায় সরকারি বেসরকারি কে কোন কাজ করতে চাইছে, কোন যন্ত্র চাইছে, কোন নির্মাণের জন্যে আহ্বান জানিয়েছে।

না, আজ কিছু নেই। কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পিয়নকে ডেকে বলল, টেবল এত এলোমেলো থাকে কেন ? লাল নীল পেন্সিল নেই কেন ? পেন্সিল কাটা হয়নি কেন ? পেপার ওয়েট উপুড় হয়ে আছে কেন ? কেন ? কেন ? কেন ?

নিঃশব্দে বেয়ারা সব ঠিক করতে থাকে, ত্রস্ত হাতে সাজায় গোছায়, পেন্সিলগুলো সরু করতে নিয়ে যায় কম্পিত হাতে।

বাবর উঠে পায়চারি করে। একবার জানালার কাছে। স্বচ্ছ শাদা পর্দার ভেতর দিয়ে নিচে রাজপথ দেখা যাচ্ছে। হারমোনিয়ামের চাবির মত দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি গাড়ি। এত ওপর থেকে পেট্রল পাম্পটাকে মনে হচ্ছে অতিকায় একটা লিপস্টিক। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল বাবর।

জাহেদা কি তাকে দেখেনি। কাঠবাদামের গাছটার নিচে দাঁড়ালে কলেজের যে কোনো কোণ থেকেই চোখে পড়ার কথা। কিম্বা নাও পড়তে পারে। হয়ত জাহেদা লাইব্রেরীতে গেছে। কমনরুমে আছে। অথবা বান্ধবীদের সাথে টুক করে বেরিয়ে চীনে দোকানে এসেছে খাবার খেতে। চায়নিজ খেতে ভারি ভালবাসে জাহেদা।

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একটা তাগিদ অনুভব করল বাবর সেই রেস্তোরাঁয় যাবার জন্যে। বেরুতে যাবে এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

হ্যালো।

বাবর সাহেব ?

বিরক্ত হলো বাবর। ব্যাটা হতরন আবার টেলিফোন করতে গেল কেন ? তাকে তো তার মেয়ের গহনার দরুন টাকা দেওয়াই হয়েছে।

সরি, বাবর সাহেব নেই।

তবে যে এর আগে যিনি বললেন আছেন।

ছিলেন, বেরিয়ে গেছেন।

কখন আসবেন ?

জানি না।

বাসার নম্বর কত ?

বাবর ঠাস করে টেলিফোন রেখে দিল। কামরার বাইরে এসে রহমানকে বলল, লাইন দেবার আগে শুনে নিতে পারেন না আমার কাছে ?

সার উনি তো---

আমি জানি উনি কে। উনি হলেই লাইন দিতে হবে কোনো মানে নেই।

আচ্ছা স্যার।

বাবর বেরিয়ে গেল। রহমান কী করে জানবে ভেতরে কত কী হয়ে গেছে। হতরন এখন আর তাদের কোনো কাজেই আসবে না।

লিফটে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখে নিল বাবর। মাথার বাঁ পাশে চুল সরে গিয়ে এক চিলতে টাক বেরিয়ে পড়েছে। হাত দিয়ে টেনে দেবার চেষ্টা করল। ফলে আরো ফাঁক হয়ে গেল। হেয়ার স্প্রে ব্যবহার করার দোষই এই। চুল ভারি হয়ে যায়। কবার ফাটল ধরলে আর রোধ করা যায় না। ক্রমশ বাড়তেই থাকে। আর স্প্রে না দেয়া পর্যন্ত এই অবস্থা। বাসায় যাবে ? কিন্তু জাহেদা যদি চায়নিজ থেকেও বেরিয়ে যায় ?

বাবর উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালিয়ে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল। না, নেই। ফ্যামিলি রুমে উঁকি দিয়েই বুকটা হিম হয়ে গেল তার। নীল কামিজ পরে জাহেদা বসে আছে। এক পা এগুল। তখন পেছন ফিরে দেখল মেয়েটা। উঃ, কী বীভৎস চেহারা। ঈশ্বর তুমি এখনো আছ স্বীকার করি। পেছনটা অবিকল জাহেদার মত দেখতে।

যাবার উদ্যোগ করতেই বাটলার সসম্ভ্রমে জিগ্যেস করল, বসবেন না স্যার ?

না। পরে কখনো।

একবার ভাবল তাকে জিগ্যেস করে, এই রকম বর্ণনার কোনো মেয়ে আরো কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে এসেছিল কি-না। পরে অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে আর থামল না। সোজা গাড়িতে বসে দম নিল। সিগারেটও ফুরিয়ে গেছে।

কন্টিনেন্টালে সিগারেট কিনতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা বই। এর আগেও বহুদিন চোখে পড়েছে। আজ যেন বিশেষভাবে পড়ল। বইটার নাম 'যুদ্ধ নয় প্রেম : জ্বলন্ত ভিয়েতনাম'। ঘন কালো চকচকে প্রচ্ছদে গাঢ় লাল রংয়ে লেখা MAKE LOVE NOT WAR — শেষ শব্দটা অজস্র খণ্ডে খণ্ডিত। হাসল বাবর, যেমন সে মাঝে মাঝেই হাসে, একা হাসে।

মিসেস নফিস তাকে বলেছিল, আপনি ও রকম হাসেন কেন ?

কই, নাতো।

আপনি হয়ত লক্ষ করেননি। ভালই দেখায়।

কথাটা শোনার পর থেকে কয়েকদিন চেষ্টা করেছিল বাবর হাসিটাকে সংযত করতে। বদলে আরো বেড়েছে। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে সে। আবার হাসল। কিনল বইটা। বলল সুন্দর একটা প্যাকেট করে দিন।

উপহার দেবেন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু ব্রাউন প্যাকেট ছাড়া যে নেই। সরি স্যার।

ঠিক আছে। খোলা থাক।

বইটা নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল।

সুলতানা বলল, আরে আপনি ? কী মনে করে ? হঠাৎ ?

এই এলাম।

ও তো অফিসে গেছে।

জানি। বাবলিও তো কলেজে ?

হ্যাঁ। বসবেন না ?

না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেদিন বাবলি বলছিল ভিয়েতনাম সম্পর্কে খুব ইন্টারেস্টেড। জানতে চায়। এই বইটা ওকে দেবেন।

আচ্ছা।

আর বলবেন, ফেরত দিতে হবে না। ওকে দিলাম।

পেলে খুব খুশি হবে। এক কাপ চা দিই ?

না দিলেই বাধিত করবেন।

সুলতানা ভেঙ্গে পড়ল হাসিতে। বলল, কথা শিখেছেন বটে! আচ্ছা বাবলি এলেই বইটা দেব।

দেবেন। চলি। আবার আসব। এসে অনেকক্ষণ গল্প করব। চলি তাহলে।

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাবর তাকিয়ে দেখল পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সুলতানা। গালের এক পাশে রোদ এসে পড়েছে ছোট্ট একটা চৌকো বিস্কুটের মত। তেমনি সুস্বাদু দেখাচ্ছে। সুলতানা মন্দ নয় দেখতে। আরেকবার তাকে দেখল বাবর এবং চোখে পড়তে পড়তে বিদায়ের হাসি ফুটিয়ে তুলল। যেতে যেতে মনে পড়ল বাবলিদের ঘরে একটা বড় ছবি আছে। সেখানে গালে গাল ঠেকিয়ে হাসছে সুলতানা আর বাবলি। বাবলিকে যদি চুমো দিয়ে থাকি তাহলে তা সুলতানার গালেই দেয়া হলো। ল্যাজে ল্যাজে জোড়া দিয়ে বর্ধমান যাওয়া আর কী ? না, হাসি নয়। ল্যাজে ল্যাজে জোড়া দিয়েই কত কী হয়ে গেল। লতিফাকে চিনল তো ঐ করে। জাহেদাকেও। ম্যাজিকের বাক্সের মত। একটার পেট থেকে আরেকটা। শেষ নেই। অনন্ত। এক মেয়ের মারফত আরেক মেয়ে। এক মেয়ে থেকে আরেক মেয়েতে।

একেক সময় বাবরের মনে হয় আসলে ওদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। জাহেদা, বাবলি,

লতিফা, টুনি, রিক্তা, জলি, পপি, সুষমা, মমতাজ, আয়েশা, ডেইজি— সব এক। এক মাপে এক ছাঁচে, এক রংয়ে বানানো। পেছন থেকে কতদিন সে একজনকে আরেকজন মনে করেছে। চুলের সেই একই বিন্যাস, কাপড়ের সেই একই নকশা, কথার সেই একই ঢং। এমনকি যাদের সঙ্গে তার কখনও আলাপ হয়নি, পথে ঘাটে ভিড়ে, বাজারে দেখা, তারাও ঐ ওদের মত। ওদের ভাবনাগুলোও যেন এক। এক তাদের প্রতিক্রিয়া। এক তাদের পছন্দ।

কেবল একটা তফাৎ আছে। খোলা গায়ের গন্ধটা। কারো গায়ে লেবুর গন্ধ। কারো গায়ে দৈয়ের। খবর কাগজের। বন্ধ সবুজ পানির। মিষ্টি কফ-সিরাপের। পনিরের। কী করে যে ঐ বিচিত্র বিভিন্ন বস্তুর গন্ধ যে ওরা সংগ্রহ করেছে কে জানে। রিক্তার পিঠে মুখ রাখলেই তার মনে হতো সদ্য খোলা খবরের কাগজে সকাল বেলা নাক ডুবিয়ে আছে সে। জিগ্যেসও করেছিল, কাগজে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছ নাকি?

না, নাতো। কেন বল তো।

এমনি।

কী যে সব অদ্ভুত কথা। খবর কাগজ! হি হি হি।

আয়েশাকে সে বলেছিল, আজ নিশ্চয়ই দৈ খেয়েছ।

কী যে বলেন। দৈ আমি কবে খাই? দৈ খেলেই আমার গায়ে চাকা চাকা দাগ হয়।

কিন্তু দৈয়ের গন্ধ পাচ্ছি যে।

তাহলে আপনি খেয়েছেন।

আজ অন্তত বছরখানেক দৈ খাওয়া দূরে থাক, চোখে দেখিনি। সত্যি দৈয়ের গন্ধ পাচ্ছি।

যান ঠাট্টা ভাল লাগে না।

আয়েশা খুব রাগ করেছিল। আয়েশা এখন কোথায়? গেল বছর খুলনা থেকে একটা চিঠি দিয়েছিল, তারপর চুপ? একবার গেলে হতো খুলনায়। নিশ্চয়ই জাঁদরেল একটা গিন্নী হয়েছে আয়েশা। স্বামীকে একেবারে নখে করে রেখেছে। মেয়েদের এক উচ্চাশা স্বামীকে নখের ডগায় রাখা আর পরপুরুষকে পায়ের তলায়।

যা খেলে যা।

আরেক বার যাবে জাহেদার কলেজে?

এবার কেমন যেন একটু সংকোচ হতে লাগল তার। ব্যাটা দারোয়ানটা লম্বা লম্বা সালাম দেয়। ঘুঘুর মত চোখ রাখে। গলায় আবার একটা রূপোর ক্রুশ। যিশু হে, তোমার দুঃখ আমি অঙ্গে ধারণ করে এই পাপের পৃথিবীতে মৃত্যুর আশায় বসে আছি— এই রকম একটা নির্মীলিত ভাব।

আচ্ছা, এই শেষবার যাওয়া যাক। না পেলে তখন আবার ভাবা যাবে। বাবর উলটো দিকে গাড়ি ঘোরাল কলেজের উদ্দেশে।

দারোয়ান নেই। গাড়িটা পথের উপর রাখল বাবর। তারপর ধীরে ধীরে ফটকের কাছে গেল। ফটকটাও বন্ধ। শুধু পেটের কাছে চোরদরোজার পাল্লাটা কুকুরের জিভের মত ঝুলে

আছে। ঢুকবে ?

বাবর অতি কষ্টে চোর-দরোজার ভেতর দিয়ে নিজেকে চালান করে ওপারে নিয়ে গেল। মেরুদণ্ড খাড়া করতেই মুখোমুখি হয়ে গেল এক সহাস্য শুভ্রবসনা সিসটারের।

ইয়েস ? কী প্রয়োজন ?

মাননীয় ভদ্র মহিলা কী এক কৌশলে চোখে ভ্রূকুটি এবং ঠোঁটে হাসি একই সঙ্গে সৃষ্টি করে জিগ্যেস করলেন। এঁরা আবার কিছু কিছু বাংলাও জানেন। বাবর এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল— বাংলায় জবাব দেবে না।

সে তার সবচে' মার্জিত ইংরেজি বের করে বলল, প্রয়োজন খুবই সামান্য। আমি আপনারই একজন ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সিসটারও এবার ইংরেজিতে শুরু করলেন।

কে সে ?

নাম বললে চিনবেন ?

এখানে আমাদের সব মেয়েকেই চিনি।

চোর-দরোজা দিয়ে ঢুকে এখন পিঠটা টনটন করছে। বাবর বাঁ হাতে একবার বহু সহস্র বছর আগে খোয়ান ল্যাজের শূন্যস্থলে টিপে ধরে বলল, জাহেদা।

ও জাহেদা ? বি.এ সেকেন্ড ইয়ার ? হোস্টেলে থাকে ?

হ্যাঁ। সেই বটে।

আপনি তার কে হন জানতে পারি ?

অবলীলাক্রমে বাবর বলল, আংকল।

মায়ের দিক থেকে না বাবার দিক থেকে ?

মায়ের দিকে। বাংলা আমরা বলি মামা। বলে বাবর একটা বিগলিত বিশুদ্ধ হাসি দান করল সিসটারকে।

তিনি আবার জিগ্যেস করলেন, ভিজিটার্স বুকে আপনার নাম আছে ?

কী বিটকেল সিসটার রে বাবা। একেবারে শকুন মার্কা। বাবর হাসির নির্মলতা আরো কয়েকমাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে জবাব দিল, বুকে নাম না থাকবারই কথা ম্যাডাম। আসলে আমি কয়েক মাস হলো ঢাকায় এসেছি। এর আগে করাচিতে থাকতাম। জাহেদার মা আমি পিঠেপিঠি ভাই বোন। অনেকদিন জাহেদাকে দেখি না। কেমন আছে ও ?

ভাল আছে। আমাদের এখানে কেউ খারাপ থাকে না।

তা বটে। তা বটে।

কিন্তু আপনার চেহারা খুব চেনা ঠেকছে।

এই রে সেরেছে। নিশ্চয়ই বুড়ি তাকে আগেও এখানে আসতে দেখেছে। করাচি থেকে সদ্য আসার মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু বাবর জানে কী করে ফাঁদ থেকে বেরুতে হয়। সে মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল অনেকেই এই কথা বলেন। আসলে ব্যাপার কী জানেন, আমি টেলিভিশনে কাজ করি তো তাই।

ও আপনি টিভিতে কাজ করেন ? কী আনন্দজনক সাক্ষাৎ। খুব প্রীত হলাম। জাহেদা তো কোনোদিন বলেনি তার মামা টিভিতে আছে।

কী জানি। দেখা পাব ওর ?

ওর বলা উচিত ছিল।

সিসটার হাঁটতে শুরু করলেন শান বাঁধান লন চেরা পথ দিয়ে। বাবর পিছনে হাত যুক্ত করে বিনীত ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল তার পাশে।

ওর অবশ্যই বলা উচিত ছিল। আপনি হয়ত জানেন না, আমরা আমাদের কলেজে প্রতি মাসের শেষ শনিবার একটি করে সভার আয়োজন করি।

উত্তম করেন।

সে সভায় বিভিন্ন পেশার নেতৃস্থানীয় একজন করে নিমন্ত্রিত হন। তিনি মেয়েদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। এতে বাইরের জগৎ সম্পর্কে মেয়েদের একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। তাদের নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হয়।

অবশ্যই। এ এক চমৎকার ব্যবস্থা।

জাহেদা যদি বলত, আপনাকেও একদিন ডাকতাম বক্তৃতা করতে।

আপনি আমাকে এখনো বাধিত করতে পারেন।

বাবর সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না, শিকারী কুকুরের মত পেট সরু করে সে তাই ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে জানে কী থেকে কী হয়।

ঐ যে, ল্যাজে ল্যাজে জোড়া দিয়ে বর্ধমান যাওয়া।

সিসটার ঘুরে দাঁড়ালেন।

দয়া করে একটা বক্তৃতা দেবেন ?

আপনাদের আদেশের শুধু অপেক্ষা।

আমি চাই আপনার কাছ থেকে মেয়েরা জানুক, কীভাবে জনতার সামনে দাঁড়াতে হয়, কথা বলতে হয়, টিভি মাধ্যম হিসেবে কতটুকু উপযোগী, এই সব।

সানন্দে তা জানাতে চেষ্টা করব।

আপনার ঠিকানা ?

এই যে।

বাবর পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল। বলল, এটা আমার ব্যবসার কাজে লাগে। বেঁচে থাকার, এই মর দেহটার সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ব্যবসা করতে হয়। ব্যবসা আমার মৃত্যু, শিল্প আমার জীবন।

কী সুন্দর কথা। সামনের মাসের পরের মাসেই হয়ত আমরা আপনাকে ডাকতে পারি।

আমি অবশ্যই সময় করব।

আপনি জাহেদার সঙ্গে দেখা করতে চান ?

একবার দেখা হলে ভাল হতো। দরকার ছিল।

আসলে আমাদের নিয়ম কী জানেন ? বুকে নাম না থাকলে এবং নিকট আত্মীয় যদি না হন তাহলে প্রিন্সিপ্যালের কাছে দরখাস্ত করতে হয়। তিনি সন্তুষ্ট হলে কেবলমাত্র একবার সাক্ষাতের অনুমতি দিতে পারেন। তবে আপনার জন্যে—

না থাক। আমার জন্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভাঙ্গা হোক চাই না। এটি শিক্ষামন্দির। এর নিয়ম কানুন বড়রাই যদি না মানি কোমলমতি শিক্ষার্থীরাই বা কেন মানবে ?

এক জাহেদার জন্যে বক্তৃতার সুযোগ নষ্ট করতে চায় না বাবর। বক্তৃতায় আরো কত নতুন জাহেদার সঙ্গে আলাপ হবে। এখন বরং নিয়মনিষ্ঠ তরুণদের জন্যে উৎকণ্ঠিত একজন প্রৌঢ়ের অভিনয় করাই সুবিবেচনার কাজ। এতে মাননীয়া ভদ্রমহিলার চোখে তার মর্যাদা বাড়বে। চাই কী হয়ত সামনের মাসেই তাকে বক্তৃতা করতে ডাকবেন।

বাবর আরো যোগ করল, আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, যা নিজে করতে পার না, তা অপরকে উপদেশ করবে না।

মূল্যবান কথা।

অতএব থাক। আপনি জাহেদাকে বলবেন, আমি এসেছিলাম। পরে একদিন দরখাস্ত করেই দেখা করব। বিদায় দিন।

চোর-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাবর। হাসল। সিসটার জানে না, দরখাস্ত ছাড়াই তার মেয়েরা কত দেখা করছে। সে নিজেও কতবার এসেছে। আজ প্রথম মুখোমুখি হয়ে গেল বলে! তবে শিক্ষা-মন্দির কথাটা বলেছে যুৎসই। নিজেকেই বড় রকমের প্রশংসা করতে ইচ্ছে করল তার। বক্তৃতা দেবার জন্যে এখনিই তার জিভে চুলচুল করতে শুরু করে দিয়েছে।

সেই ঝোঁকে বেশ কিছুদূর হাওয়ায় ভেসে গেল বাবর। পাক মোটর্সের ক্রসিংয়ে দপ করে লাল বাতি জ্বলে উঠল। যেন হোঁচট খেল সে। হঠাৎ মনে হলো সিসটারের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কলেজের ভেতরে অনেক দূর চলে গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ছিল। জাহেদা কি একবারও তাকে দেখেনি ? দেখতে পায়নি ? কোনো ক্লাশ, কোনো কামরা, কোনো বারান্দা থেকে ? আর তার নিজেরও যে কী হয়েছিল, চারদিকে একবারও সে তাকিয়ে দেখেনি। আসলে ঐ বক্তৃতার প্রস্তাবটাই সব মাটি করেছে।

বোধ হয় জাহেদা ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। হয়ত বাবলিকে সে-ই চিঠিটা দেখিয়েছে। কেন এড়িয়ে যাচ্ছে ? কেন দেখিয়েছে ? দেখিয়েছে ? জাহেদাকে তো আজ পর্যন্ত সে ছুঁয়েও দেখেনি। শুধু কথা বলেছে। তাও শুধু সিনেমা, ফ্যাশন আর চেনা মানুষদের নিয়ে। কোনো ইঙ্গিত নয়, কোনো আমন্ত্রণ নয়, কিছু নয়। আর জাহেদার বয়স এমন কিছু নয় যে বাবরের মনে কী আছে তা বোঝার ক্ষমতা তার হয়েছে। চিঠিতে কিছু ছিল ? বাবলি কেন চিঠিটা পড়ে এমন হিংসুটে হয়ে উঠল ?

নাহ কিছু বুঝা যাচ্ছে না। চিঠির প্রত্যেকটি কথা মনে আছে তার। সে লিখেছিল হুবহু এই রকম, ইংরেজি থেকে বাংলায় তরজমা করলে দাঁড়ায়— প্রিয় জাহেদা, কয়েকদিন দেখা হয় না। এর মধ্যে এক কাণ্ড হয়েছে। সেদিন টুরিজম ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। সেখানে রাস্তার মানচিত্র দেখে মনটা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। ভাবছি উত্তর বাংলায় গাড়ি করে বেড়াতে গেলে

কেমন হয় ? তুমি যদি যেতে চাও তাই লিখলাম। পরে যে বলবে, আগে জানলে যেতাম, কেন তোমাকে নিলাম না ইত্যাদি, সে সুযোগ দিতে আমি রাজি নই। তাড়াহুড়া নেই, যখন খুশি জানিও। ভাল থেকো। মন দিয়ে পড়াশুনা কোরো। আমি মেধাবী ছাত্রীদের পছন্দ করি। পরীক্ষার ফল ভাল করে আমাকে সে আনন্দ দিও। ইতি বাবর।

ইতির পরে তোমারই লিখতে গিয়েও লেখেনি। কেবল জাহেদাই যে যাবে আর কেউ যাবে না, তেমন কোনো অঙ্গীকারও কোনো শব্দে নেই। তবু এ রকম হলো কেন ?

চমকে উঠল বাবর। পেছনে কয়েকটি অধীর হর্ণ বেজে চলেছে। কখন সবুজ হয়ে গেছে বাতি। আটকে রেখেছে সবার পথ সে। রাগ হলো বাবরের। দেবে না সে পথ। ভাণ করল তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। বনাত খুলে মিছেমিছি দেখল আর আড়চোখে পেছনে সবার বিরক্তি আর পাশ কাটিয়ে বেরুবার পরিশ্রম লক্ষ করল— করে তৃপ্তি পেল সে। বোঝ, বোঝ। তারপর বাতি আবার লাল হবার আগেই লাফ দিয়ে গাড়িতে বসে বেরিয়ে গেল সমুখে।

৮

সারা দুপুর সুরাপান করল বাবর।

হাঃ হাঃ। তুমি কোথায় আছ ? অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে, যেখানে আগেও ছিলে, এখন আছ এবং পরেও থাকবে। তার এক বন্ধুকে প্ল্যান্টার্স পাঞ্চ খেতে দেখেছে মাঝে মাঝে। সে নিজে কোনোদিন চেষ্টা করেনি। কোন কোন সুরা মিশিয়ে করে তাও জানে না। গেলাশের নিচের দিকটা লালচে, ওপরে সোনালি— অস্বচ্ছ, দয়াহীন একটি পানীয় বলে ওটাকে তার মনে হয়েছে। আজ সে আনিয়ে চেখে দেখল এবং পছন্দ করল!

আবার আনাল একটা। মাথার ভেতরটা নিমিষে শূন্য হয়ে গেল যেন। মনে হলো ফেরেশতার মত জ্যোতির্ময় তার দেহ। আদিতে ইবলিসও তো ফেরেশতাই ছিলেন। না, যদি আমাকে পছন্দ করতে বলা হয়, আমি হতে চাইব মিকাইল, বৃষ্টির ফেরেশতা, কিন্তু ইস্রাফিলের শিঙ্গা আমি চাই। ওটা আমার খুব পছন্দ। বাবর নিজেকে যেন দেখতে পেল ঘন কালো মেঘের অন্তহীন স্তরে জ্যোতির্ময় দেহে দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন নিরাভরণ মিকাইলের শিঙ্গা হাতে। নিচে লাল কার্পেটে আচ্ছাদিত নীল দেয়ালে জানালাবিহীন এক বিশাল হলে মেয়েরা আসে যায় এবং মাইকেল এঞ্জেলোর গল্প করে। সেই ছবিটা কি মাইকেল এঞ্জেলোরই আঁকা ? ঈশ্বরের প্রসারিত তর্জনী থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের হাত— ব্যগ্র একটি হাত। মাঝে সামান্য দূরত্ব কিন্তু কী অসীম, অলংঘনীয়; অনন্ত তো দেখা যায় না কিন্তু দেখা গিয়েছে এখানে। বিবর্ণ ব্রাউন একটি অনন্ত, ঈশ্বর ও মানুষের আঙুলের মাঝখানে।

সিগারেট কিনতে, প্রস্রাব করতে এবং বাইরের বাতাস নিতে বাবর বেরুল। সিগারেট কিনতে গিয়ে উল্টা দিকের কাউন্টারে দেখল সারি সারি প্রসাধনী সাজানো। মৃত সুন্দর সব শিশুদের বিয়োগ স্মরণে নির্মিত মিনারের মত দাঁড়িয়ে আছে লিপস্টিকের পেন্সিলগুলো। একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব সুসম। এক উচ্চতা, এক বেধ, এক নিস্তব্ধতা। প্রত্যেকটির মাথায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার বৃত্তাকার বর্ণলেখ। সেই সব বর্ণে মৃত শিশুদের সহাস্য দুর্বোধ্য

কাকলি প্রস্তরীভূত হয়ে আছে। দেখাতে বলল। যখন হাতে নিল তখন আর কিছু মনে হলো না। বাবর হাসল। এবং নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরেই একটা কিনল।

তারপর এলো বাথরুমে। ঝাঁঝাল অনিশ্চিত একটা সুগন্ধ বাতাসে ঝকঝকে শাদা শাদা পাত্র ন্যাপথলিনের বল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কোথায় যেন অপারেশন থিয়েটারের সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। তেমনি যেন মৃত্যুকে স্মরণ করায়। নিঃসঙ্গ করে তোলে সহসা। বোতাম খুলে চোখ তুলে তাকিয়ে বাবর দেখতে পেল নিজেকে ঝকঝকে আয়নায়। সমস্ত মুখ ফোলা ফোলা লাগছে, মনে হচ্ছে দীর্ঘ একটা স্বপ্নহীন ঘুম থেকে এইমাত্র উঠেছে সে। গালে হতে দিয়ে দেখল এরই মধ্যে কর্কশ হয়ে এসেছে, কালচে দেখাচ্ছে। গলার উপর হাত রেখে অনুভব করল সেখানে জীবন স্পন্দিত হচ্ছে টিপ টিপ করে। ঠোঁটের দু'পাশে ময়লা জমে শুকিয়ে আছে। বাবর পকেটে হাত দিল রুমালের জন্য। রুমালের বদলে হাতে ঠেকল সদ্য কেনা লিপস্টিকটা।

বের করল সে। আস্তে আস্তে তার ক্যাপ খুলে নিচের চাকতি ঘুরিয়ে দিতেই মাথা উঁচু করে উঠল লাল মাথাটা। ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব পাওয়া শিশ্নের মত। কার্তিকের কুকুরের মত। লাল, দৃঢ়, মসৃণ, আলো ঠিকরাচ্ছে, যেন আমন্ত্রণ করছে। বাবর তার নিচের দিকে তাকাল। শেষ বিন্দুটা এখনো মাথায় জ্বলজ্বল করছে, এখনো যথেষ্ট হয়নি বলে পড়ছে না। বাবর একটা আলতো টোকা দিয়ে ফোঁটাটাকে ফেলে দিল এবং সেখানে ছোঁয়াল লিপস্টিকের লাল মাথা। সঙ্গে সঙ্গে একটা শিহরণে কুঞ্চিত হয়ে উঠল যেন তার সমস্ত স্নায়ু। দ্রুত হাতে সরিয়ে নিতেই দেখল লাল দাগ পড়েছে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সে। বাবলির কথা মনে পড়ল। বাবলির ঠোঁটের রং ঠিক এই রকম— আবছা লাল।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল বাবর। না, কেউ নেউ। কান পেতে শুনল। না কেউ আসছে না। দ্রুত হাতে আয়নার ওপর লিপস্টিক দিয়ে লিখল MAKE LOVE NOT WAR তারপর পেছনে আরেকটা দরোজা খুলে কমোডের মধ্যে ফেলে দিল লিপস্টিকটা। চলে আসছিল, দেখে ক্যাপটা হাতেই রয়ে গেছে। সেটা আরেকটা কমোডে ফেলে দিল। সাদা পোর্সিলিনে লেগে টং করে শব্দ করে উঠল, যেন চমকে উঠল একটি নিস্তব্ধতা।

বইটা দেখে বাবলি দপ করে জ্বলে উঠবে! কিন্তু কিছু বলতে পারবে না। বাবর কল্পনা করে মজা পেল, ভেতরের চাপা আক্রোশে বাবলি শুধু এঘর ওঘর করছে। এক সময় হয়ত সে টেলিফোন করবে। টেলিফোন তাকে করতেই হবে। আজ রাতেই সে করবে। যাক, একটা ভাল চাল দেয়া গেছে। বইটা কিনে বড় উপকার করেছে সে নিজের।

কে একজন খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে বাথরুমে ঢুকল। লোকটার একটা হাত এখনি ট্রাউজারের বোতামে। বড্ড জোর লেগেছে বোধ হয়। প্রস্রাব বেরিয়ে যাওয়ার পর অনাবিল তৃপ্তিতে চোখ তুলেই লোকটা আয়নায় দেখতে পাবে MAKE LOVE NOT WAR হাঃ হাঃ। বাবর কি বাইরে অপেক্ষা করবে লোকটা ফিরে আসা পর্যন্ত ?

আচ্ছা, দেখা যাক না। লোকটা বেরিয়ে এলে তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে লেখাটা দেখে প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে।

চকিতে বাবরের মনে পড়ল শ্যারণ টেটকে হত্যা করার পর হত্যাকারীরা বড় বড় করে লিখে গিয়েছিল PIGS— শুয়োরের দল। সব শালা শুয়োর। উদ্দেশ্যহীন একটি হত্যা— একটি

হয়, এক সঙ্গে চারটি। যারা হত্যা করেছে তারা স্বীকার করেছে নিহতদের সঙ্গে আগে তাদের কোনো পরিচয় ছিল না। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম! হাঃ প্রথম দেখাতেই মৃত্যু, রক্তপাত, হত্যা। প্রথম দেখাতে যদি প্রেমে পড়া সম্ভব হয়, চিরকাল লোকে তো একে আদর্শ একটা ঘটনা বর্ণনা করে এসেছে, তবে প্রথম দেখাতেই কাউকে হত্যা করার ইচ্ছে হবে না কেন। আমাকে বোঝাও বাপ। হাঃ। যত সব কেঁদো শুয়োরের দল।

লোকটা বেরিয়ে এলো। মুখ তার লাল। বাবরের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় দ্রুত চোখ নামিয়ে এলোমেলো পায়ে প্রায় দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। যেন বাথরুমে লেখাটা সে-ই লিখেছে। আরে, আরে, মজা দেখ। এই রকম অনুভূতি, এই রকম প্রতিক্রিয়া প্রবল হলে লোকে যাজক হয়, নেতা হয়, বিশ্বপ্রেমিক হিসেবে অভিনন্দন কুড়োয়, তার জীবনী পড়ে পরীক্ষা পাশ করতে হয়। তোমার পাপে আমি অনুতপ্ত, লজ্জিত। তোমার দুঃখে আমি কাঁদি। তোমার পতনে আমি রক্তাক্ত হই। —ব্যাস, এই তো কথা! যীশুখ্রিষ্টও এই বলেছেন। হযরত সারারাত জেগে খোদার কাছে মুক্তি চেয়েছেন মানুষের।

হাঃ খেলে যা। খেলে যারে খেলারাম। খেলে যা।

বাবর বারে এসে বিল শোধ করে বেরুল। পকেটে এখনো একরাশ টাকা। সেই হাজার টাকা থেকে একশ' টাকাও এখনো পুরো ভাঙ্গেনি। হতরনকে একবার টেলিফোন করে দিতে হয়, আলতাফকে যেন না বলে গহনার টাকা সে দিয়েছে।

হ্যালো। আমি বাবর।

হতরন অধীর গলায় উচ্চারণ করলেন, আপনাকে অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। ওরা প্রথমে বলল আছেন, তারপর বলল—

বেরিয়ে গেছিলাম। টেলেফোন করেছিলেন কেন ?

কিছু না, এই এমনি। আপনাকে শুধু বলতে যে, বুলুর মা বলল...

বুলু কে ?

আমার মেয়ে। ঐ যার বিয়ে। বুলুর মা বলল, আপনাকে নাকি ঠিক মত আমি যত্ন করিনি। এক কাপ চা খেয়ে গেলেন না। আপনার মত দয়ালু, মহৎ লোক পৃথিবীতে আছে বলেই—

বাবর যোগ করল, পৃথিবী এখনো চলছে, তাই না ?

জি ? হতরন সাহেব যেন হকচকিয়ে গেলেন।

বাবর বলল, আমি আপনার কথাটাই শেষ করে দিলাম— আমার মত মহৎ, দয়ালু, না দয়ালু আগে বলেছেন, দয়ালু, মহৎ লোক পৃথিবীতে আছে বলেই পৃথিবীটা এখনো আছে, চলছে।

জি।

হতরন সাহেবের ঢোক গেলার শব্দটা পর্যন্ত স্পষ্ট শুনতে পেল বাবর। তখন বলল, আসব নাকি চা খেতে। বলুন তো আসি।

জি ?

হতরন এবার সত্যি সত্যি বিমূঢ় হয়ে গেছেন। বাবরের খুব মজা লাগল তখন।

কি আসব ?

আসবেন না কেন ? সে তো আপনার অনুগ্রহ।

নাহ, এখন আসব না।

কেন, কেন ?

এখন মাল খাচ্ছি।

জি!

মাল! মানে মদ। হুইস্কি। খেয়েছেন কখনো ?

জি, ওসব মানে আমি, আমার, আমি গোঁড়ামি পছন্দ করি না, তবে খাইনি কোনোদিন। খান আপনি খান। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম আপনার এই উপকারের কথা সারা জীবন মনে থাকবে। বলতে গেলে বাপের কাজ করলেন আপনি।

বাপের কাজ আর কাকে কাকে দিয়ে করালেন।

মানে ?

বাবরের ভারি রাগ হলো লোকটার ওপর। চটছে না কেন ? এখন যদি তাকে দুটো কড়া কথা শোনাত, টেলিফোন ঠাস করে রেখে দিত তাহলে বোঝা যেত তার পৌরুষ আছে। মানুষ এত ভীরু হয় কী করে ? নিজেকে এতটা বিকিয়ে দেয় সে কীসের অভাবে ? কীসের তাড়ায় ?

কিছু না, কিছু না। বলল বাবর।

নইলে বুলুর মা খুব মাইণ্ড করবেন। আমাকে বারবার করে বলে দিয়েছেন।

দুস সাহেব। আপনার বৌ মাইণ্ড করবে আস্তে বলুন। লোকে কী ভাববে।

জি।

যান, মাথা ঠাণ্ডা করে শুয়ে থাকুন গে। রোজার দিন।

জি।

কি, রোজা আছেন তো ?

জি, আছি। থাকব না কেন ?

পরকালের রসদ যোগাড় করছেন ?

কী যে বলেন।

এ কালের রসদ তো অনেক হয়েছে কী বলেন।

জি ?

না, কিছু না। আর শুনুন, আলতাফকে বলবেন না ঐ টাকার কথাটা।

জি না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তাকে বলবই না। বলার কোনো সুযোগই হবে না। যে উপকার আপনি করলেন—

তার বিনিময়ে এই ঠাস করে রেখে দিলাম টেলিফোন—মনে মনে বলতে বলতে লাইন কেটে দিল বাবর। ওহ, কৃতজ্ঞতা! ল্যাজ থাকলে আদুরে কুত্তার মত তিরতির করে এখন নাড়াত হতরন। কুঁই কুঁই করত আর পা শুঁকত। মানুষের আবার কত বড় কথা—আমরা পশু নই,

মানুষ। বাবার তাকে টাকা দিয়ে নিজের জন্য আর একটা প্রমাণ সংগ্রহ করল, মূলত পশুর সঙ্গে মানুষের কোনো তফাৎ নেই। বরং মানুষ পশুরও অধম। এতক্ষণ একটা পশুকে খোঁচালেও সে থাবা বের করে দাঁত খিঁচিয়ে উঠত। আর হতরন বেমালুম সব হজম করে গেল। মানুষ যে বুদ্ধি বিবেচনা রাখে! কত ধানে কত চাল হয় তার হিসেব বোঝে!—তাই।

বড় ক্লান্তি লাগছে। ঘুম পাচ্ছে বাবরের। মনে হচ্ছে, একটা দিন, একটা জীবন যেন অপচয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল আজ। খুব ধীরে গাড়ি চালিয়ে সে পথের পর পথ অতিক্রম করতে লাগল। পেছনে যার তাড়া আছে তাকে পথ করে দিতে লাগল ক্রমাগত। যাও সবাই এগিয়ে যাও। কারণ যাওয়াই তোমরা জীবনের মোক্ষ বলে মনে কর। সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া। সেই জন্যই পথ তোমরা ক্রমশ প্রশস্ত করে তৈরি কর, নইলে পাল্লা জমবে কেন? কাউকে পেছনে ফেলে যেতে কী সুখ মানুষ নামক জন্তু না হলে উপলব্ধি করা যায় না।

দিই আটকে?

একটা সাদা ফুরফুরে গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাকে খেলাবার ইচ্ছে হলো বাবরের। চট করে ডাইনে কেটে গতি শ্লথ করল সে। ঘ্যাস করে ব্রেক করল সাদা গাড়ি। ঘাড়ের 'পরে উঁচু করে বাঁধা খোঁপার নিচে এক মহিলা চালাচ্ছিলেন। বিরক্তিতে ভ্রুকুটি করে তাকালেন তিনি বাবরের দিকে। ভ্রুকুটি বোঝা গেল তার কালো চশমার ওপরে ভ্রু যুগলের আকস্মিক ঊর্ধ্ব বিন্যাসে। বাবর হাঃ করে হেসে নিজের গাড়ি সরিয়ে নিল। মহিলাটি তীরের মত বেরিয়ে গেলেন পেছনে সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। সমাজে অনুচ্চার্য একটি কথা মনে হতেই বাবর টিপে আপন হাসি সংবরণ করল।

বাসায় এসে দেখল দরোজা খোলা। খোলা মানে ভেজান। তালা লাগান নেই। অথচ কতদিন সে বলে গিয়েছে তালা লাগিয়ে রাখতে।

মান্নান, মান্নান।

পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিল ব্যাটা। ডাক শুনে চোখ ডলতে ডলতে এলো।

দরোজা খুলে ঘুমাচ্ছিস? কতদিন এক কথা বলব? কত দিন বলতে হবে?

স্যার—

ইডিয়ট! ফের যদি দরোজা খোলা দেখি পাঁচ টাকা জরিমানা করব। লাট সাহেব হয়েছ। লর্ড লিনলিথগো?

স্যার— মান্নান কী যেন বলতে চাইল।

চুপ! কোনো কথা শুনতে চাই না। আউট।

দরাম করে দরোজা লাগিয়ে ভেতরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বাবর। ড্রইংরুমের চারদিকে পর্দা টানা। প্রায় সন্ধ্যার মত অন্ধকার। তেমনি শীতল। দেয়ালে ঝোলান মাটির তৈরি নিগ্রো মেয়েটার মাথা। টেলিভিশনের ওপর একটা তেলাপোকা স্থানু হয়ে আছে। লাইফ ম্যাগাজিনের খোলা পাতায় হাঁ করে বিকট গোলাপি মুখ দেখাচ্ছে এক শিম্পাঞ্জী। ড্রামের দুই বীটের মাঝখানে ত্বরিত স্তব্ধতার মত টানটান হয়ে আছে সারাটা ঘর। বাবর একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। চোখ বুজল। তারপর ক্লান্ত পায়ে ড্রইয়ং রুমের দৈর্ঘ্যটা

কোণাকোণি পার হয়ে খাবার ঘরের পাশ দিয়ে জাল ঢাকা করিডোর অতিক্রম করে শোবার দরোজায় ঠেলা দিল।

নিভাঁজ বিছানা কোল বাড়িয়ে ডাকল তাকে। এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দেখল সে। ছবির মত সাজানো বালিশ, চাদরের হালকা নকসা, পায়ের কাছে সরু কার্পেটের কোমলতা, পাশে পরিষ্কার ছাইদান, ঘাড় নামানো পড়ার বাতি।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বাবর পায়ে-পায়ে মোকাসিন জোড়া খুলে ফেলতে ফেলতে। মুখ গুঁজে পড়ে থাকল ঠাণ্ডা পাউডার নীল বালিশের ওপর। উপলব্ধি করতে পারল, কী উত্তপ্ত হয়েছিল তার সারা দেহ এতক্ষণ। মুখ আরো গুঁজে দিয়ে, মায়ের কোলে শিশুর মত মাথা ঘষতে ঘষতে সে কয়েকটা অব্যয় ধ্বনি সৃষ্টি করল। তখন আরো ভাল লাগল। সে ঘুমে উচ্চারিত ছড়ার মত বলে যেতে লাগল— আহ, ইস, ইস, ইস।

মোজা জোড়া বড্ড অস্বস্তিকর লাগল তার পায়ে। সে মোজা খোলার জন্যে পাশ ফিরে হঠাৎ দরোজার দিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ হয়ে গেল। এক হাত রইল তার গুটিয়ে আনা পায়ের পাতায়, আরেক হাত পাঁজরের নিচে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে এলো কিছু বলার জন্যে কিন্তু বলতে পারল না। কুয়াশার মধ্যে সূর্যোদয়ের মত সেখানে ফুটে উঠতে লাগল, ধীরে, অতি ধীরে একখণ্ড চাপা হাসির আলো।

দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জাহেদা। জাফরান রংয়ের পাজামা পরনে। গায়ে সাদার ওপরে বড় বড় জাফরান সূর্যমুখী জামা। চোখে একটা ভয়।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। একটা শ্লথ বিদ্যুৎ যেন এর চোখ থেকে ওর চোখে ক্রমাগত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। কিম্বা একটি প্রজাপতি, বাগানে যে কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, কোন ফুলে বসবে।

বাবার উঠে বসল। বলল, তুমি ? তুমি কখন ?

বাবার উঠে গিয়ে জাহেদার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, কখন এলে ?

তাকে হাত ধরে বিছানার পাশে লাল চামড়ায় ঢাকা মোড়ার ওপর বসিয়ে, নিজে বিছানায় বসে, আবার বলল, কতক্ষণ এসেছ ?

এই প্রথম জাহেদকে সে স্পর্শ করেছে। এখন মনে হচ্ছে জাহেদার এক মুঠো রেণু তার আঙুলে জড়িয়ে গেছে। বাবর আঙুলগুলো একটার ডগায় আরেকটা তখন অনবরত ছোঁয়াতে লাগল।

জাহেদা বলল, সকালে।

সকালে এসেছ ? আমি যে তোমার কলেজে গিয়েছিলাম।

আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। নইলে সিসটার খোঁজ করবেন।

কী ব্যাপার ?

পাঁচটার পর সিসটার ঘরে ঘরে দেখে যে।

তা নয়। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে।

এলাম।

দুপুরে খাওনি ?

না।

এ ভারি অন্যায়। মান্নানকে বললেই পারতে। বলা উচিত ছিল তোমার। কেন বলনি ?

ও বলল আপনি আসবেন, এক্ষুণি আসবেন।

আমি খুব লজ্জিত, দুঃখিত। একটু খবর দিয়ে আসতে হয় না ?

জাহেদা চুপ করে রইল। তারপর বলল, ফ্রীজ থেকে একটা কোকাকোলা খেয়েছি।

যাহ্, শুধু ঐ খেয়ে দুপুর কাটায় নাকি ? আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি। এক মিনিট।

না, না, আমি এখন যাব।

অসম্ভব। আগে খাবে, তারপর।

না, যেতে হবে যে!

তাহলে চল, কোথাও বসে খাই।

বাইরে যাব না।

সেই তো বলছি। মান্নান এক্ষুণি পরোটা বানিয়ে দেবে। ওমলেট দিয়ে খাও। আচ্ছা, স্যাণ্ডউইচ। কোল্ড বীফ আছে। আমি নিজে করে দিচ্ছি।

জাহেদা অস্পষ্ট একটু হাসল।

বাবর বলল, বিশ্বাস হলো না বুঝি ? আচ্ছা, খেয়েই দ্যাখ আমি বানাতে পারি কি-না! দু'মিনিট লাগবে।

খাবার ঘরে গিয়ে রুটি কেটে চটপট দুটো বড় স্যাণ্ডউইচ বানাল বাবর। কেটলিতে পানি চাপিয়ে দিল। তারপর ট্রেতে স্যাণ্ডউইচ, গেলাশ, ঠাণ্ডা পানি বোতল সাজিয়ে শোবার ঘরে এসে দেখে জাহেদা নেই। হৃদপিণ্ড ধ্বক করে উঠল তার।

চলে গেল ?

ড্রইংরুমে এসে দেখে জাহেদা বড় সোফার মাঝখানে হাঁটু জড়ো করে বসে আছে। দেখে তার ভীষণ মায়া হলো। মনে হলো হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট একটি মেয়ে।

তুমি এখানে ?

জাহেদা আবার অস্পষ্ট ম্লান হাসল।

খাও। আগে খেয়ে নাও। তারপরে কথা। কফি হচ্ছে। কই খাও ? আচ্ছা আমি কফিটা দেখে আসছি।

দু'পেয়ালা কফি বানিয়ে ফেরত এলো বাবর। দেখল জাহেদা তখন সবে একটা স্যাণ্ডউইচের কোণ ভেঙ্গেছে মাত্র।

কেন, ভাল হয়নি ?

ক্ষিধে নেই।

তা বললে চলবে কেন ? খেতেই হবে। না খেলে রাগ করব। আমি নিজ হাতে বানালাম তোমার জন্যে।

খাচ্ছি।

খাও। হোস্টেলে তো আর খেতে পাও না।

কী যে বলেন। আমরা বাইরে থেকে কত কিছু আনিয়ে খাই।

কফি খাও। কফির সঙ্গে ভাল লাগবে। কী আশ্চর্য, সকালে এসেছ, আর আমি কলেজে খুঁজে এলাম। আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি এসেছ, আমার সামনে বসে আছ, আমি তোমার জন্যে স্যাণ্ডইউচ বানিয়েছি, তুমি খাচ্ছ। মাঝে মাঝে বাস্তব এত ভাল মনে হয় যে মনে হয় স্বপ্ন, বেশি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, পাছে নষ্ট হয়ে যায়। —কই আরেকটা রইল যে! ওটাও খেতে হবে। খাও। পারবে খেতে। তোমার কলেজে দু'বার গিয়েছিলাম। আমি বলি, জাহেদা গেল কোথায়। আর তুমি আমার এখানে বসে আছ। নিজেকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয় না। আরেকটু কফি দিই? দাও কাপটা দাও।

বাবর কাপটা নিয়ে খাবার ঘরে গেল। কাপের রীমে জাহেদার ঠোঁট থেকে আবছা রং লেগেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল বাবর। তারপর সেখানে ঠোঁট দিয়ে সমস্তটা রং তুলে নিল। মোমের মত মসৃণ লাগল এখন তার নিজের ঠোঁট। শিরশির করল সমস্ত শরীর। আবার সেই বিদ্যুৎ চলাচল করতে লাগল স্নায়ুতে। সে তাড়াতাড়ি কফি বানিয়ে ফিরে এলো জাহেদার কাছে।

বলল, বাবলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

এমন সাধারণ কণ্ঠে বাবর প্রশ্নটা করল যেন সিগারেট বের করে দেশলাই আছে কি-না জিজ্ঞেস করল।

জাহেদা উত্তর করল, বাবলি?

হ্যাঁ, ঐ যে তোমার বান্ধবী।

কাল এসেছিল।

কোথায়। হোস্টেলে?

হ্যাঁ।

ভাল আছে তো!

বোধ হয়।

বোধ হয় কেন?

কাল বড্ড মনমরা দেখলাম।

প্রেমে ট্রেমে পড়েছে নাকি।

দূর।

দূর কেন? এই বয়সে একটা প্রেমে না পড়লে কেমন কথা?

যান আপনি। কী যে বলেন।

তাহলে মনমরা দেখলে?

না, তাও ঠিক না। কেমন যেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকল। তারপর আমি সুপারের কাছে গেলাম বাড়ি থেকে টাকা এসেছিল, আনতে। এসে দেখি বাবলি নেই।

শুনলাম চলে গেছে।

শরীর খারাপ ছিল না তো ?

প্রশ্নটা শুনে জাহেদা ভীষণ লজ্জা পেল। এই বয়সের মেয়েরা শরীর খারাপ বলতে প্রথমেই একটা কথা বোঝে। তুলোর রোল চোখে দেখতে পায়। জাহেদা আড়চোখে একবার বাবরকে দেখল। তারপর বলল, না বোধহয়।

বাবর একবার ভাবল চিঠিটার কথা জিগ্যেস করে। আবার ভাবল, না, থাক। বাবলি যদি চুরি করে দেখে থাকে তাহলে জাহেদা খামকা বিচলিত হয়ে পড়বে। হয়ত তার সঙ্গে উত্তর বাংলায় যেতে রাজি হবে না। অথচ তাকে নিয়ে যাবে বলে মনে মনে পণ করে বসে আছে বাবর।

জাহেদা চুপচাপ কী যেন ভাবতে লাগল কফির পেয়ালা হাতে করে।

আরেকটা স্যাণ্ডউইচ দিই ?

না না।

চকোলেট খাবে ?

না।

আজ সব কিছুতেই না করছ যে।

কই, না।

বলেই হেসে ফেলল জাহেদা। আবার একটা 'না' বলেছে সে। বলল, আপনি কথা এত ধরতে পারেন!

যাদের পছন্দ করি তাদের কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি যে! তুমি বোধহয় আমাকে একটুও পছন্দ কর না।

কেন ?

উদ্বেগ ভরা চোখে জাহেদা তার দিকে তাকাল।

এই জন্যে বলছি যে, তুমি আজ কিচ্ছু বলছ না। শুধু আমি বলে যাচ্ছি।

জাহেদা চুপ করে রইল।

বাবর বলল, কি সত্যি কিনা, বল ?

জাহেদা বলল একেবারে অন্য কথা, যেন কথা বলে প্রমাণ দিতে চায় বাবর যা মনে করে তা ভুল। বলল, এসে পরপর দু'কাপ চা খেয়েছি। আপনার যত পুরনো ম্যাগাজিন ছিল সব পড়েছি।

এতক্ষণে বাবর বুঝতে পারল শিম্পাঞ্জির ছবিটা অমন খোলা পড়ে ছিল কেন ?

জাহেদা বলে চলল, যা ঘুম পাচ্ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ শুনি আপনি চেঁচামেচি করছেন। শুনে কী যে ভয় করতে লাগল। কোনোদিন তো আপনাকে উঁচু গলায় কথা বলতে শুনিনি।

লজ্জিত কণ্ঠে বাবর বলল, এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারিনে। কাজে কর্মে শুধু ভুল করে। না চেঁচিয়ে উপায় থাকে না। —তাই বুঝি দরোজায় লুকিয়ে ছিলে ?

লুকাইনি তো।

তবে তোমাকে দেখলাম না যে।

দেখবেন কী। আপনি তো এসেই দুম করে শুয়ে পড়লেন।

বাবর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তা ঠিক।

জাহেদা মুখ গোল করে বলল, যদি কোনো চোর হতো।

কী আর হতো। চুরি করে নিয়ে যেত।

মুখে ও-রকম বলা যায়। চুরি হলে তখন দেখতাম।

চুরি যে হয়নি তাই বা কী করে বলি ?

বলেই বাবর চকিতে দৃষ্টি গাঢ় করে তাকাল জাহেদার দিকে। জাহেদা একটু অপ্রস্তুত, একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। তবু জেদ করেই যেন বলল, কী চুরি হয়েছে আপনার শুনি ?

তখন কথাটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি আকস্মিকতার সঙ্গে বাবর বলে উঠল, আরে, লতিফার খবর রাখ ?

কে ?

লতিফা, লতিফা।

সেই যে আপনার ভাই-ঝি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার খবর শুনেছ ? সে বিয়ে করছে।

মেয়েরা বিয়ে করে নাকি ? তাদের তো বিয়ে হয়।

এটাকে বিয়ে করাই বলতে পার। ও নিজে সেধে বিয়ে বসছে।

কার সাথে ?

আমারই এক ভাইপোর সাথে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে।

ভালই তো। কবে বিয়ে ?

এই সামনেই। তোমরা একে একে এভাবে বিয়ে করলে আমার কী অবস্থা বল তো। মনে হয় বুড়িয়ে যাচ্ছি।

বারে! বয়স হলে বুড়ো হবেন না ?

তা ঠিক। না, ঠাট্টা নয়। তোমরাই আমার বয়সটা বাড়িয়ে দিলে। এই তো দ্যাখ না দু'দিন বাদে শাড়ি পরবে, তখন রীতিমত মহিলা। তোমাকে দেখে মনে হবে, নাহ সত্যি সত্যি সময় চলে গেছে।

আমি কোনোদিন শাড়ি পরব না।

কেন ?

এমনি। আমার ভাল লাগে না।

আমারো ভাল লাগে না। তুমি ঠিক বলেছ। তোমার এই জামাতে তোমাকে যা ভাল লাগে, শাড়িতে তার অর্ধেকও লাগবে না।

জি না। শাড়িতেও আমাকে মানায়। সবাই বলে। মাঝে মাঝে শখ করে পরি।

তোমার নীল জামাটা কই ?

কোন নীল জামা ?

সেই যে, যেটা পরলে তোমাকে খুব ভাল দেখায়। একদিন আমার সঙ্গে নিউ মার্কেটে বই কিনতে গেলে, সেদিন পরেছিলে।

ও, সেইটা।

তাহলেই দ্যাখ, বলেছিলাম না তুমি আমাকে পছন্দ কর না ?

এর মধ্যে ও-কথা কেন ?

এই জন্যে যে, পছন্দ করলে আমার কথাটা মনে থাকত। আমি যখন যা বলি মনে রাখতে।

জাহেদা চুপ করে রইল কথা খুঁজে না পেয়ে।

বাবর বলল, আচ্ছা, সে যাকগে। এই জাফরান রংটাও খুব মানিয়েছে।

নতুন বানালাম। আজকেই পরেছি।

কী কাপড় ?

সুতি।

দেখে তো অন্যরকম মনে হচ্ছে। বাহ্ দেখি।

বলে বাবর উঠে এসে জাহেদার কামিজের একটা কোণ হাতে নিয়ে দেখতে লাগল মনোযোগ সহকারে। আসলে, তার ভারি ইচ্ছে করছে আবার একটু স্পর্শ করতে। হাত সরিয়ে আনবার সময় ইচ্ছে করে একটু ছুঁয়ে দিল উরুটা। যেন একটা রাবার ফোমে এক মুহূর্তের জন্যে হাত রেখেছিল সে। হাতটা ফিরিয়ে এনে আপন চিবুকে ছুঁইয়ে রাখল সে।

জাহেদা বলল, আজকাল কত সুন্দর প্রিন্ট বেরিয়েছে।

বাবর আরেকটা সিগারেট ধরাল।

আপনি এত সিগারেট খান ?

কী করব ? এছাড়া আর তো নেশা নেই।

তাই বলে একটার পর একটা ?

তাছাড়া থাকি একা। সিগারেট বন্ধুর মত কাজ দেয়।

তা হোক। খাবেন না এত। এইতো আপনার এই ম্যাগাজিনেই পড়ছিলাম সিগারেট খেলেই ক্যান্সার হয়।

ক্যান্সার হলেই মৃত্যু, তাই না।

তাই তো।

মৃত্যু কীসে হয় না বল। আমার কোনোদিন মৃত্যু হবে না যদি এ ভরসা দিতে পার, ছেড়ে দেব সিগারেট।

সে ভরসা কেউ দিতে পারে ?

আসলে কী জান—

আবার বক্তৃতা দেবেন তো ? আপনাকে চিনি না ? থাক। আপনার যদি মরতেই ইচ্ছে করে,

খাবেন সিগারেট।

আচ্ছা, তুমি বলছ, তোমার কথা কি ফেলতে পারি? খাব আজ থেকে কম করে। এই এটা ফেললাম। আসলে আমার কথা হচ্ছে, যতক্ষণ বেঁছে আছি যা ভাল তাই করব। একবারের বেশি দু'বার তো বাঁচব না। এই সামান্য ক'দিনের জন্য কী হবে এত বিধিনিষেধ মেনে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে? যে লোকটা সিগারেট খায় না, কিম্বা শুধু সিগারেট কেন, যা করতে ইচ্ছে করে তা করে না সে যে আমার চেয়ে ভাল আছে, তার জীবন যে আদর্শ জীবন, সুখের জীবন তাও তো নয়?

বুঝি না বাবা আপনার কথা।

বুঝবে। বয়স হলে বুঝবে। এখন তো ছেলেমানুষ। বড় হও। তখন বুঝবে।

আমি এখন কিছু কম বুঝি না?

কী বোঝ।

কী আবার? সব কিছু। ক'টা বাজে দেখুন তো।

পৌনে পাঁচটা। তোমার ঘড়ি কী হলো?

বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। উঠি।

আর একটু বস।

উহুঁ। তাহলে হোস্টেল থেকে বের করে দেবে।

দিক, আমার এখানে এসে থাকবে।

আপনি মেয়েদের হোস্টেল খুলেছেন নাকি?

ভরসা দাও তো খুলি।

জাহেদা হেসে উঠল, বলল, মেয়েদের ঝামেলা অনেক। মাথার ঘিলু নাড়িয়ে দেবে। জিজ্ঞেস করবেন আমাদের দারোয়ানকে।

সে বেটা সেই জন্যই বোধহয় গলায় ক্রুশ বেঁধেছে।

জাহেদা দ্রুত স্লিপার পরে নিল। দরোজার কাছে গেল। গিয়ে একবার ইতস্তত করল।

বাবর বলল, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

ঘাড় কাত করে নীরবে হ্যাঁ বলল জাহেদা। আর সেই সঙ্গে ভারি উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। বাবর জিগ্যেস করল, কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি?

না।

তাও ভাল। আমি ভাবলাম চিঠিটা সুপারের হাতে পড়েছে বুঝি।

ও চিঠি পড়লেই কী।

আমিও তাই বলি। তবে তোমার কাছে শুনেছিলাম যে বেটি নাকি একটা শকুন। কেবল ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। চিঠি খুলে খুলে পড়ে।

এটা পড়েনি। কিন্তু—

কী কিন্তু?

যাব কেমন করে ?

আনন্দে লাফিয়ে উঠল বাবরের হৃৎপিন্ড। যাবে তাহলে জাহেদা। যাবে তার সঙ্গে। এত সহজে রাজি হবে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। খুশিতে প্রায় জড়িয়ে এলো তার উচ্চারণ। কোনো মতে বলল, যাবে কী করে মানে ? গাড়িতে যাবে।

সে নয়। হোস্টেল থেকে বেরুব কী করে ?

পারবে না ?

না।

কিছু একটা বলে ? মাত্র তিন চার দিনের জন্য।

তিন-চার-দিন!

হ্যাঁ। যেতে একদিন, আসতে একদিন, একদিন দু'দিন ঘোরাফেরা।

তাহলে থাক। অসম্ভব। বেরুনোই যাবে না।

খুব যাবে। আমি ব্যবস্থা করব।

কীভাবে ?

দ্যাখ না তুমি।

তবু শুনি।

আমি একটু ভেবে দেখি।

আসলে বাবর আগে থেকেই ভেবে রেখেছে কী করে জাহেদাকে সে হোস্টেল থেকে বের করবে। চিঠিটা লেখার সময়ই ভেবে রেখেছে সে।

বলল, ভেবে দেখি কেমন ? আমরা পরশু দিন সকালে রওয়ানা হবো। তুমি সকালে তৈরি হয়ে একটা স্কুটার ডেকে সোজা আমার বাসায় চলে এসো। আটটার মধ্যে। ঠিক আটটার সময় বেরুতে হবে। নইলে সন্ধ্যের আগে রংপুর পৌঁছন যাবে না।

উদ্বিগ্ন শংকিত চোখে নীরবে জাহেদা কথাগুলো শুনল। তার একটা মন রাজি হতে চাইছে না, আরেকটা মন কীসের আকর্ষণে যে এগিয়ে যাচ্ছে তা সে নিজেও জানে না, বারণও করতে পারছে না। কোনোমতে ঢোক গিলে সে শুধু উচ্চারণ করল, আচ্ছা।

পরশু আটটার মধ্যে।

আচ্ছা।

আমি পৌঁছে দিয়ে আসি হোস্টেলে ?

না।

আবার না বলছ ?

জাহেদা করুণ ভাবে হাসল। তখন আবার সেই রকম মায়া হলো বাবরের। তাকে আদর করতে ইচ্ছে করল বাচ্চা মেয়ের মত। বদলে বলল, আচ্ছা, মান্নানকে বলছি স্কুটার ডাকতে। ততক্ষণ বস।

জাহেদা সোফার এককোণে চুপ করে জড়সড় হয়ে বসে রইল। তার কান পথের দিকে।

কখন স্কুটারের শব্দ শোনা যায়।

বাবর বলল, এখুনি এসে যাবে স্কুটার।

বাবর তাকে গভীর চোখে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিকের প্রতিটি বস্তু যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল। রইল শুধু জাহেদার মুখ। সে মুখে জামার জাফরান রংয়ের বিচ্ছুরিত আভা। জাহেদার ঠোঁট নড়ে উঠল একবার। টলটল করে উঠল যেন রংটা। জাফরান রংয়ের লিপিস্টিক। একটু আগে তার থেকে খানিকটা লেগেছিল কফির পেয়ালায়। পেয়ালা থেকে নিঃশেষে তা বাবর তুলে নিয়ে নিয়েছে ঠোঁট দিয়ে। প্রত্যুত্তরে বাবরের ঠোঁটও যেন নেড়ে উঠল তার ইচ্ছার অপেক্ষা না করেই।

বাবর হাসল।

তখন জাহেদাও হাসল। তেমনি ভীত করুণ এক চিলতে হাসি। বলল, আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন ?

বাবর যেন কোনো কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করছে এমনি সুরে বলল, কাজে। কাজে ছিলাম, জাহেদা। ব্যবসার কাজে। এত কাজ। যদি কাজ না করতে হতো।

জাহেদা আবার হাসল। সেই রকম।

বাবর তখন বলল, তুমি যদি যেতে না চাও তো ঠিক আছে। উদ্বিগ্ন তীক্ষ্ণ চোখে জাহেদা তাকাল। তোমার অসুবিধে হলে থাক না। পরে কখনো যাওয়া যাবে।

পরে কেন ?

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেতে চাও না।

নাতো। কত কিছু দেখব। বাবা কোনোদিন কোথাও নিয়ে যাননি। যাব না কেন ? যাব।

অনেক কিছু দেখতে পাবে। বাংলাকে জানবে। তোমরা সব ইংরাজি পড়। দেশ চেন না। নিজের দেশ না চিনলে হয় ?

জানি।

সেই জন্যেই যাবার কথা যখন হলো, সবার আগে তোমার কথা মনে পড়ল। বাবা কোথাও নিয়ে যাননি তো কী হয়েছে ? তুমি বড় হয়েছ। নিজেই যাবে। শুধু বাংলা কেন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। আমার এক বান্ধবী ফ্রান্সে আজ তিন বছর—

বাইরে স্কুটারের শব্দ শোনা গেল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহেদা।

যাই।

এসো জাহেদা। পরশু আটটার মধ্যে ?

আচ্ছা।

আটটার আগেই এসো।

কী যেন ব্যবস্থা করবেন, বললেন না ?

বাবরের একবার ইচ্ছে হলো, বলে দেয়। বলবে ? না, থাক। এখন না বলাই ভাল। বলল, কাল ভোরে আমাকে টেলিফোন কোরো হোস্টেল থেকে। রাতটা ভেবে দেখি।

আচ্ছা।

জাহেদা স্কুটারে গিয়ে বসল। ড্রাইভার ভাবল, বাবরও বুঝি আসবে। বাবর তখন তাকে ইশারা করল যেতে। জাহেদা গলা বাড়িয়ে বলল, খোদা হাফেজ।

বাবর হাত নাড়ল। শূন্য ফটকে দাঁড়িয়ে ভাবল, মেয়েটা এত বিশ্বাস করে তাকে। হোস্টেল থেকে কী করে বেরুবে সেইটে জানার জন্যে সারাদিন এখানে বসেছিল। দ্বিতীয় বার অনুরোধ পর্যন্ত করতে হলো না।

বিশ্বাস ?

বাবর হাসল। বিশ্বাস বস্তুটাই আপেক্ষিক, এই উপলব্ধি জাহেদার এখনো হয়নি। বিশ্বাস একটা পণ্যের নাম। এর কিছু জাত স্বদেশে তৈরি হয়, কিছু বিদেশে, আমদানি করতে হয়, কিছু রফতানী করি। অবিকল একটা পণ্য।

ঘরে এসে জাহেদার পেয়ালাটা ছোঁ মেরে তুলে নিল বাবর। পেয়ালায় আবার রং লেগেছে, জাহেদার ঠোঁটের রং, জাফরান লিপস্টিক। বাবর দুই ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল সেখানে। সম্পূর্ণ রংটাকে গ্রাস করে নিল। ঠাণ্ডা কটু কফির তলানি দাঁতের ফাঁক দিয়ে মুখে ঢুকে গেল তার। কিন্তু সে ফেলে দিল না। পেয়ালার ভেতরে এখনো যেন জাহেদার নিঃশ্বাস ঘুরছে। তৃষিতের মত এক ঢোকে সবটুকু উচ্ছিষ্ট পান করল সে। তারপর বিহ্বলের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, একটা পোকা খাবার পর টিকটিকির মত স্ফীত স্তব্ধ হয়ে থেকে, সে টেলিফোনের কাছে গেল। দ্রুত পাতা উলটে বার করল রশিদ ট্র্যাভেল এজেন্সির নম্বর।

বাবর বলছি।

স্লামালেকুম স্যার, কী খেদমত করতে পারি ?

খেদমত ? এমন খেদমত করার সুযোগ তুমি আর কখনো পাওনি— মনে মনে বলল বাবর এবং হাসল।

কাল চাটগাঁয়ে যাব। কালই ফিরব। রিটার্ন টিকিট চাই।

কাল কখন ?

ধরুন, যাব দশটা এগারটা নাগাদ, ঘন্টাখানেক পরে।

আচ্ছা, আমি একটু পরেই জানাচ্ছি।

যে করেই হোক সিট দিতে হবে।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্যার।

ব্যবসার কাজে ভীষণ দরকার। না হলেই নয়। কাউকে ক্যান্সেল করিয়ে হলেও —

ও-কে স্যার।

টেলিফোন রেখে দিল বাবর। অধীর হয়ে পায়চারি করল বার কয়েক। হাঁ করে শিম্পাঞ্জির ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন এ জন্তু এর আগে সে কখনো দেখেনি। তারপর বসল ঠিক সেই জায়গায় যেখানে এতক্ষণ জাহেদা বসেছিল। এতক্ষণ বসে থাকার ফলে সেখানে একটা কুলোর মত গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। গর্তটা নিখুঁতভাবে মিলিয়ে সেখানে নিজের নিতম্ব স্থাপন করল বাবর। হেলান দিল সোফার পিঠে। পা টান করে দিল সমুখে। ভাবতে লাগল

জাহেদার কথা। আশ্চর্যজনকভাবে জাহেদার মুখটাকে মনে হলো অবিকল বটপাতার মত— তেমনি সবুজ, সপ্রাণ, পাতলা, তীক্ষ্ণধার।

সমস্ত কামরায় ঝনঝন তুলে বেজে উঠল টেলিফোন।

হ্যালো।

ওপার থেকে তখুনি সাড়া এলো না। বাবর আবার অধীর গলায় বলল, হ্যালো।

তখন বাবলির গলা শোনা গেল।

আমি বলছি।

বল।

চুপ করে রইল বাবলি।

কই, বল। আমি শুনছি।

এটা কী করেছেন ?

কোনটা ?

বই।

ওহ্ বই ? হ্যাঁ, বইটা বেশ ভাল, পড়।

নিজেকে খুব চালাক মনে করেন ?

কে না করে ? কেউ নিজে বলে, সে বোকা ?

বলে। চালাক যারা তারাই বলে। আর যারা বোকা তারা নিজেদের চালাক ভাবে। বুঝেছেন ?

তোমার বয়স হয়েছে।

তার মানে ?

তুমি বুদ্ধিমতির মত কথা বলতে শুরু করেছ। আমি খুব খুশি হলাম। আমার কাছে কাল না এলে আজ একদিনে এতটা বড় হতে না।

বইটা ফেরত নিয়ে যাবেন।

যদি না নিই ?

নিয়ে যাবেন।

আমি যা দিই ফিরিয়ে নিই না। বাবলি, তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। যদি সত্যি চাও, আমি আর কোনোদিন তোমাকে ডাকব না, তোমার কথা মনে করব না। আমি কখনো কারো ওপর জোর করি না। সেটা আমার স্বভাবই নয়। বাবলি, শুনছ ? হ্যালো।

হ্যালো। নিষ্প্রাণ গলায় বাবলি সাড়া দিল।

বাবর তখন আবার মুখর হলো, আমি অপর পক্ষের ইচ্ছার খুব বড় দাম দিই। আমার কোনো ইচ্ছা নেই। বলতে গেলে ইচ্ছা কী ?— তা আমি জানি না। বিশ্বাস কর। কাল যা হয়েছে তা মনে কর অন্য কারো জীবনে হয়েছে। সে তুমি নও, সে আমি নই। আর যদি মনে কর বইটা ফিরিয়ে দিলে তোমার ভাল লাগবে, দিও।

বাবলি চুপ করে রইল।

কিছু বল। কথাও বলবে না ? বেশ তো।

হ্যালো।

বল বাবলি।

আপনি— আপনি আমার এ কী করলেন ?

আমি তো কিছু করিনি।

আমিও তো নিজে কিছু—

আমি জানি। আমরা কেউ কিছু করিনি। হবার ছিল হয়ে গেছে। মনে কর একটা স্বপ্ন দেখেছ। খারাপ স্বপ্ন। আসলে এই অনুতাপ হওয়াটাই খারাপ। অনুতাপ কখনো করবে না। অনুতাপ করে চেহারা বদলান যায় না। তোমাকে একটা কথা বলি জীবনে কাজে লাগবে। অনুতাপ কখনোই করবে না। অনুতাপ জীবনের শত্রু। ভাল না লাগে, ভুলে যাবে। যা করতে ইচ্ছে হয়, তাই করবে। আসলে আমি জানি, তোমার মন বলছে আমার সঙ্গে আবার দেখা হোক। কিন্তু লোক-ভয়, সমাজের ভয়, কত রকম ভয় তোমাকে ভাবিয়ে তুলছে। বাবলি একদিন এসো। যেদিন তোমার ইচ্ছে ; যখন তোমার সময় হয়। আসবে ? বাবলি। আসবে ?

জানি না।

এও ভাল। ভুল জানার চেয়ে কিছু না জানা অনেক ভাল। এসো কিন্তু। মন খারাপ কর না। আজ পড়াশোনা কর না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। আমি হয়ত স্বপ্নে আসব।

কিছু বলল না বাবলি। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর টেলিফোন রেখে দিল সন্তর্পণে। ঘুমের মধ্যে খুট করে একটা শব্দ হলো যেন, আর কিছু নয়। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। বাতিটা জ্বেলে দিল বাবর। নানা আকারের ছায়া মুহূর্তে ইতস্তত সৃষ্টি হলো চারদিকে, নানা ঘনত্বের আলো। দেয়ালে নিগ্রো মেয়েটার মুখ যেন হেসে উঠল হঠাৎ। অকারণে বায়াফ্রার কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল সেই কথাটা বায়াফ্রার গোটা একটা পুরুষ ভুলে যাচ্ছে কী করে খেতে হয়, চিবোতে হয়, জিহ্বার ব্যবহার করতে হয়। নতুন করে তাদের শেখাতে হবে। আর এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আর উলঙ্গ দেহে যুদ্ধের মধ্যেও রমণীরা সেখানে গর্ভবতী হচ্ছে, জন্ম দিচ্ছে চক্ষুসার উদরসর্বস্ব শিশুকে। সেই সব শিশুকে কি শেখাতে হবে সঙ্গম কী করে করতে হয় ? উত্থিত শিশ্ন মুঠো করে ধরে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকবে তারা ?

না।

বাবর হাসল। আহার এবং সঙ্গম কাউকে শেখাতে হয় না। বায়াফ্রার ওরা ঐ চমকপ্রদ কথা ছেড়েছে নিছক সহানুভূতি আদায়ের উপায় হিসেবে। অর্থাৎ আমাদের খাদ্য দাও, আমাদের বাঁচিয়ে রাখ। অমন কাব্য করে না বললে আমার গোলার দরোজা আমি খুলে দেব কেন ?

কথা। শুধু কথা। কথা তার জীবিকা। কথা তার পন্থা। টিভিতে সে সুন্দর করে কথা বলে দুটো পয়সা আসে বলে। বাবলি জাহেদা ওদের সঙ্গে কথা বলে সঙ্গমে তাদের সম্মত করতে। সে যেমন চুরি ডাকাতি করে বাঁচতে চায় না, তেমনি ধর্ষণে বিশ্বাস করে না।

সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল বাবরের। নতুন বিবাহিত স্বামী স্ত্রীকে বলছে, দ্যাখ, চাঁদ উঠেছে, আকাশে কত তারা চিকমিক করছে, কী মিষ্টি বাতাস দিচ্ছে। স্ত্রী শুনে যাচ্ছে। স্বামী বলেই চলেছে, বাগানে ফুল ফুটেছে, আর দ্যাখ—। তখন তাকে থামিয়ে স্ত্রী উত্তর করল, বুঝছি, তুমি আমারে করবার চাও।

অশিক্ষিতা হলেও গল্পের এই নায়িকাটি বুদ্ধিতে প্রখরা। সে জানে কথার পরিণামে কী আসবে।

এতটুকু বুদ্ধি আমাদের অনেক নাগরিকই রাখেন না। পল্টনে যখন বক্তৃতার তুবড়ি ছোটান নেতারা, ক'জন বোঝে, পরিণামে নতুন উপায়ে শোষণই হচ্ছে বক্তার লক্ষ্য ?

রশিদ ট্রাভেল এজেন্সি থেকে টেলিফোন এলো।

স্যার, দশটা পঁয়ত্রিশে যেতে পারবেন, ফেরার সীট দুপুরে নেই, বিকেলেও নেই, লাস্ট ফ্লাইটে আছে, রাত সাড়ে ন'টায়। এতক্ষণ আপনার ফোন এনগেজড ছিল।

হ্যাঁ। তাহলে ঐ টিকিটই করে রাখুন। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কী নামে হবে ?

কেন ? আমার নামে।

ও-কে স্যার।

৯

পতেঙ্গা এয়ারপোর্ট থেকে সোজা শহরে এসে টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকল বাবর। একটা ফরম নিয়ে খসখস করে লিখল---কী লিখবে আগে থেকে ভাবা ছিল তার---

এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম

জাহেদা ইসলাম

সেইন্ট মেরি কলেজ হোস্টেল

ইস্কাটন, ঢাকা

ফাদার সিরিয়াসলি ইল, কাম শার্প।

— মাদার।

পয়সা গুণে দিল বাবর। গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, টেলিগ্রামটা আজকেই পাবে তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কখন পাবে ?

এই ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে।

ধন্যবাদ।

বাইরে বেরিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল বাবর হাসল। একটা সিগারেট ধরাল যত্ন করে। জাহেদা আজ সকালে টেলিফোন করেছিল। তখন তাকে সে বলেছিল এই রকম একটা

টেলিগ্রাম তার হোস্টেলে যাবে, তার অজুহাতে সে দিব্যি বেরিয়ে আসতে পারবে সুটকেস নিয়ে। তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল জাহেদা।

না, না, বাবার অসুখ বলে দরকার নেই।

দূর পাগল অসুখ বললেই সত্যি সত্যি অসুখ হয় নাকি ? ওসব কুসংস্কার।

যদি কেউ ধরে ফেলে।

কারো সাধ্য নেই। চাটগাঁ থেকে টেলিগ্রাম আসবে। তোমার বাবা তো ওখানেই থাকেন। কেউ ধরতে পারবে না। বলে বাবর আর বেশি সময় দেয়নি জাহেদাকে। চট করে যোগ করেছে, কাল আটটার মধ্যেই আসা চাই। কেমন ? এখন রাখি।

জাহেদাকে কেবল যেটা বলেনি তা হচ্ছে সে নিজে চাটগাঁ যাবে টেলিগ্রাম করতে।

একটা রিকশা নিল বাবর। বেশ মিষ্টি, স্বচ্ছন্দ, সুন্দর লাগছে সব কিছু। অনেকদিন পর চাটগাঁ আসা হলো। কেমন নতুন লাগছে সব। সাইনবোর্ড, মানুষ, গাড়ি, উঁচু নিচু পথ, বাতাস, রোদ— সব কিছু। কোন দিকে যাবে ? খানিক্ষণ ঘুরে বেড়ালে হয়। এখন আর কিছু করার নেই, ভাববার নেই। এখন শুধু অবসর। শুধু আলস্য।

বাবর রিকশা থেকে নেমে হাঁটতে লাগল।

আজ ঢাকায় ফিরে রাতেই গাড়িটা দেখেশুনে রাখতে হবে। লম্বা জার্নি। তেলও আজই কিনে রাখবে সে। মান্নানকে বলবে গাড়িটাকে একটা গোসল দিতে। অনেকদিন যত্ন নেয়া হয়নি। সেদিন ময়মনসিংহ থেকে ফেরার পথে লক্ষ করছিল ক্লাচে কেমন একটা শব্দ হচ্ছে চাপ দিলেই—অল্প বয়সী কুকুরের মত আর্তনাদ। কাল জাহেদার সঙ্গে দেখা হবে। কাল রাতে তারা থাকবে রংপুরে।

আজ শুধু অবসর। একটু ঘুমিয়ে নিলে হয়। হ্যাঁ, ঘুমুবে সে। এখন মোটে সোয়া বারোটা বাজে। রাত সাড়ে ন'টায় তার ফিরতি প্লেন। স্কুটার নিয়ে হোটেল শাজাহানে এলো বাবর। হাসল। বাবরের ছেলে হুমায়ূন। হুমায়ূনের ছেলে আকবর। আকবরের ছেলে শাজাহান। যোগাযোগ মন্দ নয়। বাবা তার নামটা রেখেছিলেন বাজা বাদশার নামে। বেঁচে থাকলে বুড়ো আরামে থাকতে পারত। সারা জীবন তো ইস্কুলে মাস্টারি করে গেছেন। আলস্য পরম শত্রু, ঊর্ধ্বমুখে পথ চলিও না, ইক্ষুরস অতি মিষ্ট— লেখ বাবারা, হাতের লেখা লেখ। এরপর আঁক কষতে হবে—তিন তিরিক্কে নয়, তিন চারে বারো। এরপরে ইংরেজি আছে— সান নেভার সেটস ইন ব্রিটিশ এম্পায়ার।

হাঃ। সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক।

রেজিস্টারে নাম লেখাল বাবর। রিসেপসনিস্ট চাবি নিল বোর্ড থেকে। তখন চোখে পড়ল বাবরের, একটা রুমের কার্ডে লেখা এম ডি ফিরোজ মাজমা। এ নাম তো গণ্ডায় গণ্ডায় থাকার কথা নয়।

সে জিগ্যেস করল, ভদ্রলোক ঢাকা থেকে এসেছেন ?

জি।

বিজনেসম্যান ?

জি, হ্যাঁ।

লম্বা ? ফর্সা মত ? গোঁফ আছে সরু ?

জি, তিনিই।

বাবর ওপরে এসে মাজমাদারের কামরায় নক করল।

অন্দর আও।

ভেতর থেকে মাজমাদারের উর্দুই শোনা গেল। দরোজা ঠেলে ঢুকল বাবর। দেখল ফিরোজ বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে তাস খেলছে, সমুখে এক ভদ্রলোক, মাঝখানে একরাশ টাকা খুচরো পয়সা।

আরে, আপনি ? আসুন, কখন এলেন ঢাকা থেকে ?

আজই। কাজ ছিল। তিন তাস ?

এই আর কী! সময় কাটানো। ইনি আমার বন্ধু নজমুল হক।

ভদ্রলোক যন্ত্রের মত হাত বাড়িয়ে দিলেন নিঃশব্দ।

বাবর বলল, বোর্ডে আপনার নাম দেখলাম। কবে এসেছেন ?

দিন চারেক হয়ে গেল।

ব্যবসার কাজে ?

তাতো বটেই। তবে কাজ শেষ। এখন একটু অকাজের ধান্দায় আছি। বলে চোখ খাটো করলেন ফিরোজ মাজমাদার। ব্যাখ্যা করলেন, মানে, বোঝেন তো ? একটু টেস্ট বদলানো। হক সাহেব বললেন ভাল ভাল জিনিস আছে, কোথায় যেন বললেন হক সাহেব ?

নজমুল হক বিকারহীন উচ্চারণ করলেন শিয়ালবুক্কা।

শিয়ালবুক্কা কী ? বাবর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

একটা জায়গা। রাঙ্গামাটি যেতে পড়ে।

অদ্ভুত নামতো।

হ্যাঁ। শিয়ালবুক্কা।

নজমুল হক উচ্চারণ করলেন না তো যেন শেয়ালের ডাক ডেকে উঠলেন। তারপর ঘোঁৎ করে একটা শব্দ তুলে তাসে মনোযোগ দিলেন।

ফিরোজ মাজমাদার বললেন, শিয়ালবুক্কায় নাকি খাসা পাহাড়ি মাল পাওয়া যায়। যেমন উরু, তেমনি দুধ, তেমনি শরীর। কি ?

ভালই তো।

খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে ফিরোজ গেলাশ চুমুক দিয়ে কাবার করলেন। বাবর এতক্ষণে দেখল একটা হুইস্কির বোতল টিপয়ের নিচে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

চলবে নাকি বাবর সাহেব ?

কী ?

হুইস্কি। যদি বলেন শিয়ালবুক্কায়ও হতে পারে। যাবেন ?

নজমুল হক আড়ে একবার দেখে নিলেন বাবরকে।

বাবর বলল, আপনিই যান।

ভয় পেলেন নাকি ? আরে আপনার ভয় কী সাহেব ? বিয়ে করেননি, আছেন বেশ। আমরা শালা বিয়ে করে পস্তাচ্ছি। নিত্য অসুখ বিসুখ। মেজাজ মাশাল্লা বাঁধিয়ে রাখার মত। দিন রাত্রির খ্যাচ খ্যাচ ফ্যাচ ফ্যাচ। শুয়েও সাহেব শান্তি নেই। শালা রোজগার করি কার জন্যে ? জায়গাটার নাম যেন কী হক সাহেব ?

শিয়ালবুক্কা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ শিয়ালবুক্কা।

ফিরোজ মাজমাদার গা দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়ার মত বার কয়েক নামটা উচ্চারণ করলেন। তারপর একটা গেলাশ নিয়ে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বাবরের হাতে দিয়ে বললেন, চলুন না ভাইসাব। বিকেলে যাব। হক সাহেবের গাড়ি আছে। রাতে থাকব। দুই ভাই মিলে খেলাধুলা করে আবার সকালে ফিরে আসব চলুন।

থাকগে।

আরে বললাম তো, বিশ্বাস না হয় হক সাহেবকে জিগ্যেস করে দেখুন না, কেমন খাসা জিনিস। পম পমপম। মাল নয় তো পশমি মোজা। যেমন গরম, তেমনি আরাম, কী বলেন হক সাহেব।

দ্বিগুণ মনোগোগের সঙ্গে নজমুল হক তাস শাফল করে চললেন। তারপর চূড়ান্ত গাম্ভীর্য সহকারে উচ্চারণ করলেন, মাল ভাল।

বললাম না ? চলুন মজা হবে।

নজমুল হক তাস দিলেন ফিরোজ মাজমাদারের হাতে। তিনি তাস রেখে দিলেন। থাক, পরে খেলব।

তখন নজমুল হক নিজেই খেলতে লাগলেন বধির এবং কালার একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে।

বাবর বলল, আপনার ব্যবসা কেমন চলছে বলুন মাজমাদার সাহেব ? ঢাকায় তো দেখাই হয় না।

ব্যবসার কথা বলবেন না। এসেছিলাম একটা ধান্দায়। যাওয়া আসাই সার।

কেন ?

টু পারসেন্ট থাকলেও বুঝতাম। এক পারসেন্ট হয় কি-না সন্দেহ।

চালিয়ে যান।

আল্লা ভরসা ভাইসাব আল্লা ভরসা। অটোনমি না আসা তক শান্তি নাই। আগাখানি আর পাঞ্জাবিরাই মধু খেয়ে যাচ্ছে, আর আমরা শালা বুড়ো আঙুল চুষে চুষে নৃত্য করে গেলাম।

শেখ মুজিব তো এবার পাওয়ারে আসবেন মনে হচ্ছে।

অটোনমি পাব তবে ?

ওঁর প্রোগ্রাম তো তাই।

আল্লার কাছে দোয়া করি, ভাইসাব। আমি শেখ মুজিবের পক্ষে। তার মত একটা বাঘের

বাচ্চা হয় না, আপনাকে এই বলে রাখলাম হক সাহেব। কী বলেন বাবর সাহেব ? ঠিক কিনা কন ? অত বড় কলিজাটা কার ?

বাবর শেষ চুমুক দিয়ে গেলাশটা খালি করল। সঙ্গে সঙ্গে ভরে দিলেন ফিরোজ মাজমাদার। ঢেলে দিতে দিতে বললেন, এই বলে রাখছি হক সাহেব, শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কারো বাকসে ভোট দেবেন তো আপনার সাথে আর কথা নাই।

নজমুল হক বিকারহীন কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, ইলেকশন হয় কি-না দেখেন।

হবে না মানে ? উরুতে চাপড় দিয়ে উঠলেন ফিরোজ মাজমাদার।

ভাসানীর কথাটা মনে রাখবেন। নজমুল হক তাসের দিকে চোখ রেখে বললেন।

রেখে দিন ভাসানী। অটোনমি চাই। অটোনমি না হলে রক্ষা নাই। আপনার মার্গেও বাঁশ, আমার মার্গেও বাঁশ। বুঝলেন ? শেখ সাহেব আছে বলেই দেশটা এখন চোখে দেখেন। কী বলেন ভাইসাব ?

বাবর হাসল। বলল, পলিটিকস আমি বুঝি না।

আঃ হা। ফিরোজ মাজমাদার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পলিটিকস না বোঝেন নিজের ভাত কাপড় তো বোঝেন ?

চুপ করেন, চুপ করেন। নির্মীলিত চোখে মৃদুকণ্ঠে নজমুল হক বললেন। বলে একটা বিলাসী হাই তুললেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। লোকটার অর্ধেক দাঁত নেই, লক্ষ করল বাবর।

নীরব হয়ে গেলেন ফিরোজ মাজমাদার। একটা বড় ঢোক হুইস্কি গিলে অনাবিল হাসি সৃষ্টি করে বাবরকে বললেন, রেখে দিন পলিটিকস। শালার ওসব মানুষে আলোচনা করে ? সময় নষ্ট। হ্যাঁ ভাইসাব, যাবেন শিয়ালবুক্কায় ? অ্যাঁ ?

বাবর বলল, আসলে কী জানেন, ওসব বাইরে টাইরে আমি কখনো যাই না।

তা যাবেন কেন ? আপনার টেলিভিশনে অভাব কী ?

ছি, ছি, তা নয়।

আরে, ঢাকায় আমিও থাকি। সেদিন দেখলাম এক সুন্দরীর সাথে কাফে আরামে বসে আছেন। বয়সটা কমই দেখলাম। কে ?

আমার ভগ্নি।

দুরো সাহেব। বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিছে কথা কইতে নাই। প্রেম-ট্রেম করেন নাকি ?

কী যে বলেন।

তাহলে আর আপত্তি কী ? চলুন শিয়ালবুক্কায়।

আপনারাই যান।

বুঝেছি, বুঝেছি, প্রেম নাহলে চড়তে মজা লাগে না আপনার।

মনের মধ্যে কোথায় যেন হোঁচট খেল বাবর। ফিরোজ মাজমাদারের কথাটা কি সত্যি ? না যদি হবে তাহলে পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে শুতে বাধা কী ?

লতিফার সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক ছিল ? বাবলির সঙ্গে কী সম্পর্ক সে তৈরি করতে চেয়েছিল ? জাহেদাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে উত্তর বাংলায়। তাদের কাছে তো ঐ একটা বস্তুই

সে আশা করে যা শিয়ালবুক্কাতেও পাওয়া যায়। তবে বাধাটা কোথায় ?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন ফিরোজ মাজমাদার।

কি, ঠিক বলিনি ?

বাবর উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনি খাওয়া-দাওয়া একটু বেশি করেছেন। আমার আবার কাজ শেষ হয়নি, এক্ষুণি আগ্রাবাদ যেতে হবে। চলি।

বলে সে নিজের ঘরে এসে হুইস্কির হুকুম করল। জামা জুতো খুলতে খুলতে একরোখার মত দু'পেগ নীট উজার করে নিঃশ্বাস নিল একটা। তারপর সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। বলল, বেয়ারা, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আমাকে জাগিয়ে দিও। আর কেউ আমাকে খোঁজ করলে বলবে সাহেব কামরায় নেই।

১০

প্লেনে রাতের আকাশ দিয়ে ঢাকায় ফিরতে ফিরতে তার মনে পড়ল আজ দুপুরে পরপর সে কয়েকটা স্বপ্ন দেখেছে। কোনটা আগে কোনটা পরে এখন আর মনে নেই। খুঁটিনাটিও মনে পড়ছে না। কেবল কয়েকটা ছবি।

একটাতে তার বাবা ছাতা মাথায় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। গালের দাড়ি বেয়ে টপটপ করে ঝরছে বৃষ্টির ধারা। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, ভিজে গেছে। বাবা ধুতি পরতেন। সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু বাবা একটা কথাও বললেন না।

আরেকটাতে দেখেছে, তার গলা কেটে কারা যেন ফেলে রেখেছে। তার পাশে চুল খুলে কাঁদছে অচেনা একটা মেয়ে। পাশ দিয়ে শেখ মুজিব যাচ্ছিলেন। তার পা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কী যেন বলতে লাগল সে। শেখ একবার চোখের ওপর হাত রেখে নাবিকের ভঙ্গিতে আকাশ দেখলেন, তারপর ধীরপায়ে চলে গেলেন কুয়াশার মধ্যে।

একটা স্বপ্ন—তার গাড়ির কাচ ভাঙ্গা। একেবারে খোলা। হু হু করে। বাতাস আসছে ঠেলে। কিছুতেই গাড়ি চালানো যাচ্ছে না।

আরো অনেক কিছু দেখেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

হ্যাঁ, একটা মনে হয়েছে।

চিড়িয়াখানায় একটা রোগা সিংহ খুব ল্যাজ খাড়া করে খাঁচার মধ্যে এপাক ওপাক করছে। সিংহের চেহারাটা অবিকল কাজী সাহেবের মত। আর বাবর তাকে একটা মর্তমান কলা সাধছে খাবার জন্যে। কিন্তু সিংহ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করছে না।

আরেকটা স্বপ্ন— বাবর ক্রমাগত এ-আকাশ ছেড়ে ও-আকাশে, আকাশের পর আকাশ উড়ে যাচ্ছে। আকাশটা মেঘহীন।

দয়া করে আপনাদের সিট বেল্টগুলো বেঁধে নিন।

কোমরে হাত দিয়ে বাবর দেখল সেই যে উঠার সময় বেঁধেছিল, আর খোলা হয়নি। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল সে। এক গ্লাশ পানি চেয়ে খেল।

নিচে ঢাকার আলো দেখা যাচ্ছে। ছেলেবেলার জোনাক জ্বলা বনের মত। 'মাগো, আমার কাজলা দিদি কই ?'

যাবার সময় এয়ারপোর্টে গাড়িটা রেখে গিয়েছিল। এখন রাত দশটায় একেবারে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। অবিকল আমার মত— ভাবল বাবর। গাড়িটার হাতলে সস্নেহে হাত রাখল সে।

তারপর ইচ্ছে করে জাহেদাদের কলেজের সমুখ দিয়ে দু'একটা জানালায় জ্বলা বাতির দিকে তাকাতে তাকাতে বাড়ি ফিরল বাবর।

বাড়ি ফিরে নিজেকে বড় ক্লান্ত, ব্যয়িত কিন্তু ক্ষুব্ধ মনে হলো বাবরের। চোখের ভেতরে জ্বলজ্বল করতে লাগল ফিরতি পথে দেখা জাহেদার হোস্টেলের জানালায় তীব্রআলোর আয়তক্ষেত্রগুলো।

কেন যেন মন খারাপ লাগছে খুব।

কেন ?

কিছুতেই সে বুঝে পেল না। অসহায়ের মত টের পেতে লাগল সেই সব কিছু শূন্য করে তোলা অনুভূতিটা বৃহৎ থেকে কেবলি বৃহত্তর হচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠছে আত্মা। ভেতরটা ছটফট করছে। কী করলে যে শান্ত হবে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

মান্নান এসে বলল, খাবার দেব ?

না।

সে চলে গেলে বিছানায় চোখ বুঝে শুয়ে রইল বাবর। হাতে পুড়তে লাগল সিগারেট। কোথায় একটা বেড়াল অবিরাম ম্যাঁও ম্যাঁও করে চলছে। তার কী হয়েছে কে জানে ?

ছেলেবেলায়, মাঝরাতে, বেড়াল ঐ রকম কাঁদলে মা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতেন। বুকের শীতল কোমল মাংসে মশলা হলুদের ঝাঁঝের ভেতর মাথা ডুবিয়ে থাকতে থাকতে কেমন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আসত সব অনুভূতি। পৃথিবী গুটিয়ে আসত মায়ের বুকে। অর্ধশূন্য থলের মত মায়ের বুক হয়ে উঠত একমাত্র অবলম্বন।

বাবর বালিশে মুখ ডুবিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ভেতর থেকে একটা কান্না পাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই বাইরে আসছে না। বাইরে আসছে না বলে ভীষণ ভয় করছে। ভয় করছে এই ভেবে যে স্মৃতিও বুঝি তার কাছে আর যথেষ্ট নয়।

বাবর উঠে দ্রুত হুইস্কির বোতল বার করে সরাসরি খানিকটা পান করল। তারপর গেলাশ খুঁজে খানিকটা ঢেলে বরফ দিয়ে ভরে নিল। বসল মোড়ার ওপর। অন্যমনস্ক হাতে গেলাশটা ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগল ঘড়ির উল্টো দিকে; শীতল কাচ একবার চেপে ধরল গালে, চোখের গহ্বরে, কপালে, চিবুকের নিচে।

মাকে যেদিন কবর দেয়া হয় সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

বাবর পায়ের নিচে সিগারেটটা পিষে নিবিয়ে দিল।

হাসনু। তার ছোট বোন, বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। ঠোঁট দু'টি বিযুক্ত। যেন এই মাত্র কিছু বলেছে বা বলবে।

মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা ?

আল্লার কাছে।

কেন ?

আল্লার কাছে সবাইকে যেতে হয় যে, খোকা।

কেন যেতে হয় ?

যেতে হয়, তাই।

কেন ? আল্লা কে ?

তিনি আমাদের সব। তিনি আমাদের তৈরি করে পাঠিয়েছেন। আবার তিনি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমার মাকে তাই আজ নিয়ে গেলেন।

সেখানে বুঝি ঘুমিয়ে যেতে হয়।

হ্যাঁ খোকা, তাই।

হাঃ হাঃ হা।

বাবর চেষ্টা করল। চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল তার। সে একটা দীর্ঘ চুমক দিল গেলাশে।

আজ বাবাকে প্লেনে আসতে আসতে স্বপ্নে দেখেছে সে। বৃষ্টিতে তার দাড়ি ভিজে টপটপ করে পানি পড়ছে। মাঠের ভেতর দিয়ে আসছিলেন তিনি। একটা কথাও বলেননি। বাবরের খুব কষ্ট হতে লাগল। বাবার কথা মন থেকে তাড়াবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বার কয়েক পায়চারি করল সে। ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি দেখল। একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাল। ওয়ার্ডরোব খুলে জামা কাপড়রে সুগন্ধ বুক ভরে নিল। গেলাশটা শেষ করে আবার কানায় কানায় সুরায় বরফে ভরে নিল বাবর। যা হাসনু যা। যা এখান থেকে। যা বলছি। হাসনু তো যাবেই না। বরং হাসনু ক্রমশ বড় হতে লাগল তার চোখের ভেতরে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। জাহেদা ? লতিফা ? না, লতিফা হবে না বাবলি ?

হ্যালো।

খুব ভারি গলায় কে যেন জিগ্যেস করল, রোজারিও সাহেব আছে ?

রং নম্বর।

বসবার ঘরে এসে বসল বাবর। আবার টেলিফোনটা বেজে উঠল। আবার বোধহয় রোজারিওকে চাইছে। বাবর আর ধরল না। কিছুক্ষণ বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল টেলিফোন। নেমে এলো অখণ্ড নীরবতা।

হাসনু যা বলছি।

দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটি ছুঁড়ে মারল বাবর। ঘুরতে ঘুরতে শূন্যেই নিভে গিয়ে ঘরের কোণায় থুবড়ে মুখী পড়ে গেল।

হাসনুরে, কী চাস তুই ?

হাসনুর দুটো দাঁত পোকা খাওয়া ছিল। হাসলে ভারি মিষ্টি লাগত। হাসনু হেসে ফেলল এখন। নিঃশব্দে, দীর্ঘক্ষণ ধরে, শ্লথগতি চলচ্চিত্রের মত।

এখন আরো একা লাগল বাবরের। রক্তের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের কথা মনে পড়তেই এই বোধটা বিরাট হয়ে উঠেছে যে এখন তার চারপাশে এ দেশে কেউ নেই। আপন কাকে বলে সে ভুলে গেছে বলেই যারা আপন তারা তাকে এমন একা করে যাচ্ছে। বহুদিন পর এ-রকম আবার হচ্ছে বাবরের।

সে ঢকঢক করে খানিকটা পান করল।

হাঃ হা। আমার কেউ নেই। কেউ নেই। কোনো কিছু আমার নয়। না মাটি, না মন, না মানুষ। বর্ধমানে লেবু গাছটায় লেবু ধরেছে? কানা ফকিরটা বেঁচে আছে না মরে গেছে হাসনু?

দূর, তুই বলবি কী করে? তুই ও তো মরে গেছিস।

সত্যি?

না, বিশ্বাস হয় না, তুই হয়ত বেঁচে আছিস।

তোকে কত খুঁজলাম, পেলাম না।

ওরা তোকে কষ্ট দিয়েছে রে?

বাবর স্পষ্ট দেখতে পায় মাঠের ওপর থমথমে সন্ধে নেমে এসেছে। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। হাঁটতে গিয়ে পায়ে পায়ে আঁঠার মত জড়িয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। হাসনুর হাত শক্ত করে ধরে সে তবু হাঁটছে। প্রাণপণে হাঁটছে। বাড়ি পৌঁছুতে হবে। রাতের আগেই পৌঁছুতে হবে যে।

কোথায় গিয়েছিল দু'জন মনে নেই। মনে রাখার কোনো প্রয়োজনও নেই। যেন জন্মের পর থেকেই সে আর হাসনু অবিরাম দ্রুতপায়ে সেই অন্ধকার ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চলেছে।

কে যেন পেছনে আসছে।

কই না।

আবার তাকিয়ে দেখল বাবর। কাউকে দেখল না, তবু মনে হলো কেউ তাদের অনুসরণ করছে। তার হাত ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ধরবার জন্যে। চট করে হাসনুকে টেনে সে পোলের পাশে ঝোঁপের মধ্যে লুকাল।

হাসনু প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, দাদা।

চুপ।

হাসনুকে নিয়ে ঝোঁপের মধ্যে মুখগুঁজে পড়ে রইল বাবর। মশা কাটতে লাগল। যন্ত্রণা হতে লাগল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল তারা। নিচে পোলোর থামে পানি আঘাত করছে, করতালির মত শব্দ উঠছে থেকে থেকে।

হঠাৎ দুটো মানুষের সাড়া পাওয়া গেল পোলের অপর দিকে, নিচে। সাড়া ঠিক নয়, নিঃশ্বাসের শব্দ। তার ভেতরে একজনের যেন হঠাৎ খুব শীত লেগেছে, দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে তাই। আবার কখনো মনে হচ্ছে নিচু গলায় হি হি করে হাসছে।

কী করছে ওরা ওখানে?

বাবর কান খাড়া করল। অন্ধকারে হাসনু তার মুখের দিকে তাকাল। তারার আলোয়, নাকি

ভয়ে, শাদা শাদা লাগছে হাসনুর মুখ।

দাদা।

চুপ।

হাসনুর মুখ চেপে ধরে বাবর কান পেতে রাখল ঐ শব্দের উৎসের দিকে। তার মেরুদণ্ড দিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা তরল কী যেন নামছে অতি দ্রুত। তারপর হঠাৎ উরুর ভেতরটা ভিজে গেল উষ্ণতায়।

ঘড় ঘড় একটা শব্দ হলো সেই মুহূর্তে, ওপারে।

ফিসফিস গলায় কে যেন জিগ্যেস করল, বল শালা, হিন্দু না মুসলমান ?

উত্তরে দ্বিতীয় লোকটা হি হি করে হেসে উঠল যেন।

বল ?

চাপা গলায় গর্জে উঠল প্রথম।

আঁ করে একটা শব্দ করল দ্বিতীয়।

তারপর শোনা গেল, হি হি না, হি হি না, হি হি না না।

চুপ শালা।

বাড়িতে আমার বৌ আছে বাবা। না—আস্তে—না—না।

চিৎকারে ছিঁড়ে যাচ্ছিল অন্ধকারটা, কে যেন চেপে ধরে তা বন্ধ করল। সেই সঙ্গে ধানের বস্তা নামাবার সময় যেমন বুক থেকে শব্দ ওঠে কুলিদের সেই রকম একটা রুদ্ধশ্বাস ভারি শব্দ উঠল। আবার, আবার।

তারপর সব চুপ হয়ে গেল।

বাবর হাসনুকে টেনে তুলে দৌড় দিতে যাবে, একেবারে সামনে পড়ে গেল লোকটার। হাতে রক্তমাখা ছুরি। গলায় একটি মাদুলি চকচক করছে। আর কিছু চোখে পড়ল না তার।

আর কিছু মনে নেই বাবরের।

কেবল মনে আছে বাবর মাঠের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে।

আর পেছনে হাসনুর আর্তচিৎকার আকাশে বাতাসে হা হা করছে— দা—দা।

আরো খানিকটা হুইস্কি ঢালল বাবর।

হাসনুকে আর পাওয়া যায়নি।

কেন সে হাসনুকে ফেলে পালাল। কেন লড়াই করল না। কেন ? কেন ?

কোনটা স্বাভাবিক ? পালিয়ে আসা ? না, লড়াই করা ? গল্পে উপন্যাসে মানুষের আদর্শে রুখে দাঁড়ানোটাই চিরকাল নন্দিত। সিনেমা হলে তালি পড়ে। বই পড়তে পড়তে প্রশংসায় পাঠকের মুখ লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে নিজে, নিজের প্রাণ নিয়ে, পালিয়ে এসেছে। আমি কি ঘৃণিত বলে চিহ্নিত হবো ?

নাকি আদর্শটাই ভুল।

মানুষ যা পারে না তাই বড় করে দেখতে চায়, দেখানো হয়।

I know they do not know, but I
who have followed so many times
the road from the murderer to the murdered
from the murdered to the punishment
and from the punishment to the other murder, groping
the inexhaustible purple
that night of homecoming
when the Furies began to whistle
in the sparse grass—
I saw snakes crossed with vipers Entained on the Vile Generation
our destiny.

কতদিন পরে জর্জ সেফারিসের বইটা খুলল বাবর। পড়তে পড়তে চোখ ভরে এলো পানিতে। বইটা বন্ধ করে হাত বুলাতে লাগল নরম কভারে। ধুলা জমে আছে। ধুলোয় কিচকিচ করছে মলাট। পকেট থেকে রুমাল দিয়ে সযত্নে মুছে আলমারিতে রেখে দিল বাবর। গেলাশটা শেষ করল।

হাসনু, আর কোনোদিন আসিস না। তুই যা।

হাসনু গেল না।

আলমারির ভেতরে খুঁজে দেখার ইচ্ছে হলো বাবরের। একবার কয়েকটা কবিতা অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছিল সে। কাগজগুলো কই?

হাসনু তুই কি আমাকে মেরে ফেলবি?

এই তো কাগজগুলো। এই তো একটা অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিল সে। ঐ তো আরেকটার কয়েকটা লাইন। ঐ তো বাকিগুলো।

আমি পালিয়েছি বেশ করেছি। একশ বার পালাব। কার তাতে কী।

কাগজগুলো ভাঁজ করে একটা খামে পুরে রাখল বাবর।

সব শালাই পালায়। কিন্তু গল্প করার সময়, লেখার সময়, বক্তৃতায় উল্টোটা বলে। আমি সব জানি। সবাইকে আমার চেনা আছে।

হাসনুরে তুই যাবি না?

শূন্য গেলাশটা ছুঁড়ে মারল বাবর। দেয়ালে লেগে ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝিম ধরে উঠল মাথার ভেতরে। চমৎকার কাজ করতে শুরু করেছে সুরা? বাবর দরোজা খুলে বেরুল বারান্দায়। এক ঝলক বাতাস তার মুখ ধুইয়ে দিয়ে গেল হঠাৎ। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল সে। কই, রাত তো বেশি হয়নি?

কাউকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কারো সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হতো। কোথাও গেলে হতো। ঘরের ভেতরে গেলেই হাসনু আবার তার পোকা খাওয়া দাঁত নিয়ে হাসতে থাকবে। আর শোনা যাবে সেই আর্তচিৎকার। দা—দা!

বাবর গাড়ি স্টার্ট দিল।

সড়াৎ করে বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়। একটানা চালিয়ে জাহেদার হোস্টেলের অদূরে গাড়ি রাখল সে। সিগারেট ধরিয়ে পেছনে মাথা হেলিয়ে পা লম্বা করে দেখতে লাগল হোস্টেলের জানালায় আলোর ছক।

দুপ দুপ করতে লাগল বুকের ভেতরে। সকাল হতে এখনো অনেক বাকি। সকালে জাহেদ আসবে।

জাহেদা

ভাল জাহেদা।

আমার ভাল জাহেদা।

এই আবৃত্তি ক্রমশ অমৃতের মত মনে হতে লাগল তার। প্রশান্ত হয়ে আসতে থাকল আত্মা।

হ্যাট।

ঐ দ্যাখ হ্যাট।

ঐ দ্যাখ কালো হ্যাট।

ঐ দ্যাখ জনের কালো হ্যাট।

ঐ দ্যাখ জনের কালো হ্যাট টেবিলে।

ঐ দ্যাখ জনের কালো হ্যাট টমের টেবিলে।

হাঃ।

এইভাবে শূন্য থেকে এক, এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার, এইভাবে, এইভাবে। শূন্যতা থেকে শুরু করা যায়। শূন্য থেকে আমি। আমি থেকে তুমি। আমি তুমি থেকে সে। আমি, তুমি, সে থেকে অনেকে।

অনেক কি আমরা হয়?

আমি বিশ্বাস করি না।

আমি বলছি, আমি বিশ্বাস করি না। জাহান্নামে যাও।

হাসনু যা। যা বলছি।

না, সুরা পানে কিছু হবে না। কাউকে দরকার। কোনো একটা জীবন্ত মানুষ। অনর্গল কথা কলতে হবে। নইলে আজ রাতে সে মারা যাবে। সেই রক্তাক্ত ছুরিটা সে চোখে দেখতে পাচ্ছে, বর্ধমানের অন্ধকারে, মাঠে, পোলের পাশে, ঝোপের ধারে।

দা— দা!

উদ্দাম গতিতে গাড়ি চালিয়ে দিল বাবর।

অনেকক্ষণ গাড়ি একভাবে চালাবার পর কান পাতল বাবর। না, চিৎকারটা আর তাড়া করছে না তাকে। বাঁচা গেছে। তবু হাসনুর চেহারা একবার মনে করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনে করা গেল না। তখন স্বস্তিও হলো, আবার একটু দুঃখিতও হলো সে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল বাবর।

সমস্ত শহর ভারি অচেনা মনে হলো তার।

পেট্রল পাম্পে এলো সে। ট্যাংক ভর্তি করে তেল নিল।

টেলিফোন আছে?

আছে স্যার।

লাফ দিয়ে নেমে কাচঘেরা ঘরের মধ্যে গেল বাবর। ডায়াল করল।

হ্যালো।

কে, হাসু?

জি।

ভাল আছ, হাসু?

হাসুর নামটা উচ্চারণ করতে ভারি মিষ্টি লাগে বাবরের।

ভাল। আপনি বাবর চাচা?

হ্যাঁ। তোমার বাবা কই, হাসু।

মাদারিপুরে।

মা?

আছেন। ডেকে দিই?

কী করছেন? ঘুমিয়ে? তা হলে থাক।

না, না। মা জেগেই আছেন। মা—আ।

টেলিফোনে ডাকটা শুনতে পেল বাবর। শুনতে পেল চটির শব্দ। শুনতে পেল মিসেস নফিসের খনখনে গলা।

হ্যালো।

আমি বাবর।

নিস্তব্ধতা।

আমি বাবর। হাসুর কাছে শুনলাম জেগে আছেন। কী করছেন?

কিছু না।

আমি আসছি।

দরকার আছে?

আছে।

টেলিফোন রাখল বাবর। মিসেস নফিস সত্যি তার ওপর রাগ করেছেন। কেমন নিস্তাপ, নিস্পৃহ করে রেখেছেন গলাটা। সেদিন সত্যি সত্যি কয়েকটা কড়া কথা বলা হয়ে গেছে। রসিকতা হয়ে গেছে বড় বেশি নির্মম। আজ পুষিয়ে দেবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মিসেস নফিসকে দেখলেই তার জিবে চুলবুল করে ওঠে। খোঁচাতে ইচ্ছা করে। কেন সে টেলিফোন করতে গেল তাকে? কী দরকার ছিল?

বোধহয় মনে মনে সে এখন এমন কাউকে খুঁজেছিল যার সঙ্গে বিরোধ পদে পদে। যাকে দেখলেই নখগুলো শানিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। যদি কোণঠাসা করে প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তিটা শান্ত করা যায়।

কিন্তু প্রতিশোধ কেন ? কার ওপর ?

দরোজা খোলাই ছিল। বাবরের পায়ের শব্দে কাজের ছেলেটা বেরিয়ে এলো। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল সে।

সোফার ওপর সবুজ চটিতে পা পেতে বসে আছে মিসেস নফিস। হাতে আজ সকালের বাসী কাগজ। বাবরের মনে হলো রঙ্গমঞ্চে পর্দা উঠেছে। সে তাই হাসল। সেই হাসিটাকেই দীর্ঘ করে চটুল কণ্ঠে বাবর বলল, ভাল তো ?

মিসেস নফিস তীক্ষ্ণ চোখে নিঃশব্দে মাথা ওঠানামা করলেন আস্তে আস্তে। নিঃশব্দ সেই বার্তার অর্থ হতে পারে, হ্যাঁ। অর্থ হতে পারে আমার চোখে আপনি এখন কাচের মত স্বচ্ছ।

বাবর আবার বলল, আপনার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাই। কারণ—। অবিশ্যি রাত বেশ হয়েছে —।

সুরা এত বেশি কাজ করেছে যে বাক্যগুলি কিছুতেই শেষ করা যাচ্ছে না। বাবর একটা সিগারেট ধরাল অক্ষমতাকে ধামাচাপা দেবার জন্যে। জিগ্যেস করল, নসিফ সাহেব মাদারিপুরে কেন ?

ওর মামাকে রেখে আসতে।

সেই মামা ?

হ্যাঁ।

যার অপারেশন গল ব্লাডারে ?

গল ব্লাডারে নয়, চোখে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোখে। চোখেই তো বলেছিলেন। এখন ভাল ?

বোধহয়।

বোধহয় মানে ?

জিগ্যেস করিনি।

ঠিক, ঠিক। বাইরে আপনার গাড়ি দেখলাম ?

বাইরে যাচ্ছিলাম।

ও। কেন ?

বলবেন না। একটু আগে হাসুকে নিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। রেস্তোরাঁয় চাবি ফেলে এসেছি। এখুনি না গেলে হয়ত আর পাওয়াই যাবে না।

মিসেস নফিস উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে রইলেন। ভেতরেও গেলেন না, বাইরেও না। এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ তার ক্রমশ ধার হারাতে লাগল।

বাবর বলল, কোন রেস্তোরাঁ ?

কাফে আরাম।

বাবর হাসল। যেন চাবি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন মিসেস নফিস। সে উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরুল তারা এক সঙ্গে।

মিসেস নফিস বললেন, দেখা হবে।

বলেই তিনি গাড়িতে সরব করলেন এঞ্জিন। বাবর হাত নেড়ে তারটায় বসল। যতক্ষণ না তার গাড়ি বেরুল বাবর চাবিতে পর্যন্ত হাত দিল না। মেয়েরা গাড়ি চালালে তাদের থেকে দূরে থাকাটা বুদ্ধিমত্তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ মনে করে সে।

বাবর বেরিয়ে পেট্রল পাম্পে এলো তেল নিতে। কাল রংপুরে যাবার এই শেষ তৈরিটা বাকি আছে। চাবি খুলে ছেলেটাকে দিতে যাবে হঠাৎ তার চোখে পড়ল ট্যাঙ্কে তেল ভর্তি।

ওহো তাই তো। একটু আগেই না তেল নিয়েছে? হঠাৎ করে মাথাটা এমন শূন্য হয়ে গেল কেন?

হাঃ খেলে যা। ভাল করে খেলে যা। ব্রাভো খেলারাম।

ধন্যবাদ। হাঃ হাঃ হাঃ।

গাড়ি ছুটিয়ে দিল সে। পেট্রল পাম্পের ছেলেটা বিড়বিড় করে বলল, শালা মাতাল। তারপর তার মুখেও নিঃশব্দ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল এবং অচিরেই হাসিটা হাইয়ে রূপান্তরিত হলো। তার ঘুম পাচ্ছে।

পুরনো পেন্টিংয়ে দেখেছে ইংল্যান্ডের জলাভূমিতে ঘোড়ায় চেপে শিকার করতে চলেছেন লর্ড। তার সমুখে শিকারী কুকুর। ঠিক তেমনি পেট সরু করে ছুটতে লাগল বাবর নির্জন অন্ধকার রাজপথ দিয়ে। তীব্র গতিতে টায়ারে অবিরাম একটা হুইসিল বাজতে লাগল তার কানে।

অতিকায় একটা খেলনার মত দেখাচ্ছে ইন্টারকন্টিনেন্টালকে। কাচের দরোজার ওপারে মানুষকে মনে হচ্ছে রঙিন চলচ্চিত্রের চরিত্র। বাবর ভেতরে ঢুকল, চারদিকে দেখল, একবার ভাবল কাফে আরামে যায়, না থাক; সে ছিপ ফেলে একটা সোফায় বসল।

সবুজ শাড়িতে পুকুর ভরা শ্যাওলার মত মন্থর ঢেউ তুলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন মিসেস নফিস। বাবর তাকে ডাকলও না, উঠেও দাঁড়াল না। নিঃশব্দে বিকশিত হাসিতে অপেক্ষা করে রইল।

মিসেস নফিস কাঁধের চুল চলতে চলতে সরাতে গিয়ে বাবরকে দেখলেন এবং দু'পায়ের মাথায় গিয়ে থামতে পারলেন।

বললেন, আপনি!

হ্যাঁ, আমি।

বাবর কাছে উঠে এলো। আবার বলল, আমি। আপনি কি আমাকে এখানে আসতে বলেননি?

না তো।

তাহলে ভুল শুনেছি।

কিন্তু—।

হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। কিন্তু আপনি যেন বলেছিলেন, দেখা হবে। তাই চলে এলাম।

ও।

হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলে হেসে উঠলেন মিসেস নফিস।

বাবর বলল, চলুন, কফি খেতে খেতে কথা বলি।

কফি ?

হ্যাঁ, কফি।

আপনি তো হুইস্কি ছাড়া কিছু খান না শুনেছি।

কার কাছে ?

কেন, আপনারই কাছে। সেদিন অত করে বললাম চা খেতে।

খেয়েছিলাম তো। পরে নিজেই চেয়ে খেলাম না ?

সেটা আপনার ভদ্রতা।

দাঁড়িয়ে কথা ভাল দেখায় না। চলুন।

কোথায় ? বারে না রেস্তোরাঁয় ?

দু'টোর কোনোটাতে নয়।

তবে ?

আমার এক বন্ধু থাকে ওপরে। তার সুইটে চলুন। যাবেন ? আমার খুব ভাল বন্ধু। আপনি কি চিনবেন ? জামাল ?

জামাল ? জামাল শেখ ?

না, জামাল চৌধুরী। জামাল শেখ কে বলুন তো ?

চিনবেন না। আছেন একজন।

বাবর লিফটের বোতাম টিপল। জ্বলে উঠল একটা তীর। যেন সূক্ষ্ম বিদ্রুপ করে কেউ হাসতে লাগল কোথাও।

মিসেস নফিস নাভি ভেতরে টেনে চোখ গোল করে বলে উঠলেন, সত্যি সত্যি ওপরে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি ?

হ্যাঁ।

না, না, ভাল দেখাবে না।

ছোট্ট একটা মেয়ের মত খিন খিন করে উঠলেন মিসেস নফিস। কথাটা প্রতিবাদ নয়, সিদ্ধান্ত নয়—কিছুই নয়। বলার জন্য বলা। তাই দেখে বাবর হেসে ফেলল।

হাসছেন কেন ?

না, কিছু না।

সে মুহূর্তে দরোজা খুলে গেল লিফটের। ভেতরে পা দিলেন মিসেস নফিসই প্রথমে। বাবর এসে বোতাম চাপ দিল। ন'য়ের বোতাম।

নাইনথ্ ফ্লোরে ?

হ্যাঁ।

কিছু যদি মনে করেন ?

কিছু মনে করবেন না। আপনাকে দেখলে খুশি হবে। আর আমিও খুশি হবো যদি আমার জন্যে আপনার একটি বন্ধু বৃদ্ধি হয়।

তার মানে তার কাঁধে চাপাতে চাইছেন ? এই জন্যেই আমরা মেয়েরা বলি, পুরুষ মানুষকে যত শেখাও যত পড়াও ভদ্র হয় না, সভ্য হয় না।

বাবর হঠাৎ বলল, আপনার ছেলের নাম হাসু ?

হ্যাঁ, কী হয়েছে ?

মিসেস নফিসকে ভারি উদ্বিগ্ন দেখাল।

না, কিছু না। ভারি মিষ্টি নাম। আমার এক বোন ছিল তার নাম হাসনু।

কই, কোনোদিন বলেননি তো!

কী ?

আপনার বোন আছে।

বলিনি। বলার কী আছে ? বোন থাকাটা বিশ্বের কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। হাসনু তুই যা।

কী বললেন ?

শেষ কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাবার পর টের পেয়েছে বাবর। এক মুহূর্ত বোকার মত তাকিয়ে রইল সে মিসেস নফিসের দিকে। পরে হেসে ফেলল। বলল, কই কিছু বলিনি তো!

লিফট এসে থামল। দরোজা খুলে গেল, যেন স্বপ্নলোকের দিকে। বাবরের মনে হলো জনশূন্যযানে তারা এখন রয়েছে।

করিডোরে পা রেখে মিসেস নফিস বললেন, আজ খেয়েছেন ?

সুরার কথা বলেছেন ? হ্যাঁ, না। অতটা খাইনি।

থমকে দাঁড়াল মিসেস নফিস। দাঁড়াল বাবর। মিসেস নফিস জানলেন হাসল বাবর। এক পা পিছুলেন।

বাবর বলল, হাসু! হাসনু!

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন মিসেস নফিস। খসখসে ভয়ার্ত গলায় উচ্চারণ করলেন, আজ কী হয়েছে আপনার ?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল বাবর।

মিসেস নফিসের মনে হলো এই লোকটিকে এর আগে কোনোদিন দেখেননি তিনি। আরো দু'পা পিছুলেন। তারপর দ্রুত ছুটে গিয়ে লিফটের বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

বাবর কিছু বলল না।

বর্ধমানের সেই অন্ধকার। সেই চিৎকার। সেই পোল। তার চারদিকে চক্রের মত ঘুরছে, ফেটে পড়ছে। আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার দৃষ্টি। হঠাৎ সে দেখে মিসেস নফিস নেই। কখন চলে গেছেন।

তখন ধীর পায়ে ফিরে যেতে লাগল সে, বাবর নিজেও। তার বুকের মধ্যে এক ধরনের কান্না পাকিয়ে উঠতে থাকল, যার পরিণামে কোনো শব্দ হয় না, অশ্রু হয়।

বাবর এসে তার বিছানায় শুয়ে বিড়বিড় করে অবিরাম ডাকতে লাগল, হাসু হাসনু, হাসুরে। আর দু'হাত শূন্যে তুলে শূন্যতার মধ্যে হাসনুর মুখ নির্মাণ করে আদর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

১১

আজ সকালে বেশ কুয়াশা পড়েছিল। এখন কুয়াশা নেই, কিন্তু চারদিকে সূর্য ওঠার অনেক আগে যেমন অন্ধকার-অন্ধকার তেমনি করে আছে। শীত করছে। হাতের তেলো মরা মাছের মত মনে হচ্ছে। কী যেন কোথায় হবে তারই অপেক্ষায় মুগ্ধ হয়ে আছে বস্তুপুঞ্জ। দালানগুলো যেন ঝুঁকে পড়েছে সম্মুখে, পথটা উঠে গেছে দূরে, যেমন পাহাড়ে। একটা করে গাড়ির শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে সময়কে তোলপাড় করে চলে যাচ্ছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। মানুষগুলো পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটছে।

তখন জাহেদা এলো। তার স্কুটার ফটক পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার ঘুরে এসে ভেতরে ঢোকার জন্যে নাক বাড়াল। হাত দিয়ে থামাল জাহেদা। নেমে অত্যন্ত মনোযোগ নিয়ে পয়সা খুঁজতে লাগল ব্যাগে।

আটটা বাজতে আঠার মিনিট বাকি।

বাবর এতক্ষণ বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল। ফটকে ঢুকেই তাকে দেখেছে জাহেদা। আর বাবরও দেখেছে স্তব্ধ, উদ্বিগ্ন, পাণ্ডুরতাকে। যেন ফাঁসির মঞ্চে যাচ্ছে জাহেদা। পরনেও তার কালো পাজামা, কালো কামিজ, পায়ে কালো ফিতের স্যান্ডেল।

বাবর তার পয়সা দেয়া দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়েই। যেন সে ভুলে গেছে চলা, এক মুহূর্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর টকটক করে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। হাসল একটু।

জাহেদা জবাবে হাসল না, কথা বলল না, পয়সা গুণে দিল স্কুটারওলাকে। বাবর তার ছোট সুটকেশটা নিয়ে বারান্দায় গেল। পেছনে পেছনে এলো জাহেদা। দরোজা খুলে ধরল বাবর। মাথা নিচু করে জাহেদা দ্রুত ঢুকল, সম্মুখেই যে আসন পেল তাতে বসে পড়ল। সুটকেশটা রেখে বাবর হাসল আবার।

এবার জাহেদা ছোট একটু হাসল। কিন্তু চোখ উদ্ভাসিত হলো না সে আলোয়। সেখানে তখনো উদ্বেগ আর শঙ্কায় শাসন।

চা খেয়েছ ?

জাহেদা মাথা নাড়ল।

নাশতা হয়নি ?

তেমনি নিঃশব্দে মাথা নাড়ল জাহেদা। কোনো কথা না বলে, শুধু গভীর চোখে জাহেদার চোখ একবার বিদ্ধ করে বাবর তখন ভেতরে গেল। জাহেদার জন্য নাশতা সে বানিয়েই রেখেছিল। ভেতরে এসে একবার দেখে নিল সব ঠিক আছে কি-না। মান্নানকে গরম দুধ

দিতে বলল। চায়ের জন্যে পানি বসাল বাবর। তারপর বাইরে এসে বলল, এসো।

জাহেদা প্রশ্নের চোখে তাকাল।

নাশতা করবে।

নীরবে জাহেদা তাকে অনুসরণ করল। এসে ডাইনিং টেবিলে বসল। তার বিপরীতে, দূরে বসল বাবর। জাহেদা এক চামচ কর্নফ্লেকস খেল, এক টুকরো রুটি মুখে দিল, ওমলেটের একটা কোণ ভাঙ্গল। একটা ছোট চুমু দিল বাবরের বানিয়ে দেয়া চায়ে।

বাবরের একবার মনে হলো বলে, এত কম খাচ্ছে কেন ?—কিন্তু বলতে পারল না। কেমন যেন একটা সম্মোহন তাকেও পেয়ে বসেছে। জাহেদাকে একই সঙ্গে চেনা এবং অচেনা মনে হচ্ছে তার। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে তাকিয়ে রইল ঐ কালো কামিজের ওপর জীবন্ত গম্ভীর কোমল মুখখানার দিকে।

জাহেদা একবার চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। পরক্ষণে চোখ নামিয়ে রুটি ছিঁড়ল একটু। কিন্তু সেটা মুখে দিল না। আবার তাকাল বাবরের দিকে।

বাবর বলল, টেলিগ্রামটা কখন পৌঁছেছিল ?

বিকেল। পাঁচটায়।

অসুবিধে হয়নি তো ?

জাহেদা মাথা নাড়ল নীরবে।

সুপার কী বললেন ?

কিছু না।

ক'দিনের ছুটি পেলে ?

কিছু বলিনি।

জাহেদা মনোযোগের সঙ্গে চা খেতে লাগল। বাবর তাকে জিগ্যেস করল, তোমার খারাপ লাগছে ?

জাহেদা প্রথমে মাথা নাড়ল। তারপর সেটা যথেষ্ট মনে না করে মুখে ছোট্ট করে বলল, না।

তারপর চোখ তুলে সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, আর কেউ আসেনি ?

কে আসবে ?

আর কেউ ?

তখন বাবর বুঝল জাহেদার কথাটা। জাহেদা মনে করেছে আরো দু'একজন যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। বাবর ভাবল একটা কিছু বানিয়ে বলে, পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে। এমন কিছু সময় আসে যখন সত্যি বলা অনেক ভাল।

সে বলল, আর কেউ আসার কথা নেই। তুমি তাই মনে করেছিলে নাকি ?

জাহেদা চায়ের কাপ ধরে চুপ করে রইল।

তুমি আর আমিই যাচ্ছি। ভেবেছিলাম একাই যাব। প্রত্যেক বছর এই রকম দু'চারদিন ঘুরতে বেরোই। এবার তোমার কথা মনে পড়ল। এই দ্যাখ আটটা পাঁচ বাজে। এক্ষুণি না

বেরুলে আরিচার ফেরি পাব না। ওঠ।

বলে সে নিজে ওঠে দাঁড়াল। জাহেদার উঠতে একপলক দেরি হলো। সেই পলকটিকে অনন্ত বলে মনে হলো বাবরের। জাহেদা উঠে দাঁড়াতেই বাবর স্নিগ্ধ হেসে বলল, তুমি গাড়িতে গিয়ে বস।

জাহেদা ইতস্তত করতে লাগল।

কী হলো ?

আপনি যান, আমি আসছি।

ও, আচ্ছা।

বাবর বাইরে বেরিয়ে মান্নানকে সব বুঝিয়ে দিল। হুঁশিয়ার করে দিল, বাসা ছেড়ে এক পাও যেন না নড়ে। টাকা দিল কয়েকটা। তখন বাথরুম থেকে জাহেদা বেরিয়ে এলো। বাবর যেন তা বুঝেনি এমনি নির্বিকার মুখে বলল, গাড়িতে যাও। বলে সে দরোজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে জাহেদার পাশে বসে সুটকেশটা পেছনের সিটে ফেলে দিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট করল। খুব সন্তর্পণে ফটক দিয়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়। বলল, তোমার চশমা নেই ?

আছে।

পরে নাও।

অতি বাধ্য ছাত্রীর মত ব্যাগ খুলে কালো চশমা পরে নিল জাহেদা।

গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল বাবর। গতি বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের মাতামাতিতে জাহেদার গা থেকে মিষ্টি সৌরভ এসে নাকে লাগল বাবরের। সে আপন মনেই হাসল। পার হয়ে গেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। তারপর বুড়ো গাছের ছায়া। আরে, রোদ উঠেছে ? ডাইনে মাঠ, বাঁয়ে জলা, কয়েকটা বাড়ির পুঞ্জ। পুল, মীরপুরের বাজার। মীরপুর পুলের কাছে গিয়ে পেল লালবাতি। উল্টো দিক থেকে গাড়ি আসছে এখন। বাবর একটা সিগারেট ধরাল।

কিছু বলছ না।

কই, না।

বলে জাহেদা একটু নড়েচড়ে বসল। যা চোখে পড়ল বলল, এখানে এত বালি কেন ?

নৌকো করে এনে ফেলেছে যে! বাড়ি তৈরিতে লাগে। দেখছ না। ট্রাক বোঝাই শহরে যাচ্ছে।

ও।

জাহেদা চোখ নিচু করল। বাবর লক্ষ করল আশেপাশে লোকেরা খুব উৎসাহ নিয়ে সরস চোখে জাহেদাকে দেখছে। একজন সমস্ত ক'টা দাঁত বের করে হাসছে। পকেটে নীল চিরুনি।

লাল বাতিটা সবুজ হলো। ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে পার হলো পুলটা। তারপর ঢালুতে নেমেই বাড়িয়ে দিল গতিবেগ। এবার বাতাস আরো দাপাদাপি করে উঠল। সুবাসে, চুলে, বাতাসের হিম স্পর্শে বাস্তব যেন স্বপ্নে রূপান্তরিত হল। দু'পাশে খেত, মাঠ, বাড়ি, জলা,

নৌকো, রোদ দ্রুত সরে যাচ্ছে পেছনে। টায়ার থেকে শন শন শব্দ উঠেছে একটা। আর কিছু না। আর কোনো ধ্বনি নয়। গাড়ির ভেতরটা জাহেদার উপস্থিতিতে, রোদের আদরে, উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

চুপ করে আছ!

এমনি।

মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে যেতে লাগল ওরা। পার হলো কর্ণ নদীর পুল।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বাবর বলল, তুমি গাড়ি চালাতে পার?

না।

শিখবে?

জাহেদা ম্লান একটু হাসল।

আমি শেখাতে পারি। শিখে নিও। কেমন?

আচ্ছা।

আবার নেমে এলো সেই বিদ্যুৎপৃষ্ট নীরবতা। বাবর জানে, এখন জাহেদা আর ফিরতে পারবে না। এখন সে ঘটনার হাতে। কিন্তু কোথায় যেন মায়া করতে লাগল তার ওকে ওমন চুপচাপ দেখে। অনেকক্ষণ সেই মায়াটাকে বাড়তে দিয়ে আবার সে বলল, কিছু ভাবছ?

নাহ্।

কাল রাতে ঘুম হয়েছিল?

হ্যাঁ।

তোমার ঘরে তুমি একা থাক?

না, আরো দু'জন আছে। পাপ্পু আর শরমিন।

তখন নাশতা খেলে না?

খেয়েছি তো।

পাপ্পু কী পড়ে?

আমার সাথে।

শরমিন?

আমার এক ক্লাশ ওপরে।

আচ্ছা, ইকনমিক্স তোমার শক্ত লাগে না।

জাহেদা জবাবে একটু হাসল।

বাবর বলল ইকনমিক্স খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। ওটা সবার পড়া দরকার। মানুষের যা কিছু কাজ, যা কিছু সে বিশ্বাস করে, যা কিছু তার অর্জন, উপলব্ধি—তার পিছনে ইকনমিক্স যে কীভাবে কাজ করে তা তোমাকে বললে অবাক হয়ে যাবে।

জাহেদা হাসল আবার। কিন্তু কোনো কথা বলল না।

বাবর বলল, চুয়িংগাম খাবে? এই নাও।

ড্যাশবোর্ড থেকে বার করে দিল বাবর। বার করতে গিয়ে কাঁধ ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। জাহেদা তার বাঁয়ে সরে গেল অনেকখানি।

বাবর একটু হাসল।

খাও, খুব ভাল গাম।

এখন থাক।

সাভার ডেইরী ফার্ম পার হয়ে গেল তারা।

বাবর বলল এরপরে ছোট্ট একটা শালবন আছে। খুব সুন্দর।

কিছুক্ষণ পর শালবনের ভেতর এসে পড়ল তারা। দু'ধারে সারি সারি গাছ। পথটা একটু উঁচু হয়ে গেছে। লালমাটি। এই একটা নিচু জলা এলো। এই আবার শালবন। একঝাঁক পাখি ভারি মাতামাতি করছে।

বাবর জিজ্ঞেস করল, ভাল না?

হুঁ।

একদিন তোমাকে রাজেন্দ্রপুর নিয়ে যাব।

জাহেদা চুয়িংগাম মুখ থেকে বের করে সযত্নে কাগজে মোড়াতে লাগল। একটা বল বানাল ছোট্ট। তারপর জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল বাবর।

দূরে হাতের ডাইনে, ঘোড়াপীরের মাজার।

বাবর বলল, এখানে একটা মাজার আছে জান? একটা বুড়ো বটগাছ আছে। তার ডালে অসংখ্য সব লাল কাপড়ের টুকরো বাঁধা।

কেন?

যাদের ছেলে হয় না, তারা মানত করে, কাপড় বেঁধে দিয়ে যায়। হাজার হাজার। সবুজ পাতা আর লাল কাপড়ের টুকরোয় ভারি সুন্দর লাগে। ছবির মত। আমাদের যে কত অন্ধ বিশ্বাস, কত কুসংস্কার। একদিন নিয়ে যাব তোমাকে।

জাহেদা মুখ নিচু করল।

বাবার বলল, তোমার যখন বিয়ে হবে, আমি বলে দিচ্ছি, প্রথমে মেয়ে হবে তোমার। আমি মেয়ে খুব পছন্দ করি। অথচ লোকে কী মন খারাপ করে মেয়ে হলে। লোক দেখান হাসে বটে কিন্তু ভেতরে নিজেকে খুব ছোট মনে করে। এক সময় তো মেয়ে হলে গলা টিপেই মারত। আমার এক বন্ধুর কথা বলি। তার সঙ্গে তাদের দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখি একটা গোল কবর। অবাক কাণ্ড। জিজ্ঞেস করলাম, কার? আমার দাদির?

কবরটা গোল কেন?

আমিও তাই জিগ্যেস করলাম। শুনলাম ওখানে একটা ইঁদারা ছিল আগে। ওর দাদির তখন অল্প বয়স। কেবল এক ছেলের মা হয়েছে। সেই সময় বাড়িতে কীসের জন্যে যেন কাওয়ালীর আসর হয়েছিল। দাদি ভেতর বাড়ি থেকে চিক তুলে লুকিয়ে তা দেখছিল। সেই কথা জানতে পেরে আমার বন্ধুর দাদা বৌকে সেই রাতেই গোসল করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, ঐ ইঁদারায় ফেলে দেয়। তারপর সিমেন্ট করে দেয় মুখটা। পরে আমার বন্ধুর বাবা

সেখানে একটা মার্বেল পাথরে নাম লিখে দিয়েছেন। বুঝে দেখ, ঐ টুকুন অপরাধ।

সত্যি ?

হ্যাঁ আমি নিজে দেখে এসেছি কবরটা। তোমার মন খারাপ করে দিলাম ?

জাহেদা কোনো জবাব দিল না। ঠোঁট কামড়ে ধরে বসে রইল সে সমুখের দিকে চেয়ে। দূরে নয়ারহাটে অর্ধসমাপ্ত পুল। তীরের মত ক্রমাগত কাছে আসছে।

গাড়ি থামিয়ে ফেরির টিকিট কিনে ফিরে এলো বাবর। ঢালু বয়ে সন্তর্পণে নামল ঘাটে। ফেরি দাঁড়ানই ছিল। খালাসিরা হাত ইশারা করে ডাকতে লাগল বাবরকে। বাবর বলল, কপাল ভাল সঙ্গে সঙ্গে ফেরি পেলাম। এই রকম সব ক'টা পেলে চারটের মধ্যে রংপুর পৌছে যাব।

রংপুরে থাকব ?

হ্যাঁ আজ রাতে। কাল আবার বেরুব। কাল দিনাজপুরে। পচাগড় পর্যন্ত যাব। ফেরার পথে বগুড়া। বগুড়ার উপর দিয়েই যাব, কিন্তু আজ থামব না।

আগে থেকেই ইপিআরটিসির একটা কোচ দাঁড়িয়েছিল ফেরিতে। বাবরের গাড়ি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। কলকল জল সরিয়ে ওপারে যেতে লাগল ফেরিটা। জাহেদা অবাক হয়ে দেখতে লাগল দুটো নৌকা এক সঙ্গে বেঁধে কেমন পারাপারের ব্যবস্থা হয়েছে।

বাবর বলল, এতক্ষণে সত্যি সত্যি ঢাকা ছেড়ে চললাম।

গাড়ির সঙ্গে গা ঠেকিয়ে জাহেদা দাঁড়িয়ে রইল। নদীর প্রফুল্ল বাতাসে তার চুল মিহি ঝাউয়ের মত মুখে উড়তে লাগল। ভারি চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। যেন জীবনমৃত্যুর চিন্তা করছে জাহেদা।

কী ভাবছ ?

কিছু না।

জাহেদা এবার সকালে এই প্রথম নির্মল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভারি অবাক লাগল বাবরের। এতক্ষণ এই নির্মলতাই সে প্রার্থনা করছিল, কতবার কতভাবে কথা বলতে চেয়েছিল সে জাহেদাকে, আর এখন কী এমন হলো, কী এমন কথা তার ঐ ছোট্ট মাথায় পাখির মত বসল যে অমন সুন্দর হয়ে উঠল তার মুখ ? বাবর কিছু বুঝতে পারল না, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সেও প্রশস্ত হাসিতে নিজেকে সুন্দর করার চেষ্টা করল নদীর ওপর ভাসতে ভাসতে।

ওটা কী লেখা ?

জাহেদা খালাসিদের বুকে আঁটা পেতলের তকমার দিকে চোখ ইশারা করল।

তুমি তো বাংলা পড়তে জান না। ওখানে লেখা 'জনপথ'। মানে, হাইওয়ে বলতে পার। তোমাকে বাংলা শেখাব আমি।

জানেন, খুব অসুবিধা হয়। আজকাল একটু একটু বুঝতে পারি। জাহেদা হঠাৎ মুখ তুলে বাবরকে বলল, বাবা আমাকে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়িয়েছেন। মা জানেন না ইংরেজি। তাকে চিঠি লিখতে পারি না। লিখলে ইংরেজিতে লিখতে হয়।

তোমার বাবা সেটা পড়ে দেন মাকে ?

হ্যাঁ। কিন্তু সব সময় তো সব কথা বাবাকে জানিয়ে লেখা যায় না।

তা ঠিক। এই দ্যাখ না—বাবর একটু কাছে এলো জাহেদার। বলল, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলেছি, একেক সময় মনে হয়, যদি তুমি বাংলা বুঝতে।

বুঝি তো। আপনি বাংলাতেই বলবেন। জাহেদা এই প্রথম বাংলায় বলল আজ সকালে।

বলতে পারি। কিন্তু সব কথা, বাংলা সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না বলে ভয় হয়। কথার একটা অর্থ, সাধারণ অর্থ, সেটা বোঝা যায়, আরেকটা অর্থ দেশের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, মানুষের মনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। রক্তের মধ্যে থাকে সেই অর্থটা। সেটা বুঝতে হলে তোমাকে ছেলেবেলা থেকে বাংলা পড়তে হতো। এই যেমন ধর—শ্রাবণ। শ্রাবণ কী জান ?

জাহেদা হেসে বলল, জানব না কেন ? শ্রাবণ একটা বাংলা মাসের নাম।

শুধু তাই নয়। যদি বাংলা কবিতা পড়তে, বাংলা গান শুনতে, যদি বাংলা তোমার স্মৃতির মধ্যে থাকত তাহলে শ্রাবণ কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বপ্নের জগৎ খুলে যেত তোমার চোখে। একটা গম্ভীর গান শুনতে পেতে। একটা আকুলতায় তোমার মন হু হু করে উঠত।

আপনি আমাকে শেখাবেন ?

কেন শেখাব না ? তোমার জন্য আমি সব করতে পারি।

জাহেদা হঠাৎ জিগ্যেস করল, আর ক'টা ফেরি আছে ?

এরপর একটা। তারপর বড় ফেরি আরিচা থেকে নগরবাড়ি। তারপর আর একটাই মোটে।

আরো তিনটে। জাহেদা মুখ গোল করে বলল।

ওপারে এসে গাড়িতে ঠিকঠাক হয়ে বসে বাবর বলল, তুমি কিছু বল, আমি শুনি।

আমি কী বলব ?

বলার কথা কত আছে। তোমার কথা বল।

আমার কোনো কথা নেই।

তবু।

ভাবছি, একটা কথা ভাবছিলাম।

কী কথা।

আমি, আমি এখানে কী করছি ?

আমার সঙ্গে আছ। কথা বলছ। আমি গাড়ি চালাচ্ছি। আমরা এখন মানিকগঞ্জে আছি। এই।

আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় কোথায় যেন আছি, জানি না।

বাবর বলল, তুমি আছ অতীত ভবিষ্যতের মাঝখানে, আগেও যেখানে ছিলে, পরেও সেখানে থাকবে।

বাবর শুধু বলল না—কথাটা তার নিজের নয়। নীরবে সে দেখতে লাগল দূরে দ্রুত কাছে

আসা বাড়ি, গ্রাম, মানুষ, নৌকো, মুদি দোকান আসছে, সরে যাচ্ছে, আবার সরে যাচ্ছে। এক আধটা বাস ট্রাক সরাৎ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। চকিত ঝড় তুলে।

বাবর বলল কিছু বল।

জাহেদ চুপ করে রইল।

বাবর তখন বলল, গল্প শুনবে?

কী গল্প? আপনার?

আমি কি গল্প লিখি নাকি? এই এদিকে যা পড়েছি। একটা মজার গল্প বলি কেমন? একটা চুটকি। এক লন্ড্রীর দোকান। লন্ড্রীওয়ালা ছোকরা মানুষ। মেয়েদের দিকে ভারি চোখ তার। বসে আছে কাউন্টারে। এমন সময় এক তরুণী এলো খুট খুট করে। পরনে তার মিনিস্কার্ট। মিনি তো মিনি—যাকে বলে মিনি, কোমরের তলায় এসেই শেষ। ছোকরা হা করে তাকিয়ে আছে দেখে তরুণী বলল, ভারি বেয়াদব তো আপনি। ছোকরা একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে উত্তর দিল, বেয়াদব নয় ম্যাডাম। ভাবছিলাম আমাদের লন্ড্রীতে কাপড় ধুলে তো এত খেপে যাবার কথা নয়। বোধহয় পাশের লন্ড্রী থেকে ধুয়েছিলেন?

হা হা করে হেসে উঠল বাবর।

জাহেদা বলল, যাঃ। এটা আবার গল্প নাকি?

আচ্ছা আরেকটা শোন। এক পাগল। রাস্তায় এক দেয়ালে কান লাগিয়ে কী যেন শুনছে। দূর থেকে গোঁফওয়ালা এক পুলিশ দেখে ভাবল ব্যাপারটা কী? ব্যাটা আধ ঘণ্টা ধরে কান লাগিয়ে শুনছেটা কী? সেও এসে পাগলের পাশে কান লাগিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। অনেকক্ষণ কান লাগিয়ে রাখল, তবু কিছু শোনা গেল না। তখন মহা খাপ্পা হয়ে পুলিশটা বলল, এই ব্যাটা, এখানে তো কিছু শোনা যাচ্ছে না। পাগল তার জবাবে একগাল হেসে বলল, জি, আমিও কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

জাহেদা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, যা এ রকম হয় নাকি?

আরো শুনবে।

জাহেদা হাসতে হাসতে আরেকটা চুয়িংগাম বের করে মুখে পুরল। তার গোলাপি জিভ টুকু বেরিয়েই ভেতরে চলে গেল। মুগ্ধ হয়ে গেল বাবর। বলল, আরেকটা খাও।

এক সঙ্গে ক'টা খাব?

ঠিক বলেছ।

কথাটাতে বেশ একটু ওজন আরোপ করল বাবর। জাহেদা লক্ষ করে রাঙ্গা হয়ে গেল যেন।

বাবর জানে এখন কথা বলতে নেই। সে নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল। মানিকগঞ্জের সাইনবোর্ড তাদের অভ্যর্থনা জানাল এবং কিছু পরে বিদায়।

জাহেদা বলল, কই, আরেকটা গল্প বলবেন যে!

ভাবছি, কোনটা বলব?

খুব সুন্দর দেখে একটা।

আচ্ছা।

বাবর সত্যি মনে করতে পারছিল না কোন গল্প। মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগল সে। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ একটা মনে পড়ে গেল।

এই গল্পটা একটু বড়। হাসির নয় কিন্তু। আবার হাসিরও।

তা হোক।

এক দেশে ছিল এক চাষী। তার ছিল এক মেয়ে।

এতো রূপকথা।

কেন, খুব বয়স হয়ে গেছে নাকি তোমার ?

হয়েছেই তো।

তোমার মা রূপকথা বলতো ?

না বাবা বলতেন, বাংলাতে শুনলে নাকি আমার ইংরেজি খারাপ হয়ে যাবে।

শোননি রূপকথা ?

কনভেন্টে কত শুনেছি। সিন্ডারেলা, আলাদিন এন্ড ওয়ান্ডার ল্যাম্প, সেভেন ডোয়ার্ফস।

আজ একটা শোন। একটা শুনলে বুঝবে বড়দের জন্যেও রূপকথা হয়। জাহেদা নড়েচড়ে গ্যাট হয়ে বসল, যেন বসার ভঙ্গিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল, সে খুকি নয়, রীতিমত মহিলা।

বাবর বলতে শুরু করল এক দেশে ছিল এক চাষী, তার ছিল এক মেয়ে। একদিন সে রাজাকে বলল, তার মেয়ে খড় থেকে সোনা বানাতে পারে। বুঝে দেখ, যেন রাজার সঙ্গে তার রোজই দেখা হচ্ছে, এমনি একটা ভাব।

রূপকথায় ওরকম হয়।

শুধু তাই নয়, চাষীর কথাটাও মিথ্যে। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে রাজাকে বলেছে তার মেয়ে সোনা বানাতে পারে। মেয়েকে খুব ভালবাসত কিনা ? এখন বিপদ দ্যাখ, রাজা চাষীর মেয়েকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বলল, এখানে এক গাদা খড় রইল, যদি কাল ভোরের মধ্যে সব সোনা বানিয়ে দিতে না পার, তাহলে গর্দান যাবে। এই বলে রাজা চলে গেলেন তার প্রাসাদে। কী রকম গর্দভ দেখ রাজা ভদ্রলোকটি। প্রথম কথা একবারও তার মনে হলো না, এই মেয়ে যদি সোনাই বানাতে পারবে তা'হলে তার বাপের এত গরীবী হাল কেন ? দুই নম্বর, আমি রাজা হলে তো সেই ঘরে গদীনসীন হয়ে বসে দেখতাম কেমন করে খড়কে সোনা বানায়। রূপকথার রাজাদের কোনো কৌতূহল নেই।

আপনার টিপ্পনি রাখুন।

আরে, টিপ্পনি না কাটলে তো এটা বাচ্চাদের গল্প হয়ে যাবে। তুমি আর বাচ্চা নও।

গল্প বলুন।

বলছি।

বাবর একটা ট্রাক পেরিয়ে নিশ্চিন্তে গাড়ি চালাতে চালাতে বলতে লাগল, সারারাত সেই খড়ের গাদার ওপর বসে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদল মেয়েটা। সে তো আর সত্যি সোনা বানাতে জানে না। এখন কে তাকে উদ্ধার করবে এই বিপদ থেকে ? এমন সময়ে ঘরের মধ্যে টুক

করে লাফিয়ে পড়ল দেড়হাত লম্বা একটা মানুষ। লোকটা সব শুনে টুনে বলল, ঠিক আছে এই খড় সব সোনা বানিয়ে দিচ্ছি, বদলে তুমি আমাকে কী দেবে ? চাষীর মেয়ে বলল, আমার গলার এই হারটা দেব। লোকটা সোনা বানিয়ে হারটা নিয়ে চলে গেল। পরের দিন রাজা তাকে আরো একটা বড় ঘরে আরো বেশি খড় দিয়ে বলল, এগুলোও সোনা বানিয়ে দাও। মেয়েটা সারারাত কাঁদল, আবার সেই দেড় হাত মানুষটা এলো। মেয়েটা এবার তাকে হাতের আংটিটা খুলে দিল। পরদিন ঘর ভর্তি সোনা দেখে রাজা মহাখুশি। আরেকটা ঘর ভর্তি খড়কে যদি তুমি সোনা বানিয়ে দিতে পার তাহলে তোমাকে আমি আমার রাণী বানাব, আর যদি না পার তাহলে গর্দান যাবে। রূপকথার শাস্তি শুরুই হয় গর্দান নেয়া থেকে। তাই না ?

জাহেদা হাসল। ভাগ্যিস তখন জন্মাইনি।

বাবর বলে চলল, সেদিন রাতেও মেয়েটা কাঁদতে বসল। এলো সেই দেড় হাতি মানুষটা। তাকে বলল সব।

তরার ঘাটে ফেরি পাওয়া গেল না। ফেরি তখন ওপারে। জাহেদা জিগ্যেস করল, কতক্ষণ লাগবে ?

এই এক্ষুণি এসে যাবে। তারপর শোন, লোকটা বলল আমি সব সোনা করে দিচ্ছি কিন্তু আজ তুমি আমাকে কী দেবে ? মেয়েটা বলল, আর যে কিছু নেই আমার।

জাহেদা বলল, চাষীর মেয়ে হার আর আংটিই বা পেয়েছিল কোত্থেকে ?

রূপকথার চাষীর মেয়েদের ওরকম থাকে। এবার কিন্তু তুমি টিপ্পনি কাটছ।

সঙ্গদোষে।

হেসে উঠল বাবর। বলল লোকটা তখন একটা জিনিস চাইল।

কী ?

না, তাকে নয়।

যাহ।

সে চাইল, তুমি যখন রাণী হবে, তারপর যখন ছেলে হবে, সেই ছেলে দিতে হবে। রাজি হয়ে গেল মেয়েটা। ভেবে দেখ, জ্বলজ্যান্ত নিজের ছেলেকে দিতে রাজি হয়ে গেল সে। একেই বলে স্ত্রী বুদ্ধি।

কী বললেন ?

কিছু না। তারপর মেয়েটার তো বিয়ে হলো ? এক বছর গেল। সত্যি একটা ছেলে হল মেয়েটার। একদিন দোলনায় তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে এমন সময় সেই দেড় হাতি লোকটা এসে হাজির। বলে, ছেলে দাও।

তারপর ?

মেয়েটি কেঁদে বলল, তোমাকে টাকা পয়সা হীরে জহরৎ যা চাও তাই দেব, তুমি শুধু আমার ছেলেকে নিও না। কী বুদ্ধি! যে লোকটা খড়কে সোনা বানাতে পারে তাকে কি-না সে সাধছে টাকা পয়সা।

গল্পে ওরকম হয়। তারপর ?

লোকটা তার কান্না শুনে একটু নরম হলো। বলল, ঠিক আছে, তোমার ছেলে নেব না এক শর্তে, যদি তুমি আমার নাম বলতে পার। তিন বারের মধ্যে বলতে হবে। বলতে না পারলে ছেলে চাই। মেয়েটি বলল আচ্ছা। তারপর সে চারদিকে চর পাঠাল— দেড় হাত একটা লোক, যাদু জানে, তার নাম কেউ বলতে পারে ? সাত দিন সাত রাত পরে চর এসে জানাল, হ্যাঁ মহারাণী নাম জানা গেছে।

কী নাম ? জাহেদা জিগ্যেস করল।

বাবর বলল, ফেরি এসে গেছে। আগে ফেরিতে উঠেনি।

ফেরিতে উঠে গাড়ি থেকে বেরুল ওরা। ফেরির পেছন দিকে একটা রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল বাবর। তার পাশে জাহেদা। জাহেদার কালো ছায়া পড়েছে পানিতে। ঢেউয়ের দুষ্টুমিতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। বাবর একটু সামনে ঝুঁকল। এবার তার ছায়াটা স্পর্শ করল জাহেদার ছায়া। প্রীতি চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে বাবর। তারপর চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল বাতাসে পাজামা কামিজ সেঁটে গেছে জাহেদার ঊরুতে। একটা গভীর Y-এর সৃষ্টি হয়েছে। নিটোল দুটি ঊরু স্বাস্থ্যে ফেটে পড়ছে যেন। মনে মনে বাবর সেখানে মুখ রাখল। বেড়ালের মত ঘষল খানিক।

জাহেদা বলল, গল্পটা কী হলো ?

তখন চমক ভাঙ্গল বাবরের। সে জাহেদার দিকে তাকিয়ে হাসল।

ওপারে গিয়ে বলব। এখন একটু নদী দেখি।

জাহেদা নদীর দিকে তাকিয়েই দেখতে পেল তার ছায়া বাবরের ছায়া ছোঁয়াছোঁয়ি হয়ে আছে। তারপর আকাশের দিকে চোখ রাখল। চিবুকের তলায় লাল কয়েকটা সূক্ষ্ম শিরা তখন দেখতে পেল বাবর। রোদ্দুরে যেন স্বচ্ছ হয়ে গেছে তার গ্রীবা। একটু নিরিখ করলে যেন ভেতরে সব কিছু দেখা যাবে।

চুল উড়ছিল খুব। জাহেদা গাড়ির ভেতর থেকে একটা রুমাল নিয়ে এলো। মুঠি করে বাঁধল চুলগুলো। টানটান হয়ে চুল বিছিয়ে রইল কপালের দু'পাশে। তখন নতুন মনে হলো জাহেদাকে। একেবারে অন্য চেহারা।

বাবর বলল কালো কামিজে তোমাকে মানায়নি।

খুব মানিয়েছে।

সকালে ভালই লাগছিল। এখন ততটা না। তোমাকে নীলটা মানায়।

আছে সুটকেশে।

তাই নাকি ? পরশু তো চিনতেই পারলে না যখন বললাম।

হোস্টেলে গিয়ে খুঁজে বের করেছি।

তোমাদের হোস্টেল সুপার কিছু সন্দেহ করেনি তো ?

কেন ?

যদি ধরা পড়তে।

বাবা আমাকে আস্ত রাখত না।

ধর, আমি যদি তোমাকে চুরি করি।

ইস, আমাকে চুরি করা সোজা নয় সাহেব।

চলে এলে বিশ্বাস করে ?

এসেছি তো ?

মুখে বলল বটে কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে জাহেদা নতুন করে বাবরের দিকে তাকাল। আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল কিছু। বাবর তখন হেসে বলল, গল্পটা শোন। আটদিনের দিন সেই দেড়হাতি লোকটা এসে হাজির। বল, আমার নাম বল। তিন বারের মধ্যে বলতে হবে। মেয়েটি জানে তার নাম, তবু স্বভাব তো, মেয়েলিপনা করে বলল, তোমার নাম গিরিশৃঙ্গ। উহুঁ হলো না। তাহলে, উদ্ভটবর্তুল ? না তাও নয়। তোমার নাম দেড় আংলা। তখন লোকটা বলল, হাঁ হয়েছে কিন্তু ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল তার, সে দড়াম করে পড়ে মরে গেল।

সে-কী!

হ্যাঁ।

লোকটা বোধহয় ওকে ভালবেসেছিল।

সে তোমরা বলতে পারবে। তারপর শোন। আগে নামি।

বাবর জাহেদার হাত ধরে গাড়িতে নিয়ে এলো। গাড়ি যতক্ষণ না ফেরি থেকে রাস্তায় এলো ততক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর সড়কে পড়তেই গতি বাড়িয়ে বলতে শুরু করল সে, একদিন রাজা বলল, রাণী, আজকাল তুমি আর সোনা বানাও না যে। তখন মেয়েটি বলর, সোনা তো আমি বানাতাম না, বানাত একটা দেড় হাতি লোক। বলে সব ঘটনা রাজাকে জানাল সে। রাজা তো রেগে কাঁই। রাণীর মুঠি ধরে জিগ্যেস করল, তার মানে তুমি বলতে চাও একটা অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে পরপর তিন রাত তুমি কাটিয়েছ। তোমাব ছেলেকে এক বছর পরে এসে সে চেয়েছে। তারপরও তুমি বলতে চাও এ ছেলে তার নয়, আমার ? আমাকে বুদ্ধু, গাধা, গোবর-গণেশ পেয়েছ ?

ওমা, সে-কী কথা।

মহারাণী, এই হচ্ছে রূপকথা। বল তো ছেলেটা আসলে কার ?

কী যে বলেন।

বল না ? তিন রাত লোকটা মেয়েটার ঘরে এসেছে। কিছু হয়নি ? শুধু হার আংটি নিয়েই খুশি থেকেছে সে ?

দেখুন, দেখুন, সামনে একটা কত বড় পুল। জাহেদা অন্য কথা বলল।

তোমার কী মনে হয়ে বল না ?

এর পরে তো আরিচা ?

হ্যাঁ। আমার কী মনে হয় জান, রাজা আসলে অতটা গর্ধভ নয়। ও ছেলেটা ঐ ব্যাটা দেড় আংলারই।

জাহেদা মনোযোগের সঙ্গে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। বাবর মনে মনে বলল, তুমিও আমার সঙ্গে তিন দিনের জন্যেই যাচ্ছ। কল্পনায় সে স্পষ্ট দেখতে পেল নিজেকে— জাহেদার ওপর শুয়ে দম বন্ধ করা চুমোয় বেঁধে রেখেছে তাকে। মুখের ভিতরটা সরসর করে উঠল বাবরের। মাথার ভেতরে কেমন একটা ঝিম সৃষ্টি হল যেন। ঠোঁটে একটা অর্থহীন হাসি। সে গাড়ি চালাতে লাগল।

ছোট্ট একটা হাই তুলল জাহেদা। বাবর ভাবল, এরপর বোধহয় কিছু বলবে। কিন্তু বলল না। মাইলের পর মাইল পার হয়ে যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর বাবর বলল, কিছু বলছ না।

এমনি।

তবু কিছু বল।

কী বলব ?

কেন, নিজের কথা।

আমার কোনো কথা নেই। বলেই একটুখানি হাসল জাহেদা।

হাসছ যে।

আপনার কথা শুনে মনে পড়ল, ইস্কুলে রচনা লিখতে দিত, একটি পয়সার আত্মজীবনী, একটি ছাতার আত্মজীবনী, একটি পেন্সিলের আত্মজীবনী— এইসব।

সেই রকম করেই না হয় বল।

আমি একজন মেয়ে। আমার একটি নাক, দুইটি কান ও দুইটি চোখ আছে। চোখ দিয়ে আমি দেখিয়া থাকি। কান দিয়া শ্রবণ করি।

চাপা হাসিতে প্রায় উপুড় হয়ে পড়ল জাহেদা। তার পিঠে আলতো একটা চাপড় দিয়ে বাবর বলল, খারাপ বলেছি ?

বাবর জানে এইভাবে এগুতে হয়। এখন একটি চাপড় দিলেও জাহেদা কিছু মনে করবে না। সত্যি জাহেদা সেটা লক্ষও করল না। হাসতে হাসতে মাথা তুলে বলল, আপনার সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল। সত্যি আমার কিছু বলার নেই।

ভুল। সবারই বলার কথা আছে। তুমি আমাকে বলতে চাও না।

বিশ্বাস করুন।

হ্যাঁ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বাস না কচু। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল বাবরের। দু' পয়সা দাম দিই না। আমি যা চাই তা এমনি তোমার পাজামা ছিঁড়ে ভেতরে যেতে। কী ক্লান্তিকর এই অভিনয়, এই সহাস্য মুখ তৈরি করা, এই কথার মালা গাঁথা। আমি যদি হঠাৎ এখন তোমাকে জড়িয়ে ধরে মুখে রুমাল গুঁজে ধর্ষণ করি ? কে বাঁধা দেবে ?

কিন্তু সে হাসল। এবং আরেক বার বলল, তোমাকে বিশ্বাস করি। কণ্ঠ যথাসম্ভব ভিজিয়ে নির্বিকার চিত্তে সে দ্বিতীয় মিথ্যে যোগ করল, আমি চাই তুমি আমাকেও বিশ্বাস কর। কর না ?

করি।

আমি কৃতার্থ।

কী যে বলেন।

জান, এর আগে, আর কোনদিন, কেউ, কখনো আমাকে এতটা বিশ্বাস করেনি। নইলে তুমি আসতে না। এই বাস্তবটা স্বপ্ন হয়ে থাকত। প্রিয়জনের সঙ্গে বাস্তবও স্বপ্ন হয়ে যায়, যেমন এখন হয়েছে। বাংলাটা তুমি বুঝতে পারছ?

হ্যাঁ।

তুমি খুব অল্প দিনে শিখতে পারবে। আমি নিজে তোমাকে শেখাব।

বাবর প্রসঙ্গ বদলালো ইচ্ছে করে। জাহেদাকে সে ভাববার অবকাশ দিতে চায় না। একমুখী একটা ঝড়ের মত তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেখানে— যেখানে সে নিজেকে দেখছে জাহেদার সঙ্গে শুয়ে আছে সদ্য জাত দু'টি শিশুর মত।

আর কোনো কথা বলল না কেউ। ওরা আরিচায় এলো। শুনল ফেরি আসতে এখনো এক ঘণ্টা দেরি।

কিছু খাবে জাহেদা?

এখানে কি পাওয়া যায়?

আমার সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আছে। এখান থেকে মিষ্টি খেতে পার। চমচম খাবে? ছেলেবেলায় আমি খুব পছন্দ করতাম। খাও না?

জাহেদা মাত্র আধখানা চমচম খেল।

খাও, একটা খেলে এমন কিছু মোটা হয়ে যাবে না।

আপনি কী মনে করেন? সব সময় ফিগারের কথাটা চিন্তা করি?

বকুনি খাওয়া শিশুর মত কাঁচুমাচু হলো বাবর। দেখে হেসে ফেলল জাহেদা। বলল, আচ্ছা, বলছেন যখন। যা মিষ্টি। এই জন্যে খেতে চাচ্ছিলাম না।

চা খেয়ে নদীর পার দিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। কত অসংখ্য নৌকো। ছোট, বড়, ছৈওলা, মহাজনি, ডিঙ্গি, শালতি কোষা, ছিপ। একটা নৌকা ভারি চোখে ধরল বাবরের। ঝকঝকে ছৈ, গলুইয়ে গাঢ় কমলা রঙের সারি সারি ত্রিভুজ আঁকা, তিমি মাছের লেজের মত সর সর করে পানি কাটছে গাব দিয়ে মাজা হাল। ভেতর থেকে নীল শাড়ি পরা একটা বৌ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে চলমান পাড়ের দিকে।

হঠাৎ যেন বাবর দেখতে পেল এই রকম একটা নৌকোয় জাহেদাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে সে। নিচে কুলকুল করছে পানি। টিপটিপ করছে জাহেদার বুক। তার দু'পায়ের ভেতর স্বপ্ন গুঁজে বিভোর হয়ে শুয়ে আছে সে। বাবর অস্পস্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, তোমাকে একবার নৌকোয় চাই।

কিছু বললেন?

নাতো। হেসে ফেলল বাবর। নৌকোটা ভারি সুন্দর। বৌ বোধহয় বাপের বাড়ি যাচ্ছে।

কী করে বুঝলেন?

শ্বশুর বাড়ি হলে অমন চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকত না।

অবাক হয়ে গেল জাহেদা? বলল, সত্যি, এত কথাও আপনার মাথায় ঢোকে। এই রকম একটা ধাঁধা ছিল না আপনার টিভিতে।

ছিল। বাহ্ তোমার মনে আছে তো?

হোস্টেলে আমাদের সেট আছে যে। খাবার পর এক ঘণ্টা দেখতে দেয়।

বাবর অন্যমনস্কভাবে হাসল। এখনো তার চোখে নৌকোর স্বপ্নটা ভাসছে। নৌকোয় সে কখনো কোনো মেয়েকে নিয়ে যায়নি। কথাটা মনেই হয়নি তার। এবারে মনে রাখবে। একদিন জাহেদাকে নিয়ে যাবে সে।

বাবর বলল, চল, ওদিকে যাই। মাছ বিক্রি হচ্ছে। দেখবে।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁ দিকে চলে গেল তারা যেখানে জেলেরা বড় বড় রুই অবলীলাক্রমে দু'হাতে তুলছে, দাম বলছে, মাথা নাড়ছে, আবার মাছটা রেখে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল ওরা।

একটা মাছ নেবে?

নিয়ে কী হবে? জাহেদা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

এমনি দেখতে কত ভাল লাগছে।

চলুন, চলুন। যা ভাল লাগে তাই কিনতে হয় বুঝি। কী সাংঘাতিক লোক আপনি। চলুন তো।

জাহেদা প্রায় টেনে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনল। দূরে দেখা ফেরি জাহাজটা ধীরে ধীরে আসছে। সাদার রংটা প্রায় মিশে গেছে নদীর রূপালি পানির সঙ্গে। স্মৃতি বিস্মৃতির মাঝখানে ভাসমান একটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

বাবর বলল, ঐ আমাদের ফেরি।

কই?

আরে ঐ তো।

কই, দেখছি নাতো।

এইখানে দ্যাখ।

বাবর ডান হাত তুলে বাঁ হাতে জাহেদার মাথাটা ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে করে দিল।

এবার দেখতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ।

বাবর হাতটা সরিয়ে নিল ওর মাথা থেকে। চুলগুলো অদ্ভুত খসখসে। বোধহয় ঘন করে স্প্রে ছড়ায় জাহেদা। কেমন আঠাল আর ভারি।

বাবর বলল, চুলে এত স্প্রে দাও কেন?

জাহেদা বাবরের চোখের দিকে তাকাল হঠাৎ।

এতটা দিও না। এত সুন্দর চুল, নষ্ট হয়ে যাবে!

আপনি কী জানেন ? স্প্রে না দিলে চুল বানানো যায় ?

বানানো মানে ?

তাও জানেন না। চুড়ো ফুলে থাকবে কী করে ? চুর হবে কী করে ?

জাহেদা যেন ভারি মজা পেয়েছে, খিলখিল করে হেসে উঠল।

বাবর গম্ভীর হবার অভিনয় করে বলল, ও, জানতাম না। শিখলাম।

থাক, মেয়েদের এসব শিখতে হবে না।

কোনো কথাই ফেলা যায় না। কখন কোনটা কাজে লাগে।

টিভিতে ধাঁধা দেবেন না কি ?

বাবর একটু আহতই হলো। তার কি আর কোনো ক্ষেত্র নেই ধাঁধা ছাড়া ? সবাই তাকে ঐ একটা ছকে ফেলে দেখে কেন। আবার হঠাৎ মাথার ভেতরে বাঘটা লাফিয়ে উঠল তার। ইচ্ছে করল, নিষ্ঠুর একটা চুমোয় সবটা রক্ত শুষে নেয় জাহেদার, তার পেছনে প্রচণ্ড একটা চাপড় দেয় যেন হাতের পাঁচটা আঙুল নীল হয়ে বসে থাকে।

বাবর স্পষ্ট দেখতে পেল চোখের সমুখে, আকাশ জোড়া, ঈষৎ রক্তাভ একটি নিতম্ব, তাতে পঞ্চনদের মত আঙুলের পাঁচটি নীল দাগ।

হাঁটতে হাঁটতে বাবর বলল, জান, ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতাম বড় কবি হবো।

হলেন না কেন ?

কবি কি হওয়া যায় ?

ইচ্ছে থাকলেই হওয়া যায়। আপনি হতে পারতেন।

পারতাম ?

হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস আপনি হতে পারতেন।

কিন্তু হইনি। ক্লাশ এইটে যখন পড়তাম তখন শেফালি ফুল নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম। আর একটা লিখেছিলাম কলেজে থাকতে, তাজমহলের উপর। প্রেম সম্পর্কে খুব বড় বড় কথা ছিল ওতে। এখন হাসি পায়।

কেন ?

কী, কেন ?

হাসি পায় কেন ?

হাসি পায়, প্রেম তখন সাংঘাতিক একটা কিছু বলে মনে হতো, তাই।

জাহেদা হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। এক পলক কোথায় যেন অন্তর্হিত হলো মেয়েটা। বাবর কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল, চল, আরেকটু চা খাইগে।

গাড়ির কাছে এসে বলল, তুমি গাড়িতে বসে খাও। আমি টিকিটটা করে আনি।

ফিরে এসে দেখে, জাহেদা দু'হাতে চিবুক রেখে চুপ করে বসে আছে। আর তার কাছে হাত পাখা বিক্রি করবার চেষ্টা করছে একটা বুড়ো লোক। বাবরকে দেখে লোকটা এগিয়ে এসে কয়েকটা পাখা পাড়িয়ে দিল।

শীতকালে হাতপাখা দিয়ে কী হবেরে বাবা ?

নিয়া যান, কত কামে লাগে, আমাগো সাহায্য হয়।

আচ্ছা, দাও একটা।

জাহেদাকে দিয়ে বলল, কেমন, সুন্দর না ?

হুঁ!

ও-রকম করে আছ যে ? চা খেয়েছ ?

হ্যাঁ। আপনি খান।

দাও।

জাহেদা সন্তর্পণে চা ঢেলে দিল বাবরকে। জাফরান রং করা নখগুলো ঘিরে ধরল প্লাস্টিকের পেয়ালাটা। পরশু যে রংটা লাগিয়েছিল আজও সেটা আছে। পাঁচটা সযত্ন ফোঁটার মত দেখাচ্ছে কোনো নববধূর কপোলে! বাবরের ইচ্ছে করল ছুঁয়ে দেখে। বাবর সেই ভবিষ্যতকে দেখতে পেল, যখন কম্পিত আঙুলের ডগায় অন্ধকারে তার পিঠে এসে বসবে ঐ জাফরান ফোটাগুলো। বাবর তার ট্রাউজারের ভেতরে বাসনার সঞ্চরণ এবং উত্থান অনুভব করতে পারল। দগ্ধ হতে লাগল উত্তাপে। কিন্তু এ উত্তাপ পোড়ায় না, পরিণামে ছাই করে না, নিরবধি শুধু বিকীর্ণ হতে থাকে এবং কিছু করা যায় না।

অসহ্য এই অভিনয়। এই ছলাকলা। এই শোভন সদালাপ। তার চেয়ে যদি এমন হতো, স্পষ্ট বলা যেত আর সে শুনত।

দাঁতে দাঁত ঘষল বাবর।

জাহেদা এই প্রথম জিগ্যেস করল, চুপ করে আছেন যে!

কই, না।

হেসে ফেলল বাবর। সুন্দর করে হাসল। তার সেই বিখ্যাত রমণীমোহন হাসিটাকে বের করে দেখাল সে। আর মনে মনে বলল, খেলারাম খেলে যা।

১২

আরিচার পর বাঘাবাড়ি। শেষ ফেরি এটাই। তারপর সোজা একটানা রংপুর। বাঘাবাড়িতে এসে রেস্ট হাউস দেখে জাহেদা বলল, একটু দাঁড়ান।

তার ছোট্ট সুটকেশটা নিয়ে জাহেদা ভেতরে চলে গেল।

একটা বাবলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইল বাবর। ওপাশে নিচু জমিতে একটা মরা গরু পড়ে আছে। কয়েকটা শকুন খুবলে খুবলে খাচ্ছে তার পচা মাংস। বহুদূরে একটা কুকুর বসে বসে জিভ বার করে তাই দেখছে। কয়েকটা ন্যাংটা ছেলে এসে ভিড় করেছে বাবরের চারপাশে। সে গাড়ি থেকে তাদের একটা বিস্কুটের প্যাকেট বার করে দিল। তারা তো প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের দেয়া হয়েছে। তারপর যখন বিশ্বাস হলো, প্যাকেটটা নিয়ে দে ছুট কলরব করতে করতে । বাবর হা হা করে হেসে উঠল। তার ফেলে দেয়া

সিগারেটের টুকরো পথ চলতে পেয়ে গেল বুড়ো। নির্বিকার মুখে টানতে টানতে সে মাঠের মধ্যে নেমে গেল।

জাহেদা বেরিয়ে এলো।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল বাবর। জাহেদা কালো পোশাকটা পালটে নীল জামা নীল পাজামা পরে এসেছে। মাথায় একটা নীল রিবণ দিয়েছে। রং বুলিয়েছে ঠোঁটে। মুখে মিহি গোলাপি পাউডারের আভা। চোখের কোলে একটুখানি পেন্সিল পরেছে, আরো গভীর এবং সজল লাগছে এখন।

বাবর প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হলো। জাহেদাও হাসল তারপর ঘুরে যখন গাড়িতে বসল তখন তার প্রশস্ত নিতম্ব দুলে উঠল গুরুভার একটা কোষার মত।

বাবর বলল, কিছু খেয়ে নেবে ?

ক্ষিদে নেই।

আরিচা থেকে আবার স্তব্ধতা পেয়ে বসেছে জাহেদাকে। ফেরিতে সারাক্ষণ উদাস হয়ে বসেছিল সে।

গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বাবর বলল, তোমার ভাল লাগছে না ?

হ্যাঁ।

অনেক কিছু দেখার আছে। মহাস্থান দেখব, রামসাগরে যাব, কান্তজীর মন্দির— সারা উপমহাদেশের পোড়া মাটির ফলকে তৈরি একমাত্র মন্দির, সেটা দেখবে। আর এভারেস্ট দেখবে পচাগড় থেকে। পাহাড় দেখেছ কখনো ?

চাটগাঁয়ে দেখেছি।

সে তো বাচ্চা পাহাড়। তোমার মত।

বাবর রসিকতা করল এবং হাসিটা দীর্ঘস্থায়ী করে রাখল। জাহেদাও হাসল, কিন্তু কেমন যেন আনমনা সে। তখন বাবর আর কিছু বলল না। খুব চড়া রোদ দেখে কালো চশমা পরে নিল।

কিছুক্ষণ পর ডানে দেখিয়ে বলল, এই রাস্তা দিয়ে শিলাইদহে যাওয়া যায়। ফেরার পথে তোমাকে নিয়ে যাব। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে এখানে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছ ?

হ্যাঁ শুনেছি। কী মনে করেন ? আমি তার গানও শুনেছি।

ভাল লাগে তোমার ?

লাগে। তার একটা গল্পও পড়েছি। 'দি হোম কামিং'।

'দি হোম কামিং' ? বাবর মনে করতে পারল না কোন গল্পের কথা জাহেদা বলছে। সে আবার জিগ্যেস করল, কী আছে বলতো ওতে ?

একটা ছোট্ট ছেলে। মানিক না ফটিক নাম।

ওহো। বাংলায় ওটার নাম 'ছুটি'। অতি বিখ্যাত গল্প। ইংরেজিতে 'দি হোম কামিং' নাকি ? জানতাম না। রবীন্দ্রনাথ এই শিলাইদহে বসে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প, গান আর কবিতা লিখেছেন। তুমি যখন বাংলা শিখবে তখন তার বই পড়তে দেব।

পড়ব।

জাহেদার উচ্চারণে এমন একটা মিনতি ছিল যার অর্থ আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দাও। বাবর তাই দিল। নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল সে। উল্লাপাড়া পার হয়ে গেল। আজ বোধহয় এখানে হাটবার। দলে দলে লোক চলেছে কত রকম জিনিস নিয়ে। বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে। আড় হয়ে পড়ে আছে কোথাও কয়েকটা গরুর গাড়ি। এরই মধ্যে হঠাৎ একটা পালকি দেখা গেল। দু বেহারা হুম হাম করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খয়েরি রংয়ের ওপর সাদা চুণে লতাপাতা আঁকা পালকির গায়ে। দরোজা বন্ধ। বোধহয় বৌ যাচ্ছে।

বাবর গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, ওটা কী দেখেছ ? পালকি। আজকাল দেখাই যায় না। আমিও প্রায় পঁচিশ বছর পরে দেখলাম।

মিষ্টি করে হাসল জাহেদা। কিন্তু তেমনি অন্যমনস্ক।

আবার বাঁধান রাস্তায় টায়ারের শনশন আর এঞ্জিনের একটানা আওয়াজ শোনা যেতে লাগল শুধু। বাবরের একটু মাথা ধরেছে, এইমাত্র বুঝতে পারল সে। ঠিক মাথা ধরা না, যেন কিছুক্ষণ পর ধরবে।

জাহেদা হঠাৎ জিগ্যেস করল, আচ্ছা আপনি একা থাকেন কেন ?

বাবর ভাবল, আবার সেই প্রশ্ন। কতজন কতভাবে এই এক কথা জিগ্যেস করেছে। মনে হয় মায়ের থেকে বেরিয়েই এ কথা শুনতে শুরু করেছে সে। একা থাকেন কেন ? বিয়ে করে বৌয়ের সঙ্গে বেশি তাল দিলে লোকে প্রশ্ন করবে, উনি অতটা স্ত্রৈণ কেন ? বৌ থেকে দূরে দূরে থাকলে তারা মুখর হয়ে উঠবে, বৌকে ভালবাসেন না কেন ? বাচ্চা না হলে, বাচ্চা হচ্ছে না কেন ? বাচ্চা যদি হয়, আর কত বংশবৃদ্ধি করবেন ? আর যদি কিছুই না করে ঘরে খিল দিয়ে থাকা যায়, প্রেমে ব্যর্থ হয়েছিল নাকি ভদ্রলোক ? নাকি নপুংশক।

মুক্তি নেই।

বাবর মুখে বলল, একা থাকি মানে ?

মানে, বিয়ে করবেন না নাকি ?

বাবরের খুব পছন্দ হলো জাহেদাকে এখন। খুব সুন্দর পছন্দ গলায় বলেছে কথাটা। বোধ হয় ওরা যাকে বিশ্বাস বলে থাকে তারই ফলে কণ্ঠ এ-রকম স্বছন্দ হয়।

হাসছেন কেন ?

না, হাসছি না। কী জবাব দেব ভাবছি।

বাবর ভাবল যা সত্যি তা বললে ও বুঝতে পারবে না। বিয়ে সে করবে কেন ? শরীরের জন্যে ? সে প্রয়োজন বিয়ে না করেও মেটান যায়। বরং তাতে তৃপ্তি আরো অনেক। বিবাহিত বন্ধুদের কি সে শোনেনি স্বীকারোক্তি করতে ? বৌয়ের সঙ্গে শুয়ে সুখ নেই। বন্ধুরা কি তাকে বলেনি, দে না একটা মেয়েটেয়ে যোগাড় করে ? বিয়ে করবে সন্তানের জন্যে ? সন্তান সে চায় না। চায় না তার উত্তারাধিকার কারো উপরে গিয়ে বর্তাক। আমার জীবনের প্রসারণ আমি চাই না। মৃত্যুর পরেও আমি বেঁচে থাকতে চাই না। আমার এমন কিছু সম্পদ নেই, অর্জন নেই, উপলব্ধি নেই যা যক্ষের মত আগলে রাখার স্পৃহা বোধ করি ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্যে। এ জীবন আমি চাইনি, অতএব কারো জীবনের কারণও আমি হতে চাই

না। বিয়ে করব ভালবেসে ? ভালবাসা বলে কিছু নেই। ওটা একটা পন্থা। পন্থা কখনো লক্ষ্য হতে পারে না, নিবৃত্তি নেই তাতে। ভালবাসা একটা অভিনয়ের নাম।

কিন্তু জাহেদা এতসব বুঝবে না। কিম্বা সে বোঝাতে পারবে না। লোকে যতই বলুক, সে সুন্দর করে কথা বলতে পারে, সে নিজে জানে অনেক কথাই সে গুছিয়ে বলতে জানে না, এবং তাদের সংখ্যাই অধিক। তাই আর দশজনের মত সে বলল এবং মিথ্যে হলেও বলল, তোমাকে সত্যি কথা বলতে কী ? একজনকে ভালবাসতাম তার ভালবাসা পাইনি, তাই একা আছি।

জাহেদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাবর প্রীত হলো একটি অনবদ্য মিথ্যা কথা সুন্দর করে বলতে পেরেছে ভেবে।

সত্যি ?

হ্যাঁ সত্যি।

কোনোদিন বলেননি তো ?

কোনোদিন তো জিগ্যেস করনি।

কে সে ?

বাবর একটু হাসল। এইভাবে অবকাশ নিল দ্বিতীয় মিথ্যে রচনার। বলল, তাকে তুমি চিনবে না। সে এখানে নেই। বিলেতে আছে এখন।

বিলেতে ?

হ্যাঁ, ওর স্বামী ওখানে এম্‌ব্যাসিতে আছে।

কবে বিয়ে হয়েছে ?

সে পনের বছর আগে। তুমি তখন বোধ হয় টলমল করে হাঁট। কত বয়েস হবে তখন তোমার ? তিন ? চার।

জাহেদা তার জবাব না দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আর দেখা হয় না ?

হবে কী করে ? সে বিলেতে, আমি ঢাকায়। হ্যাঁ, মাঝখানে একবার দেশে এসেছিল। এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা। ব্যাগেজের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি কী একটা কাজে ভেতরে ঢুকেছিলাম। বাবর থেমে থেমে বানিয়ে বানিয়ে বলে যেতে লাগল, যেন সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে এখন। দেখি ওর পায়ের কাছে ছোট্ট ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে।

কথা হলো না ?

না।

না ? প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। বলল, কেন ?

ও বলল না। আমাকে দেখেও দেখল না। আমি চলে এলাম।

জাহেদা উদাস হয়ে গেল। যেন কল্পনা করতে লাগল এয়ারপোর্টের ছবিটা। বাবর আপন মনেই হাসল। কত সহজে বিশ্বাস করে ওরা। তার চমৎকার মিথ্যেটাকে সত্যি মনে করে বুকের ভেতর ভাঙ্গন অনুভব করছে মেয়েটা।

জাহেদা অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, ভালবাসা তবে কী ?

মনে মনে বাবর বলল, খুব ভাল কথা তুলেছ। তোমাকে বলব। তাহলে তোমাকে পাওয়া সহজ হবে। পাজামা খুলতে এতটুকু গ্লানি বোধ করবে না তুমি।

কিন্তু সরাসরি তার জবাব না দিয়ে সে একটু খেলা করতে চাইল। বলল, কোনোদিন তুমি ভালবেসেছ, জাহেদা ?

না।

মুখে বলল, এবং একই সঙ্গে মাথা নাড়ল জাহেদা। পরে হেসে ফেলল। কোলের উপর আসা কামিজটাকে নামিয়ে দিয়ে মসৃণ করতে লাগল ভাঁজগুলো।

বিশ্বাস করি না।

সত্যি বলছি।

হতেই পারে না। আমাকে বলতে কী ? বল ?

জাহেদার মুখ থেকে হাসিটা হঠাৎ নিভে গেল। তারপর দপ করে জ্বলে উঠল বাতিটা। মাথাটা কাৎ করে দরোজার হাতল বাঁ হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, কী শুনবেন ? সে অনেক আগের কথা।

তবু শুনব। বল তুমি।

না।

বল। ছেলেটা তোমার কাজিন ছিল, না ?

কী করে জানলেন ?

আমি জানি।

ইস, অন্ধকারে একটা ঢিল লেগে গেছে, বুঝি, বুঝি।

বাবর হাসল। নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানে, জাহেদা না বলে পারবে না। শুধু একটু সময় নিচ্ছে।

জাহেদা বলল, একদিন, আমার এখনো মনে আছে, ছাদের ওপর আমরা সন্ধেবেলায় হাত ধরাধরি করে বসেছিলাম।

তোমাদের বাসায় থাকত ?

না। বেড়াতে এসেছিল। একটা ছাই রংয়ের সুটকেশ ছিল ওর। টিনের, একদিন ওর জামার পকেট থেকে টুক করে পড়ে গেল চাবিটা। আমি পা দিয়ে চেপে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমার সামনেই সারা ঘর তোলপাড় করল চাবির জন্যে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই আমি আর হাসি রাখতে পারিনি। হেসে ফেলেছি।

খুব চালাক তো ?

ভীষণ চালাক ছেলে। আমাকে ও মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল। চোখে যেন আগুন। আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে। ভয়ে আমার বুকও শুকিয়ে এসেছিল। হঠাৎ ও হেসে ফেলল। হাসলে ওকে ভারি সুন্দর দেখাত জানেন ?

কল্পনা করছি। বল।

তারপর একটি কথা না বলে আস্তে আস্তে আমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসল। একটা

হাত রাখল ঠিক যে পায়ের নিচে চাবি ছিল তার ওপর। আমার কী হলো আমি পা সরিয়ে নিতে পারলাম না। ও সরিয়ে দিয়ে চাবিটা নিয়ে মাথা নিচু করে ঘর থেকে দৌড়ে চলে গেল। আর আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম তো থাকলামই।

তারপর ?

তারপর আর কিছু নেই। এখন কেন বলছি কে জানে ? হঠাৎ মনে পড়ল। আপনি জিগ্যেস করলেন, তাই।

তারপর ?

বললাম তো, আর কিছুই নেই।

বলে জাহেদা হাসল, ঠিক যেমন ঘুমের মধ্যে বাচ্চারা হাসে নিঃশব্দে।

সেই হাসিটা অস্পষ্ট হতে হতে যখন মিলিয়ে গেল, তখন চকিতে বাবরের দিকে তাকাল।

বাবর বলল, তারপর কী হয়েছিল আমি জানি।

ইস।

সত্যি জানি। বলব ?

বলুন তো।

তারপর রাতে তুমি ঘুমিয়েছিলে। হঠাৎ জেগে উঠে দ্যাখ তোমার পায়ে চুমো খাচ্ছে সে।

জাহেদার চোখ হঠাৎ উদ্বেগে ভরে উঠল।

তুমি কিছু বলতে পারলে না। তোমার শরীরের ভেতরে আরেকটা শরীর যেন তৈরি হতে লাগল। সে এবার সাহস পেয়ে তোমার গালে চুমো দিল। ছেলেমানুষ তো, তাই জানে না, ঠোঁটে চুমো দিতে হয়।

যাহ্।

লাল হয়ে উঠল জাহেদা।

তারপর অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে আবার চুমো খেল সে : হঠাৎ একটা কীসের শব্দ হলো কোথাও। লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

কি ঠিক বলিনি ?

জবাব দিল না জাহেদা।

মিলে গেছে ? বল না। আমার কাছে লজ্জা কী ?

না।

কাউকে না কাউকে বলতে হয় বল।

প্রায় ঠিক বলেছেন। জাহেদা ফিসফিস করে বলল। কী করে বললেন ?

তোমার চেয়ে আমার বয়স যে অনেক বড়। আমার মত বয়স হলে তুমিও বলতে পারতে।

বাবার নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল আর অনুমানটা সত্যি হয়ে যেতে দেখে। কী করে বলল সে। এ-রকম যোগাযোগ সাধারণত হয় না। হঠাৎ খুশি কাটিয়ে মনে পড়ল তার জাহেদা বলেছে, প্রায় ঠিক বলেছেন। সে জিগ্যেস করল, প্রায় ঠিক বলেছি, না ? আসলে আর কী

হয়েছিল ?

জাহেদা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না, সে রাতে তার প্যান্টের বোতামগুলো খুলে ফেলেছিল। তখন বাধা দিয়েছিল সে। কিন্তু বাধা মানেনি। কী ভীষণ লজ্জা করছিল তার। মরা একটা মাছের মত পড়েছিল সে। উন্মুক্ত উরু হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তার। খুব ঠাণ্ডা লাগছিল। গলার কাছে দম একটা ছিপির মত আটকে ছিল তার। কিন্তু ছেলেটা কিছুই করেনি। একমুহূর্ত পর প্যান্টটা টেনে দিয়ে চুমো খেয়েছে তাকে। তারপর সত্যি কোথায় যেন একটা খড়মের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। কিন্তু লাফ দিয়ে পালায়নি ছেলেটা। চট করে পাশে সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর উঠে গেছে আস্তে আস্তে।

বাবর বলল, কী ভাবছ ? মনে পড়ছে সব ?

জাহেদা অস্পষ্ট করে হাসল।

বাবর জিগ্যেস করল, ছেলেটা কোথায় ?

এখন ফাইনাল ইয়ারে আছে।

ঢাকায় ?

হ্যাঁ, ঢাকায়।

দেখা হয় না।

না। জানেন ? হঠাৎ জাহেদা খুব স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করল। ঝরঝরে গলায় বলল, জানেন ও এখন প্রেম করছে ওরই ক্লাশে পড়ে। পাশ করে বেরুলেই বিয়ে হবে। বিলেতে যাবে।

যাক, যারা বিলেতে যেতে চায়, যাক কী বল ?

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

জাহেদা বলল, আপনি সিগারেট কিন্তু বেশি খাচ্ছেন!

তাই নাকি ? আর খাব না।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাবর। পথের ওপর ঘুরতে ঘুরতে পড়ে দ্রুত পেছনে সরে গেল ধিকি ধিকি আগুনটা। বাবর হাসল।

কী, হাসছেন যে ?

না, এমনি। হাসি কান্না এসব শরীরের একেকটা অবস্থা। মনের অবস্থা অনুযায়ী লোকে কাঁদে হাসে, আবার কখনো কখনো শরীরের অসংখ্য কোষে হঠাৎ সাড়া জাগে, পেশিগুলো নিজে নিজেই এমন বিন্যাসে হঠাৎ পড়ে যায় যে তখন হাসি হয়, কান্না পায়। বুঝেছ ? কিছু ভেবে হাসছি না।

আপনার কথা আমি একটুও বুঝতে পারি না।

বলে জাহেদা সীটে মাথা এলিয়ে চোখ বুঝল। হঠাৎ চোখ খুলে একবার দেখে নিল বাবরকে। না, এখন আর সে হাসছে না। একটু পর বাবর তার দিকে চোখ ফেরাল। তার ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল জাহেদার দু'চোখে চুমো দেয় সে। জিভের ডগা দিয়ে তার সাদা দাঁতগুলো মেজে দেয়। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু একটু চোখ পড়ছে। ঠোঁটে খাড়া কয়েকটা ভাঁজ। সোনালি রোমগুলো চিকচিক করছে আলোয়। বাবর জানে যখন চুমো খাবে তখন

ঐ রোমগুলো তার শরীরে তুলবে শিহরণ।

গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল বাবর।

এক সময়ে জাহেদা হঠাৎ চোখ মেলল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ।

এটা কোথায় এলাম ?

এই তো বগুড়া। একটু পরেই সাতমাথা আসবে। সাতটা রাস্তা এক জায়গায় এসে মিলেছে। ছেলে ছোকড়ারা খুব আড্ডা দেয় এখানে।

এই যে।

সত্যি তো।

গলা বাড়িয়ে জাহেদা সাতমাথার মোড় দেখল। তারপর গাড়ি এগিয়ে গেলে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল।

বাবার বলল, কিছু খেয়ে নেবে ?

কত খাব ?

কিছুইতো খাওনি ?

তবু। আর কিছু খাব না। চমচম খেয়ে পেট ভরে গেছে।

স্যাণ্ডউচ তো ছুঁলেই না। আচ্ছা, একটু চা খাও। চা কিনে নিই। রংপুর এখনো অনেক দূরে।

গাড়ি থামিয়ে চায়ের খোঁজ করল বাবর। চা পাওয়া গেল না। বগুড়ায় বিকেলে নাকি চা হয় না। পাঁচটা বাজবে, তখন চায়ের কেতলি বসবে উনুনে। অনেক খোঁজাখোঁজি করে এক দোকান পাওয়া গেল। সেখান থেকে চা কিনে গাড়িতে বসে খেল ওরা। তারপর বগুড়া ছাড়ল।

ফেরার সময় এখান থেকে রসকদম নিয়ে যাব।

রসকদম কী ? জাহেদা জিগ্যেস করল।

এক ধরনের মিষ্টি।

মিষ্টি বুঝি খুব ভালবাসেন আপনি ?

হ্যাঁ! এবারে ছাড়তে হবে। বয়স হচ্ছে। ডায়বেটিসের ভয় আছে। এই যে বাঁয়ে মহাস্থানগড়। ফেরার পথে থেমে তোমাকে দেখাব।

জাহেদা হেসে উঠল।

হাসির কী হলো ?

আপনি সেই সকাল থেকে সব কিছু ফেরার পথে দেখাবেন বলে রাখছেন। যাওয়ার পথে কিছু দেখার নেই নাকি ?

বাবর একটু লজ্জিত হলো। কথাটা একবারও তার মনে হয়নি। কিন্তু হেরে যাবে না সে। মিষ্টি হেসে বলল, যাওয়াটাই বা কম কীসে ? এই চলা, তুমি সঙ্গে আছ, কথা বলছি; ঢাকায়

থাকলে হতো ? নতুন লাগছে না।

তা লাগছে। কিন্তু আমরা দেখতে যাচ্ছি কী তাও তো বললেন না ?

অনেক কিছু।

কী, অনেক কিছু ?

গেলেই বুঝবে।

বাবর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। এ-রকম সচরাচর হয় না তার। নিজের ওপর, বিশ্বের ওপর, সময়ের ওপর ক্রোধ হয় তার। কী ক্লান্তিকর অভিনয় তার করতে হচ্ছে। কী দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে তাকে। মাথার ভেতরে জ্বলন্ত বর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে জাহেদার সাথে সঙ্গমরত তার ছবিটা। সে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। জাহেদা কি এখনো বুঝতে পারছে না, সে কী চায় তার কাছে ? এতই সে নাবালিকা যে তার সঙ্গে ওভাবে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এতদূর এসেছে অথচ একবারও মনে হয়নি যা বাবরের মনে মনে আছে ?

বাবরের ভেতরে তীব্র ইচ্ছে ফণা তুলে দুলতে লাগল— এখন, এই পথের ওপর আর কিছু না হোক জাহেদাকে একটু স্পর্শ করতে।

ইচ্ছে করে হঠাৎ ব্রেক করল সে। যা চেয়েছিল তাই হলো। জাহেদার মাথা ঠুকে গেল সামনের কাচে। সামলে নিয়েছে মেয়েটা, জোরে লাগেনি।

বাবর বলল, দ্যাখ, দ্যাখ, লোকটাকে পাশ কাটাতে কী হয়ে গেল। বলে সে গাড়ি একেবারে থামিয়ে জাহেদার কপাল, দু'হাতে ধরল।

দেখি, কোনখানে লেগেছে। ইস।

জাহেদা হেসে মাথা নাড়ল। না, লাগেনি তেমন।

লেগেছে, শব্দ পেলাম যে।

বলে সে তার কপালে করতল রাখল। আস্তে আস্তে ঘষে দিতে লাগল। জাহেদা চেষ্টা করল মুক্তি পেতে। কিন্তু পারল না। বাবর বলল, ছেলেমানুষি ক'র না। একটু বুলিয়ে দেই। নইলে মাথা ধরবে।

আমার লাগেনি, বললাম।

মিথ্যে ব'ল না।

সত্যি। ছেড়ে দিন। রংপুর কদ্দূর ?

বাবর কপাল ছেড়ে এবার দু'হাতের মধ্যে জাহেদার মুখটাকে নিয়ে নাড়া দিতে দিতে বলল, আমি খুব দুঃখিত। ওভাবে ব্রেক করা উচিত হয়নি।

জাহেদার মুখের কোমলতা যেন হাত ভরে রইল বাবরের। সে হাত ফিরিয়ে এনে নিজের মুখে রাখল, যেন এটা খুব স্বাভাবিক। যেন সে নিজেও ক্লান্ত। আর শরীর দিয়ে টের পেল তার করতল থেকে সঞ্চারিত জাহেদার মৃদু উত্তাপ তার মুখে। হাত দুটো যেন অন্য কারো হয়ে গেছে, এমন লাগছে তার। নিজের হাতের দিকে চকিতে তাকিয়ে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল সে। বলল, এই রাস্তাটা খুব ভাল। প্রায় সোজা। মাইলের পর মাইল। রংপুর পর্যন্ত।

দু'দিকে কী সুন্দর আখের খেত দেখেছ ? দ্যাখ, একটু কুয়াশার মত লাগছে না ? ও কুয়াশা না। রান্নার ধোঁয়া। বিকেলের দিকে গ্রামে এই রকম একেকটা ধোঁয়া থমকে থাকে মাঠের ওপর।

চোখ ভরে দেখতে লাগল জাহেদা।

বাবর যখন পাশে ঝুঁকে দু'হাতে জাহেদার কপাল ধরেছিল তখন জাহেদা বিব্রত হয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে দিয়েছিল। খুব উচ্চগ্রামে কম্পন হলে যেমন হয় তেমনি দেখা যায় কি যায় না। কাঁপছিল তার ঠোঁট। সে কি ভাবছিল বাবর তাকে চুমো দেবে হঠাৎ ? দিলে হতো। হয়ত তৈরি ছিল জাহেদা তখন।

বাবর বলল, জাহেদা।

কী ?

তখন তুমি ভালবাসার কথা জিগ্যেস করছিলে না ?

হুঁ।

বিশ্বাস কর ভালবাসা বলে কিছু আছে ?

আছে তো।

সবাই বলে তাই না ?

সবাই কেন বলবে। আমি নিজেই জানি।

না, তুমি জান না।

জাহেদা প্রায় চমকে উঠল। নিঃশব্দে একটা চোখের তীর তুলে তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ।

বাবর বলল, যাকে ভালবাসা বলে আমরা সবাই জানি সেটা ভালবাসা নয়। ভুল জানি আমরা।

কেন ?

আচ্ছা, তুমি বল, ভালবাসা একটা আবেগ, একটা অনুভূতি, না ?

হ্যাঁ, তাইতো। মানুষের যত আবেগ আছে, যত অনুভূতি আছে, যত রকম প্রতিক্রিয়া আছে তার, আমি বলি, মূলত তা দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। বাবর অনেকক্ষণ পর এই কথাগুলো ইংরেজিতে বলতে লাগল যাতে জাহেদা বুঝতে পারে। আর তা ছাড়া ইংরেজিতে অনেক নগ্ন কথা স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিকভাবে বলা যায়। সে বলে চলল, মন দিয়ে শুনছ তো ?

হ্যাঁ, শুনছি। আপনি বলুন।

দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে তার রক্ত মাংসের অনুভূতি, জান্তব অনুভূতি, তার মৌলিক অনুভূতি, আবেগ। আর একটা তার অর্জিত অনুভূতি— যা সে শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা ভাবনা সভ্যতার ফলে অর্জন করেছে। একটা ভেতরের, আরেকটা বাইরের।

যেমন ?

মনে কর আমার কারো ওপর খুব রাগ হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি সে আমার শত্রু। তখন আমার মৌলিক আবেগ হবে তাকে হত্যা করা।

শিউরে উঠল জাহেদা। বলল, না, না।

বাবর হেসে বলল, ভয় পাবার কী আছে ? এটাই হচ্ছে সত্যি। প্রাণীজগতে এইই দেখবে। মানুষও একটা প্রাণী। কিন্তু— কিন্তু আমরা হত্যা করি না, সাধারণত করি না। আদিম কালে, যখন আমরা উলংগ থাকতাম, পাথর ছুঁড়ে প্রাণী হত্যা করে তার মাংস ঝলসে খেতাম, যখন ইতিহাস ছিল না, ভাষা ছিল না, তখন আমরা ক্রুদ্ধ হলে হত্যা করতাম। তখন সেটা স্বাভাবিক ছিল। এখন যে করি না তার কারণ আমরা আইন করে নিয়েছি, কতকগুলো নিয়ম বানিয়েছি। আর মনে রাখবে, নিয়ম কানুন আইন এসব দুর্বল মানুষের সৃষ্টি। আমরা এখন হত্যা করি না, দয়া করি, সহানুভূতি দেখাই। দয়া হচ্ছে অর্জিত আবেগ। মানুষের রক্তে তা নেই, সভ্যতা যার নাম তারই একটা অবদান ঐ দয়া। আমরা ক্রোধ দমনকে একটা মহৎ গুণ বলে সবাই স্বীকার করে নিয়েছি। যাঁর ক্রোধ নেই তিনি মহাপুরুষ। কিন্তু এটা প্রকৃতির নিয়ম নয়।

যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে অথচ বিশ্বাস করা যাচ্ছে না এমনি একটা দোল জাহেদার চোখে।

বাবর গাড়ি চালাতে চালাতে সমুখের দিকে স্থির চোখ রেখে নির্মল স্থির একটা হাসির উদ্ভাস সৃষ্টি করে বলে যেতে লাগল, দৈহিক মিলন মৌলিক অনুভূতি, প্রেম অর্জিত অনুভূতি, জাহেদা।

জাহেদা চোখ নামিয়ে নিল।

বাবর বলল, এখন বড় হয়েছ, এসব কথা শুনে লজ্জা পাবার কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়মটা কী জান ? এই যে গাছ, তার একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে, তারপর মরে যাবে। কিন্তু ধারাটা তাই বলে শেষ হয়ে যাবে না। প্রকৃতির নিয়মেই একটা গাছ থেকে আর একটা দুটো দশটা গাছ হবে, হয়ে এসেছে, এইভাবে জগৎ চলে এসেছে। একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে জন্ম দেবে। ফুলের রেণু ভোমরার পায়ে অন্য ফুলে ছড়ায়। একটা বিপ্লব ঘটে যায়। বীজ হয়। বীজ থেকে গাছ। কার্পাসের তুলোটা প্রকৃতির একটা কারসাজি— বীজটাকে উড়িয়ে অন্যখানে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের লেপ তোষক তৈরির জন্যে তার সৃষ্টি হয়নি। পুরুষ মিলিত হয় স্ত্রীর সঙ্গে, প্রকৃতির বিধানেই তাকে হতে হয়, কারণ স্ত্রীকে গর্ভবতী হতে হবে, সে আরেকটা মানুষের জন্ম দেবে। মানুষ নামে প্রাণী এইভাবে বেঁচে থাকবে। প্রকৃতির মূল তাগিদ হচ্ছে এইই। মিলন, নিজের আকৃতিতে সৃজন, সঙ্গমের মাধ্যমে জীবনের বিস্তার। এটা আমাদের রক্তে মাংসে আছে। কিন্তু আমরা সভ্য হয়েছি, চিন্তা করতে পারি, তাই একটা সুন্দর নাম দিয়েছি সেই জান্তব আকর্ষণের, নামটা প্রেম, ভালবাসা। ভালবাসা না হয়ে এর নাম কাঁঠাল বললে, লোকে ভালবাসাকে কাঁঠালই বলত। তাই নিয়ে গান হতো, কবিতা হতো, ছবি আঁকা হতো।

বিমূঢ় একটা হাসি ফুটে উঠল জাহেদার ঠোঁটে। তার ভেতরে একটা ঝড় হচ্ছে যেন। একটা শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর গোপনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাজ্যের বাতাস।

বাবর মাইল পোস্টটা দেখে নিল গাড়ির গতি একটু কমিয়ে। রংপুর আর মাত্র দশ মাইল দূরে। বেলা পড়ে আসছে। আকাশের একটা কোণ লাল হয়ে উঠেছে। তার আলোয় আরো কোমল হয়ে উঠেছে জাহেদার মুখ। স্টিয়ারিং-এর ওপর নিজের হাতের শিরাগুলো

অনাবশ্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করল বাবর কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, আর বিয়ে কেন আবিষ্কার করেছে মানুষ জান? তখন বলেছিলাম না, ইকনমিক্স বড় মজার সাবজেক্ট। আমাদের এই জীবনটা কম্পাসের কাঁটার মত। ইকনমিক্সের পাল্লায় পড়ে বেচারা আর অন্য দিকে মুখ ফেরাতে পারে না। নিজের সম্পত্তি মানুষ এমন একজনকে দিতে চায় যে তার নিজেরই একটা প্রসারিত অস্তিত্ব— অর্থাৎ তার সন্তান। আগে, অনেক আগে আমরা যে যার সঙ্গে মিলিত হতাম। একটা গোষ্ঠীতে যে পুরুষেরা থাকত তারা নিজেদের সব মেয়ের সঙ্গেই সহবাস করতে পারত। মা বাবা ভাই বোন বলে কিছু ছিল না। হয়ত নিজের মেয়ের সঙ্গেই, মায়ের সঙ্গেই, বোনের সঙ্গেই, ভাইয়ের সঙ্গেই হচ্ছে। এতে মালিকানার গোলমাল দেখা দিল। মানুষ সভ্য হচ্ছে যে, তাই বুঝতে পারল এভাবে তো চলে না। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি জন্ম নিচ্ছে যে, তাই সে চিন্তিত হয়ে পড়ল, আমার বলে কিছু থাকছে না যে। অতএব একটা নিয়ম কর, আইন কর। বিয়ে আমরা আবিষ্কার করলাম। এখন আর কোনো গোল রইল না, এই আমার সম্পত্তি এই আমার সন্তান— আমার সম্পত্তি পাবে আমার সন্তান—পুরো গোষ্ঠী নয়। বিয়ে আমাদের স্বার্থ রক্ষার একটা আদর্শ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই নিজের বৌ ফেলে অন্যের বৌয়ের দিকে তাকান পাপ। এক সঙ্গে দশটা মেয়েকে একজন পছন্দ করলে তাকে পশু বলে গাল দিই, দশ জন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবে কোনো মেয়ে এ কল্পনা করলেও শিউরে উঠি।— জাহেদা?

হুঁ! কিছু বলছ না।

শুনছি।

বুঝতে পারছ?

কিছু কিছু।

আমার কাছ থেকে শুনে নাও, বয়স হলে তখন নিজেই বুঝতে পারবে, প্রেম বলে কিছু নেই। প্রেম একটা অভিনয়। আসলে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে শুতে চাই। বিশুদ্ধ এবং কেবলমাত্র শয়ন; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ, সম্পূর্ণ তৃপ্তি, চূড়ান্ত উল্লাস এবং নিঃশেষে বিজয় প্রকৃতি একমাত্র সঙ্গমেই দিয়েছে। কে একজন খুব বড় কবি, বলেছিলেন, একটা ভাল কবিতা লিখলে তার যে সুখ হয় তা রতিসুখের তুল্য। আমি বিশ্বাস করি তাকে। আমরা, লক্ষ করে দেখবে, আমাদের সমস্ত সুখানুভূতি ঐ মানদণ্ডে মেপে থাকি। সারারাত কীর্তন গেয়ে জিকির করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের যে চরম সুখ আমরা পেতে চাই তাও ঐ রতিসুখের মানদণ্ডেই বিচার্য। একজন তন্ময় তদগত ঈশ্বর প্রেমিকের মোহাবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, যদি বিশ্বাস না হয়। কী? কিছু বল?

জাহেদা পথের দিকে তাকিয়ে রইল। বিহ্বল চোখে। তারপর সেদিকে চোখ রেখেই বলল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু যা বলছেন, এতে কোনো নিয়ম থাকবে না যে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি যায়?

জাহেদা বাবরের দিকে তাকাল।

বাবর সময় নিল উত্তর দিতে। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, যাক। সভ্যতার নামে মানুষ সৌন্দর্য সৃষ্টি যেমন করতে চেয়েছে, তেমনি ধ্বংসও করেছে। মানুষ হাজার হাজার বছর

ধরে একটু একটু করে অভিনয়ের শিক্ষানবিশী করতে করতে এখন বড় একজন পাকা অভিনেতা হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য ভুলে গেছে সে। লক্ষ্য ভুলে গেছে। অভিনয়টাই জীবনের সার মনে করেছে। ফলে তার নিজের মুখ বিকৃত থেকে বিকৃততর হচ্ছে। এই বিকৃত মুখ থাকার চেয়ে না থাকলেই ভাল। বন্ধুত্বের নামে শোষণ করছে, মানুষ শান্তির নামে যুদ্ধ, মুক্তির নামে বন্ধন, ধর্মের নামে অন্ধত্ব। আমরা যা ভাবি তা বলি না, যা বলি তা করি না। যা করি তাতে আমাদের মনের সায় নেই। আত্মার যে কণ্ঠ তা আমরা শুনি না। আর কত বলব ? আমি একা লড়তে চাই। আর কেউ আমাকে বুঝুক বা না বুঝুক, আমার পক্ষে থাক না থাক, আমাকে পৃথিবীর জঘন্যতম লোক বলে তারা চিহ্নিত করুক, আমি স্বভাবের প্রতিষ্ঠা চাই। আমি বেঁচে থাকতে চাই। বেঁচে থাকার আনন্দ পেতে চাই। প্রতিমুহূর্তে আমি অনুভব করতে চাই আমি বেঁচে আছি।

না না। জাহেদা উদ্বেগভরা গলায় বলে উঠল, আপনাকে কেউ জঘন্য বলছে আমি ভাবতেও পারি না।

তুমি বলবে না ?

কখনো না।

বাবর হাসল। বলল, সত্যি ?

জাহেদা চোখ নামিয়ে নিল কিন্তু কিছুই বলল না আর। আস্তে আস্তে হেলান দিয়ে বসল। যেন ভীষণ একটা শরীরিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামে আলস্যে শিথিল হয়ে যাচ্ছে সে। বাবর তার হাতে একটা ছোট্ট করে টোকা দিয়ে বলল, দ্যাখ, আমরা রংপুরে এসে গেছি।

১৩

সার্কিট হাউজে কামরা খালি নেই। ডাক বাংলোয় পাওয়া গেল। ঠিক তখন সন্ধে। দোতলার একটা ঘর খুলে দিল চৌকিদার। জাহেদা বলল, এত টায়ার্ড লাগছে।

লাগবে না ? কতদূর এসেছ। গাড়িতে একভাবে বসেছিলে।

বাতি জ্বালালো চৌকিদার। দুটো খাট। একটা ড্রেসিং টেবিল। তার ওপরে কবেকার একটা মেঘলা গ্লাশ পড়ে আছে। ঘরে ঢুকে জাহেদা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। একবার শুধু উচ্চারণ করল, এই ঘর ?

হ্যাঁ। এক্ষুণি সব ঝেড়ে মুছে ঠিক করে দিচ্ছে। চৌকিদার ভাল করে বিছানা করে দিও। কম্বল দিও। পরিষ্কার সব চাই। একেবারে পরিষ্কার। মেমসাহেব যেন পছন্দ করেন। বুঝেছ ?

হ্যাঁ। সে বুঝেছে। সে এক্ষুণি সব গুছিয়ে দিচ্ছে। গরম পানি আগে চাই ? কইরে পানি গরম কর। না, এখানে তো খাবার ব্যবস্থা এখন করা যাবে না। কাল হতে পারে। আজ বাইরে থেকে খাবার এনে দিক সে। আচ্ছা, আপনাদের মর্জি, বাইরেও ভাল ভাল হোটেল আছে। সকালে কি নাশতার ব্যবস্থা করব ? ডিম কেমন খাবেন, পোচ, ওমলেট ?

জাহেদাকে বাবর বলল, গরম পানি হলেই হাত মুখ ধুয়ে চল কোথাও থেকে খেয়ে আসি।

চটপট। তুমি বেরুলে আমিও মুখটা ধুয়ে নেব।

অন্য কিছু ভাববার অবকাশ দিতে চায় না বাবর। ঝড়ের মত কথা বলে চলে। চৌকিদারকে আরেকটা তাগিদ দিল গরম পানির জন্যে। একবারও সে জাহেদার দিকে তাকাল না। চৌকিদার বাইরে গেলে বাবর বলল, আমি আসছি। সিগারেট নিয়ে আসি।

বাইরে এসে চৌকিদারকে ধরল সে। বলল, কম্বল একটাই দিও। কেমন ? আর একটা আমাদের আছে।

অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় এলো বাবর। ফুটপাথে অসংখ্য দোকান বসে গেছে। হারিকেন, হ্যাজাক, বিজলী বাতি আর মানুষের কণ্ঠস্বরে গমগম করছে সন্ধ্যাটা। বাবর দু'তিন দোকান ঘুরে অবশেষে একটাতে তার সিগারেট পেল। জিগ্যেস করল এখানে খাবার ভাল রেস্তোরাঁ আছে ? নাম ঠিকানা শুনে নিল তার কাছ থেকে। তারপর ধীর পায়ে ফিরে এলো বাংলোয়।

দেখে, জাহেদা ঘরে নেই। ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরে। তারপর হেসে ফেলল, জাহেদা তো বাথরুমে। পানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বসে বসে আরো দুটো সিগারেট শেষ করল সে। সব তার ভেবে ঠিক করা আছে। যেন একটা নাটকে দীর্ঘদিন মহড়া দিয়ে আজ মঞ্চে নেমেছে। পার্ট মনে আছে সব, তবু কেমন যেন একটা উদ্বেগ হচ্ছে থেকে থেকে।

বাথরুম থেকে বেরুল জাহেদা। বেরিয়ে তাকে দেখেই থমকে গেল যেন। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল আয়নার দিকে। চুল ঠিক করতে লাগল। বাবর জানে এখন কোনো সংলাপ নেই। এখন শুধু মঞ্চে নিঃশব্দে পদচারণা। সে ভেতরে গিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। জাহেদার তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে মুছল মুখ, একবার চেপে ধরে সুগন্ধি নিল। আয়নায় নানা রকম মুখভঙ্গি করে মুখের জড়তা ভাঙ্গল। তারপর বেরিয়ে এলো।

জাহেদা শাদা একটা পুলওভার পরে নিয়েছে। আয়নার সামনে তখনো নিজেকে দেখছে সে। নিঃশব্দে। অতি ধীরে। আর চৌকিদার বিছানা করছে। নিজের সুটকেশ থেকে কর্ডের জ্যাকেটটা বের করে গায়ে চড়াতে চড়াতে বাবর বলল, চল, চল।

বলে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। জাহেদা যেন একযুগ পরে এলো।

চল, শহরটা ঘুরে আসি। খেয়েও নেব। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে হাত পা ভেঙ্গে আসছে যেন।

কথাটা মিথ্যে। বাবর এখন ছত্রীসেনার মত সতেজ, প্রস্তুত, অস্থির।

কিন্তু ফল হলো। জাহেদা মুখ খুলল।

আবার এখন গাড়ি চালাতে চান ?

না। রিকশা নেব।

তখন সিগারেট কিনতে যাবার সময় মাঠে একটা ছোট্ট বাঁধান নালা দেখেছিল বাবর। প্রায় পা পড়ে মচকাচ্ছিল আর কী। সেখানে এসেই চট্ করে জাহেদার হাত ধরে বলল, সাবধানে।

তারপর হাত ছাড়ল না। গেট পর্যন্ত ঐ ভাবেই হাঁটল। গেটের কাছে এসে জাহেদা নিজেই হাত ছাড়িয়ে নিল। মুখে বলল, এত ভিড়।

এইতো বেচাকেনার সময়।

কথাটা বলেই বাবর বুঝল, আরো একটা অর্থ হয় এর। কে জানে জাহেদা তাই বুঝল কিনা। জাহেদা আর কিছু বলল না। রিকশায় উঠে বসল ওরা। উরুতে উরু লাগল। বাবর টের পেল জাহেদা একবার ছাড়াতে চেষ্টা করল সন্তর্পণে, কিন্তু পারল না। মনে মনে হাসল বাবর। মুখে বলল, রিকশা, নবাবগঞ্জের দিকে চল।

এর আগে কখনো কোনো মফঃস্বল টাউনে এসেছ ?

না। জাহেদা তাকে অবাক করে দিয়ে হাসল। এখন হাসিটা আশা করেনি বাবর। জাহেদা আরো বলল, দেখার মধ্যে ঢাকা আর চাটগাঁ।

তোমার জন্ম কোথায় ?

ঢাকায়। আপনার ?

বর্ধমানে। আর সেখানে যাওয়া হবে না। এখন আর আপন-পর বুঝি না। যেখানেই যাই সেই আমার দেশ।

সাইকেলের দোকান. কবিরাজি ওষুধের দোকান, বই, মনোহারি জিনিস, কাপড়-চোপড়, ছোট ছোট চায়ের আড্ডা, হা করা অন্ধকার সব গলির মুখ। কোথায় যেন কাঁসর বাজছে। সুম সুম করছে হ্যাজাকের আলো। হা হা হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুরনো পুরনো সব দালানের পলেস্তারা ওঠা থাম চারদিকে। একটা বাদুড় উড়ে গেল। আকাশে অনেকগুলো তারা ঝিকিমিক করছে।

বাবর বলল, এখানে একটা জিনিস লক্ষ করছ। প্রত্যেক দোকানে, রাস্তার মোড়ে আড্ডা হচ্ছে। এখানকার মানুষগুলো বোধ হয় খুব আড্ডাবাজ। মনে হচ্ছে, সারা শহরে আড্ডা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিষয় নেই।

জাহেদার গা থেকে মাঝে মাঝে একটা মিষ্টি গাঢ় ঘ্রাণ দিচ্ছে।

অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল ওরা। তারপর সিগারেট কিনে শোনা সেই রেস্তোরাঁ খুঁজে বের করল। বড় রাস্তার ওপর একটা সরু প্যাসেজের মুখ। সেটা দিয়ে ঢুকলে ডান দিকে একটা বড় ঘর। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল নীল চুনকাম করা দেওয়াল। রেডিও বাজছে রংপুর স্টেশনে। এককোণে চারজন তরুণ চায়ের কাপ নিয়ে জটলা করছে। তাদের ঢুকতে দেখে হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল। মাথা নামিয়ে নিল সব এক সঙ্গে। তারপর একে একে মাথা তুলে একেবারে সরাসরি তাকিয়ে তাদের দেখতে লাগল।

মজা লাগল বাবরের। বলল, ভাগ্যিস এরা টিভি দেখতে পায় না এখানে। এর জন্যে ঢাকায় কোথাও বসতে পারি না।

আসবার সময় আরিচা ফেরিতে কয়েকজন আপনাকে চিনেছিল।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, আপনার নাম বলছিল।

খেয়াল করিনি। কী খাবে ? কিছুই নেই। মফঃস্বল তো কিছু পাবে না। বিরিয়ানি খাও। এ ছাড়া—

যা আপনার খুশি বলুন। আমার একেবারে ক্ষিদে নেই।

আসলে এখন দরকার ছিল গরম সুপ। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ।

চল, খেয়েই বাংলোয় যাব।

খেতে খেতে হঠাৎ জাহেদা একবার বলল, শারমিন আর পাপ্পু খুব আরাম করে বিছানায় শুয়ে আছে।

তোমার রুমমেট ?

হ্যাঁ, ওরা কি স্বপ্নেও জানে আমি এখন এখানে ?

কোনোদিন জানবেও না। বাবার প্রশস্ত হেসে বলল।

তখন কী যেন কথাটা বলছিলেন ? অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝখানে, কী যেন ?

অতীত আর ভবিষ্যতে মাঝখানে তুমি আছ, যেখানে আগেও ছিলে, পরেও থাকবে। অর্থাৎ সব সময়ই বর্তমান, জাহেদা। বর্তমানটাই আমরা একমাত্র চাক্ষুস করি। অসংখ্য বর্তমানের একটি মালা এই জীবন।

'রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা সেই মন্দিরের কাছে এলো যেখানে কাঁসর বাজছিল। এখন সেখানে গান হচ্ছে। একটা তালপাতার মত লোক, মাথায় একরাশ কোঁকড়ান বাবরি, পরনে হলুদ ধুতি, গায়ে লাল ছোপান গেঞ্জি, কপালে চন্দনের ফোঁটা দু'হাত তুলে গান করছে। চারদিকে মেয়ে পুরুষে গোল হয়ে ভক্তিমন্ত্র মনে বসে আছে।

জাহেদা অবাক হয়ে শুনতে লাগল। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সে। লোকটা বলছে।—

'তোমার স্বর্ণসীতা কি কথা বলতে পারে ? না। সে কি চোখে দেখতে পারে ? না, তাও পারে না। সে কি কানে শুনতে পায় ? না, সে কানেও শুনতে পায় না।' সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গে একটা রোল পড়ল। লোকটা দু'হাত তুলে ঘুরতে ঘুরতে এবার সুরে গেয়ে উঠল, 'তবে চাই না, চাই না আমি স্বর্ণসীতা চাই না'।

স্বর্ণসীতা কী, জিগ্যেস করবার জন্যে জাহেদা ফিরে তাকাতেই টের পেল বাবর তার একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে শরীরের পেছনে যে উষ্ণতা তাকে জড়িয়েছিল তা বাবরের। জিগ্যেস করা আর হলো না। কেবল বলল, চলুন।

চল।

নিঃশব্দে পায়ে হেঁটে বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানপাটের, থমথমে দরোজাগুলোর সমুখ দিয়ে তারা বাংলোয় এসে পৌঁছুল। আবার সেই মাঠের মধ্য নালাটার কাছে এসে বাবর তার হাত ধরল। হাত ধরে পার করে দিল তাকে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

জাহেদা বলল, একটা বাতি নেই।

বাবর কিছু বলল না। শুধু হাসল। ঠিক হাসিও নয়, হাসির একটা তরঙ্গ মাত্র। কেমন একটা উদ্বেগ তার ভেতরে এখন হঠাৎ বড় হচ্ছে, কেন হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

জাহেদাই বলে চলল, আমাদের হোস্টেলেও এ রকম হয়। হঠাৎ হঠাৎ চুরি হয়ে যায়। কে চুরি করে কে জানে ?

নিঃশব্দে ঘরের দরোজা খুলল বাবর। জাহেদা কথা বলেই চলেছে।

একদিন অন্ধকারে প্রায় গড়িয়ে পড়েছিলাম সিঁড়িতে। বাঁ পায়ের গোড়ালিটা মচকে গিয়েছিল। সারারাত কী ব্যথা! পাপ্পু তেল মালিশ করে দিয়েছিল। ও জানেন, খুব সেবার হাত ওর। কার কোথায় মাথা ধরেছে, কার গা গরম, কে তরকারি পছন্দ নয় বলে খায়নি, কার বাড়ির চিঠি পেয়ে মন খারাপ—সব পাপ্পু সামলাচ্ছে।

জাহেদা কথা বলছে আর বাবর ওদিকে কখনো একটু হাসছে, কখনো 'তাই নাকি?' বলছে আর বিছানা ঠিকঠাক করছে চটপটে দু'হাতে। একবার শুধু ছোট্ট করে বলল, পুলওভারটা খুলে বস। কম্বলের নিচে চাদর দিয়ে দিয়েছি।

জাহেদা পুলওভার খুলতে খুলতে বাধ্য বিনীত ভঙ্গিতে কম্বলের তলায় পা চালান করে চুলে একটা ঝাড়া দিয়ে ঠেস দিয়ে বসল। আর এই সর্বক্ষণ বলে চলল কথা।

পাপ্পুকে তো দেখেননি? একদিন আলাপ করিয়ে দেব। রাঙ্গামাটির মেয়ে। তেমনি চ্যাপ্টা নাক, চওড়া মুখ, হলুদ রং; কিন্তু ভারি মিষ্টি। জানেন ওরা বৌদ্ধ। আমাদের সবাইকে বলেছে ওদের ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল হয়, এবার নিয়ে যাবে দেখাতে। খুব নাকি মজা হয়। ভরা পূর্ণিমা রাতে নাচ হয়, গান হয় পুজো হয়। আচ্ছা, বৌদ্ধরা কি হিন্দু?

না।

তাহলে ওরা পুজো করে যে। একটু অন্যমনস্ক দেখাল জাহেদাকে। তারপর হেসে আবার তুবড়ি ফোটাতে লাগল, আমার কিন্তু ভালই লাগে। আমি অবশ্য কোনোদিন পুজো দেখিনি। আমার বাবা জানেন, আমাকে ইংরেজি পড়িয়েছে বটে কিন্তু ভারি গোঁড়া। আমাদের কোথাও নিয়ে যায়নি। কোনো একটা কিছু করতে গেলেই হাঁ হাঁ করে ওঠেন। তার মুখে সর্বক্ষণ 'গেল গেল' লেগে আছে। পারেন তো ছেলেমেয়েকে একেবারে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখেন। একবার জানেন কী হলো— আজকাল তো ওড়না পরে না, শুধু কামিজ পাজামা। তাই পরে বাড়ি গেছি, বাবার তো চক্ষুস্থির। রাগে হার্টফেল করেন আর কী? মাকে বললেন, মেয়ের জন্ম দিয়েছ, আদব কায়দা নামাজ রোজা শেখাতে পারনি? জান, ছেলেমেয়ের দোষে বাপ-মাকেও দোজখে যেতে হয়? আচ্ছা বলুন তো, যেতে হয় নাকি?

বাবর সেই কখন, আরাম চেয়ারটা টেনে, তার ওপর গা এলিয়ে বসেছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে জাহেদার দিকে। জাহেদার একটা কথাও কানে যাচ্ছে না তার; কেবল জাহেদার জীবন্ত, বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার দূরন্ত মুখখানা সমস্ত অস্তিত্ব, বস্তু এবং বিশ্ব জুড়ে আছে। জাহেদা এবার থামতেই কুয়াশার মত হাসল বাবর। জাহেদাও হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল তার দিকে। একটি যুগ যেন অতিবাহিত হয়ে গেল। সে নিজেই মনে করতে পারল না এতক্ষণ একতাড়া কী বলছিল সে। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে হঠাৎ সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল। বলল, কম্বল একটা যে! কম্বল? বাবর হাসিতে মধুর হয়ে উঠল। উত্তর দিল, মফঃস্বলের ডাকবাংলো কম্বল এদের একটাই আছে। ঢাকা থেকে আনা উচিত ছিল। কে জানে এখানে এত শীত।

এত শীত কেন এখানে?

হিমালয়ের কাছে যে। এইতো, চোখ তুলে তাকালেই হিমালয়।

আপনার শীত করবে না ? জাহেদা উদ্বিগ্ন চোখে প্রশ্ন করল।

নাহ। চলে যাবে। রাত অনেক হয়েছে তুমি ঘুমোও। সারাদিন পথ চলে ক্লান্ত তুমি।

বলে সে জাহেদার কাছে এসে তার বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে দিল গুঁজে দিল, চারপাশে। যখন ওপাশে গুঁজে দিচ্ছিল তখন তোরণের মত বাঁকা তার দেহের নিচে ঢাকা পড়ে গেল জাহেদা। সোজা হতেই দেখল জাহেদা বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে ততক্ষণে। কিন্তু চোখ খোলা। কাজল একজোড়া চোখ টলমল করছে। চোখের শাদায় শিরাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার। আর খাড়া নাকের নিচে সোনালি রোম, যেন কিছু ফুলের রেণু লেগে আছে ওখানে। শিরশির করে উঠল বাবরের শরীর। সে আবার আরাম চেয়ারে এসে বসল। বলল, ঘুমোও।

আপনি ?

আমি কিছুক্ষণ বসে থাকব।

বলে বাবর আরো একটা সিগারেট ধরাল। জাহেদা কী ভেবে একটু পর চোখ বুজল। তখন একেবারে অন্য একটা মেয়ে বলে মনে হলো। সে একটু সোজা হয়ে বসতেই চেয়ারে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ উঠল। চোখ খুলল জাহেদা। তড়াক করে উঠে বসে কম্বলটা পা পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে বলল, এ হতে পারে না। আপনি কী গায়ে দেবেন ?

তাকে উঠতে দেখে বাবরও নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে হেসে ফেলে বলল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি ঘুমাও তো।

না।

দ্যাখ, দুষ্টুমি করলে কিন্তু আমি বকব।

আমার ঘুম আসবে না।

আসবে, চেষ্টা করলেই আসবে। শুয়ে পড়।

জাহেদা কম্বলের দিকে চোখ ফেলে চুপ করে রইল।

কথা শুনতে হয় জাহেদা। তুমি ঘুমোও। আমার তেমন কিছু ঠাণ্ডা লাগছে না। সোয়েটার আছে। একটা চাদর এই যে। এতেই চলে যাবে।

জাহেদা একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার তেমনি গোঁয়ারের মত বসে রইল। বাবর দাঁড়িয়ে আছে বলে জাহেদাকে ওপর থেকে দেখছে। চিবুকটা সরু লাগছে। কোমল একটা ত্রিভুজের মত মনে হচ্ছে। ত্রিভুজটার খাড়া নিচে তার দুই উরুর সংযোগ বিন্দু। সেটা চোখে পড়তেই বাবরের আরেকবার মনে হলো, কী দীর্ঘ, কী ক্লান্তিকর এইসব প্রস্তুতি। মুখে কিন্তু অন্য রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবল সে। এক টুকরো বাঁকা হাসি। ধাক্কা দিয়ে হাসল সে একটু। হাসতে হাসতে বলল, বোকা মেয়ে, এক কম্বলে দু'জনের হয় ? নাও, শুয়ে পড় দেখি।

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল জাহেদা। সুবোধ মেয়ের মত নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল টেনে দিল নিজেই। নীল জামা পাজামা, ফোলান লালচে চুল, পরিচ্ছন্ন ঘাড়, সব ঢাকা পড়ে তাকে দেখাল একটা বৃহৎ জান্তব পোস্টাল পার্সেলের মত।

বাবর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ করে মাথার ভেতরে সব শূন্য হয়ে

গেছে যেন। অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক সে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে শরীরের মধ্যে টের পেতে শুরু করল একটা অস্থির স্রোত সরু হতে হতে নিচের দিকে নেমে আসছে। যতই নামছে জ্বালা বাড়ছে তত। সেতারে ঝালার মত তীব্র সেই অনুভূতি। বাবর নাভির নিচে হাত রাখল, চেপে ধরল এবং তখন তার মনে পড়ল অনেকক্ষণ বাথরুমে যাওয়া হয়নি। এখন সেটা ফেটে বেরুতে চাইছে।

সন্তর্পণে বাথরুমের দরোজা খুলে ঢুকল সে। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সন্তর্পণে। স্যাঁতস্যাঁতে হলুদ দেওয়াল যেন চেপে এগিয়ে এলো চারদিকে। শীত করতে লাগল হঠাৎ।

নিঃশেষে ভারমুক্ত হলো বাবর। টোকা দিয়ে শেষ বিন্দুটা পর্যন্ত ঝরিয়ে দিল। পানি দিতেই ছ্যাঁত করে উঠল ঠাণ্ডাটা। প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল বাবর। নিজেকে সামলে নিল। দেখল কেমন দ্রুত গুটিয়ে আসছে ওটা; রং শ্যামল থেকে কালো, কালো থেকে ঘন কালো হয়ে গেল, এখন তাকে দেখাল কোনো পুরনো বাড়ির সদর দরোজায় বেরিয়ে পড়া মড়চে ধরা বড় একটা ইস্ক্রুপের মত। জাহেদার আকাশ-নীল তোয়ালে দিয়ে আবৃত করে মুছল সে। তোয়ালের নরম সুতোয় শুষে নিল সমস্ত সিক্ততা। এখন সেটাকে দেখে বাবরের মনে হলো মিটিমিটি হাসছে।

তারপর আয়নায় আবার ভাল করে মুখ দেখে, মাথার চুল টেনে টাক ভাল করে একপ্রস্থ ঢেকে বেরিয়ে এল আগের মতই সন্তর্পণে। দরোজা লাগিয়ে ঘুরে দেখে জাহেদা এখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তেমনি কম্বলে ঢাকা, নিতম্বের নিচে দু'পায়ের ফাঁকে সৃষ্টি হয়েছে একটা দীর্ঘ উপত্যকা, একগুচ্ছ চুল বেরিয়ে আছে বালিশে।

বাবর টের পেল, জাহেদা এখনো ঘুমোয়নি।

সে এবারে তার নিজের বিছানায় বসল, সাবধানে ধীরে, ধীরে। মাত্র একগজ দূরে জাহেদার বিছানা। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কী অসীম দূরত্ব। কিম্বা কাছেই, মাঝে একটি স্তব্ধতার পাহাড়। বাবর কান খাড়া করে বাইরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। তখন কানে এলো দূরে কোথাও কারা কথা বলছে, একটা রিকশা টুনটুন করে চলে গেল, কুকুর ডাকছে দীর্ঘস্বরে। জাহেদা পড়ে আছে, যেন একটা মৃতদেহ। যেন এতটুকু প্রাণের লক্ষণ নেই তার আচ্ছাদিত দেহে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল বাবর। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তার। এত শব্দ হতে লাগল যেন জাহেদা শুনতে পাবে। প্রাণপণে সে নিঃশ্বাস শাসন করতে লাগল। ফলে দেহের আধোভাগে উত্তাপ আরো দ্বিগুণ দ্রুতভায় বৃদ্ধি পেতে লাগল তার। পায়ের উপর পা দিয়ে বসল সে।

হাঃ ফিরোজ মাজমাদার বলে কিনা, ভালবাসা না হলে তার জমে না। আজ বিকেলে রংপুরের পথে জাহেদাকে সে যা বলেছে তা শোনা উচিত ছিল তার। নিজেই চমৎকৃত হলো ভেবে—ভালবাসাকে কাঁঠাল বলেছে। কথাটা তখনি মাথায় এসেছিল। এর চেয়ে চমৎকার করে আর দেখান যেন না ভালবাসার আকাশ-প্রমাণ মিথ্যেটাকে। হাঃ।

তবে হ্যাঁ, আমি বাছাই করি, আমার পছন্দ-অপছন্দ আছে। সবার সঙ্গেই শুতে হবে নাকি? বাজারের সব জামা কি পছন্দ হয় আমার? দশটার মধ্যে একটা কিনি। তার কাপড় পছন্দ হতে হবে, বুনোন ভাল হওয়া চাই, রং পছন্দ হওয়া চাই, ছাঁট ভাল লাগা চাই। তবে তো? এমন রংয়েরও জামা আছে বিনি পয়সায় দিলেও আমি ছুঁয়ে দেখব না।

মাজমাদারকে এক সময় বলবে সে। দেখি সিঙ্গি মাছটা জবাব কী দেয়?

আরো একটু এগিয়ে বসল বাবর। কোনোমতে কেবল পেছনটা তার ছুঁয়ে রইল খাটের প্রান্ত। সে জানে, একটু পর ওখানে একটা গভীর সরল রেখা পড়ে যাবে। অবশ হয়ে আসবে। শেষে ঝিনঝিন করে উঠবে। তবু ঐ কষ্টকর ভঙ্গিতে বসে রইল সে, বসে রইল জাহেদার উপুড় হয়ে থাকা অস্তিত্বের দিকে অপলক তাকিয়ে।

হঠাৎ আরো একটা তুলনা মাথায় এলো তার। আদিম কালে মানুষ যখন অরণ্যচারী ছিল, পাথরের বল্লম নিয়ে শিকার করত, তখন কী তার একপাল শ্বাপদের মধ্যে এটিকে পছন্দ হয়ে যেত না? — যাকে নিজ হাতে হত্যা করতে ইচ্ছে হয়?

সে যদি গল্প লিখতে জানত, তাহলে চমৎকার একটি গল্প লিখত সে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যের এক প্রান্তে বাস করত এক গোষ্ঠী। তার তরুণ এক সদস্য একদিন পিপাসার্ত হয়ে ঝিলে গিয়েছিল। উপুড় হয়ে জন্তুর মত জলপান করছিল সে। তৃপ্ত হয়ে মুখ তুলতেই দেখে ওপারে দপদপে একটা আগুন স্থির হয়ে আছে। বাঘ! তরুণ একটি বিদ্যুতের তরঙ্গ।

মুহূর্তে সে নলখাগড়ার ভেতরে অন্তর্হিত হলো। কিন্তু তাকে আর ভুলতে পারল না সে। তার দিনের আলো আর রাতের অন্ধকার জুড়ে রইল সেই বাঘের দুঃসহ বুকভাঙ্গা সৌন্দর্য। গোষ্ঠীর মধ্যে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। উৎসবের রাতে সে দূরে নির্জনে পাথরের চাকতির ওপর বসে থাকে। সূর্য ওঠার আগে চুপিচুপি বল্লম হাতে অধীর হৃদয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রতি বনে, প্রতি ঝিলের কিনারে, রৌদ্র ছায়ায়, শরবনে সে সন্ধান করে বাঘটাকে। গোষ্ঠী প্রধান তার সুদূরে নিবদ্ধ চোখ দেখে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোনো উত্তর পান না। সবার সঙ্গে থেকেও সে আলাদা। যেন সে একটা ভিন্ন সময়ের ভিন্ন জগতের মানুষ।

কিন্তু পরিহাস এই, মানুষটা জানে না প্রথম যেদিন বাঘটা তাকে দেখেছে সেও তার তাকে ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারেনি ঝিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়া পেশির স্থির তরঙ্গে গরীয়ান তার প্রশস্ত কাল কাঁধ। যখন চোখাচোখি হয়েছিল তখন যে ত্বরিত প্রবাহিত হয়েছিল তার অভিভাব যেন মাতৃযোনী থেকে নির্গমনের মত। জন্তুটাও সেই তরুণের সন্ধানে বারবার এসেছে ঝিলের কিনারে, রাতের অন্ধকারে সাহস করে গোষ্ঠীর আগুনজ্বালা বাসস্থান পর্যন্ত গিয়েছে। আকাশে মুখ তুলে ঘ্রাণ নিয়েছে। বুনো হলুদ ফুলের মত কান দুটো খাড়া করে সেই তরুণের মুখনিঃসৃত কোনো শব্দ শুনতে চেষ্টা করেছে সে।

তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে যখন সুন্দরী রমণীর গাত্রবর্ণের মত জোছনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চারদিক, উত্তরে হিমালয় যখন গম্ভীর তন্ময় একটি মৃদুহাস্য হয়ে আছে, ঝিলের জল যখন তীব্র আবেগে কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে, তখন তাদের সাক্ষাৎ হলো। এবড়ো থেবড়ো জমির ওপর, চন্দ্রতারকাখচিত রঙ্গমঞ্চে, দু'ধারে সুউচ্চ বৃক্ষের উইংস দিয়ে দুজনে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। নদীর উৎস মুখে যেমন অবিরাম একটা তান শোনা যায় তেমনি একটা ধ্বনি সমাবেশ শুনতে পেল তারা উভয়ে। তাদের চোখগুলো একেকটি ক্ষুদ্র তীব্র চাঁদ হয়ে গেল। বল্লম তুলল তরুণ। জন্তুটা একবার মুখব্যাদান করল— হিংসায়, ক্রোধে সে এ রকম করে থাকে কিন্তু আজ সে আবেগ নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছু যা তার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সে দৃপ্ত পিঠটাকে বাঁকিয়ে মাটি স্পর্শ করল প্রায়, যেমন সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

মাটি স্পর্শ করে মানুষকে সে নিতে দেখেছে। তারপর একটি মাত্র মুহূর্ত। গোষ্ঠীর অনির্বাণ আগুন হঠাৎ একেক সময় যেমন লাফিয়ে ওঠে, তেমনি।

উষ্ণ প্রস্রবণের মত উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল রক্ত।

দক্ষিণ অভিমুখে বহমান একটি নদীর মত নির্গত হতে লাগল তরুণের অশ্রু।

প্রভাতে গোষ্ঠীর সবাই আবিষ্কার করল উভয়ের পায়ের ছাপ। আর কোনো চিহ্ন নেই, অবশিষ্ট নেই, এমনকি কোনো সংকেতও নেই। দলের মধ্যে শুভ্রকেশ যে বৃদ্ধ ছন্দোবদ্ধ ভাব প্রকাশে সক্ষম, তিনি আকাশবিদ্ধ করা একটি গাছের দুধশাদা কাণ্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, মুদিত চোখে, হাত নিবদ্ধ করে একটি গাথা রচনা করলেন। 'তিনি আমাদের থেকে উন্নীত হলেন। তাঁর দেহ দেবতার মত জ্যোতির্ময়। কুঙ্কুমের টিপ শোভিত চির তরুণ। ব্যাঘ্র তার বর্তমান রূপ। এসো প্রণিপাত করি।'

ঢাকায় ফিরে আজহারকে সে গল্পটা বলবে। অনেকদিন আজহার কিছু লেখে না। তার শেষ বইটা খুব খারাপ হয়েছিল। সেদিন টেলিভিশনে একটা নাটক হলো তার, এমন তৃতীয় শ্রেণীর নাটক আর হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তবু লোকটা ভাল। লেখার জন্য সর্বক্ষণ আকুলি-বিকুলি করে। লেগে আছে, এইটাই বড় কথা। তাকে গল্পটা বলবে বাবর।

নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। কখন যে পোশাক পালটে পাজামা পরে নিয়েছে মনেও পড়ল না তার। গল্পটা তাকে একবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এখন ঘোরটা কেটে যেতেই আবার তার সমস্ত ভাবনা, উদ্যম, দৃষ্টি জাহেদার দিকে ধাবিত হলো। এক পা এগিয়ে বালিশের ওপর লুটিয়ে থাকা তার চুলের গুচ্ছ স্পর্শ করল সে। কান পেতে চেষ্টা করল জাহেদার নিঃশ্বাস শুনতে। কিন্তু ভারি কম্বলের ভেতর থেকে কিছুই শোনা গেল না। তখন সে ডান হাত রাখল জাহেদার নিতম্বের উপর। প্রথমে আলতো করে তারপর ধীরে ধীরে চাপ বাড়াল। কোমল মাংসের মধ্যে বসে গেল তার করতল। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না জাহেদার। সে তখন ফিসফিস করে নাম ধরে ডাকল। একবার দু'বার। কোনো সাড়া এল না। আবার সে বলল বাতি নেভানোর কথা। শব্দগুলো গুঞ্জন করে উঠে থেমে গেল। তেমনি লম্বমান নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল ব্রাউন কম্বলের অতলে জাহেদার দেহ। ঘড়ি দেখল বাবর। রাত এখন বারোটা উনিশ। বাইরে থেকে আব কোনো শব্দ আসছে না। বাতাসের একটানা চুলঝারার মত একটা ক্ষীণ ধ্বনিমাত্র, আর কিছু নয়।

১৪

হাত ফিরিয়ে আনল বাবর। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল সে। বাতি নিভিয়ে হাতরে হাতরে জাহেদার খাটের কাছে এসে দাঁড়াল। বসল। বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সন্তর্পণে লম্বা হয়ে শুল তার পাশে। বাবরের বাবা মারা গেলেন তার তিনদিন আগে এক রাতে ঘুমিয়েছিল সে। হঠাৎ স্বপ্ন কী স্বপ্নের মত বাস্তবে সে দেখতে পেয়েছিল ঘন কালো কাপড়ে টানটান আবৃত এক পুরুষকে। লোকটা তার পাশে এসে বসল। অপেক্ষা করল। তারপর কাৎ হলো। ধীরে ধীরে পা ছড়িয়ে একটা লাশের মত নিজেকে বিস্তৃত করল। অনেকক্ষণ পর একটা পা তুলে দিল বাবরের গায়ে। বাবর তখন কিছু বলছে না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা

করছে। লোকটা এবার তার দিকে পাশ ফিরল। আরো এক যুগ পরে জড়িয়ে ধরল তাকে একটা কালো আলিঙ্গনে, তখন চিৎকার করে উঠল বাবর। তার অসুস্থ বাবা স্বপ্নটা শুনে পরদিন সকালেই মৌলবী ডেকে তওবা করলেন। মারা গেলেন তিন দিনের দিন।

কিন্তু আমি এখন জ্যোতির্ময়। জীবনের আলোয় উদ্ভাসিত। আমার স্বচ্ছ শরীরে দৃষ্টি কর।

বাবর পাশ ফিরল জাহেদার দিকে। কম্বলের একটা প্রান্ত তুলে প্রথমে বাঁ পায়ের আঙুল ঢোকাল, তারপর গোড়ালি পর্যন্ত, অবশেষে সম্পূর্ণ উরুটা। উষ্ণতায় শরীরের ঐ অংশটা যেন অন্য কারো হয়ে গেল। বাবর এবার একবারে ডান পা ঢুকিয়ে দিয়ে নাভি পর্যন্ত টেনে দিল কম্বলটা।

সে একটা সিগারেটের তৃষ্ণা অনুভব করতে লাগল। কিন্তু না, থাক।

একেবারে প্রথম বারের মত লাগছে। এ-রকম খুব কম মনে হয় তার। বোধহয় আজ সারাদিন ধরে ভেবেছে, তাই এমন মনে হচ্ছে।

সমস্ত শরীর তার সাহসে, বাসনায় এখন উষ্ণ স্ফীত হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ দেহটা সে কম্বলের তলায় নিয়ে গেল। তারপর সামান্য একটু সঞ্চালনে সংলগ্ন হলো জাহেদার। সঙ্গে সঙ্গে সুবাসিত নিঃশ্বাসে তৈরি, মধুর গ্রীষ্ম যেখানে বারো মাস, এমন একটা পৃথিবীতে পৌঁছে গেল সে। জাহেদার পিঠে হাত রাখল। জায়গাটা পছন্দ হল না। হাতটাকে আস্তে আস্তে নাবিয়ে আনল আরো নিচে, দুই পাহাড় বেষ্টন করা ব্রীজের মত স্থাপিত হল জাহেদার নিতম্বের ওপর।

মুখটাকে আরো কাছে নিয়ে গেল সে। প্রায় সেঁদিয়ে গেল চুলের অজস্র টিকার-টেপের প্রপাতে। সেই প্রপাত পার হয়ে জাহেদার তন্দুর থেকে সদ্য টানা রুটির মত উষ্ণ গালে গাল রাখল এবং সেখানেও স্থির হলো না। মাথা তুলে জাহেদার মুখের ওপর ঝুঁকে রইল সে একটা কনুইয়ে ভর করে, যেন রবি বর্মার ছবিতে বালকৃষ্ণেরা ঘুমন্ত মুখের ওপর নাগরূপী ঈশ্বর। জাহেদার নিঃশ্বাস তার সমস্ত মুখ পুড়িয়ে দিতে লাগল সকাল বেলার প্রথম সূর্যের মত। সে আলতো করে একটা চুমু দিল তার কপালে, অবিকল বলির আগে ছাগলের কপালে যেমন করে পরানো হয় রক্ত সিঁদুরের ফোঁটা।

আস্তে আস্তে উপুড় থেকে চিৎ করে দিল জাহেদাকে। জাহেদা দু'দিকে দু'হাত বিছিয়ে শিথিল দেহে পড়ে রইল। একতালে বইতে লাগল তার নিঃশ্বাস। এখনো সে ঘুমিয়ে আছে। এখনো সে জানে না সে আর একা নয়। এখন সে হয়ত একটা স্বপ্ন দেখছে। বাবর তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। শিউরে উঠল জাহেদা। সে ঠোঁট চুষে ঢোক গিলে আবার প্রশান্ত হল। তখন আরেকটা চুমু দিল তাকে বাবর। স্খলিত কণ্ঠে বলল, তুমি ঘুমোও।

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল তার। হাঁপানি রোগীর মত মনে হতে লাগল। বারবার মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। ঢাকায় ফিরেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। রক্তচাপের যে উপসর্গগুলো প্রায় দেখা দিচ্ছে বলে ডাক্তার বলছিলেন তার জন্যে ওষুধ-বিষুধ বাছবিচার তো নিয়ত করছে। তবু এ রকম হচ্ছে কেন? লতিফার সঙ্গে সে রাতেও ঠিক এই রকম বোধ হচ্ছিল। না, এত দ্রুত জরার শিকার হতে চায় না। ওষুধে কিছু না হোক, ইচ্ছে দিয়ে সে ঠেকিয়ে রাখবে। সে এখন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করল।

আশ্চর্য, ফল হলো। স্বচ্ছন্দ হয়ে এলো নিঃশ্বাস।

বাবর জাহেদাকে আলতো করে পাশ ফিরিয়ে পিঠে বোতাম সন্ধান করল। হাতে ঠেকল জিপের ছোট লকলকে জিভেটা। আস্তে আস্তে নিচের দিকে টান দিল সে। কোমর পর্যন্ত খুলে গেল। তখন আবার তাকে চিৎ করে প্রথমে জামাটা নিচ দিয়ে খোলার চেষ্টা করল, পরে ওপর দিয়ে দেখল হলো না। কোমল অথচ গুরুভার মনে হলো জাহেদার হাত দুটো। তখন জামাটা ঠেলে গলা পর্যন্ত তুলে দিয়ে একটা হাতে বুকের ছোট জামাটা ঠেলে দিল। ঢিলে করে পরেছে জাহেদা।

এতটুকু কষ্ট হলো না। কাপড়ের পেয়ালা দুটোর ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরুল স্তন। বাবর প্রথমে ঠোঁট দিয়ে একটিতে স্পর্শ করল আলতোভাবে। তারপর আরেকটার কথা মনে পড়ল। তখন সেটাও স্পর্শ করল সে। তারপর আবার প্রথমটা। যেন দুটি ছোট্ট মেয়েকে সে পছন্দ করে একই রকম। কখনো একে কখনো ওকে আদর করছে সে। প্রথমে একেকজনকে অনেকক্ষণ করে। তারপর কমে আসতে লাগল সময়। কমতে কমতে চলচ্চিত্রের মত দ্রুতগতিতে এটা ওটা এটা ওটা করতে লাগল। এবং পরিণামে হঠাৎ দুই ঠোঁটে দৃঢ় নিবদ্ধ করে মুখ গুঁজে দিল। যেন এক শিশু মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল হঠাৎ। এবং সেই শিশুর মত অবিকল একটা ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু ক্রন্দন নয়, তার কণ্ঠ দিয়ে বেরুতে লাগল। বুজে থাকা চোখের ভেতরে উজ্জ্বল কতগুলো বর্ণের প্রলেপ ঘনঘন বদলাতে লাগল অবিরাম। কালো, লাল, নীল, বেগুনি আবার লাল। কখনো লালের মধ্যে ছিটে পড়তে লাগল গাঢ় নীল বিন্দুর। ঘুরতে লাগল। পরক্ষণে নীল বিন্দুগুলো মুহূর্তে লাল হয়ে গেল এবং লাল পটভূমি কালো। অভিভূতের মত মুখ তুলে ঠোঁট দিয়ে সন্ধান করতে লাগল জাহেদার চোখ, কানের লতি, চিবুকের কার্নিশ, গ্রীবার পেছনে ছোট ছোট সোনালি রোমের সীমানা, যেন একটা বুলডোজারের প্রশস্ত লেভেলার-ফলার মত সচল মাতাল তার মুখ এবড়ো থেবড়ো মাঠে, যেখানে শহরের পত্তন হবে। সে তার এবং আবহমান কাল মানুষের রক্তের স্বভাববশত অতি সুন্দর ব্যক্তিগত কণ্ঠে রাসের মেলায় কেনা পুতুলের মত— যার ভেতর ফাঁপা এবং পেছনটা রং করা হয়নি— শব্দগুলো উচ্চারণ করতে লাগল। সে জানে এ সত্য নয় তবু নাটকের সংলাপ এইই, তাই বলে বলল, তন্ময় অভিনেতার মত।

সে জাহেদার কানের লতিতে ঠোঁট রেখে বলতে লাগল, আমি তোমাকে ভালবাসি জাহেদা। জাহেদা। জাহেদা। জাহেদা। তোমাকে ভালবাসি। তোমার জন্যে আমি মরতে পারি। আমি জীবন জানি না, মৃত্যু দেখিনি। আমি তোমাকে জানি তোমাকে দেখেছি জাহেদা। আমি তোমাকে ভালবাসি। ও জাহেদা, ভালবাসি। জাহেদা হেডা, হেডা, আমার হেডা।

বলতে বলতে এমন একটা গুঞ্জনের সৃষ্টি হলো যে তার অভিভাব তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলল। সে কিছুক্ষণ নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল জাহেদার গালে মুখ রেখে। তারপর হঠাৎ সচল হয়ে দুই ঠোঁটে ব্যগ্রতার সঙ্গে সবুজ একটা অশ্বথ পাতার মত স্তনমুখ তুলে নিল। এবং ক্রমশ টের পেতে লাগল কোমলতার ভেতর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা এক অপরূপ কাঠিন্য। আবেগের একটি ক্ষুদ্র মিনার তার মুখের মধ্যে এখন, ঋজু, অনমনীয়, উদ্ধত, তার তালুর আকাশের নিচে। বৃষ্টির মত স্নেহে সে সিক্ত করে দিতে লাগল তা। আর করতল

বিস্তৃত করে, পাঁচ আঙুল প্রসারিত করে দু'হাতে জাহেদার কাঁধ থেকে পাঁজরের পাশ দিয়ে নিতম্ব দিয়ে নেমে হাঁটু পর্যন্ত বারবার সে ভ্রমণ করতে লাগল, যেন কুমারী কোনো দ্বীপে সে একজন আবিষ্কারকের মত প্রতিটি বাঁক, চড়াই, উৎরাই হেঁটে হেঁটে স্মৃতির অন্তর্গত করছে।

আহ।

চমকে উঠল বাবর। জাহেদার কণ্ঠ থেকে নির্গত ঐ ধ্বনি কত পরিচিত, কতবার সে শুনেছে অন্য কণ্ঠে, অন্য আধারে, তবু তাকে বিস্মিত করল, অভিভূত করল এবং আরো ব্যাকুল করে তুলল। সে টের পেল জাহেদা একটা হাত নাভির নিচে এনে রাখল। বাবর আর তার সংলগ্ন শরীরের ভেতরে একরোখার মত প্রবেশ করে হাতটা মুঠিবদ্ধ হয়ে উঠল। আঙুলের কঠিন পিরামিড বসে গেল বাবরের পেটে। মৃদু যন্ত্রণা এবং অস্বস্তি করে উঠল ওখানে। বাবর পিরামিডটা ভাঙতে চেষ্টা করল। পারল না। সরিয়ে দিতে চাইল, অনড় হয়ে রইল। তখন শক্তি প্রয়োগ করল। তাতেও কাজ হলো না। বরং আরো উঁচু হয়ে উঠল পিরামিডটা, আরো কঠিন হয়ে গেল। বাবর তখন দু'হাতে জাহেদার মুখ ঘোমটার মত ঘিরে তার শরীরের ওপর নিজের শরীর টেনে কাছে এলো। এক আঁজলা নাকের ডগা, ঠোঁট, চিবুক পান করে কানের কাছে মুখ রেখে বলল, ও জাহেদা, হেডা, হেডা, হেডা আমাকে ধরে রাখ।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কানের লতি দংশন করল সে তার, স্বর্ণকার যেমন অলংকার তৈরির আগে সোনার পাতে আলতো একটা কামড় দিয়ে দেখে। একই মুহূর্তে নিজে হাত দিয়ে জাহেদার প্রহরী হাতে চাপ দিল। পুরনো একটা হাতলের মত সরে গেল তা। বাবর তার করতল দিয়ে চেপে ধরল শূন্যস্থান এবং ধীরে ধীরে মুঠিবদ্ধ করতে লাগল। আধখানা মুঠো করে সে ধরে দুই উরুর মাঝখানে, আর জাহেদার চিবুকের তলায় মুখ গুঁজে চিবুকটা ধীরে ধীরে ঠেলে নিতে লাগল ওপরে যেন একটা লাল ইটে তৈরি বাংলোবাড়ির শাদা জানালার শার্সী সে খুলেছে।

আহ।

আবার অদ্ভুত আর্তনাদ করে উঠল জাহেদা।

কী সোনা?

আহ্

হেডা সোনা।

না।

জাহেদার দুটো হাত হঠাৎ জড়িয়ে ধরল বাবরের গলা। প্রচণ্ড চাপে যেন শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মারবে। উপরের দিকে টেনে তুলতে চাইল সে বাবরের মুখ। এবং নিজেও নামিয়ে আনল। বাবরের চোখের নিচে জাহেদার ঠোঁট এসে যুক্ত হতেই মেঘ ফেটে রৌদ্র বেরুল যেন। জাহেদা তাকে কম্পিত ঠোঁটে চেপে ধরল সারা জীবনের মত। তারপর একটা জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল। বাবর উঠে এলো আরো কাছে। উপহার করে ধরল তার ঠোঁট। জাহেদা একটু ইস্ততত করল। একবার স্পৃষ্ট হলো। আবার বিযুক্ত হল। তারপর গলা টান করে রেসের ঘোড়া শেষ মুহূর্তে যেমন প্রথম হয়ে যায় তেমনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাবরকে সে স্পর্শ করল। দূর থেকে, কিন্তু কাছে। যেমন দুটো দালানের ছায়া পথের কংক্রীটে একে

অপরকে ছুঁয়ে থাকে কিন্তু তারা ছুঁয়ে নেই. তেমনি।

অনেকক্ষণ পর বাবর মুখ সরিয়ে জাহেদার কানের কাছে অস্পষ্ট একটু হাসল। বোধহয় কুঞ্চিত হলো জাহেদার কপাল। বাবর তখন মুখ তুলে অন্ধকারে জাহেদার মুখ দেখতে লাগল যেন আগে কখনো দেখেনি, যেন এইমাত্র কিছু সৃষ্টি করছিল সে, কী করছিল জানে না, এখন দেখছে এবং অবাক হয়ে যাচ্ছে। ফ্রানজ্ ক্লাইনের মত। মেঝেতে ক্যানভাস বিছিয়ে উন্মাদের মত বালতি বালতি রং ঢেলে, পা দিয়ে মথিত করে, তার ওপরে মডেলের নগ্ন নিতম্ব স্থাপন করে দু'হাতে তাকে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো টেনে নিয়ে দৌড়ে একটা মই বেয়ে উঠে ফ্রানজ্ ক্লাইন দেখছে এইমাত্র আঁকা তার ছবিটা।

বাবর হাসল। হাসিটা স্থির হয়ে রইল তার মুখে।

অন্ধকারে জাহেদার চোখ শুধু দেখা যাচ্ছে। কোথা থেকে এক বিন্দু আলো এসে বন্দি হয়ে আছে মাঝখানে। আলোটা ধীরে ধীরে ডান থেকে বাম দিকে নড়ছে, আবার ফিরে আসছে। বাবর বুঝতে পারল জাহেদাও তাকে এই প্রথম দেখার মত দেখছে। বাবর জানে, সে এখন ক্রমশ জাহেদার স্মৃতির অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছে।

বাবর মুখ নামিয়ে তার গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল, তুমি ভাল তুমি আমার ভাল। হেডা ? হেডা নামটা পছন্দ হয় ? বল, সোনা, বল। হেডা সোনা। ও হেডা সোনা, তুমি ভাল।

বলতে বলতে সে জাহেদার পাজামার ইলাস্টিক প্রসারিত করে ধরল। একটু কেঁপে উঠল জাহেদা, জানালার পর্দায় হঠাৎ বাতাস লেগে যেমন। বাবরের হাত মুঠো করে ধরল সে। হাসতে হাসতে বলতে বলতে বাবর সে হাত সরিয়ে দিয়ে পাজামা নামিয়ে দিল হাঁটুর কাছে। হাঁটুর ডিম দুটো গোটান করতলে মাজতে লাগল ক্রিকেট খেলোয়াড় যেমন বল নিয়ে করে।

হেডা, ও হেডা, দ্যাখ না। তোমার ঠাণ্ডা করছে না তো ?

বাবর একটু অবাকই হয়েছে, তার হাতের নিচে জাহেদা আর কেঁপে উঠছে না দেখে। এমনকি কি লোমকুপের অসংখ্য চুমকিও ঠেকছে না তার হাতে। মসৃণ, প্রশান্ত, অন্তহীন তার দেহ। বাবর তার রংটা পর্যন্ত আঙুলের ডগা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে।

মনে মনে হাসল সে। হোস্টেলে শরমিন, পপ্পু আর জাহেদা নিশ্চয়ই কখনো কখনো একজন আরেকজনকে আবিষ্কার করে। নইলে সে চমক নেই কেন জাহেদার ? সেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীনের মরা ব্যাংয়ের মত নড়ে ওঠা ?

হঠাৎ থমকে গেল বাবর। দ্রুত আঙুল বুলিয়ে দেখল। অ্যাকসিডেন্ট হলে শাদা ট্রাফিক পুলিশ যেমন ছুটে যায় তেমনি হাতটা পাঠিয়ে দিল সে। অবাক হয়ে টের পেল একটা শক্ত মোটা খসখসে কাপড়ের ফালি দিয়ে দৃঢ় আবৃত জাহেদার অঙ্গ। ফালিটা অনুসরণ করে কোমরে পৌঁছে অনুভব করল চওড়া একটা ফিতের ঘের, চেপে বসে আছে কোমল মাংসে। সন্ধান করল গ্রন্থি। কিন্তু পেল না। উন্মোচনের অধীরতায় বারবার পিছলে যেতে লাগল তার আঙুল। আবার ফিরিয়ে আনতে লাগল। জাহেদা মাথা এপাশ ওপাশ করতে করতে অনুচ্চ কিন্তু তীব্র স্বরে উচ্চারণ করল, না, না।

শান্ত হলো বাবরের হাত। সে হাসল। জিগ্যেস করল, তোমার শরীর খারাপ ?

জাহেদা কিছু না বলে মাথা নাড়তে লাগল শুধু।

কবে থেকে ?

তবু কিছু বলল না জাহেদা। বাবর মনে মনে ভাবল, কপাল একেই মন্দ বলে। কিন্তু তাতে নিবৃত্ত হলো না সে। আবার সচল হয়ে উঠল।

না।

হেডা সোনা।

না।

কবে থেকে খারাপ।

না।

খারাপ নয় ?

না।

না ?

যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল বাবর। শরীর খারাপ নয় ? তাহলে। তাহলে এই দেয়াল কেন তুলেছে জাহেদা ? কখন সে নিজেকে এভাবে বেঁধেছে ? তার মনে পড়ল, ঢাকায় তার বাড়িতে বাথরুমে গিয়েছিল জাহেদা, তারপর বাঘাবাড়িতে, আরেকবার এখানে এই ডাকবাংলোয়। হঠাৎ একটা কথার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেতনা। জাহেদা যখন আসতে রাজি হয়েছে তখন থেকেই জানত পরিণামে এই-ই হবে। হয়ত তাই আজ হোস্টেল থেকে বেরুবার আগেই নিজেকে সুরক্ষিত করে নিয়ে বেরিয়েছে। বাবরের মনে পড়ল প্রতিবার বাথরুমে অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছিল সে। বাঁধন খোলা এবং লাগানোয় তো সময় লাগবেই। সারাদিনে সেই জন্যেই তো তিনবার।

জাহেদা জেনে শুনেই এসেছে। কী বোকা আমি। আমার সঙ্গে এতদূর ওভাবে হোস্টেল পালিয়ে কোনো মেয়ে কেন রাজি হয়েছে দেখেই বোঝা উচিত ছিল। বোধহয় ভালবাসে। ভালবেসে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু কবে থেকে ? কই, আমি তো কিছুই লক্ষ করিনি। সে জন্যেই কী ভালবাসার অর্থ জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটা ?

ঈশ্বর, এদের দয়া কর। এবং আমাকেও। আমি এত মোটা মাথা বলে।

তাই জাহেদা আসবার পথে প্রথমে অমন চুপ করেছিল। আবার এ ঘরে শুতে আসার সময় কথা বলে চলেছিল অনর্গল যেন ভাবনাটা মাথায় না বাসা বেঁধে থাকে। আর এই সারাক্ষণ তার পাজামার ভেতরে শক্ত কাপড়ের কামড় ধরে রেখেছে সে। আশ্চর্য! আমি তাহলে এখনো বুড়ো হয়ে যাইনি।

ভেতরটা খুব উদার হয়ে এলো বাবরের। কিন্তু সেই সঙ্গে বাসনাও গাঢ় হলো আরো। সে আবার খুঁজতে লাগল উন্মোচনের গ্রন্থি। দু'হাতে তাকে চেপে ধরল জাহেদা। না, না। মা, মা, আম্মি।

কণ্ঠে কান্নার ধ্বনি। বাবর তার মাথায় সস্নেহে হাত রাখল।

মাকে কেন ডাকছ সোনা ?

আম্মি, আম্মি।

আমি তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব সোনা। যাবে তুমি?

জাহেদা শুধু মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

বাবর তখন কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল, ও-রকম করে না।

জাহেদা বাবরকে জড়িয়ে ধরল।

আবার তার গ্রীবায় একটা দীর্ঘ চুমু দিয়ে বলল, আমাকে ধরে শুয়ে থাক। তোমার কোনো ভয় নেই।

চুলে হাত বুলিয়ে দিল তার। তারপর তাকে বুকে করে পিঠের পরে একটা হাত রেখে আরেকটা হাতে জাহেদার মাথা তুলে নিয়ে সে বলল, হেডা তুমি ভাল মেয়ে। তুমি ঘুমোও। আমি আর কিছু করব না। হেডা, ও হেডা, তুমি মাকে কেন ডাকলে? তুমি কার মত দেখতে হয়েছ? মা-র মত? ও সোনা, তুমি ঘুমাও। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

জাহেদার পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বাবর গুনগুন করে উঠল, অনেক আগে শোনা জোন বাজের একটা গান। ঘুমপাড়ানির মত সুর। কোথায় যেন কান্না। ছেলেবেলা থেকে কনভেন্টে ইংরেজি পড়া মেয়ের জন্যে আর কোনো এই মুহূর্তের গান তার জানা নেই। সে গাইতে লাগল—

সেই গ্রীষ্মের কথা স্মরণ কর
এবং ক্রন্দন কর মাথা নিচু করে,
প্রাণনাথ তুমি ক্রন্দন কর।
লোকে বলে বিচ্ছেদ আসে
প্রতিটি ভাল বন্ধুর জীবনে;
তাহলে তুমি আর আমিই বা ব্যতিক্রম কীসে?
প্রাণনাথ তুমি ক্রন্দন কর।
সেই গ্রীষ্মের কথা স্মরণ কর
এবং ক্রন্দন কর মাথা নিচু করে।

১৫

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল বাবর। জেগে দেখল জাহেদা আর সে পিঠ ফিরিয়ে শুয়েছিল। জাহেদাকে এখন জাগাল না। দ্রুতপায়ে নেমে বাথরুমে গেল, পরিষ্কার করে গাল কামাল, গরম পানি আনিয়ে গোসল করল অনেকক্ষণ ধরে। পরল তার শাদা ফ্লানেলের সুট। সবুজ ফোঁটা দেয়া টাই বাঁধল গলায়। মন খুব ভাল থাকলে এই পোশাকটা সে পরে। টাইটা আলজিরিয়া থেকে আনিস তাকে পাঠিয়েছিল।

তারপর জাহেদার জন্যে গরম পানি আনিয়ে তার কানের কাছে মুখ রেখে ডাকল, হেডা, ও হেডা।

চোখ মেলে অচেনা চোখে এক পলক তাকিয়ে রইল জাহেদা। হঠাৎ একটা সলজ্জ স্নিগ্ধতায় ভরে গেল সদ্য ঘুম ভাঙ্গা মুখ।

শিগগির তৈরি হয়ে নাও। আমি নাশতা নিয়ে আসছি। কেমন।

বলে সে হাত ধরে জাহেদাকে তুলে দিয়ে বেরুল। বেরিয়ে দেখল সারারাত শিশিরে গাড়িটা ভিজে আছে। কাচ অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। কাচের ওপর আঙুল বুলাতেই সুন্দর পরিষ্কার দাগ ফুটে উঠল। তখন বড় বড় করে সে লিখল H-E-D-A, কৌতুকভরা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল, আবার মুছে দিল। রুমালটা ভিজে গেল সারা রাতের শিশিরে।

চৌকিদার এসে বলল, নাশতা দেবে কি ? হ্যাঁ, একটু পর। চৌকিদার তখন বলল, ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিই, গাড়ি মুছে দেবে ? হ্যাঁ, তাই দাও। বাবর গাড়িতে বসে এঞ্জিন স্টার্ট করে গরম করল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফটকের দিকে গেল। জাহেদার তৈরি হতে অন্তত আধ ঘণ্টা সময় লাগবে। এই সময়টুকু হেঁটে বেড়ান যাক।

ঘুম থেকে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে রংপুর। দালানের খরখড়িতে, থামে, বারান্দায়, পথের ওপর রোদ পড়ছে। ঠিক যেন ঘুম ভাঙ্গা জাহেদার মত হাসছে শহরটা। মিষ্টির দোকানে কয়লার উনুন থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সিঙ্গারা সাঁতার কাটছে গরম তেলে। একপাল কাক মোড়ে জনসভা করছে যেন, কলরবে নাচানাচিতে জমজমাট। চাদরে কান মাথা ঢেকে লাঠি হাতে বুড়োরা বেড়িয়ে ফিরেছে। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি থেমে থেমে পরিচ্ছন্ন করছে পথ। ফুটপাতের পাশে দেয়ালে শূন্য সব রশি টানান, গত রাতে যেখানে ঝোলান ছিল রং-বেরং-এর শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা। পানের দোকান থেকে ধোয়ামোছার পানি গড়িয়ে ছোট ছোট হ্রদ সৃষ্টি করেছে। চারদিক থেকে কুয়াশার পর্দা, হিমের পর্দা, ঘুমের পর্দা ক্রমশ নিঃশব্দে নাতিদ্রুত উঠে যাচ্ছে। খুব ভাল লাগল বাবরের। বিশেষ কোনো বিষয়, ব্যক্তি বা সমস্যা তাকে এখন অন্যমনস্ক করে রইল না। মনে হতে লাগল সব কিছুই ভাল, সবকিছুর সমাধান আছে এবং বেঁচে থাকার একটা বিস্ময় আছে যার সঙ্গে কোনো বিস্ময়ের তুলনা নেই।

হাঁটতে হাঁটতে ধাপ পর্যন্ত গেল বাবর। এখানে আরো শান্ত পরিবেশ। গাছপালার মধ্যে বেড়া দেয়া বাড়িগুলো উঁকি দিচ্ছে। লম্বা লম্বা গাছের ছায়া পড়ে নিবিড় দেখাচ্ছে পথটাকে। মাটির একটা তাজা গন্ধ সর্বক্ষণ নাকে এসে নেশা সৃষ্টি করছে।

বাবর এবার ফিরল। খবর কাগজের জন্যে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর মনে পড়ল এটা ঢাকা নয়। এখানে কাগজ আসে একদিন পরে। আশ্চর্য, সকালটা এরা খবরের কাগজ ছাড়া কাটায় কী করে ? অথচ সে নিজেও যে একটা পড়ে তা নয়। কিন্তু সকালে টুথব্রাশের মতই ওটা একটা জরুরি বস্তু, নইলে সকালটাকে সম্পূর্ণ মনে হয় না। যেদিন কাগজের ছুটি থাকে, মনে হয় সারাদিন ভারি মনমরা যাচ্ছে।

আসসালামো আলাইকুম।

অতি বিশদভাবে উচ্চারিত এই সম্ভাষণে ঘুরে তাকাল বাবর। লোকটাকে পাশ কাটিয়েই চলে এসেছিল সে। ফিরে তাকিয়ে দেখল রেডিও পাকিস্তানের আসগরউল্লাহ। এই যে বাবর সাহেব। এখানে ?

আরে আপনি ? আপনি এখানে কী করছেন ?

আমি তো এখন রংপুর রেডিও স্টেশনের চার্জে আছি। মাস তিনেক হয়ে গেল।

তাই নাকি। আমি তো কিছু জানি না।

আর জানবেন কী করে ? টেলিভিশন আসার পর তো রেডিওর পথ আপনারা ভুলেই গেছেন।

তা সত্যি। বাবর অপরাধী হাসি একটা ফুটিয়ে তুলল। বলল, তারপর বলুন চলছে কেমন ?

এই এক রকম। আপনাদের খেদমত করে যাচ্ছি। রংপুর কবে এসেছেন ?

কাল সন্ধ্যায়।

কী ব্যাপার ?

এই বেড়াতে টেড়াতে।

উঠেছেন কোথায় ?

ডাকবাংলোয়। অফিসে যাচ্ছেন বুঝি ?

জি, আর কোন চুলোয় যাব বলুন। চলুন না আমাদের স্টেশনটা দেখে আসবেন।

আচ্ছা, আচ্ছা।

না, না, আপনাকে আসতেই হবে। এই সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় নেবেন, যেতে যেতে জেলখানা পড়বে, সোজা চলে যাবেন, হাতের ডানে রেডিও অফিস। ও দেখলেই চিনতে পারবেন। কখন আসছেন বলুন ?

দেখি।

দেখি টেখি না। আসতেই হবে। আপনাকে যখন পেয়েই গেলাম, একটা কিছু করিয়েও নেব। রংপুর স্টেশন থেকে ব্রডকাস্ট হবে।

শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন।

সে-কী কথা বাবর সাহেব। এতো আমাদের সৌভাগ্য। ছোট্ট একটা বক্তৃতা মাত্র। আপনি এখনই চলুন না ? কতক্ষণ লাগবে ?

আসগরউল্লাহ হাত ধরে ফেলল।

বাবর তখন বলল, আচ্ছা আসব। এখনো নাস্তা হয়নি।

আপনার অপেক্ষা করে থাকব কিন্তু।

অবশ্যই। তবে বক্তৃতা টক্তৃতা হবে কিনা বলতে পারছি না।

সে আপনাকে দিয়ে করিয়ে নেব। চলি।

আসগরউল্লাহ চলে গেল। বাবর একটু খুশিই হয়েছিল তাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করাতে। সেই খুশিটা তাকে নাচিয়ে নিয়ে এলো ডাকবাংলোর দোতলা পর্যন্ত। তার দরোজায় টোকা দিল। মধুর গুঞ্জন করে উঠল, আসতে পারি।

দরোজা ঠেলে দেখল জাহেদা আরাম চেয়ারে বসে আছে পিঠ সোজা করে। একদিকে একটু পাশ ফিরে। গোলাপি আর গাঢ় সবুজে আঁকা মনোরম একটা ছবির মত। গোলাপি পাজামা

পরেছে। পায়ে সবুজ ফিতের চটি। হাতকাটা গাঢ় সবুজ কামিজ, পিঠে গোলাপি বোতাম বসান। ঠোঁটে গোলাপি বংয়ের আবাস বার্নিশের মত উজ্জ্বল। কপালের মাঝখানে গোলাপি টিপ। ভ্রূ টেনেছে সরু করে, চোখে কাজলের ফ্রেম। মাথার পেছনে টানটান করে চুল বাঁধা। অত্যন্ত প্রশান্ত আত্মস্থ স্নিগ্ধস্নাত মনে হচ্ছে তাকে। মুখটাকে দেখাচ্ছে কোমল ব্রাউন। এত কোমল যেন স্পর্শ করলেই ভেঙ্গে যাবে। গভীর চোখ তুলে তাকাল জাহেদা। বসে বসে নোখে রং পরছিল সে। সমুখে নাশতা সাজান। বাবর মিষ্টি করে হাসল। বলল, তুমি বসে আছ ?

কতক্ষণ নাশতা দিয়ে গেছে। এই আপনার আসা ? খান।

তুমি ?

আপনি শুরু করুন।

গতরাতে যেন কিছুই হয়নি, গতরাত যেন অন্য কারো নাটকের রাত ছিল, জাহেদাকে দেখে এখন তাই মনে হলো বাবরের। তার মনে একটুখানি আশঙ্কা ছিল এই সকালের জন্য, এখন তা একেবারে নির্মল হয়ে গেল। সে একবার তার প্রশংসা করবে ভাবল, কিন্তু করল না। দু'চোখ ভরে দেখল জাহেদাকে তার বদলে। আজ সকালে যেন আরও সুন্দর লাগছে তাকে।

উঃ, আপনার এই হাসিটা।

রং রেখে নোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে জাহেদা বলল।

কেন কী হয়েছে ? গম্ভীর থাকা বুঝি ভাল ?

নিন খান।

চৌকিদার চা দিয়ে গেল। নাশতা শেষে বাবর বলল, ভেবেছিলাম আজ রংপুর ছাড়ব। তা বোধহয় হলো না।

আশংকায় করুণ দেখাল জাহেদাকে। বলল, কেন ?

এই মাত্র নিচে রেডিওর একজনের সঙ্গে দেখা। বলল, একটা বক্তৃতা দিতে হবে। এখানে আমার এক বন্ধু থাকে, প্রণব বাবু, ভাবছি তার সঙ্গেও দেখা করব, মানে এলাম যখন। চল, আগে রেডিও সেরে আসি।

আমি যাব ?

কী হয়েছে তাতে ? চল, চল। তারপর শহর দেখাব তোমাকে। রেডিও থেকে ফেরার পথে।

জাহেদা হেসে ফেলল।

হাসছ, যে ?

আবার ফেরার পথে বলেছেন।

কালকের কথা মনে পড়ল বাবরের। কাল সবকিছুই সে ফেরার পথে জাহেদাকে দেখাবে বলছিল ক্রমাগত। তার জন্যে শাসনও শুনছিল। আজকে আবার। বাবর বিস্তৃত হাসিতে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। বলল, আজ থেকে আর ফেরার পথে নয়।

কথাটা একটু ওজন দিয়ে উচ্চারণ করল বাবর। জাহেদা উঠে দাঁড়াল। তখন বেরুতে বেরুতে বাবর বলল, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। খুব মানিয়েছে তোমাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে বলল, জান জাহেদা, আমার মনে হয়, একেক সময় আমি ভাবি, ঈশ্বর যদি থাকেন, আমি তার খুব আদরের তৈরি। তিনি নিজ হাতে আমাকে বানিয়েছেন।

কেন ?

কেন আবার ? আমার মত ভাগ্যবান আর কে বল ?

বাবর মুখ ফিরিয়ে জাহেদার দিকে অর্থভরা চোখে দেখল। জাহেদা সমুখে চোখ রেখেই বুঝতে পারল সেটা। অনাবশ্যকভাবে বলল, গাড়িটা সারারাত বাইরেই ছিল নাকি ?

হাসতে হাসতে গাড়ির দরোজা খুলে দিল বাবর। একটু রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারল না সে। গাড়ির গায়ে চাপড় দিয়ে বলল, এ বেচারার জন্যে কাল কোনো ব্যবস্থা করা গেল না।

শীতের উজ্জ্বল রোদে গাড়িটা বেরিয়ে গেল ওদের নিয়ে। জাহেদার গাঢ় সবুজ ফোঁটা চমৎকার ম্যাচ করেছে। এইসব ছোট্ট কিন্তু সুন্দর যোগাযোগগুলো ভারি প্রীত করে বাবরকে।

বাঁ দিকে জেলখানা পড়ল। আসগরউল্লাহ বলেছিল; সোজা আরো কিছুদুর যেতে হবে। বাবর বাঁয়ে দেখিয়ে বলল, এই হচ্ছে রংপুর জেলখানা।

আমাকে দেখাচ্ছেন কেন ?

তবে ?

ওটা তো আপনার জায়গা।

তা বটে। যদি তুমি জেলর হও।

আমার বয়ে গেছে।

ঐ বোধহয় সামনে রেডিও স্টেশন।

নাম পাঠাতেই আসগরউল্লাহ নিজে সদর দরোজার কাছে এসে অভ্যর্থনা জানাল। আসুন, আসুন।

কিন্তু চোখ তার জাহেদার দিকে। বাবর হেসে বলল, জাহেদা আমার বোন। সবচেয়ে ছোট।

ও, উনিও এসেছেন।

হ্যাঁ, চিরকাল রাজধানীতে মানুষ। বেড়াতে নিয়ে বেরিয়েছি।

খুব ভাল করেছেন।

জাহেদা বাবরের দিকে চোখ কালো করে একবার অনেকক্ষণ তাকাল। বাবর তা না দেখার ভাণ করে আসগরউল্লাহকে বলল, আপনার স্টুডিও দেখান।

সমস্ত স্টেশনটা ঘুরিয়ে দেখান হলো ওদের। সবার সঙ্গে আসগরউল্লাহ আলাপ করিয়ে দিতে লাগল।

এই যে ইনি বাবর আলী খান। আর তার ছোট বোন।

বাবর যে রংপুরে সেটা যেন আসগরউল্লারই অনেক কীর্তির মধ্যে একটি, এই রকম একটা যাদুকর-শোভন গর্ব তার চোখেমুখে। ভারি মজা লাগল বাবরের। আপিসে বসতে বসতে

বলল, কীসের বক্তৃতা দিতে হবে বলুন।

জি, বিষয় আমি ঠিক করে রেখেছি। রংপুরের ভাওয়াইয়া গানে বিরহ।

গান ? গানের আমি কী বুঝি ?

তবু।

আর বিরহ ? হাঃ হাঃ। আসগরউলাহ সাহেব, এই শীতের চনমনে সকালে আর কোনো বিষয় পেলেন না ? বিরহ!

মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল বাবর। জাহেদা 'বিরহ' শব্দটা বোঝে না। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বাবরকে হাসতে দেখে তার ভেতরেও সংক্রমণ হলো যেন। সে ঠোঁট টিপে মুখ নামিয়ে রইল। আসগরউল্লাহ বুঝতে পারল না বাবর কী ঠাট্টা করছে না সত্যি সত্যি বলছে। খুব সপ্রতিভ হয়ে বলল, বিরহ তো শীতের সকালেরই ব্যাপার সাহেব।

তাই নাকি ? আরো মজা পেল বাবর। হা হা করে হেসে উঠল সে। তার চেয়ে বাংলাদেশের জাহাজ শিল্পের ভবিষ্যৎ বা গবাদি পশুর যক্ষ্মা গোছের কোনো বিষয় দিন, মিনিট দশেক বক্তৃতা করে দিচ্ছি।

এবারে হা হা করে হেসে উঠল আসগরউল্লা। বলল, ঠাট্টা করছেন ? স্বীকার করি, আমাদের অধিকাংশ বক্তৃতার বিষয়ই ঐ রকম। তাই বলে তা আপনাকে দেব কেন।

আচ্ছা তাহলে ঐ ভাওয়াই গানে বিরহই ?

জি, আপাতত এটাই আছে। দশ মিনিটের বক্তৃতা। মিনিট আটেক বললেই হবে।

কিন্তু কী বলি বলুন তো! ভাবতে হবে, লিখতে হবে, কখন লিখব, কখন পড়ব ?

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আপনার বক্তৃতায় উদাহরণ হিসাবে কিছু গানের অংশ তো থাকবেই। আমি রেকর্ড বাছাই করেও রেখেছি। গানেই যদি বলেন মিনিট পাঁচেক সবশুদ্ধ চালিয়ে দেয়া যাবে। মাত্র তিন মিনিট কথা বলবেন। ব্যাস।

জাহেদার পাশে নিজেকে খুব চটপটে লাগছিল বাবরের। মনের কোণে তাকে একটু তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটাও হচ্ছিল থেকে থেকে। সে বলল, বেশ, সোজা স্টুডিওতে চলুন। মুখেই বলছি। ফাইলের জন্যে টেপ থেকে কাউকে দিয়ে টুকে নেবেন।

বেশ তো তাই হবে। স্টুডিওতে চলুন। গানগুলো শুনে নেবেন।

চল জাহেদা।

জাহেদার কাঁধে হাত রেখে বাবর বলল। জাহেদা আবার চোখ কালো করে দেখল তাকে। কয়েক পলকের জন্যে। তখন আরো সুন্দর লাগল তাকে।

বক্তৃতা রেকর্ড করে বেরুতে বেরুতে সাড়ে এগারটা বেজে গেল। যাবার সময় বাবর বলল, চেকটা ঢাকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।

খুব খুশি হলাম। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আবার আসবেন। ঢাকায় গেলে দেখা করব।

করবেন।

বাগান থেকে একটা বড় সূর্যমুখী তুলে বাবর জাহেদাকে দিল। জাহেদা আবার চোখ কালো করে তাকাল।

আরে, কী হয়েছে ?

আপনার এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত।

অবশ্যই।

বলে সাঁ করে গাড়ি পথের ওপর তুলে আনল বাবর। রওয়ানা হলো শহরের দিকে। হাসতে হাসতে বলল, জানি না কীভাবে কথাটা ইংরেজিতে অনুবাদ করব, বাংলায় একটা কথা আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমার হয়েছে সেই অবস্থা।

আমি বেশ বাংলা বুঝি সাহেব। আপনি খামোকা সর্বক্ষণ ইংরেজি বলেন।

কী জানি। বাংলায় বললে মনে হয় তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না আমি কী বলতে চাইছি। ইংরেজিটা অনেক নির্ভরযোগ্য মনে হয় তাই।

জাহেদা সীটে গা এলিয়ে বসল।

নিপুণ হাতে গাড়ি চালাতে চালাতে বাবর বলল, তখন ঐ বিরহ শব্দটা বুঝেছ ?

না।

কী করে বোঝাই তোমাকে ইংরেজি কী হলে বুঝতে পারছি না। এটা একটা বিচ্ছেদের অবস্থা। সঙ্গে অনন্ত বেদনা আছে, প্রতীক্ষা আছে।

লঙ্গিং ?

না, না, লঙ্গিং নয়। তার চেয়েও বেশি। বিরহ বুঝতে হলে তোমাকে রাধার কথা জানতে হবে। রাধা।

আমি রাধাকে চিনি। রাধা হচ্ছে হিন্দুদের একজন সুন্দরী দেবী। ইন্ডিয়ান লাভ মেলোডিজ বলে একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড, তার কভারে আছে রাধার ছবি।

বাবর হাসল।

কি, ভুল বলেছি।

না, নাতো। বোধহয় জান না, রাধা শুধু দেবী নয়, কল্পনা নয়, রাধা যে-কোনো মেয়ের নাম কোনো বিশেষ মুহূর্তে।

অর্থাৎ ?

কিছু না, ও কিছু না। তুমি আমার রাধা। সবুজ আর গোলাপি দিয়ে আঁকা, চোখে বর্ষার মেঘ টানা, কাঁচুলিতে নীল পয়োধর বাঁধা, তুমি আমার রাধা।

বাংলা ভাল বুঝি না বলে যা খুশি তাই বলছেন, বুঝি না বুঝি। আপনি এখন থেকে ইংরেজি বলবেন। শুধু ইংরেজি।

তাইতো বলছিলাম কাল থেকে।

তাই বলবেন সাহেব এরপর থেকে।

ইয়েস, ইয়োর ম্যাজেস্টি।

বাবর পথের দু'দিকে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে তাকাতে লাগল।

কী দেখছেন ?

এইখানে কোথায় মিলন স্টোর বলে একটা দোকান আছে।

কী কিনবেন ?

কিছু না। আমার এক বন্ধু আড্ডা মারতে আসেন শুনেছি। ঢাকায় বহুবার বলেছেন রংপুরে এলেই যেন খোঁজ করি। চমৎকার মানুষ। এই যে!

পেট্রল পাম্প পেরিয়েই দোকানটা। বাবর সেখানে প্রণব বাবুর খোঁজ করল। না, তিনি তো নেই। হ্যাঁ, তিনি এখানে সকাল বিকেল আসেন। আজো আসবেন। বাবর একটা টোকা লিখে দোকানির হাতে দিল। হ্যাঁ, এলেই প্রণব বাবুকে দেবে। লোকটা সারসের মত গলা বাড়িয়ে যদ্দুর দেখা যায় বাবরকে দেখল। পাম্প থেকে পেট্রল ভরে নিল বাবর। বলল, চল তাজ হাটের মহারাজার প্রাসাদটা দেখিয়ে আনি।

মহারাজা ?

ছিলেন, এখন নেই। শুনেছি শেষ যিনি মহারাজা ছিলেন কলকাতা যাবার পথে গাড়িতে হার্টফেল করে মারা গেছেন।

বেচারা। জাহেদা দুঃখিত মুখ করল।

মানুষ তো মরেই। মরবে না ?

তবু কী আশ্চর্য, এইটুকু জীবনের জন্য কত না হৈচৈ।

সেটা দোষের নয়। মানুষ এত হৈচৈ করে কেন জান ? করে সে যে বেঁচে আছে সেইটে অনুভব করার জন্যে।

এবং করাবার জন্যে। জাহেদা যোগ করল।

হয়ত। তবে আমার মনে হয়, না। আমার মত তোমারও যখন বয়স হবে তখন তুমিও বুঝতে পারবে, মানুষের নিজের কাছে নিজেই প্রমাণ দেয়া যে সে বেঁচে আছে এইটে বড়। ক'টা লোক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে সে বেঁচে আছে ?

জাহেদা সে চ্যালেঞ্জের ধারে কাছে দিয়েও গেল না। মুখ গোল করে বলল, আপনি সব সময় নিজেকে খুব বুড়ো ভাবতে ভালবাসেন, না ?

হেসে ফেলল বাবর।

আবার হাসছেন ?

হাসছি ? না, হাসছি না। কী জানি, হয়ত নিজেকে বুড়োই মনে করি। বয়স তো হচ্ছেই। কী জান তোমাদের দেখে একেক সময় ঐ রকম হয়। দু'দিন পরে এই তুমি গম্ভীর হয়ে যাবে, চঞ্চলতা কমে যাবে, শাড়ি পরবে, সংসার করবে, মা হবে।

কখনো না।

আইবুড়ো থাকবে ?

হ্যাঁ, থাকব।

কেন ?

কেন আবার ? বিয়ে টিয়ে আমি পছন্দ করি না। হাসছেন যে ?

কই ?

আপনার হাসি দেখলে আমার গা জ্বালা করে। কেন, আপনিও তো বিয়ে করেননি। আমি যদি হাসি ?

আমি ধন্য হব।

আমার কী দায় পড়েছে আপনাকে ধন্য করব ?

রাগ করেছ।

জাহেদা চুপ করে থাকে। বাবরের সত্যি সত্যি একবার মনে হয় তার হয়ত বয়সই হয়ে যাচ্ছে এবং তাই সে বুঝতে পারছে না এই সদ্য কৈশোর পেরুনো তরুণীকে। সে বলল, একটা লিমেরিক শুনবে ? বলে সে আর জাহেদার মতামতের অপেক্ষা করে না। বলে চলে—

আল্লাতালা বানিয়েছিলেন আদম এবং হাওয়া।

হাওয়া বলেন, দুর্ভাবনা বেবাক হলো হাওয়া।

ব্যাটাছেলে বলতে এক,

আমারই সে তাকিয়ে দ্যাখ!

কারো সাথে করতে তো নেই চুলোচুলি বাওয়া।

হেসে ফেলল জাহেদা। তারপর লজ্জায় একটু মাথা দুলিয়ে চিবুক মানাল। বলল, আপনার মাথায় কী কী যে সব খেলে। এটা বললেন কেন ?

বললাম এই জন্যে যে, আমাদের অবস্থাটা খুব ভিন্ন নয়। তোমার এখন রাগ করতে আমি, ঝগড়া করতে আমি, আবার আদর করতেও—

জি না।

জাহেদা পা গুটিয়ে বসল। চুপচাপ গাড়ি চালাল কিছুক্ষণ বাবর। ভেতরটা আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তার। আজ সকালে এই প্রথম। যেন ভোরের মিঠে সূর্যটা এখন মাথায় চড়ে গন্‌গন্ করছে।

বাবর তার নাম ধরে ডাকল। জাহেদা তাকাল তার দিকে। হাসল বাবর। আস্তে আস্তে জাহেদাও হেসে ফেলল। বাবর তখন একটা হাত স্টিয়ারিং থেকে তুলে চকিত ছুঁয়ে দিল জাহেদার কাঁধ। বলল, এই মেয়ে, কথা বলছ না ? আচ্ছা, আরেকটা লিমেরিক বলি।

না, না, বাবা আর না।

শুধু এইটে। বলেই ব্যাস।

খারাপ কিছু বললে আমি কিন্তু কাঁদব।

কেঁদ। তোমাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি।

কাঁদলে খুব বিচ্ছিরি দেখায় আমাকে। আমি যদি কোনোদিন কাঁদি, আমার মুখের দিকে কিন্তু আপনি তাকাতে পারবেন না।

আচ্ছা, কথা দিলাম।

বলুন লিমেরিকটা।

এক রূপসী বাড়ি তেনার সুদূর টিটিকাকা—

উড়ে এলেন এয়ার মেলে মস্ত খামে ঢাকা।

পিয়ন দিল বসিয়ে ছাপ।

বলল মেয়ে, বাপরে বাপ,

তলিয়ে গেল প্যারিস রোম, করল ফতে ঢাকা।

জাহেদা চোখ কালো করে বলল, এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই তো ?

বাবব হাসল রহস্যময় ভাবে।

তার মানে, আছে ?

থাকলেই বা। যখন কেউ কারো এই রকম কাছে হয় তখন খারাপ বলে কিছু থাকে না, থাকতে পারে না। সব ভালো, সব সুন্দর। সব কিছুর ভেতর দিয়ে তারা একটা কথাকেই ফুটিয়ে তোলে। সেটা হচ্ছে, আমরা আমাদের।

জাহেদা কয়েক মুহূর্ত পর বলল সত্যি, আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারি না। ঠাট্টার মধ্যে হঠাৎ গুরুগম্ভীর কথা বলেন, বলেন সেই ঠাট্টার সুরেই। আবার পাদ্রীদের মত গলায় এমন কথা বলেন যা আসলে রসিকতা।

আসলে কী জান, জীবনে সিরিয়াস হয়ে দেখেছি, কিছু পাইনি। আবার যখন সেই খোলসটা ছেড়ে ফেললাম, দেখি সব আমার হাতে।

তার মানে আপনি এখন সিরিয়াস নন ?

একপলক জাহেদাকে দেখল বাবর। কথাটার মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করল। বুঝে দেখল, একটু আটকে ফেলেছে তাকে মেয়েটা। বাবর তখন তার বহু ব্যবহৃত অস্ত্রটা আবার প্রয়োগ করল— হাসল। বলল, তোমার কী মনে হয় ?

জাহেদা চুপ করে রইল।

বাবর জানে কী এখন বলতে হবে তাকে। কূটনৈতিক মিশনের নিপুণ কোনো সদস্যের মত উচ্চারণ করল, সত্যি বলতে কী আগে ছিলাম না, কিন্তু কাল সন্ধে থেকে হয়েছি। কখন জান ? যখন তুমি গায়ে পুলওভার চাপিয়ে পা ক্রস করে বসলে সেই তখন কোথা থেকে কী হয়ে গেল, তোমাকে নতুন করে দেখলাম। সে দেখার বিস্ময় আর কাটল না। ওভাবে কেন বসলে তুমি ? তা হলে তো কিছু হতো না।

আমি কিছু ভেবে তো বসিনি। পা ক্রস করে ছিলাম তাই জানতাম না। আপনি বলছেন তবু মনে করতে পারছি না।

আকাশ কি জানে সে রঙ্গিন হয়ে আমাদের রঙ্গিন করে। না মনে রাখে।

জাহেদার মুখটা চিকচিক করে উঠল।

বাবর গাড়ি থামিয়ে নামল। বলল, এটা মহীগঞ্জ। এক সময়ে, সে অনেক আগে রংপুরের প্রধান এলাকা ছিল এইটে। দাঁড়াও তাজহাটের রাস্তাটা কাউকে জিগ্যেস করি।

দু'দিকে সারি সারি গুদাম ঘর, বাসা ভাঙ্গা দালান। মনে হয় মানুষ ছিল কিন্তু কোনো মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গেছে। যাদের দেখা যাচ্ছে তারাও যেন নিঃশব্দে চলাফেরা করছে,

এপার থেকে ওপারে মিলিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। ঘুঘু ডাকছে দূরে ঘন ঝোঁপের ভেতর থেকে। পরাজয়ের একটা বিষণ্ন বর্ণের প্রলেপ চারদিকে। জাহেদার মনে হলো, অবিকল একটা গোলডরাশ শহরের মত, আমেরিকায়, ছবিতে দেয়া, সোনার লোভে মানুষ গড়েছে এবং ফেলে চলে গেছে যেখানে সোনা আছে। মনটা খুব খারাপ করে উঠল তার।

বাবর ফিরে এলো। খুলে রাখল জ্যাকেট।

যা গরম লাগছে। আরো খানিকটা যেতে হবে, বলেই অবাক হয়ে গেল বাবর। শুনল জাহেদা আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছে।

কী বলছ জাহেদা?

ম্লান হাসল মেয়েটা। তাকে সুদূরের মনে হলো।

বলবে না আমাকে?

কী শুনবেন সব ছেলেমানুষী।

তবু।

টেবল পড়ছিলাম। ফোর থ্রিজা টুয়েলভ; ফোর ফোরজা সিক্সটিন, ফোর ফাইভজা টুয়েন্টি।

হঠাৎ নামতা কেন?

এমনি। এমনি মাঝে মাঝে বলি। ভাল লাগে। ফোর সিক্সজা টুয়েন্টি ফোর, ফোর সেভেনজা টুয়েন্টি এইট। কই চলুন।

যাচ্ছি।

বাবর থমকে গিয়েছিল। একটা নতুন খবর শুনেছে যেন। নামতা পড়তে ভাল লাগে। আশ্চর্য! সংখ্যার কী সম্মোহনী শক্তি! ঘুম না এলে একশ' থেকে উল্টো দিকে গুণতে হয়। জাহেদার মন কি খুব বিক্ষিপ্ত এখন?

গাড়ি সচল হয়ে উঠল। বলল, হোস্টেলের জন্যে ভয় করছে?

নাহ। যা হবার হবে। ওসব ভেবে আর মন খারাপ করতে চাই না।

বাবর হাসল। বলল, জান, এই একদিনে অনেক বয়স বেড়ে গেছে তোমার। তুমি বড় হয়ে গেছ।

হঠাৎ ব্রেক করল বাবর। জাহেদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, কী হলো?

ঐ দ্যাখ।

সমুখে একটা কালো অতিদীর্ঘ সাপ মন্থর গতিতে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। আতঙ্কে পাথর হয়ে রইল জাহেদা। বাবর সেই সাপটার দিকে তাকিয়ে রইল সম্মোহিত স্মিতহাস্যে। ধূলায় তার দেহের দাগ পড়ে যাচ্ছে। এই যে বাঁ দিকের শটি বনে ঢুকল। ধীরে ধীরে ঢুকে গেল তার রাজকীয় দেহটা। লেজের তাড়নায় ফট ফট করে শব্দ হতে লাগল শটি বনে। তারপর শব্দটাও মিলিয়ে গেল। তখন শুধু শূন্য সংবলিত এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

জাহেদা জিগ্যেস করল, কী সাপ?

গোখরা। পৃথিবীর ভীষণতম গোখরা এই অঞ্চলে দেখা যায়। এদের যে বিষ তার এত তীব্র

ক্রিয়া হয় যে—

দোহাই। দু'হাতে মুখ ঢাকল জাহেদা। চুপ করুন।

একটা নিয়ম আছে জাহেদা। সাপ দেখলে আশেপাশের গেরস্তকে খবর দিয়ে যেতে হয়। আমি গাঁয়ের ছেলে তো। ওটা মানি। বলে সে গাড়ির দরোজা খুলতে গেলে জাহেদা খপ করে হাত টেনে ধরল তার। না, আপনি যেতে পারবেন না।

থরথর করে কাঁপছে জাহেদার হাত। নোখগুলো বসে গেছে বাবরের হাতে। কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত তারা তাকিয়ে থাকল একে আরেকজনের চোখে। তারপর হঠাৎ বাবর তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখল অত্যন্ত কোমল করে। পরে মুখটা সরিয়ে কানের লতির উপর ছুঁইয়ে বলল, না, যাব না। তুমি যদি বল যাব না।

গাড়ি ফিরিয়ে নিল বাবর। বাঁ হাতে জাহেদার ডান হাতটা ধরে গাড়ি চালাতে লাগল সে। জাহেদা নীরবে নিজেকে সমর্পণ করে বসে রইল শূন্য চোখে দুপুরের রোদজ্বলা শালবনের রাস্তার দিকে।

সারা রাস্তায় আর একটা কথাও হলো না। সারা রাস্তা সেই রাজকীয় সাপটা এপার ওপার করতে লাগল অলস মন্থর গতিতে সারাক্ষণ। জাহেদা খোদিত একটা মূর্তির মত একভাবে বসে রইল। তারপর ক্রমশ যখন শহরে ঢুকল তারা, তখন জীবনের লক্ষণ দেখা গেল তার ভেতরে। একটা নিঃশ্বাস পড়ল। একটা হাত স্থান বদল করল। একটা পা স্যান্ডেল সন্ধান করল।

বাবর বলল, মৃত্যুকে তুমি ভয় পাও ?

আমি মরতে চাই না।

কেউ চায় না— পাগল, প্রেমিক, কবি ছাড়া।

তা জানি না। আমি বেঁচে থাকতে চাই।

কিন্তু মৃত্যুই তো নিয়ম।

বুঝি না।

মৃত্যুকে যেভাবেই দ্যাখ জাহেদা, পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক এই মৃত্যু। যদি একটা কোনো অনড় অবিচল সত্য থেকে থাকে তো তা মৃত্যু।

দোহাই আপনার, চুপ করন।

সত্য আর স্বাভাবিক থেকে তুমি কেন পালাবে জাহেদা ?

আহ আমি শুনতে চাই না।

অব্যক্ত যন্ত্রণায় জাহেদা মাথা এপাশ ওপাশ করতে লাগল। সুদক্ষ গলফ খেলোয়াড় যেমন সন্তর্পণে টি-তে বল ঢোকায়, তেমনি যত্ন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বাবর গাড়িটা ডাকবাংলোর ভেতর আনল। পরমশীলতার সঙ্গে দরোজা খুলে দিল জাহেদার। এবং নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগল দোতলার দিকে। জাহেদা একটু দ্রুত হাঁটছে। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দু'জনের ভেতরে দূরত্ব আরো বেড়ে গেল। কিন্তু সিঁড়ির কাছে গিয়ে অপেক্ষা করল জাহেদা। তখন আবার পাশাপাশি হলো তারা। এক সাথে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

দোতলায় উঠেই দেখে প্রণব বাবু দ্রুতগতিতে বারান্দায় পায়চারি করছেন। পরনে শাদা খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবি, সাদা জহর কোট, পাট ভাঙ্গা ধুতি, পায়ে লাল চটি। মাথায় রূপালি একরাশ তরঙ্গায়িত চুল ঝিকঝিক করছে। পাতলা ঠোঁটে সহাস্য পানের ছোপ।

বাবর ফিসফিস করে জাহেদাকে বলল, তুমি ঘরে যাও।

প্রণব বাবু ততক্ষণে পায়চারি করে উল্টোদিকে ফিরতেই বাবরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। শরৎ কালের মেঘের মত হাসতে হাসতে কাছে এসে প্রণব বাবু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, কী সৌভাগ্য! মশাই দোকানে আপনার চিঠি পেয়েই সেই থেকে পায়চারি করছি।

তাই নাকি?

আরে হ্যাঁ। একবার ভাবি চলে যাই, পরে আসব। আবার ভাবি দেখিই না একটু। সেই যে অভিজ্ঞান। শকুন্তলম-এ আছে— গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ সংস্থিতং চিতঃ। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতংনীরমানস্য। অর্থাৎ কিনা যাচ্ছি বটে, মন পেছনে পড়ে রইছে, যেন নিশান যাচ্ছে সমুখে, পতপত করছে পেছনে। হাঃ হাঃ। আছেন কেমন?

ভাল। এলাম আপনাদের দেশ দেখতে।

খুব ভাল করেছেন, খুব ভাল করেছেন। আমি মশাই সর্বক্ষণ আপনার কথা চিন্তা করি। এই কালও কাকে যেন বলেছিলাম। চলুন, কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবেন, নিয়ে যাই আপনাকে। সঙ্গে মহিলা দেখলাম।

আমার বোন।

বা বা বা। প্রীত হলাম। তাহলে দয়া করে একবার গরিবের বাড়িতে পদধূলি দিতে হয়। চাট্টি খাবেন।

নিশ্চয়ই। আপনার নিরামিষ খাবার গল্প কত শুনেছি।

মশাই, সাত পুরুষের অভ্যেস। সাত পুরুষ থেকে নিরামিষাশী। আপনাদের কেমন লাগবে জানি না, তবে যত্নের কোনো ত্রুটি রাখব না। হাঃ হাঃ। আজ রাতে?

হ্যাঁ, আজ রাতটা আছি। আজ রাতে মন্দ কী?

সেই ভাল। বসে বেশ গল্প গুজব করা যাবে। অনেক দিন থেকে মশাই আড্ডার জন্যে প্রাণটা আইটাই করছে। এখন কী করছেন?

এই বাইরে থেকে বেড়িয়ে এলাম।

তাহলে যান মশাই, স্নানাহার করে নিন, একটু বিশ্রামও হোক। আমি ও-বেলা আসব। এই চারটের সময়?

সে-কী! একটু বসবেন না? একটু বসুন। কদ্দিন পর দেখা।

তাতো বটেই। তবে কিনা দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময়। চোখের দেখা হয়ে গেল, মনটাতে আর আক্ষেপ নেই। আপনি আরাম করুনগে। ঐ কথাই রইল। রাতে গরিবালয়ে চাট্টি খাবেন। ন চেদন্যকার্য্যাতিপাতঃ প্রবিশ্য প্রতিগৃহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ। আর বিকেলে আমি আসছি।

পিঠ চাপড়ে দিয়ে চটি ফটফট করতে করতে প্রণব বাবু চলে গেলেন। যেন একটা নির্মল

আনন্দ কোথা থেকে হঠাৎ মনটাকে আলোকিত করে চলে গেল। তিন পুরুষ আগে এখানে জমিদারি কিনেছিলেন ওরা। এখন শুধু শীলতাটুকু আছে। মাঝে মাঝে জন্মভূমি বারানসিতে যান, ছেলেমেয়েরা সব সেখানেই, কিন্তু নিজে থাকতে পারেন না। রংপুরে পড়ে থাকে মনটা। জমিজমার কাজে হাইকোর্ট সেক্রেটারিয়েট আছে, সেই সূত্রে ঢাকা যেতে হয়। একবার এক ভাওয়াইয়া গায়কের সঙ্গে টেলিভিশনে বেড়াতে এসেছিলেন প্রণব বাবু। সেই তখন আলাপ। প্রথম আলাপেই ভারি ভাল লেগেছিল তাঁকে, বিশেষ করে ঐ সংস্কৃত উচ্চারণগুলো ভারি চমৎকার শোনায়। কতবার বলেছেন, রংপুরে এলেই মশাই আমাকে স্মরণ করবেন।

চৌকিদারকে খাবার আনতে পাঠিয়ে ঘরে ঢুকল বাবর। দেখল জাহেদা ছোট্ট আয়না তুলে মুখ দেখছে। জিগ্যেস করল, চলে গেলেন?

হ্যাঁ।

এই রকম চুল শাদা বুড়ো আপনার বন্ধু?

আমিও তো বুড়ো। হাসতে হাসতে বাবর খাটের ওপর বসল। যোগ করল, বুড়ো নই? তুমি যে তখন বলছিলে।

জাহেদা ভ্রূকুটি করে তাকাল। তারপর আয়নার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, আমার কথা জিগ্যেস করেনি?

করেছে।

পরিচয়টা কী দিলেন?

নিঃশব্দে সব ক'টা দাঁত বের করে হাসল বাবর। জাহেদা আবার চোখ কালো করল। নিঃশব্দে সালতামামী করতে লাগল চেহারার। বাবর একটা সিগারেট ধরাল। খাবার এলে খেল ওরা দু'জন। খেতে খেতে নেমতন্নের কথা জানাল বাবর। খাওয়া শেষে জাহেদা বলল, আপনি বাইরে যান।

কেন? বাইরে কেন?

আমি একটু শোব। যান।

বাবর আবার নিঃশব্দে হাসল। তারপর বনবেড়ালের মত পায়ে আরাম চেয়ারটা বাইরে এনে বসল।

১৬

বাবর চোখ খুলে দেখে আকাশটা লাল হয়ে উঠছে। আরাম চেয়ারে শুয়ে ঘাড়টা ব্যথা করছে তার। পাশে তাকিয়ে দেখে, জাহেদা। তখন বুঝল জাহেদা তার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। দুপুরের পোশাকটা পালটে শাদা জামা পাজামা পরেছে। তাতে কালো বর্ডার দেয়া। চুল পিঠের পরে ছেড়ে দেয়া, কাঁধের নিচে ডোল হয়ে আছে।

বাবর হাসল।

যান, মুখ ধুয়ে নিন। চা আনতে বলেছি।

বাথরুমে এসে দেখল জাহেদার পাজামা ঝুলছে হুক থেকে। স্তম্ভিত নিঃশ্বাসে সে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর কম্পিত হাতে স্পর্শ করে রইল ঠিক যেখানে জাহেদার রাজহাঁসটা লুকিয়ে থাকে। জাহেদা যখন হেঁটে যায় তখন পেছনটা দেখায় ঐ রকম। সুতোর, মাড়ের, সাবানের, সুগন্ধের স্তব্ধ উষ্ণ একটা অনুভব। পাজামাটা আবার ঝুলিয়ে রেখে মুখ ধুল বাবর। মুখ মুছল জাহেদার তোয়ালে দিয়ে। টাক ঢেকে সিঁথি করে জাহেদার স্প্রে ব্যবহার করল।

বেরিয়ে দেখে চা নিয়ে বসে আছে জাহেদা।

বাবর বলল, ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলাম এখন।

জাহেদা হেসে বলল, আপনি জেগেও স্বপ্ন দেখেন নাকি?

হ্যাঁ দেখি। এই যে তুমি, আমি, কোথাকার কোন রংপুরের ডাকবাংলো, এই চা খাচ্ছি, এটা স্বপ্ন নয়?

আবার বক্তৃতা।

আমার অভ্যাস। বাবর হেসে ফেলল।

এটা তো টিভি নয় যে বক্তৃতা দিলে পয়সা পাবেন।

যা পাচ্ছি সেটা টাকার চেয়ে বড়।

কথা ঠিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক জায়গায় আনতে আপনার দ্বিতীয় নেই।

নিঃশব্দ হাসিতে উজ্জ্বল হলো বাবর। দরোজায় টোকা পড়লে চমকে তাকাল। দরোজা খুলে দেখল, প্রণব বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে টুক টুক করছে পান। হাতে চুন লাগান বোঁটা। দেখা হতেই চিবুক তুলে, যাতে রস গড়িয়ে না পড়ে, বললেন, বিশ্রাম হলো?

হলো। আসুন। জাহেদা, এই প্রণব বাবু।

প্রণব বাবু নমস্কার করলেন।

চলুন তাহলে, আপনাদের জন্যে ব্যবস্থা করে এলাম।

ব্যবস্থা মানে?

এই একটু লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী সংস্কৃতিমনা ভদ্রলোককে খবর দিয়েছি। ওরা সবাই পাবলিক লাইব্রেরীতে আসবেন। পাশে বহুদিনের গৌরবময় রংপুর সাহিত্য পরিষদ আছে সেটাও এক নজর দেখে নেবেন। ব্যস।

করেছেন কী? বাবর চোরচোখে জাহেদার দিকে তাকাল।

প্রণব বাবু জাহেদার দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝেছেন দিদি, কোনো রকমে সংস্কৃতির সলতে টিমটিম করে জ্বালিয়ে রাখা যাচ্ছে, রংপুরের সেদিন নেই, সেই মানুষও নেই, তবু কয়েকজন আছেন, বিশেষ উৎসাহী, একেবারে নিবেদিত প্রাণ। ঢাকা থেকে এসেছেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না গেলে মনে বড় ব্যথা পাবেন তারা। ন খলু ন খলু বানঃ সন্নিপাতোহয়মস্মিন মৃদুনি মৃগ-শরীরে তুলরাশবিবাগ্নিঃ। শেষাংশে সংস্কৃতটুকু তিনি বাবরের উদ্দেশে বললেন।

একে ঐ রকম বাংলা তার ওপর সংস্কৃত, বাবর যার একবর্ণ নিজেও বোঝে না, শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জাহেদা। বাবর নিজে তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে।

বাংলা কখনো বললে তার কঠিন শব্দটা সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করে দেয়। প্রণব বাবু তা জানবেন কোত্থেকে ? তিনি ভেবেছেন, জলের মত স্বচ্ছ তরল তার বাংলা না বোঝার কী আছে ? জাহেদাকে বিব্রত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাল বাবর। বলল, চলুন তবে বেরোই। চল জাহেদা।

বেরিয়ে এক ফাঁকে জাহেদার কানে কানে সে বলল, চুপচাপ থাকবে। বোঝার ভাণ করবে। আর তোমাকে আমার বোন বলেছি। ওঁর বাসায় খেতে যেতে হবে কিন্তু।

ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে অল্প একটু গেলেই রাস্তার ওপারে পাবলিক লাইব্রেরী। সমুখে মস্ত মাঠ। আঁধারে ঢেকে আছে এখন। ভুতের মত এক আধটা লোক চলাচল করছে। খোলা দরোজায় লালচে আলো পর্দার মত ঝুলে আছে। মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। মাঝখানে একটা বাঁধান বেদির ওপরে খুঁড়ে পাওয়া প্রাচীন কোনো দেবীমূর্তি যেন সন্ধ্যা শাসন করছে। প্রণব বাবু অনর্গল বলে চলেছেন রংপুরের ইতিহাস, এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস— এখানকার প্রতিটি বস্তু এবং মানুষের ইতিহাস যেন তার নখদর্পণে।

বারান্দায় দেখা গেল কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। প্রণব বাবু তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন বাবরের। ভেতরে সে দেখতে পেল শাদা চাদরে ঢাকা একটা টেবিল, তার মাঝখানে স্নিগ্ধ ফুলের স্তবক, সমুখে কিছু ভাঁজ খোলা চেয়ার। প্রণব বাবু আজ না ডুবিয়ে ছাড়বেন না। এযে একেবারে একটা সভার আয়োজন। বাবর একটু সন্ত্রস্ত একটু সংকুচিত বোধ করল। পাগলের পাল্লায় পড়া বোধহয় একেই বলে।

প্রণব বাবু বললেন, আরো কিছু সুধী আসবেন, এই এসে পড়লেন বলে, চলুন ততক্ষণে সাহিত্য পরিষদটা ঘুরে আসি। জাহেদাকে বললেন, দিদি, একটু অন্ধকার বটে সাবধানে পা ফেলবেন।

বাবর পকেট থেকে মিনিলাইটটা বের করল। সেদিন কেনার পর আজ এই প্রথম ব্যবহাব হচ্ছে। মাকড়শা জালের মত ফিনফিনে একটা আলো পড়ল ঘাসের ওপব। জাহেদার হাতে দিয়ে বলল, এটা তোমার কাছে রাখ।

ছোট্ট, ঠাণ্ডা, স্যাতস্যাতে, পরতের পর পরত ধুলো জমা, স্বল্পালোকিত একটা ঘর। মিটমিট করে বাতি জ্বলছে মাথার ওপর। এই সাহিত্য পরিষদ। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে চারদিকে রাখা সব প্রাচীন মূর্তি, মূর্তির ভগ্নাংশ। স্তূপ স্তূপ পুঁথি। একহাঁটু ধুলো তর ওপর। ন্যাকড়া দিয়ে জড়ান কোনোটা। কোনোটায় কাঠের পিঁড়ি দিয়ে মলাট।

এত পুঁথি এখানে ? বিস্ময়ে প্রায় শিষ দিয়ে উঠল বাবর। এবং পরক্ষণে চৈতন্য হলো তার, শিষটা স্থানোপযোগী হলো না।

কে একজন জবাব দিলেন, আরো বহু পুঁথি ছিল, কিছু নষ্ট হয়েছে, কিছু হারিয়ে গেছে। বহুদিনের বহুকালের সংগ্রহ এসব।

দেখতে লাগল বাবর। হঠাৎ দেখে পাশে জাহেদা নেই। ঘরের মাঝখানে প্রশস্ত তাকের জন্য ওপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল ঝর্ণার মত অবিরল প্রণব বাবুর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কানখাড়া করে বাবর টের পেল, জাহেদাকে তিনি একেকটা সংগ্রহের পরিচয়, ইতিহাস ইত্যাদি বলে চলেছেন। আস্তে আস্তে সরে গেল বাবর। তার সঙ্গে যারা ছিল তারাও অনুসরণ করেনি। বাবর দেখল একটা ভাঙা বিষ্ণু মূর্তি নত হয়ে দেখছে জাহেদা সেই

মিনিলাইট জ্বালিয়ে। সমস্ত পেছনটাকে একটা বিরাট বলের মত মনে হচ্ছে। প্রায় স্পর্শ করে রয়েছে দুই হাঁটু। ফলে চমৎকার একটি জীবন্ত ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। বাবর তার সঙ্গীদের দিকে একবার দেখল। এবং তার ভেতরে একটা তীব্র ইচ্ছে লাফিয়ে উঠল এই ঝাঁঝাল ধুলি গন্ধ স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে জাহেদাকে পেতে, তার শাদা ঐ পোশাকটার ভেতর থেকে শরীরটাকে জন্মদিনের চিঠির মত খুলে ফেলতে।

সে টোকা দিল জাহেদার পিঠে।

কী দেখছ ?

প্রায় পলকে লাফিয়ে সোজা হলো জাহেদা। বলল, দেখছিলাম।

প্রণব বাবু বললেন, আরো দেখুন দিদি, এই যে পেতলের ধুপপাত্র দেখছেন এটি ডিমলার মহারাজা দান করেছিলেন। অতি প্রাচীন বস্তুটি। অনুমান করা হয় রাজা রামপালের সময়ের। সম্ভবত এই পাত্র দেবীর আরাধনাকালে ব্যবহার করা হতো। দেবদাসীরা নৃত্য করতেন এই ধুপপাত্র কোমল লীলায়িত হস্তে ধারণ করে।

জাহেদা বলল, আই সি।

বাবর তাকে তাড়াতাড়ি বলল, জাহেদা, তোমাকে আমি রামপালের কাটা দীঘি রামসাগর, বলেছি না ?

বলতে বলতে তাকে নিয়ে বাইরে এলো সে। প্রণব বাবু বলল, চলুন লাইব্রেরিতে যাই। বোধহয় সবাই এসে গেছেন।

আরো কয়েকজন এসে পৌঁছেছেন। দলটা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। জনা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবেন। প্রণব বাবু হাত ধরে বাবরকে ভাল চেয়ারটায় বসালেন। জাহেদাকে বললেন, বসতে আজ্ঞা হোক দিদি। তারপর করজোড়ে সবাইকে উদ্দেশ করে নিবেদন করলেন, আপনারা আসন গ্রহণ করুন। এটা কোনো বিধিবদ্ধ সভা নয়, সংবর্ধনা হিসেবেও এ আয়োজন অতি সামান্য, আমরা সম্মানিত অতিথির সঙ্গে আলাপ করবার মানসে মিলিত হয়েছি। তার মত মহৎ একজন সংস্কৃতিসেবীর কাছ থেকে দু'চার কথা শুনে ধন্য হব। সুধীবৃন্দ, আপনারা আসন গ্রহণ করুন।

শিশুর মত কৌতূহল নিয়ে জাহেদা তাকিয়ে রইল। বারান্দায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে বসলেন। তরুণেরা প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের জন্যে সমুখের আসনগুলো ছেড়ে দিল। বাইরে পেয়ালা পিরীচের শব্দ হতে লাগল টুং টাং। বাবর বুঝল, চায়ের ব্যবস্থাও হয়েছে।

প্রণব বাবু একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে বলে চলেছেন, অলমতিবিস্তরেণ। সুদূর রাজধানী ঢাকা থেকে আমাদের এই নগণ্য শহরে বাবর আলী সাহেব তাঁর সহোদরাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। আমরা তাঁর সান্নিধ্যলাভের এই সহসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চাইনি বলেই এই মিলন-সভার আয়োজন। সম্মানিত অতিথির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। দেশের এই ক্রান্তিকালে নিঃশব্দ দীপবর্তিকার মত যে কয়জন সংস্কৃতিসেবী এ দেশের অন্ধকারে আলো দিয়ে চলেছেন ইনি তাদেরই একজন।

জাহেদা প্রশ্ন-চোখে বাবরের দিকে তাকাল। একবর্ণ সে বুঝতে পারছে না। বাবর তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল এবং আবার হাতের দশ আঙুল ডগায় ডগায় ছুঁইয়ে একটা শোভন

ভঙ্গি ধারণ করে অবনত মস্তকে বসে রইল।

প্রণব বাবু বলছেন, ইনি যখন যেখানে অবস্থান করেন সংস্কৃতির একটা সুবাতাস সেখানে প্রবাহিত হয়ে যায়। আমরা আজ এই মহতী সন্ধ্যায় যে যার কাজ ফেলে ক্ষণকালের জন্যে হলেও এই সুফলা শস্যশ্যামলা স্বদেশের সাহিত্য-শিল্প সংস্কৃতির দিকে যে মনঃসংযোগ করেছি তা এই বাবর আলী সাহেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে, সম্মোহনে। বন্ধুগণ, কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্ত্ততে ?— অর্থাৎ বিশাখা তারা দু'টি যে সর্বদাই চন্দ্রের অনুকরণ করবে, অনুসরণ করবে, এত আশ্চর্যের কী আছে ? প্রণব বাবু স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে সস্নেহে সবার ওপর চোখ বুলিয়ে আনলেন। তারপর বললেন, ইনি একজন সুনিপুণ বক্তা। এর বক্তৃতার অনায়াস ভঙ্গি, যুক্তির অপূর্ব ঋজুতা—

জাহেদা বলল, কী বলছেন উনি ?

বাবর নীরবে হাসল এবং শুনতে পেল তাঁকে এবার প্রবন্ধকার, সমালোচক, দার্শনিক ইত্যাদি একের পর এক বলা হচ্ছে। অভিভূতের মত তাকিয়ে আছে জাহেদা। একাগ্র হয়ে প্রণব বাবুর বক্তৃতা শুনছে উপস্থিত সকলে। মাথার ওপরে জ্বলছে কড়া শাদা আলো। চারদিকের আলমারিতে সার সার বই, নীল সবুজ হলুদ কাপড়ে বাঁধান, ক্রমিক সংখ্যার টিকিট সাঁটা। একটা টিকটিকি কাচের ওপর পেট চেপে স্থির হয়ে আছে।

বাবরের হঠাৎ কথাটা মনে হলো। ফিসফিস করে হেসে বলল, জাহেদা, তখন স্বপ্ন আর বাস্তবের কথা বলছিলাম।

জাহেদা মাথা ঝুঁকিয়ে নীরবে সায় দিল।

স্বপ্ন থেকে বাস্তবের কোনো তফাৎ নেই। বাবর নিচু গলায় বলে চলল, একটা বাঘ মনে কর হরিণকে দেখতে পেয়েছে। সে স্বপ্ন দেখল ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর, এবং তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। দু'য়ের মধ্যে এক পলেরও কম ব্যবধান। আসলে স্বপ্ন হচ্ছে ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভবিষ্যৎ আসলে বর্তমানেরই সম্প্রসারণ।

বাবর থেমে থেমে বলছিল এবং ফাঁকে ফাঁকে সভার দিকেও তাকাচ্ছিল। এক সময়ে দেখল সভার ভেতর থেকে একজন উঠে স্থানীয় সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। বক্তা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বর্ণনা করে চলেছেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কী কী বাঁধার সম্মুখীন তারা প্রতিনিয়তই হন। একটা টুকরো কানে এলো এখন বাবরের—

রবীন্দ্র-বিরোধী দল এখানেও বেশ ভারি। এবং তাদের অনেকেই আমাদের মুরুব্বি। মফঃস্বলে অসুবিধা এই মুরুব্বিদের বিরোধিতা প্রকাশ্যে করা যায় না। এখানে সবাই আমাদের বাবা-চাচা কিংবা বাবা-চাচার মত। বাবা-চাচার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারপর ধরুন— বর্ষা। সেবার বর্ষা উপলক্ষে আমরা একটি গান ও কবিতার আসর করতে চেয়েছিলাম। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, আমরা হিন্দু হয়ে গেছি। বর্ষার গানের আসর করলে যদি সেই হিন্দু হয়ে যায়, তাহলে ঈদের নামাজ পড়লেই মুসলমান তাকে বলতে হবে ?

সহাস্য দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন সবাই।

বক্তার কণ্ঠ আবেগে আরো ঘন হয়ে উঠল।

জাহেদা জিগ্যেস করল চাপা গলায়, তখন কী একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন বলছিলেন।

হ্যাঁ।

কী ?

দেখেছিলাম, মিসেস নফিস, তাকে চেনো ? না, তুমি চিনবে না। তাকে দেখি ঢাকার রাস্তা দিয়ে এক ষাঁড়ের পিঠে চড়ে যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ উলংগ। কিন্তু সেটাই যেন স্বাভাবিক। কেউ ফিরেও দেখছে না। যে যার মত চলে যাচ্ছে।

লজ্জায় মাথা নিচু করল জাহেদা।

বাবর তখন বলল, বাংলা ভাল বোঝ না বোঝ শোনার ভাণ করে যাও।

এবারে শোনা গেল, বক্তা বলছেন, এই কথাগুলো আমাদের প্রিয় বাবর সাহেবকে বললাম, তিনি যেন ঢাকায় গিয়ে সমস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীকে জানিয়ে দেন। আমার আর কিছু বলার নাই।

প্রণব বাবু বললেন, আমরা স্থানীয় তরুণ কবি, আমাদের পরম স্নেহভাজন আকসাদ মোল্লার কথা শুনলাম। এবার বাবর সাহেব আপনি কিছু বলুন।

বাবর সলজ্জ হেসে বলল, বলতেই হবে ?

কিছু না বললে, এরা সবাই এসেছেন, বলুন কিছু।

বাবর উঠে দাঁড়াল। সবার দিকে দেখে মুখ নিচু করল একবার। সত্য বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না সে। এক মুহূর্ত পর তার চিরকালের যে অভ্যেস ঝুঁকির মধ্যে বাস করা, সেই অভ্যেসের বশে কিছু না ভেবেই শুরু করল এবং বলতে বলতে নিজেই আরেকবার চমৎকৃত হলো নিজের গুণে, চমৎকৃত হলো কথার পিঠে কথা কী স্বচ্ছন্দভাবে এসে যাচ্ছে বলে।

সে বলতে লাগল, বন্ধুগণ! প্রণব বাবু আসলে একটি পরকলা। ছোট জিনিস বড় দেখায় তার কল্যাণে। নইলে আমার মত মানুষকে যে সমস্ত বিশেষণে তিনি সম্মানিত করেছেন, তার একটিও শাদা চোখে দেখা যেত না। মানুষকে, কোনো মানুষকে এই যে আপন করে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা, তার এবং আপনাদের সবার, এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। এটা প্রাণের পরিচয় বহন করে। নির্মল প্রাণ, স্বচ্ছন্দ প্রাণ, সংবেদী প্রাণ। আমি বলি, সবার ওপরে এই প্রাণের স্থান। এই প্রাণের অনুমতি নিয়ে, এই প্রাণের অন্তর্নিহিত শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, এই প্রাণের প্রেরণায়, যারা যা কিছু করবেন তাই সত্য, তাই সুন্দর, তাই কল্যাণ। মনের ভাষা আমরা সবাই শুনতে পারি না। আপনারা শুনছেন। তাই আপনারা আমার চিরকালের প্রিয় হয়ে রইলেন। আজকের এই সন্ধ্যার স্মৃতি আমি আমৃত্যু বহন করব। এবং হ্যাঁ আপনাদের ক্ষোভ, আপনাদের এই প্রতিরোধের সংবাদ আমি ঢাকার শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে পৌঁছে দিব। আপনাদের রংপুরের ছেলে সৈয়দ শামসুল হক, টেলিভিশনে প্রায়ই আসেন, আমি তাঁকে বিশেষ করে বলব। ধন্যবাদ।

একজন তরুণ উঠে দাঁড়াল। বলল, তাঁকে বলবেন সিনেমার জন্যে লিখে, টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করে যেন নিজেকে নষ্ট না করেন। আমাদের দাবি আছে তাঁর ওপরে।

বাবল বলল, আমি যতদূর জানি, সেটা তার জীবিকা। তিনি তো লিখছেন। অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা এসব করেও তো লোকে লেখে।

আরেকজন উঠে দাঁড়াল। হাত নেড়ে বলল সে, হক সাহেবকে বলবেন তিনি যেন ব্যক্তির

কথা না লিখে সমাজের কথা লেখেন ! আমরা বেঁচে থাকতে চাই, আমরা সংগ্রাম করছি সে নিয়ে তাকে উপন্যাস লিখতে বলবেন।

আচ্ছা বলব।

আরো একজন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, তাকে বলবেন গোর্কি'র মা'র মত উপন্যাস কেন হচ্ছে না ? নাজিম হিকমতের মত কবিতা কেন বেরুচ্ছে না ? আমরা জানতে চাই।

নিশ্চয় বলব। আমি জানতাম না তিনি জীবনের কথা লেখেন না।

তাঁকে লিখতে বলবেন।

সভা শান্ত হলো। চা এলো, সন্দেশ এলো। সভা শেষে হাঁটতে হাঁটতে সবাই বাবর জাহেদার সঙ্গে ডাকবাংলো পর্যন্ত এলো। তারপর বিদায় নিল একে একে। সবাই অনুরোধ করল আরো একদিন থেকে যাবার জন্য। না, কালই বেরুবে বাবর। অনেকেই বাসায় ডাকলেন, অনুগ্রহ করে চাট্টি খাবেন। অনেক ধন্যবাদ, প্রণব বাবুর বাড়ি আপনাদের সবারই বাড়ি, সেখানে আতিথ্য স্বীকার করেছি, মনে করব আপনাদের সবার প্রতিনিধি তিনি।

প্রণব বাবু বললেন, চলুন তবে, রাত হয়ে গেল।

করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

বাবর জাহেদাকে বলল, চল, খেয়ে আসি।

গাড়ি করে বেরুল ওরা। শীতের মফঃস্বল। হিম হিম হাওয়া বইছে। ঘুমিয়ে পড়ার আয়োজন করছে সারা শহর। এখানে ওখানে বাতি জ্বলছে, গান হচ্ছে কোথাও লাউড স্পীকারে, চাদর মুড়ি দিয়ে রিকশা চালাচ্ছে রিকশাওয়ালা। বড় রাস্তা থেকে বাঁয়ে কেটে একেবারে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়ল ওরা। পেছনে প্রণব বাবু। সামনে জাহেদা। বাবর জাহেদার আঙুল স্পর্শ করল একবার। বরফের মত ঠাণ্ডা।

এইবার ডানে, ডানে যান মশাই। এই ডাইনে।

অন্ধকার গলিটাতে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল বাবর। জাহেদা বলল, এত চুপচাপ আর অন্ধকার কেন ?

পেছন থেকে হাসলেন প্রণব বাবু।

দিদি, এ যে মফঃস্বল। এই যে এলাকাটা দেখছেন পঞ্চাশ বছর আগেও এখানে বাঘ টাঘ দেখা যেত। বাবর সাহেব, যদি একটু কষ্ট করেন, এই সামনেই, দেবী সিংহের দরবার যেখানে ছিল দেখিয়ে আনি ?

এই রাতে ? থাক।

এখন অবশ্য নেই কিছু। শুধু ফাঁকা মাঠ। তবু দেখতেন। একবার কী হলো জানেন, কলকাতা থেকে তিন ইংরেজ কাপ্তান পাঠানো হয়েছে দেবী সিংকে গ্রেফতার করতে। দেবী সিংহ খবর পেয়ে এক হাজার সেপাই নিয়ে দরবার জাঁকিয়ে হুঁকোর নল হাতে করে গদিতে গদিয়ান হয়ে বসলেন।

দেবী সিং কে ? জাহেদা জিগ্যেস করল।

প্রণব বাবু বাবর আর জাহেদার মাঝখানে মাথা এগিয়ে বললেন, দেবী সিং ? সে এক

নররূপী রাক্ষস। রাক্ষসের তবু ক্ষুধার তৃপ্তি আছে, তার ছিল না। তার অত্যাচারে প্রজাকুল জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। বাবর সাহেব জানেন না বোধহয়, এই রংপুরেই প্রথম কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ব্যাস, এই আমার বাড়ি মশাই, এইখানে রাখুন।

দরোজা খুলে চটি ফটফট করে এগিয়ে গেলেন পুরনো খোয়া ওঠা বিশাল দুটো থামের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ডাকলেন, কইরে, রামটহল ব্যাটা কুম্ভকর্ণ। ওঠ, ওঠ। লণ্ঠনটা ধর। এই যে আসুন, সাবধানে, সিঁড়ির একটা দিক ভাঙ্গা আছে।

ভেতরের আঙিনায় গিয়ে পড়ল ওরা। বিশাল উঠান। চারদিকে চকমিলানো ঘর। সব ঘরের দরোজা বন্ধ। অন্ধকার। ভূতুড়ে বাড়ির মত মনে হয়। মনে হয় যারা ছিল তাদের কথাবার্তা নিঃশ্বাস এখনো গমগম করছে।

প্রদীপ হাতে এক তরুণী কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বলল, নমস্কার।

এটা হচ্ছে সুষমা।

চৌকো শ্যামল মুখ। চোখে ঘুম জড়ান। মিষ্টি হেসে বলল, আসুন।

সব তৈরি তো সুষি ? প্রণব বাবু জিগ্যেস করলেন।

কখন সব করে রেখেছি। কাকা, তুমি ওঁদের বসতে দাও। আমি এক্ষুণি আসছি।

চলে যেতে যেতে সুষমা জাহেদার দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন। নির্মল কিন্তু করুণ একখণ্ড হাসি। চোখে লেগে রইল বাবরের।

প্রণব বাবু বললেন, আমার এক আশ্রিত পরিবার, তাদের মেয়ে। আমার কেউ না। আমার দেখাশোনাটা হয়ে যায়, বাড়িটাও খালি থাকে না। এই আর কী।

ভেতরে গিয়ে বসল ওরা। একদিকে বিরাট একটা খাট— ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠের মত। এতবড় বিছানা এর আগে কখনো বাবর দেখেনি। জাহেদা বলে উঠল, মাই গুডনেস।

আগাগোড়া নিভাঁজ চাদর। একজোড়া বালিশ। তিনটে কোলবালিশ মুখখোলা নিখুঁত একটি আয়তক্ষেত্র সৃষ্টি করে আছে মাঝখানে। বিশাল মশারির মুখটা থিয়েটারের পর্দার মত দু'দিক থেকে তোলা। ঘরের আরেক দিকে প্রণব বাবু লেখাপড়া করেন। সুন্দর করে সাজান টেবিল। পুরনো কাচের আলমারি। ভারি ভারি কাঁসার তৈজসপত্র। দেয়ালে বাঁধান স্বামী বিবেকানন্দ। আরেক দিকে জিন্নাহ্ সাহেবের রঙ্গিন একটা ছবি। একটা পুরনো ঢাল ঝুলছে। খোলা জানালায় স্তিমিত হয়ে আছে অন্ধকার। দুটো গোল পাথরের টেবিল ঘরের মাঝখানে এনে খাড়া পিঠ চেয়ার টেনে প্রণব বাবু বললেন, আসন নিন।

বাবর জিগ্যেস করল, আপনার পিতৃপুরুষের কারো ছবি দেখছি না।

ছিল। সব ছেলেমেয়েরা নিয়ে গেছে। আমার হয়েছে মশাই সেই অবস্থা— কৃত্যয়োর্ভিন্ন দেশত্বাদ দ্বৈধীভবাতি মসে মনঃ, পুরঃ প্রতিহতং শৈলে স্রোতঃ শ্রোতোবহো যথা। অর্থাৎ কিনা, পর্বতে নদী বাধা পেলে যেমন দু'ভাগ হয়ে যায়, আমার মনের অবস্থাও তাই। ছেলেমেয়েরা ইন্ডিয়া চলে গেল, আমি পারলাম না। বুঝে দেখুন মশাই। এটা আমার দেশ নয় ? আমার মাটি নয় ? এক কথায় চলে যাব ? বলি, মাটি কখনো পর হয়ে যায় ? শুনে দেখবেন মশাই যারা গেছে তারা ঐ রাত্তিরে দেশের দিকে মুখ করে কাঁদে।

এর মধ্যে নিঃশব্দে সুষমা খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। এখন সেই মিষ্টি হাসিটা ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে এককোণে।

গরম ধোঁয়া ওড়ানো ভাত। তার ওপর গলে পড়ছে সোনার মত ঘি। চারদিকে ছোট ছোট দশ বারোটা করে বাটি। সব নিরামিষ। কোনোটায় ঝাল, কোনোটায় ভাজা, টক, মিষ্টি তেতো, দু'রকম ডাল, বেগুনি, চচ্চড়ি, মাংসের মত করে রাঁধা ছানার বরফি, অম্বল, কিসমিস উঁকি দিচ্ছে কোনোটা থেকে।

সুষমা বলল, কাকাবাবু শুধু বকবক করেন। আপনারা খান তো।

একটি বাটি নিতে যাচ্ছিল, সুষমা বলল, না, ওটা নয়। এটা নিন। আগে ঐটে খেতে হয়।

একের পর এক বলে যেতে থাকল সুষমা, কোন বাটিতে কী, কোনটার পর কোনটা খেতে হয়। প্রণব বাবু বললেন, নিজের বাড়ি মনে করে খাবেন দিদি। কী ছাইপাঁশ রেঁধেছে কে জানে? সুষি পড়াশোনায় যেমন লাড্ডু তেমনি রাঁধাবাড়ায়। বুঝলেন? দোষ নেবেন না।

না, না, চমৎকার হয়েছে। এত সুন্দর রান্না বহুকাল খাইনি।

বাবারের সঙ্গে জাহেদাও যোগ করল, খুব ভাল।

কিন্তু কৌতুকের সঙ্গে বাবর লক্ষ করল, জাহেদা খাচ্ছে কত। শুধু নিরামিষ দেখে হকচকিয়ে গেছে বেচারা। প্রণব বাবুকে জিগ্যেস করল জাহেদা, মাছ মাংস ডিম কিছু খান না আপনি?

আমি তো খাইই না, আমার সাতপুরুষে কেউ কখনও খায়নি।

পারেন না খেয়ে?

হ্যাঁ, পারব না কেন? কোনো অসুবিধে হয় না তো!

মাছ মাংস যারা খায় তাদের অপছন্দ করেন?

হা হা করে হেসে উঠলেন প্রণব বাবু।

কেন, এই যে সুষি, সুষমা। ওরা মাছ মাংস হরদম খাচ্ছে।

বাবর জিগ্যেস করল, সুষমাকে এই প্রথম সে কথা বলল, তুমি পড়?

হ্যাঁ।

কী পড়?

এবার বি.এ পড়ছি। ফার্স্ট ইয়ার।

বাহ, চমৎকার।

ও-কী, হয়ে গেল?

হ্যাঁ, অনেক খেয়েছি।

না, না. ঐ ক'টা ভাত রাখলেন যে। জাহেদাকে বলল, আপনি তো কিছুই খেলেন না।

জাহেদা হাসল।

সুষমা দু'গ্লাশ গরম দুধ নিয়ে এলো। বাবর বলল, এ-কী!

কিছু না। দেখতেই তো পাচ্ছেন। খেয়ে নিন।

দুধ খাবার তো অভ্যেস নেই। বাবর বলল, জাহেদা?

জাহেদা মাথা নাড়াল।

নিঃশব্দে সুষমা একে একে সব বাটি থালার ওপর সাজিয়ে চলে গেল। ফিরে এলো রূপার তশতরিতে সুন্দর করে কাটা সুপুরি আর লং এলাচ নিয়ে। বলল, বারান্দায় হাত ধোয়ার জল আছে।

বারান্দায় এসে গায়ে কাঁথুনি তুলে জাহেদা বলল, যা অন্ধকার।

নিচু গলায় বাবর জিগ্যেস করল, খেয়েছ ঠিক মত ? কেমন লাগল ?

এক রকম। — দেখেছেন মেয়েটা কেমন অন্ধকার দিয়ে যাচ্ছে, আসছে, একটু ভয় নেই।

কীসের ভয় ?

সাপ-টাপ। বলেই শিউরে উঠল জাহেদা। কোনো রকমে হাত মুছে ঘরে ছুটে গেল।

বাবর ভেতরে এসে বলল, জানেন প্রণব বাবু, আজ সকালে মহারাজ দর্শন হয়েছে।

মহারাজ মানে ?

প্রায় পাঁচ হাত লম্বা এক গোখ্‌রো।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল জাহেদা। বলল, প্লীজ।

হা হা করে হেসে উঠে কোলে বালিশ টেনে প্রণব বাবু বললেন, দিদির বোধহয় খুব ভয় ? তাহলে শুনুন বলি, আপনি ওকে যতটা ভয় পান, ও-ও আপনাকে ঠিক ততটাই ভয় পায়। আপনি কিছু না করলে ও আপনাকে কিছুই করবে না।

অবিশ্বাস আর ভয় ভরা চোখে তাকিয়ে রইল জাহেদা।

প্রণব বাবু বলে চললেন, জন্তু জানোয়ার এদের মধ্যে এই নিয়মটা ভাল, যার যার তার তার মত থাকে। কেউ কারো গায়ে পড়ে কিছু করতে ওরা একেবারেই নারাজ। কেবল মানুষের মধ্যেই এটি দেখবেন না। গায়ে পড়ে আপনার উপকার করবে, গায়ে পড়ে আপনার ক্ষতি করে যাবে। কোথা থেকে কে যে কোন কলটি নেড়ে দিলেন টেরটি পাবেন না মশাই। ভয় পাবেন না দিদি। সাপের দেশ রংপুর। জীবন কাটিয়ে দিলাম। কত রকম সাপ দেখলাম, এখনো তো বেঁচে আছি। শুনুন তবে।

জাঁকিয়ে গল্প বলতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর তখন ছেলেবেলা, একদিন রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখেন বাড়িশুদ্ধ মানুষ জেগে। সবাই চুপচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ। শুধু ওপাশের ঐ ভাঁড়ার, ওখান থেকে ভীষণ ফোসফোসানি আর ঠকাস ঠকাস একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। খুড়ো মশাইয়ের কোলে চেপে গিয়ে দেখেন, হারিকেনের আলোয় দেখা যাচ্ছে ইয়া এক কেঁদো সাপ। এই এতবড় একটা ফণা— প্রণব বাবু দু'থাবা পাশাপাশি ধরে দেখালেন। দুধের মত ধবধব করছে, মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা। কী গর্জন তার। লকলক সকসক করছে জিভ। চোখ হীরের মত জ্বলজ্বল করছে— এই এত বড় বড় দুটো চোখ। একবার করে ছোবল মারছে একটা ছোট্ট খাট ছিল বাচ্চাদের, ভাঙ্গা, তার পায়ার ওপর। আবার ঘুরে যাচ্ছে। আবার গজরাচ্ছে, আবার এক ছোবল। শব্দ উঠছে ঠকাস ঠকাস। ফোঁসাচ্ছে না তো যেন শালকাঠ চিরছে করাতিরা। সে-কী ভয়ানক ক্রোধ। রাজকীয় ক্রোধ মশাই। সে-কী সৌন্দর্য। সে-কী আক্রোশ। বাবা লোক পাঠালেন সামাদ নামে এক চরিত্রের কাছে। ইয়া দশাসই চেহারা, লাল ভাটার মত চোখ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবড়ি, দেবী চৌধুরাণী দলের

ডাকাত যেন মশাই। সে খবর পেয়ে তেলপাকা কুচকুচে লাঠি নিয়ে এলো। এলো বটে কিন্তু দূর থেকে দেখেই বলল, কর্তা, বলেন তো জান দেব, কিন্তু সাহস পাই না। সালাম করে চলে গেল সে।

যতটা সঙ্কুচিত হয়ে থাকা যায় জাহেদা তাই আছে। বারবার পায়ের কাছে দেখছে। মুখ একেবারে ছাই। বাবর বলল, সাপটা অমন করছিল কেন ?

কী জানি মশাই, তা জানি না। বোধহয় কোনো ইঁদুর টিদুর ফসকে গিয়েছিল।

আর কোনোদিন দেখেছেন ? সম্মোহিত গলায় জাহেদা প্রশ্ন করল। ভয়ের একটা সম্মোহন আছে যখন আর ভয় করে না।

না। আর একবার দেখেছিলাম। বাবা মারা গেলেন। শ্মশান থেকে ফিরে এসে দাওয়ায় বসে আছি দেখি সাপটা চলে যাচ্ছে।

কোথায় ?

বোধহয় বাড়ি ছেড়েই যাচ্ছিল। তারপর আর দেখিনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন প্রণব বাবু। সাপ না স্বর্গীয় পিতা কাকে তিনি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করছেন বোঝা গেল না। গমগম করতে লাগল সারা ঘর। বাবর তাকিয়ে দেখল সুষমা কখন দরোজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

স্মিতহাসি ফুটে উঠল প্রণব বাবুর মুখে।

আরেক দিনের কথা। এই তো মাত্র বছর খানেক আগে। সেদিন একেবারে ফুটফুটে পূর্ণিমা। রাত অনেক হয়েছে। সুষিরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দায় চুপচাপ একা বসে আছি। রামটহল ব্যাটা সেদিন, ইয়ে, সিদ্ধি বানিয়েছিল, একগ্লাশ পান করা হয়েছে। এই যে বারান্দা, এখন রাত বলে বুঝতে পারছেন না, এর পুব কোণ থেকে বাঁশঝোঁপটা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে আছি। পূর্ণিমার আলোয় খাড়াখাড়া ছাঁয়া পড়ে ভারি সুন্দর লাগছিল বাঁশতলা। হঠাৎ দেখি জোড়ায় জোড়ায় সাপ।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল জাহেদা। বাবর তার হাত ধরল ক্ষণেকের জন্যে।

বুঝলেন, জোড়ায় জোড়ায় সাপ। একজোড়া দু'জোড়া নয়, অন্তত শ'খানেক হবে। একেবারে কিলবিল কিলবিল করছে। পূর্ণিমার আলোয় দেখাও যাচ্ছে স্পষ্ট। সব মাথা তুলে জড়াজড়ি করে নাচছে। নাচ করছে মশাই, নাচ। হেলে দুলে ডাইনে বাঁয়ে। এমনি এমনি করে।

প্রণব বাবু নিজের দু'হাত জড়িয়ে ফণার মত তুলে নাচিয়ে নাচিয়ে দেখালেন।

জাহেদা বাবরের হাত শক্ত করে ধরল। বলল, চলুন।

হ্যাঁ, এইতো।

খপ করে হাত নামিয়ে নিলেন প্রণব বাবু।

যাবেন ?

ওর শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া ছেলে মানুষ তো, ঘুম পাচ্ছে। রাত হলো।

বড্ড হতাশ হলেন প্রণব বাবু। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন। হতাশ গলায়

বললেন, আর একটু বসবেন না ? চা খাবেন ? চা ? সুষি চা করে আনুক।

না, এত রাতে আর কষ্ট করবেন না। এমনিতেই সুষমাকে অনেক জ্বালিয়ে গেলাম।

সুষমা পথ ছেড়ে দিয়ে আবার সেই মিষ্টি হাসিটা তৈরি করল।

১৭

গাড়িতে বসে গায়ে কাঁপন দিল জাহেদার। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। এতক্ষণ শিশিরে ভিজে ভেতরটা একেবারে হিমাগার হয়ে আছে।

শীত করছে ?

হুঁ।

বাবর তার জ্যাকেট খুলে দিল।

এটা জড়িয়ে নাও।

না।

দাঁতে দাঁত বেজে উঠল জাহেদার। বাবর শাসন করে উঠল, শীতে মরবে তবু কথা শুনবে না মেয়ে।

জোর করে জ্যাকেটটা চাপিয়ে দিল জাহেদার গায়ে। বলল, গাড়ি চললে ভেতরটা গরম হয়ে উঠবে।

আপনার শীত করবে না ?

করবে তো ! তা কী করা যাবে ? ঠাট্টা করে বাবর বলল। বড় রাস্তায় এসে জিগ্যেস করল, ঘরে যাবে, না একটু ঘুরে আসবে ?

জাহেদা কোনো কথা বলল না।

চল, ঘুরেই আসি। কারমাইকেল কলেজের দিকে গাড়ি ছোটাল বাবর। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর বলল, থমথমে এই রকম রাতে তোমাকে আর কবে নিয়ে বেরুব, কে জানে ?

কেন বলছেন ?

এমনি। আমার খুব ভাল লাগছে। যা ভাল লাগে তা ধরে রাখা বোকামি। মানুষ ধরে রাখতে চায় বলেই দুঃখ পায়। আসলে সব কিছুই একটা স্রোতের মত। সুখ, ঐশ্বর্য, জীবন, আকাশ, বিশ্ব, মহাবিশ্ব, ছায়াপথ, তারকাপুঞ্জ, সব কিছু। সমস্ত কিছু মিলে প্রবল শুভ্র জ্বলন্ত একটা মহাস্রোত মনে হয়। দুঃসহ কষ্ট হয় তখন। আমার জীবনে যদি একটা কোনো কষ্ট থাকে তাহলে তা এই। এই মহাস্রোতের সম্মুখে আমি অসহায় তুচ্ছ। তুমি আমি এই শহর, মহানগর, সভ্যতা সব অর্থহীন বলে মনে হয়। আমি কী করলাম, তুমি কী করলে, ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য, মনে হয় সবই এক, সব ঠিক আছে— কারণ সবই কত ক্ষুদ্র।

বাবর হাসল। অনুভব করল জাহেদা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কিছু বলছ না ?

উঁ।

শুনছ ?

হ্যাঁ শুনছি।

এই মহাস্রোতে কোথাকার কে বাবর আলী খান। বাবর হাসল। কে তুমি কোন সাত্তার চৌধুরীর মেয়ে জাহেদা। বাবর আবার হাসল। কিছু এসে যায় না। কে একজন তার নাম সেক্সপীয়ার, সে হ্যামলেট লিখল কি না লিখল, তাও কিছু নয়। এই পৃথিবীর মত কত কোটি পৃথিবী আছে, কত কোটি হ্যামলেট লেখা হয়েছে, কত বিতোভেন সোনাটা লিখছে, কত বাস্তিলের পতন হয়েছে— কতটুকু জানি ! এই পৃথিবী আদিতে ছিল উত্তপ্ত একটা পিণ্ড, কোটি কোটি বছর পর একটা শীতল প্রাণহীন বস্তুপিণ্ড হয়ে তা মহাশূন্যে ঘুরতে থাকবে। তখন কোথায় তোমার বাবর আলী কোথায় জাহেদা, কোথায় সেক্সপীয়ারের হ্যামলেট আর জাপানের সামুরাই আকাশ ছোঁয়া দালান আর সমুদ্রে ভাসমান কুইন এলিজাবেথ। হাঃ। বাবর হাসল। সাঁ করে গাড়ি ঘুরিয়ে বলল, চল ফিরে যাই।

ফিরতে ফিরতে বাবর আবার হাসল।

হাঃ। জান জাহেদা, মানুষ সেই জন্যেই বোধহয় ঈশ্বরের কল্পনা করে। ঈশ্বরের ধারণা একটা সীমার আরোপ, একটা আকার প্রদানের প্রচেষ্টা মাত্র। এই অনন্তকে ধারণ করতে পারি না বলেই নামে একটা ফ্রেম দিয়ে নিয়েছি। কিন্তু যাক। আমার কষ্ট হচ্ছে।

জাহেদা আবার বাবরকে দেখল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে। আবার সে দ্রুত অপসৃয়মাণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। ডাকবাংলোয় এসে জ্যাকেট ফিরিয়ে দিল জাহেদা। সেটা ডান হাতে ঝুলিয়ে বা হাতে জাহেদাকে বেষ্টন করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল বাঁবর। বলল, হেডা, আমরা যেখানে, সেখানে আগেও ছিলাম, এখনও আছি, পরেও থাকব।

পরিচিত কথাটা শোনে জাহেদার মুখে হাসি ফুটে উঠল। অর্থহীন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার চুল ঝাড়লো সে। তখন অতি সুন্দর দেখাল। আকাঙ্ক্ষা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবরের সারা দেহে। ভেতরে একটা ক্ষুদ্র সূর্য উদিত হয়ে তাপ বিকিরণ করতে লাগল অকস্মাৎ। চকিতে চোখে ভেসে উঠল। বিষ্ণু মূর্তির ওপর ঝুঁকে পড়া জাহেদার ছবিটা। আঙুলগুলি উদগ্রীব হয়ে উঠল স্পর্শ করতে। দরোজা খুলতে কেঁপে উঠল তার হাত। দু'তিনবার চেষ্টা করে তালায় চাবি পরানো গেল।

দরোজা খুলে দেখে দু'দিকে বিছানা সুন্দর করে পাতা। মাঝখানে চেয়ার, তার ওপর পানির জগ, গ্লাশ। দু'বিছানায় দুটো কম্বল দেখে অবাক হলো বাবর। আর একটা কখন দিয়ে গেছে চৌকিদার ? তাকে তো সে দিতে বলেনি ? নাকি, বিকেলে যখন সে ঘুমিয়েছিল তখন জাহেদা বলেছে ! সহাস্য ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু দাঁড়িয়ে রইল বাবর। জাহেদা বাথরুমে গেল।

তখন পাজামা পরে নিল বাবর তাড়াতাড়ি। জাহেদা ফিরে এলো পোশাক পাল্টে। নীল শাদা ডোরা কাটা ঢিলে পাজামা। এসে সোজা কম্বলের তলায় ঢুকে মুখ পর্যন্ত টেনে দিয়ে মরার মত পড়ে রইল। কেবল পেটের কাছটা ওঠা নামা করতে লাগল তালে তালে। বাবর তখন টিপে টিপে আয়নার সামনে ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে ক'টা পাপড়ি ছিঁড়ল, পাপড়িগুলো ঝুরঝুর করে ফেলে দিল জাহেদার পেটের ওপর। তালে তালে পাপড়িগুলো উঠতে লাগল,

পড়তে লাগল আবার উঠল, অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল বাবর। জাহেদা এতটুকু নড়ল না। এতটুকু কৌতূহল হলো না জানতে নিঃশব্দে বাবর কী করেছে। টুক করে বাতিটা নিভিয়ে দিল বাবর। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল সমস্ত অস্তিত্ব। বাবর নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল কম্বল টেনে। বলল, শুভরাত্রি।

কোনো জবাব দিল না জাহেদা।

বাবর একটা সিগারেট ধরাল। বাথরুম থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার শব্দ আসছে। সিক্ত অবিরাম একটা শব্দের স্রোত। অনেকক্ষণ পর চৈতন্য হলো সিগারেটটা পুরে ছাই হয়ে গেছে, আঁচ লাগছে আঙুলে। সেটা নিভিয়ে আরেকটা ধরাতেই কাঠির আলোয় দেখল জাহেদার মুখ খোলা, বুকের ওপর হাত বিছিয়ে ছাদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে সে। আস্তে আস্তে আলো কমে এলো, অন্ধকার বাড়তে লাগল। কাঠিটা লাল ছাই হয়ে গেল। জাহেদা তেমনি তাকিয়ে রইল শূন্যের দিকে।

জাহেদা।

উঁ ?

ঘুম আসছে না ?

জাহেদা কোনো জবাব দিল না। বাবর সিগারেট খেতে লাগল নিঃশব্দে। আবার সে জিগ্যেস করল, নিজের সমুখের দিকে চোখ রেখেই, কী ভাবছ ? আমাকে বলবে না ?

তখন প্রায় ফিসফিস করে জাহেদা উত্তর করল, আমি এখন আমার মা-র কথা ভাবছি। বাবর শুধু বলল, হ্যাঁ।

নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত পার হয়ে গেল। জাহেদা আবার বলল, শূন্যের দিকে তেমনি তাকিয়ে থেকে, আমি এখন আমার বাবার কথা ভাবছি।

হ্যাঁ।

আরো কয়েকটি মুহূর্ত গেল। আরো কয়েকটি দীর্ঘ মুহূর্ত।

আমি এখন পাপ্পুর কথা ভাবছি।

হ্যাঁ।

একটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। জাহেদা তখন বলল, আমি এখন হোস্টেলের সবুজ মাঠটা দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ।

আমি এখন আরিচার ফেরিবোটে।

হ্যাঁ, জাহেদা, হ্যাঁ।

আমি এখন সেই ছেলেটার কথা ভাবছি।

চুপ করে রইল জাহেদা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল বাবর জাহেদার কণ্ঠস্বরের জন্যে। কিন্তু নীরবতা শাসন করতে লাগল এই ঘর এবং ঘরের বাইরে সম্পূর্ণ বিশ্বটাকে। তখন বাবর তাকিয়ে দেখল জাহেদা কখনো তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। তার নাক, চিবুক, গ্রীবার উপত্যকা অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার হয়ে ফুটে আছে।

চোখ ফিরিয়ে নিল বাবর। সেও তাকিয়ে রইল তার সমুখে। ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়তে লাগল বাথরুমে। বালিশের নিচে হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল হাত ঘড়ির টিকটিক। তার সমস্ত অস্তিত্বকে ঠুকে ঠুকে বাজিয়ে যেতে লাগল ওটা।

জাহেদা তখন ভীরু কণ্ঠে জিগ্যেস করল, জেগে আছেন?

বাবর তখন শুনল কিন্তু উত্তর দেয়া হলো না। অনেক সময় নীরব থেকেই মনে হয় বলা হয়ে গেছে।

কই, আপনি জেগে?

হ্যাঁ।

আপনার কথা শুনছি না?

কথা শুনতে চাও?

হ্যাঁ।

যা খুশি।

বাবর সমুখে তাকিয়ে অন্ধকারে মৃদু হেসে বলল, এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইস ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি। এ মাইনাস বি—

ও-কী? জাহেদা এই প্রথম মুখ ফিরিয়ে বাবরকে দেখল। বলল, ও-কী বলছেন?

অ্যালজেব্রার একটা ফর্মুলা।

এই বুঝি কথা?

তাহলে কী বলব?

জানি না। জাহেদা মুখ ফিরিয়ে নিল, তাকাল আবার সেই শূন্যের দিকে।

বলি? হেডা, ও হেডা, তোমাকে ভালবাসি।

না, আমি শুনতে চাই না।

আসলে তুমি আমার কথা শুনতে চাও না জাহেদা। বলতে বলতে বাবর উঠে দাঁড়াল। আসলে আমি এখন কথা বলতে চাই না। বাবর এসে জাহেদার পাশে শুলো। আসলে তুমি এখন আমাকে চাও। বাবর কম্বলের ভেতর ঢুকে জাহেদাকে কাছে টানল। আসলে তোমার একা লাগছে। আমারও হেডা, আমারও লাগছে। বলে সে প্রথমে তার কপালে একটা চুমু দিল, তারপর ঠোঁটে। বিশুষ্ক থেকে ধীরে ধীরে সিক্ত হয়ে এলো ঠোঁট। নিষ্প্রাণ যেন সপ্রাণ হয়ে উঠল। জাহেদাকে একেবারে বুকের মধ্যে নিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আলিঙ্গন করল বাবর।

তখন একবার কেঁপে উঠল মেয়েটা। তারপর হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার বাহুমূলে মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে রইল।

এই সময় বাবর মুঠো করে ধরল জাহেদার হাত। তারপর সেটা এনে রাখল তার উত্তপ্ত অঙ্গের ওপর। প্রথমে বিদ্যুতে হাত পড়ার মত হাতটা টেনে নিল জাহেদা। কিন্তু আলাদা

হতে পারল না। আস্তে আস্তে কম্পিত করতল সে এবার রাখল ওখানে। তার আঙুলের ডগায় কেন্দ্রীভূত হলো সমস্ত জীবন। জন্মের বেদনা। ভয়, বিস্ময় একত্রিত মিশ্রিত হয়ে একটি উত্তাপের আকার ধারণ করল। সে ধীরে ধীরে মুঠো করে ধরল। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে ছেড়ে দিয়ে আবার আঁকড়ে ধরল সে। এবার আর ছাড়ল না। জ্বলন্ত ফুলকি ছড়ান একটা তারাবাতি শিশুর মত মুঠোয় ধরে রইল জাহেদা। সে একই সঙ্গে এক এবং দুই হয়ে গেল। নির্ভয়ে কৌতূহলে আক্রান্ত সে অনুভব করতে লাগল বাবর যেন অন্য কারো দেহ উন্মোচন করছে অতি সন্তর্পণে ; যেন অন্য কারো পায়ের তলায় পড়ে থাকল পাজামা, অন্য কারো বুকে বিচ্যুৎ হলো বোতাম। প্রথমে একটু ঠাণ্ডা করে উঠল। তারপর কোথা থেকে একখণ্ড তাপ এসে তার পাশে স্থির হলো।

সেইভাবে স্থির থেকে কণ্ঠ থেকে নিসৃত কিছু ধ্বনি শুনল জাহেদা। সে নিজেই বলছে, কিন্তু কেন বলছে, বুঝতে পারল না, এতটুকু অপ্রাসঙ্গিক মনে হলো না, তবু আর একটা সত্তা কৌতুক অনুভব করতে লাগল। সে বলছে, আচ্ছা মানুষ শুধু নিরামিষ খেয়ে বাঁচতে পারে ?

যেন টেবিলে মুখোমুখি বসে চায়ের পেয়ালা নিয়ে গল্প করছে এমনি গলায় বাবর উত্তর করল, কেন পারে না ? প্রণব বাবুকে তো দেখলে।

তাই ভাবছি। আশ্চর্য !

এতটুকু আশ্চর্য নেই এতে। তুমি জান না জাহেদা, মানুষ নিজেকে কতটা মানিয়ে নিতে পারে। তোমার কাছে যেটা অস্বাভাবিক, আরেক জনের কাছে সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। তুমি যা বিশ্বাস কর, আরেকজন তা করে না। তুমি যাতে বাঁচ, আরেকজনের কাছে সেটাই মৃত্যু। আমি যেভাবে বাঁচতে চাই, আরেকজন সেভাবে চায় না। তুমি যা নাও, আরেকজন তা ফেলে দেয়। সবই সত্য। কারণ সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক, এই মৃত্যু ছাড়া। হেডা, তুমি শুনছ ? তুমি ভাল, তুমি সোনা, হেডা, হেডা ও। বলতে বলতে আপন দেহে সে ঢেকে দিল জাহেদাকে।

জাহেদা অস্পষ্ট স্বরে বলল, না।

হ্যাঁ, বল হ্যাঁ। না বলে কিছু নেই পৃথিবীতে ও হেডা।

না।

তখন বাবর বলল, ফোর থ্রিজা টুয়েলভ, ফোর ফোর জা সিক্সটিন, ফোর ফাইভ জা টুয়েন্টি।

হঠাৎ হেসে ফেলে জাহেদা।

আর সেই মুহূর্তে বাবর তার দেহ এবং অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে গেল। জাহেদা টের পেল তার ভেতরে একটা ক্রন্দন থমকে আছে যেন। সেটা নড়ছে না, বড় হচ্ছে না, ফেটে বেরুচ্ছে না, স্তব্ধ হয়ে আছে।

তারপর মুহূর্তে তার দেহ একটা তীরবেগে উর্ধ্বগামী পাখি হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ফিরে

জাহেদা বালিশে মুখ গুঁজে দিল। ভেতরে সচল হয়ে উঠল তখন কান্নাটা। চাপ দিতে লাগল। ফেটে বেরুতে লাগল। ফুলে ফুলে উঠল তার শরীর।

বাবর তখন আবার তাকে কাছে টেনে চুমো দিয়ে বলল, কাঁদছ? ও সোনা তুমি কাঁদছ? কেন কাঁদছ?

জাহেদা বলল, আমার সব কিছু পর হয়ে যাচ্ছে। দূরে সরে যাচ্ছে। সব কিছু ফেলে দিয়ে আমি কোথায় যেন যাচ্ছি। কেবলি যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি।

তখন বাবর তাকে বুকে তুলে নিল। আবার তার হাতে দিল তারাবাতিটা। বলল, এটা নাও। নাও।

যেন শিশুর হাতে একটা খেলনা তুলে দিল বাবর।

জাহেদা ধরে রইল। ক্রমশ দৃঢ় হয়ে এলো তার পাঁচটা আঙুল। যেন ছেড়ে দিলেই অথই পানিতে পড়ে যাবে সে।

তারপর হঠাৎ টের পেল তার ভেতর থেকে কান্নার বিদায়। সে তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবরের কানের কাছে মুখ রেখে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে একবার মাত্র বলতে পারল, আমাকে ফেলে যেও না।

বাবর তাকে সারা শরীর দিয়ে আবার ঢেকে দিল।

১৮

হাঃ। খেলারাম, খেলে যা।

পাশে শুয়ে আছে জাহেদা। ঘুমন্ত. পরিশ্রান্ত, অধিকৃত, শিথিল। দীর্ঘলয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার নিঃশ্বাস। সমস্ত দেহ এখন মসৃণ, কেবল কীসের স্মৃতিতে স্তনমুখে কিছু পদ্মকাঁটা ধরে আছে। ঋজু বাঁ পায়ের ওপর ডান পা-টা ভাঁজ হয়ে চেপে আছে দেখাচ্ছে হেনটি মাতিসের বার্নস মিউরাল ডান্স ওয়ানের মধ্য-ফিগারের মত। চুলে ঢাকা গাল চিবুক গলার কোল। চোখের কাজল দুষ্টুমিতে কপালের পাশ কালি করে আছে। সন্তর্পণে দেশলাই ধরিয়ে ছবিটা দেখল বাবর। তারপর দ্বিতীয় কাঠিতে জ্বালাল সিগারেট। কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিল জাহেদাকে। আর সে নিজে তার নগ্ন দেহটাকে হিমেল হাওয়ার হাতে ছেড়ে দিল। এখন এই শীত বড় উপভোগ্য মনে হচ্ছে। থেকে থেকে কাঁপন লাগছে। কাঁটা দিয়ে উঠছে সারা গা। আবার সদ্যস্মৃতিটা ফিরিয়ে আনছে উত্তাপ। সিগারেটের আলোয় থেকে থেকে একটা লাল বেলুন ফুলে উঠছে, হারিয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে।

সে যেন এইমাত্র প্রচুর হুইস্কি খেয়ে উঠেছে।

জাহেদা পাশে আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয়; থাকলে সে আছে, না থাকলে সে নেই। কোনোদিন যেন তাকে দেখেনি, চিরদিন যেন তাকে দেখেছে। জাহেদা মৃত, জাহেদা জীবন্ত। পাশে তাকাল বাবর। জাহেদাকে মনে হলো বিন্দুসমান, অনেক ওপরে প্লেন

থেকে দেখলে পদ্মায় নৌকো যেমন দেখায়। জাহেদার পাশ ফেরা ডান উরুটাকে মনে হলো তার শরীরের চেয়ে বৃহৎ, হাঁটুর কাছে ক্যামেরা রেখে দেহের ছবি তুললে যেমন হয়।

সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র নিজেকে জীবিত বলে মনে হলো তার। মনে হলো সে একটা প্রাচীন গাছ, মাটিতে সমান্তরাল পড়েছিল কতকাল; সেখানে নতুন ডাল বেরুচ্ছে আবার, সমস্ত কাণ্ড জুড়ে, একে একে, অসংখ্য উজ্জ্বল, জলজ সবুজ, ঋজু, ক্ষীণদেহ। ক্রমশ বড় হতে দেখল সে ডালগুলো। ক্রমে একটি অরণ্য হয়ে গেল তার সমস্ত দেহ জুড়ে। একটা প্রদীপ্ত সূর্য নির্মল কিরণে ভাসিয়ে দিয়েছে সবকিছু। সবকিছু স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, প্রখর দেখাচ্ছে। সেই অনন্তগামী মহাস্রোতে অসহায় ভাসমান একটি অণু আর সে নয়, সে সেই স্রোতের একটি সচল সক্রিয় উল্লসিত অংশ।

স্বচ্ছল প্রপাতের মত হাসতে ইচ্ছে করল তার। সে মনে মনে নির্মল অবিরাম হাসি হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল। এবং খাটের কার্নিশ দু'হাতে শক্ত করে ধরে নগ্নদেহে বসে রইল অনেকক্ষণ।

কিন্তু মনে মনে নয়, সরবে হেসে উঠতে ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল বাবরের। সে খালি পায়ে দাঁড়াল দুই খাটের মাঝখানে। তারপর ছাদের দিকে মুখ তুলে গ্রীবায় দু'হাত চেপে সে হাসতে লাগল, করতলের চাপে প্রায় বোবা কিছু ঘরঘর শব্দ নির্গত হলো শুধু। এই সাবধানতা শুধু জাহেদার ঘুম যেন না ভাঙ্গে।

সমস্ত শরীর একটা তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। কল্লোলিত, হিল্লোলিত একটা দুর্বার তরঙ্গ। ধরে রাখা যাচ্ছে না নিজেকে। অস্থির হয়ে উঠেছে পায়ের আঙুল; নিতম্বের মাংশপেশিতে দ্রুত সঞ্চরণ অনুভব করা যাচ্ছে। মণিবন্ধে এপাশ ওপাশ একটা মোড়চ বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। তার নাচ করতে ইচ্ছে করছে। এই শীতরাত্রে সম্পূর্ণ নগ্ন সংগমতৃপ্ত বাবর অন্ধকারে একটি গাঢ় রক্তবর্ণ বৃহৎ আদি পুষ্পের মত দুলতে লাগল ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে, একতালে।

তারপর হাতড়ে হাতড়ে বাবর ছোট্ট টেপরেকর্ডারটা বের করল। যে ক্যাসেট হাতে ঠেকল সেটাই পরিয়ে চালিয়ে দিল যন্ত্রটা। ছড়িয়ে পড়ল সুরের মূর্ছনা। কমিয়ে দিল ধ্বনি, এত কমিয়ে দিল যে আর শোনা গেল না, কিন্তু সে তার এখনকার প্রখর শ্রবণ দিয়ে স্পষ্ট শুনে চলল। জিজি জাঁ মেয়ার গাইছে। ফরাসি জানে না কিন্তু অর্থগুলো শুনেছিল সে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে প্রথম গানটা শুনল বাবর। এসো, নাচবে এসো। নাচঘরে দেখবে কত রূপসী তরুণী। এসো। শোন তাদের উল্লাসধ্বনি যা আমার পছন্দ। বড্ড ঠাসাঠাসি হবে। বড্ড ভিড়। তোমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরতে হবে। ধরব চুমো দেব আর ঘুরব, সঙ্গীতের ঘূর্ণিতে আমরা ঘুরব। খুলে যাবে তোমার জামা। হারাবে তোমার চেতনা। খুলে যাবে মোজা। খুলে পড়েব সব। আমরা শুধু ঘুরছি, আর ঘুরছি, আর ঘুরছি।

ঘুরতে লাগল বাবর। তালে তালে ঘুরতে লাগল। ডান হাত তুলে, বাঁ হাত নাভির অদূরে ত্রিভুজ করে রেখে, মাথা ঝাঁকিয়ে, তার বহির্চেতনা হারিয়ে— যেমন মাজারে জেকের

করতে হয়, মণ্ডপে কীর্তন করতে করতে দশা লাগে, তেমনি।

শেষ হলো গানটা। অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল বাবর, দাঁড়িয়ে রইল পরের গান যতক্ষণ না শুরু হয়। শুরু হতেই আবার সে তালে তালে ঘুরে চলল। এবার দু'দিকে উত্তোলিত প্রসারিত তার হাত। প্রতি দোলায় তার শিশ্ন এ উরু ছুঁয়ে যেতে লাগল অবিরাম। মেট্রোনমের মত ঐ গানের সাথে তার দেহের সাথে তাল রেখে চলছে যেন।

জিজি জাঁ মেয়ার সুরের নদীতে ছিপছিপে নৌকার মত কথা ভাসিয়ে বলে চলেছে— এটা কোনো ওষুধ, কোনো প্রসাধনী, কোনো কারখানায় তৈরি কিছু, না, সান্টা ক্লজের দোকানে একটা খেলনা ? আমি কত অভিধান দেখলাম, কত নিষিদ্ধ পঞ্জিকা খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। শুধু তাতে লেখা, বলা হয়ে থাকে জিনিসটা... । একটু চেয়ে দেখলাম, পুরোটা খেতে ইচ্ছে করল। আমি এক তরুণী থেকে রূপান্তরিত হলাম আক্রমণ উদ্যত ট্যাঙ্কে। আমি ওটা নিজের করে চেয়েছি। কিন্তু বাইসাইকেল তো আর ওটা নয়, ওর জন্যে দাম দিতে হয় জীবন। তখন এক টুকরো হাসি দিয়ে ওটা পেলাম। ভাবলাম, হয়ে গেল জয়। আমার জয়। কিন্তু পরিণামে আমিই তার ক্রীতদাসী হয়ে গেলাম। আমার দেহ শেকলে বাঁধা। আমি সাহায্য চাই। কিন্তু চিৎকার করব না, কারণ প্রথমে তো আমি নিজেই চেয়েছিলাম। আমার জিনিস। আমার আনন্দ। আমার মৃত্যু। গলার মৃত্যুফাঁস।

অন্ধকার নগ্নদেহে ভূতের মত নাচ করতে করতে সে তার নিজেরই কণ্ঠ থেকে নিসৃত কিছু অব্যয় ধ্বনি শুনতে পেল।

বিছানায় সটান শুয়ে বাবর। অবলুপ্ত হয়ে গেল সঙ্গীত, শান্ত হলো শরীরের মাংসপেশিগুলো। বাবর স্বপ্ন দেখল, তার বাবা কাচাপাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন, লেখ বাবারা লেখ, হাতের লেখা লেখ, ঊর্ধ্বমুখে পথ চলিও না, ইক্ষু রস অতি মিষ্ট।

একপাল ছেলে উবু হয়ে থুথু নিয়ে শেলেট মুছছে আর লিখছে। কেবল বাবরই যেন কোন অপরাধে একেবারে বস্ত্রহীন নিলডাউন হয়ে আছে করোগেটের টিন কাটা জানালার কাছে। বাইরে পাকা সোনার মত ধান খেতের ওপর দিয়ে স্রোত হয়ে চোখ ঝলসনো রোদ আসছে সারাদিন। মন খারাপ করা একটা ঘুঘু ডাকছে ইস্কুল ঘরের কাছেই। দূরে শোনা যাচ্ছে ঢাকের সতেজ একটানা বৃষ্টিমুখর শব্দ। সামনে মহরম। আহা কানা ফকিরের সেই গানটা গো। কাঠের টুকরো কিট কিট করে বাজায় আর বাড়ি বাড়ি গায় 'ও কাশেম, তুমার সখিনা ছেড়ে কুথাকে যাও নাথ!' ঘোমটা টানা বৌদের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, পয়সা দেয়, চাল দেয় তারা। কান্নার জন্যে দাম দেয়। তখনি খুব অবাক লাগত বাবরের। কোথায় যেন কী একটা গোপন অর্থ আছে যা ধরা যেত না। স্বপ্নের মধ্যে বাবর দেখল বেড়ার ফাঁকে কানা ফকিরের গান শুনছে জাহেদা।

দু'পাশে আখের খেত। সোনার মত রং। সবুজ ফেটি বাঁধা লাঠিয়ালদের মত ভিড় করে আছে, এই হাসছে, এই কানাকানি করছে। দ্রুত সরে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে পথের দু'পাশে। জাহেদা আর বাবরের চোখে মুখে এসে লাগছে ভোর সকালের নির্মল হিম হিম হাওয়া। রংপুর থেকে দিনাজপুরের দিকে চলেছে ওরা।

জাহেদা তখন থেকে কী একটা সুর গুন গুন করছিল।

কী গাইছ ?

মিষ্টি করে হাসল জাহেদা। অনেকটা কাল রাতে দেখা সুষমার মত।

বাবর বলল, গাইতে পার জানতাম না তো।

কতটুকুই বা জানেন ?

মানে ?

আমার কতটুকই বা আপনি জানেন!

তা সত্যি। বাবর হাসল। পরে যোগ করল, আমার সব জান ?

হুঁ, জানি।

কী জান ?

বলব না। বলে জাহেদা হঠাৎ বাবরের হাত চকিতে ছুঁয়ে দিল। আপনাকে জানি না ? আপনাকে চিনতে বাকি নেই আমার। বুঝছেন ?

বাবর বাঁ হাত জাহেদার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সে আলতো করে সরিয়ে দিয়ে বলল, গাড়ি চালান।

বলে আবার সে গুন গুন করতে লাগল। তখন বাবরও গুন গুন করে উঠল। ইচ্ছে করে নয়, জাহেদার সঙ্গে পাল্লা দিতে নয়, একেবারে ভেতর থেকে।

জাহেদা হেসে বলল, কী গাইছেন ?

একটা গান।

সে তো বুঝতেই পারছি। জোরে গাইলে শুনতে পেতাম।

বাবর গান থামিয়ে বলল, এই গানটা মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে। গানটা কিছু নয়, ছেলেদের একটা কবিতা। বাংলা পড়লে ছেলেবেলার বইতে পেতে। বাংলাদেশের এমন কোনো ছেলেমেয়ে নেই জানে না।

শুনিই না।

আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। এইভাবে শুরু— মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। ছেলেবেলায় খুব ভাল বুঝতে পারতাম এটা। সারাদিন সারারাত সারাদিন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর হঠাৎ করে মেঘ দরোজা খুলে দিল, রোদ পা বাড়াল পৃথিবীর মস্ত আঙিনায়। তখন কী

যে খুশি হতো। কে যেন ডাক দিত কোথা থেকে। মাতামাতি করে বেরুতাম ঘর ছেড়ে, একেবারে পাখির মত মনে হতো। এখনো যখন কিছু হয়ে যায়, কিছু পেয়ে যাই যার জন্যে গুমোট অপেক্ষা করেছিলাম, তখন ঐ পাখির মত লাগে। গানটা মনে পড়ে। রবি ঠাকুরের লেখা।

টেগোর ?

বাবর হেসে সস্নেহে বলর, হ্যাঁ, টেগোর।

শুনুন। জাহেদা পাশ ফিরল, আদুরে গলায় বলল, ভাল কথা মনে পড়েছে। টেগোরের শ্যামা বলে একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড আছে না ?— আমাকে যোগাড় করে দিতে পারেন ?

কেন ? কী হবে ?

বারে, বাজাব, শুনব। কত নাম শুনেছি রেকর্ডটার। দেবেন ?

আচ্ছা। নিশ্চয়ই দেব। তোমার প্লেয়ার নেই ?

শরমিনের একটা ছোট্ট আছে।

তোমাকে একটা প্লেয়ারও কিনে দেব।

না বাবা না।

কেন ? বাড়িতে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না ? তখন কী বলব?

বলবে, মাসে মাসে টাকা জমিয়ে কিনেছ। সারপ্রাইজ দেবার জন্য এতদিন বলনি।

জাহেদা চোখ পাকিয়ে বলল, আপনার মাথায় যত নষ্ট বুদ্ধি জোটে। বলেই হেসে ফেলল।

বাবর বলল, হ্যাঁ স্বীকার করি, এবার করলাম তুমি আমাকে জান।

জানিই তো। কী ভেবেছেন সাহেব ?

বলে সীটে গা এলিয়ে জাহেদা আবার গুন গুন করতে লাগল।

সৈয়দপুর পার হয়ে গেল ওরা।

জাহেদা নীরবে চোখ মেলে তাকিয়েছিল সমুখে। তার শরীরের চমৎকার একটা সুবাস থেকে থেকে নাকে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। জাহেদাকে আরো কাম্য বলে মনে হচ্ছিল তখন। স্মিত মুখে বাবর বাসনার সেই আসা-যাওয়া উপভোগ করছিল তার সারা শরীর দিয়ে।

হঠাৎ জাহেদা প্রায় আচমকা একটা প্রশ্ন করল।

যদি কিছু হয় ?

বাবর চমকে উঠল যেন।

কী কিছু হয় ?

যদি কিছু হয় ?

সাবধানে সামান্য একটু হাসল বাবর প্রথমে। তারপর বাঁ হাতে জাহেদার কাঁধ জড়িয়ে নিল। দুষ্টুমি গলায় বলল, কিছু হয়ত হবে।

জাহেদা বোবা চোখে বড় করে তাকাল বাবরের দিকে।

হ্যাঁ, কিছু হয়ত হবে। তার জন্যে এত ভাবনা কীসের? আমার ছোট বোন থাকে আজাদ কাশ্মীরে। ওর স্বামী আর্মির ডাক্তার বলেছি তোমাকে?

জাহেদা মাথা নাড়ল।

বলিনি? তার ওখানে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। তোমার বাবা জানবে কোনো ছাত্রীদলের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়াতে গেছ। সেখানে আমার বোনের কাছে বাচ্চা হবে। তুমি চলে আসবে। বাচ্চা থাকবে ওর কাছে। একটু বড় হলে নিয়ে আসব। আমার মেয়ে পছন্দ। তোমার?

জাহেদা শুনছিল আর ক্রমশ মাথা নিচু করছিল। এবার চোখ তুলে বলল, না, না, সত্যি কিছু হয়ে গেলে?

আদর করে হঠাৎ জাহেদাকে একটু কাছে টেনে নিল বাবর, তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠাট্টা করছিলাম। কিছু হবে কেন? আমি জানি কী করে কী করতে হয়।

জাহেদা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরোজার সাথে ঠেস দিয়ে বসল।

কাল তুমি কাঁদছিলে কেন?

অনেকক্ষণ পর জাহেদা বলল, আচ্ছা, এইসব ছাড়া আমরা ভালবাসতে পারি না? বলেই সে হাসিতে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল। খুব ছেলেমানুষ দেখাল তাকে এখন।

বাবর এক মুহূর্ত ভাবল। ভালবাসা সম্পর্কে তার ধারণা পরশু রংপুরে আসতে আসতে জাহেদাকে সে বলেছিল। ভুলে গেল কী করে এরই মধ্যে মেয়েটা? এখন আবার বলবে? না, থাক। কাল আর পরশু রাতের পর এখন ওভাবে বললে অন্যরকম মনে করবে জাহেদা।

কথা আজ পর্যন্ত তাকে প্রতারণা করেনি। এখনো করল না। বাবর বলল, সেদিন রাতে মন্দিরে গান শুনেছিলে মনে আছে?

এটা কী উত্তর হলো বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে জাহেদা বলল, হ্যাঁ।

গানে বলছিল না?— চাই না স্বর্ণসীতা চাই না?

হ্যাঁ।

স্বর্ণসীতা বুঝেছ?

জাহেদা মাথা নাড়ল।

না বোঝবারই কথা। আমরা যে কালে বড় হয়েছি রামায়ণ মহাভারত তখন এমনিতেই জানা হয়ে যেত। রামায়ণে আছে, সীতাকে রাবণ চুরি করে নিয়ে গেল। যুদ্ধ করে তাকে উদ্ধার করে আনল রাম। অযোধ্যায় রাজা হলো রাম আর সীতা তার রাণী। প্রজারা বলাবলি করতে লাগল, সীতা এতদিন রাবণের কাছে বন্দি ছিল, সীতা কি সতী আছে?

প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাম তখন সীতাকে নির্বাসন দিলেন।

কী নিষ্ঠুরতা! জাহেদা চোখ গোল করে মন্তব্য করল।

তারপর শোন। সীতাকে নির্বাসন দিয়ে রামের অন্তরে সুখ নেই।

বিমর্ষ দিন কাটতে লাগল তার। শরীর কৃশ থেকে অতিকৃশ হয়ে গেল। মলিন হলো উজ্জ্বল ক্লান্তি। তখন অনুতপ্ত প্রজারা রামের তুষ্টির জন্যে রাজ্যের সেরা কারিগর দিয়ে সীতার একটা স্বর্ণমূর্তি বানিয়ে রামের সামনে আনল। বলল, এই নিন আপনার সীতা। রাম তখন প্রশ্ন করল, তোমার এই সোনার সীতা কি কথা বলতে পারে? উত্তর এলো, না। কানে শুনতে পায়? —না। —সে কি চোখে দেখতে পায়। —না, তাও পারে না। তখন রাম বলল, হোক না সোনার তৈরি, হোক না সেরা কারিগরের সৃষ্টি, চাই না আমি এই সোনার সীতা, চাই না।

সুন্দর। জাহেদার গাঢ়স্বরে ঐ একটি মাত্র শব্দ শোনা গেল।

হ্যাঁ সুন্দর। এবং সত্যি। আমার মনের কথাই রামের মুখে শোনা গেছে। আমি যাকে চাই রক্তমাংসে চাই তাকে। সপ্রাণ তাকে চাই। জীবন্ত তাকে চাই। এই তুমি যেমন তেমনি করে চাই।

জাহেদা সমুখে তাকিয়ে রইল অঙ্কিত একটা চিত্রের মত।

কী ভাবছ?

না, কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছ। বাবর প্রীত মুখে উচ্চারণ করল জোর দিয়ে।

জাহেদা তখন নিঃশব্দে এক টুকরো হাসল।

বাবর বলল, তুমি ভাবছ, এ কেমন কথা বলছি আমি। নয়? ভাবছ, তাহলে মানুষের মন কিছু না? শরীরটাই সব? এতকাল যা জেনে এসেছ তা ভুল? এই ভাবছ তো?

আপনার কী দোষ জানেন?

কী?

আপনার দোষ, নিজেই বলে চলেন, অন্যে যে অন্য কিছু ভাবতে পারে, অন্য কিছু বলার থাকতে পারে তার, তা আপনার মনেই হয় না।

অপরাধীর মত হাসল বাবর। বলল, তোমার কথা তাহলে বল।

চুপ করে রইল জাহেদা। নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগল বাবর। কিন্তু এটাও খুব শান্তিকর বলে মনে হলো না। কথা বলার জন্যে ভারি তৃষ্ণার্ত হয়ে রইল সে। বারবার তাকাতে লাগল জাহেদার দিকে।

জাহেদা বলল, বকা খেয়ে চুপ করেছেন তো!

হুঁ। বোধহয়।

আচ্ছা বলুন, আপনার যা মনে আসে বলুন।

এভাবে কথা বলা যায় না।

কেন ?

এক তরফা কথা হয় না।

আমি তো শুনছি। তারপর কী হলো ? রামের কী হলো ?

রাম ?

হ্যাঁ, এই যে বলছিলেন।

বাবর হেসে ফেলল। বলল, ঐ তো, বললামই তো। সীতাকে যে চায়, রক্ত মাংসের সীতা। সীতার স্মৃতি নয়, প্রতিকৃতি নয়; যে সীতা জীবন্ত, যে সীতা বর্তমান। আমাদের একটা দোষ কি জান ? আমরা স্বাভাবিকতাকে ভয় পাই। শরীরকে ভয় পাই। ইচ্ছাকে ভয় পাই। আমরা আমাদের কামনাকে নিয়ে বিব্রত। বুকে হাত দিয়ে ক'টা লোক বলতে পারবে কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখে তার ইচ্ছে হয়নি ? যদি কেউ বলে যে তার হয়নি, আমি বলব, হয় সে অসুস্থ নয়তো মিথ্যুক।

ব্যতিক্রম তো আছে।

আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়মের অস্তিত্বই প্রমাণ করে জাহেদা। বিশ্বাস কর, কাউকে দেখে আমার তাকে পেতে ইচ্ছে করবে, তার অন্তর্গত হতে ইচ্ছে করবে— এর চেয়ে স্বাভাবিক এবং সাধারণ আর কোনো ইচ্ছে আমি জানি না।

জাহেদা নির্বিকার মুখে চোখ দ্রুত ধাবমান দৃশ্যের দিকে রেখে শুনে যেতে লাগল, যেন ক্লাশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণসমূহ সে অধ্যাপকের কাছ থেকে শুনছে।

বাবর বলে চলল, কিন্তু ঐ যে বললাম, আমরা আমাদের দেহকে ভয় পাই, যেমন সাপকে, তুমি তো সাপের উল্লেখে শিউরে ওঠ, যেমন ভয় পাই অ্যাটম বোমাকে। কিন্তু ভয় পেলেই তো কিছু মিথ্যে হয়ে যায় না। কী বল ?

বোধহয়।

বাবর সুদূরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

হাসছেন যে ?

একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার বড় চাচা। ইয়া ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, টকটকে গায়ের রং, গালে সুন্নতি দাড়ি, সর্বক্ষণ মাথায় টুপি, কী প্রশান্ত পবিত্র দর্শন তাঁর। দেখলে ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসত। এখনো ছবিগুলো স্পষ্ট চোখের ওপর ভাসে। এই তো সেদিনের কথা। কত দিন হবে ? মাত্র তিরিশ বছর আগে। তুমি তখন কোথায় ?

জাহেদা হাসল নিঃশব্দে।

তুমি তখন হওনি। আমার সেই চাচার কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

কেন ?

না, থাক। বলব না। বললে মন খারাপ হয়ে যাবে।

আপনাকে বোধহয় খুব ভালবাসতেন ?

হ্যাঁ, খুব। বলতে গেলে আমি তাঁর কাছেই মানুষ।

মারা গেছেন ?

হ্যাঁ। আমি তখন ঢাকায় এসেছি। চিঠিতে জানলাম।

জাহেদা বলল, আপনিই তো বলেন মৃত্যু সবচেয়ে স্বাভাবিক, তাহলে মন খারাপ করছেন কেন ?

না, সেজন্যে নয়।

বাবর চকিতে উপলব্ধি করল জাহেদা ভুল ধারণা করেছে।

তাহলে ?

তুমি ভেবেছ, আমার মন খারাপ হবে ? না, আমি তোমার কথা বলছিলাম। শুনলে তোমার খারাপ লাগবে। কারণ, সংস্কার তোমার রক্তের মধ্যে আছে। ভাল মন্দের চলিত ধারণায় তুমি মানুষ হয়েছ।

জাহেদা তার গায়ে টোকা দিয়ে বলল, বাহাদুরি না করে বলুন। আমি শুনব। আমার মন খারাপ হবে না।

শুনবে ? শোন তাহলে। আমি তখন চাচার বাড়িতেই থাকি। পাশাপাশি বাড়ি আমাদের। চাচি তার ছেলেমেয়ে নিয়ে গেছেন বাপের বাড়িতে। তখন নামাজ পড়তাম। চাচার সঙ্গে। একদিন আছরের সময়, ওজু করে চাচার কাছে গেলাম, চাচা বললেন, তিনি নামাজ পড়ে নিয়েছেন। একটু অবাক লাগল। কোনোদিন তো চাচা আমাকে ফেলে নামাজ পড়েন না ? ভাবলাম, কী জানি, হয়ত আমারই দেরি হয়ে গেছে। নামাজে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখন, মনে হলো উঠানে নিচু গলায় চাচা কী যেন কাকে বলছেন। এ রকম কণ্ঠ চাচার কখনো শুনিনি। আমার সেই বয়সেই বুদ্ধি হয়েছিল খুব, আমি বুঝতে পেরেছিলাম গলা শুনেই যে গোপন কিছু একটা চলছে যা আমার শোনা উচিত নয়।

থামলেন কেন ? তারপর ?

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, উঠানে চাচা আব্বাসের মাকে কী যেন বলছেন। আব্বাসের মা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সারা গা যেন থর থর করে কাঁপছে তার।

আব্বাসের মা কে ?

চাচার বাড়িতে কাজ করত। মাঝ বয়সী। বিধবা। আব্বাসকেও আমরা কোনোদিন দেখিনি, তিনি মাঝ বয়সেই নাকি মারা গিয়েছিল। গোলমত মুখ, শ্যামল, ঘন ভ্রু ছিল মনে আছে আব্বাসের মা-র। আর মনে আছে পায়ের তেলো ঘেয়ো শাদা ছিল তার। সারাদিন মাড় দিয়ে কাপড় কাচতে হতো, তাই। সন্ধ্যের সময় দেখতাম কাঠ পুড়িয়ে ধোঁয়া দিত পায়ে।

কেন ?

ওটা ঘায়ের ওষুধ। লালচে একটা দাগ হয়ে যেত পায়ের চারদিকে অনেকটা আলতার

মত।

আলতা কী?

ও চিনবে না। এককালে বাংলার মেয়েরা শখ করে পায়ে পরত। আরো আগে নাপিত বৌ চুবড়িতে করে আলতা নিয়ে আসত বাড়ি বাড়ি, বৌদের পায়ে দিত। দেখি, ঢাকায় ফিরে, খুঁজে তোমাকে এক শিশি আলাতা কিনে দেব। এখনো হয়ত পাওয়া যায়। তোমার পায়ে চমৎকার লাগবে।

বাবর পা দিয়ে জাহেদার পা ছুঁয়ে দিল। জাহেদা পা টেনে বলল, আপনার শুধু প্রমিজ আব প্রমিজ। তারপর গল্পটা কী হলো?

গল্প নয়। সত্যি। একেবারে চোখে যা দেখেছি। সেদিন সারা বিকেল সারা সন্ধে কেন যেন গা ছমছম করতে লাগল আমার। মগরেবের নামাজ পড়লাম চাচার সঙ্গে, কিন্তু ভাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। রাতে দেখলাম, চাচা চোখে দিচ্ছেন সুরমা। আমি তাকাতেই কেমন তড়বড়ে গলায় চাচা বলে উঠলেন, চোখ ভাল থাকে, তুই ঘুমো।

তারপর?

আহ, অত উতলা হয়ো না।

জানেন আপনার দোষ কি?

বলতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে। তোমার কোনটা চোখে পড়েছে তাই বল।

আপনি গল্প বলেন এত ঘুরিয়ে যে আসল কথাই হারিয়ে যায়।

আচ্ছা, আচ্ছা। তারপর পড়েছি ঘুমিয়ে। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে যেন মনে হলো, পানির শব্দ। খুব সরু করে পানি পড়ছে কোথাও। যেন রাতের অন্ধকারের মধ্যে একটা তরল শব্দ পথ করে চলেছে। আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন টের পেলাম, পানি গড়াচ্ছে আমাদের আঙ্গিনায় এক কোণে যে গোসলখানা, তারই পাকা ড্রেন দিয়ে, গিয়ে পড়ছে বাইরে। কেউ গোসল করছে। কান খড়া করে রইলাম। কে? কে এত রাতে গোসল করে' অনেকক্ষণ পরে দেখি, চাচা। গোসল করে চাচা এলেন। ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কেমন খাপছাড়া ঠেকেছিল সে রাতেই, সেই ছেলে বয়সেই। এত রাতে কেন চাচা গোসল করবেন? কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি—

আর আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আপনার এতে এত চমকাবার কী ছিল।

ছিল না? শোন তাহলে। চাচা সে রাতে আব্বাসের মাকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন।

জাহেদা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কথাটা যেন পুরোপুরি, উপলব্ধি হলো তার। চট করে সামলে নিল নিজেকে। একেবারে চুপ করে গেল।

কী, কথা বলছ না?

জাহেদা তবু কিছু বলল না।

বাবর বলল, তাই বলছিলাম, চরিত্র বলে যা আমরা জাহির করি আসলে তা কতটা খাঁটি সত্য সেটা বিবেচনার বিষয়। আমার তো মনে হয়, সব মানুষেরই দুটো চেহারা। একটা

তার নিজের, আরেকটা সে তোলে অপরের জন্যে।

আপনারও ?

তার মানে ?

আপনারও দুই চেহারা ?

এবার থমকে গেল বাবর। একটু হাসল। কী বলবে গুছিয়ে নিতে চাইল মনের মধ্যে। এক লহমা পর বলল, হ্যাঁ আমারও। আমাকে তুমি যা জান, আমি তা নই।

২০

হাসু, হাসনু, হাসুরে।

তীব্র আর্তনাদের মত তার নিজেরই সে ডাক যেন কানে শুনতে পায় বাবর।

হাসুরে।

মুখ খানা কেমন ছিল হাসনুর ? পথের দিকে চোখ রেখেই চোখ তীক্ষ্ণ করে বাবর ভাবতে চেষ্টা করে। যেন নিজেরই সঙ্গে একটা মল্লযুদ্ধ চলতে থাকে তার। কিছুতেই সে পারছে না জয়ী হতে, কিছুতেই পারছে না মনে করতে, কেমন ছিল দেখতে হাসু।

হাসু সন্ধেবেলায় পড়তে বসে বড় বিরক্ত করত।

পড়া বলে দে'না দাদা।

চুপ কর।

দে'না তোর পায়ে পড়ি।

যাবি তুই।

একটুখানি বলে দে।

মারব এক চাপড়।

তখন মুখ ভেংচে দৌড় দিত হাসনু।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে। মুখ ভেংচালে ভারি মিষ্টি লাগত হাসনুকে। আদর করতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তখন আদর করলে একটু আগে রাগ করবার মানে থাকে না নিজের। তাই সে পেছনে থেকে চেঁচিয়ে বলত, আবার আসবি তো তোর বেণি কেটে দেব। তখন মজা টের পাবি।

বাবরের চোখ যেন ভিজে আসে।

জাহেদাই এবার বলে, আপনি চুপ করে যে!

এটা বিশ্বের কি খুব অস্পষ্ট ঘটনা ?

মানে ?

আমার চুপ করে থাকাটা ?

জাহেদা অবাক হয়। কেমন যেন টের পায় কোথায় একটা তার ছিঁড়ে গেছে।

বাবর যেন এখানে থেকেও নেই। সাহস হয় না ঘাটাতে। কাল রাতের পর এই প্রথম জাহেদা টের পায়, তার শক্তি যেন কে শুষে নিয়েছে। আগে যেমন চট করে একটা কিছু করবার কথা ভাবতে পারত, এখন যেন সেই ঝোঁকটা নেই। বরং খানিক ভেবে দেখার ঢিলেমি এসেছে।

জাহেদা বলল, যাচ্ছি কোথায় ?

বর্ধমানে।

বলেই সামলে নিল বাবর। বলল, ঠাট্টা করছিলাম। যাচ্ছি কান্তনগরের মন্দিরে দেখতে। তোমায় নিয়ে যাব বলছিলাম। এই তো প্রায় এসে গেছি।

খানিক পরেই হাতের বাঁয়ে লাল মাটির কাঁচা রাস্তা।

বাবর নেমে এক লোককে জিগ্যেস করল, এই পথেই তো মন্দির ?

হ্যাঁ, সোজা চলে যান।

গাড়িতে এসে আবার স্টার্ট দিতে দিতে বাবর বলল, এখনো পথটা মনে আছে। ভুলিনি। চমৎকার মন্দির; পোড়া মাটির ফলকে তৈরি। এমনটি আর কোথাও নেই। অথচ জান, দেশের এত পুরনো, এত বিশিষ্ট একটা জিনিস, কারো খোঁজ নেই। খোঁজ নিতে গেলে ইনফরমেশনের লোকেরা বলবে, মুসলমান হয়ে হিন্দুর জিনিসে অত উৎসাহ কেন ? লাগাও টিকটিকি। ভারতের দালাল নয় তো!

দালাল মানে ?

তাও জান না। বাংলায় জন্ম, থাক এদেশে, দালাল চেন না ? ঐ ইংরেজিতে যাকে বলে এজেন্ট। ধান-চাল ওষুধ পত্তরের এজেন্ট নয়— এজেন্ট।

জিরো জিরো সেভেন ? জেমস বণ্ড।

হা হা করে হেসে উঠল বাবর।

ধরেছ ঠিকই। তবে পদমর্যাদা অতটা নয়; এদেশে দালাল বড় কুৎসিত কথা; আর যে বলে, তার মনটাও কিছু কম কুৎসিত নয়। সবচেয়ে সহজ গাল, দালাল। এক সময় ছিল, বাংলা ভাষায় নেড়ে বা যবন বলাটা ছিল গালের চূড়ান্ত। এখন তার বদলে নতুন কথা এসেছে, দালাল।

আপনি আবার মাস্টারি করছেন! জাহেদা কৃত্রিম অনুযোগ করল।

তোমার বাংলার মাস্টার।

বাবর তাকিয়ে দেখল সামনে খাল। সেই খালের উপর চওড়া কাঁচা সাঁকো। মানুষজন পার হচ্ছে। এর উপর দিয়ে তো গাড়ি যাবে না। অতএব গাড়ি রাখতে হলো।

নেমে এসো জাহেদা, হাঁটতে হবে।

গাড়ির চারপাশে এরি মধ্যে বেশ ভিড় জমে গেল। এক হাঁটু ধুলোপায়ে লোকেরা হ্যাঁ করে দেখতে লাগল গাড়ি। জাহেদা বেরিয়ে আসতেই গাড়ির বদলে চোখ পড়ল তার দিকে। গাড়ি ছেড়ে তারা দেখতে লাগল জাহেদাকে।

ধুলোর গন্ধ হঠাৎ যেন নতুন মনে হলো বাবরের। অনেকদিন এমন গাঢ় গন্ধ পায়নি সে। যেন কীসের কথা মনে পড়তে চায়, স্মৃতিটা একেবারে দরোজার ওপারে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

জাহেদা বলল, এর উপর দিয়ে হাঁটতে হবে নাকি ?

সাঁকোটা এতই নিচু যে পানি ছুঁয়ে আছে। সাঁকোর ওপরে খড় বিছান। পায়ের চাপে পানি ফুটে বেরুচ্ছে। পা ভিজে যাচ্ছে।

বাবর বলল, স্যাণ্ডেল জোড়া হাতে করে নাও। আর নইলে চল গাড়িতে রেখে আসি।

ইতস্তত করতে লাগল জাহেদা।

থাক না, মন্দির থাক।

কী বলছ ? এতদূর এসে দেখে যাবে না ?

আপনি তো মন্দির দেখতে আসেননি।

নিশ্চয় এসেছি।

হাতি! কী জন্যে এসেছেন, নিজেকেই জিগ্যেস করুন।

এতক্ষণে বাবর বুঝল। মেয়েটা ভেবেছে তার এই আসা শুধু তাকে জয় করার জন্যে। আপন মনেই হাসল সে। কথাটা মিথ্যে বলেনি। যতক্ষণ জাহেদা ছিল হাতের বাইরে, তাকে পাওয়াটা ছিল মুখ্য। যেই পাওয়া হয়েছে, তখন সেটা যেন পেছনে পড়ে গেছে। নিজেই সে বুঝতে পারেনি, কখন এই বদল হয়েছে তার মনের মধ্যে। এতক্ষণ, এই আজ সকাল থেকে, যেন তার মনে হচ্ছিল, আসবার একমাত্র উদ্দেশ্য কান্তনগরের মন্দির দেখা। আর কোনো উদ্দেশ্য নেই যেন তার। ছিলও না।

আবার হাসল বাবর। এবারে হাসিটা ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়। আর তো লক্ষ করল জাহেদা। বলল, চলুন গাড়িতেই রেখে আসি।

স্যাণ্ডেল রেখে এসে ওরা সাঁকো পেরুতে যাবে, একটা লোক হাত পেতে দাঁড়াল। কী ব্যাপার ? জানেন না বুঝি ? সাঁকো পেরুতে পাঁচ পয়সা করে গুনে দিতে হবে। কারণ ? তাও জানেন না। কাল গেছে মেলা। মেলার লোকের সুবিধের জন্যে এরা সাঁকো করেছে। নইলে নৌকোয় করে, নয়ত কোমর পানিতে গা ডুবিয়ে পার হতে হতো। পয়সা দিল বাবর। কিন্তু ভারি দুঃখ হলো, আগে জানলে কালকেই আসা যেত। কতদিন মেলায় যায়নি সে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হাসনুকে নিয়ে মেলা দেখতে গিয়েছিল বাবর। মহরমের মেলা। বড় বড় তাজিয়া বানিয়েছিল। সেই তাজিয়া মিছিল করে গেছে মেলার দিকে। তারপর ভাল

করে মনে নেই। মেলা পর্যন্ত পৌছিয়েছিল কিনা তাও আজ মনে নেই। কেবল মনে আছে লোকজন সব লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে পড়েছে। কেমন একটা থমথমে ভাব। বুকের কাছে অস্পষ্ট আতঙ্ক।

বাড়ি যাও খোকা, বাড়ি যাও।

কেন্ ?

শিগগিরে বাড়ি যাও।

ভারি অবাক হয়েছিল বাবর। এ-কী কাণ্ড! সেই কবে থেকে বসে আছে সে, একটা একটা করে পয়সা জমিয়েছে, মেলায় যাবে বলে। আর এখন বলে কিনা, বাড়ি যাও।

মেলা হবে না ?

মেলা ? হ্যাঁ মেলাই হবে। রক্তগঙ্গার মেলা।

বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠেছিল বাবরের।

হাসু, হাসনু, হাসুরে।

হাসু কে ?

জাহেদা হঠাৎ প্রশ্ন করল। আর প্রশ্নটা যেন হতবিহ্বল করে দিল বাবরকে। এক মুহূর্তের জন্যে বুঝতে পারল না। কার কথা বলছে জাহেদা।

হাসু কে ?

সামলে নিল বাবর। মাথা নাড়ল। বলল, কেউ না।

নিশ্চয়ই কেউ।

বলছি কেউ না।

তাহলে নাম ধরে ডাকলেন যে!

কখন ?

এই তো এক্ষুণি।

ভুল শুনেছ।

না বলুন, হাসু কে ?

বললাম তো কেউ নয়।

নিশ্চয় কোনো মেয়ে।

হাসু ছেলের নামও হয়।

আমাকে ফাঁকি দিচ্ছেন। বলুন না কে ? আমি তো জানি, আপনার একগাদা মেয়ে বন্ধু। নাম বললে তো আর খেয়ে ফেলব না!

মিছেমিছে হিংসে করছ।

বলুন আপনার একগাদা মেয়ে জানাশোনা নয় ?

তুমি ঝগড়া করছ।

মোটেই না।

মাথা ঝাড়া দিয়ে জাহেদা এমন মুখভঙ্গি করল, তারপর নিশ্চল নিস্তরঙ্গ করল চেহারা, যেন পাথর দিয়ে এক্ষুণি সেটা তৈরি হলো।

বাবর হাসল।

আবার হাসছেন ? লজ্জা করে না একশ' মেয়ের সঙ্গে থাকতে ? হাসু কে তা না বললেও জানি। সত্যি কখনো চাপা থাকে না।

না, থাকে না।

বাবরের নিজের কথাই চমকে দিল নিজেকে। কিছু না ভেবেই বলার জন্যে যেটা সে বলেছিল, বলা হবার পর সে অবাক হয়ে দেখল তার মধ্যে বিশ্বজোড়া অর্থের ভার।

বাবর বলল, চল, পা চলিয়ে চল।

২১

মাঝখানে একটা জীবন গেছে, একটা পৃথিবী বদলে গেছে, এই রকম মনে হচ্ছে বাবরের। গেলকাল আর আজ মধ্যিখানে একটা সমুদ্র নিয়ে আছে।

কতবার কতজনের সঙ্গে শুয়েছে বাবর। কিন্তু এর আগে যেন এ রকম করে অবসাদ আসেনি। বড্ড উন্মনা লাগে তার। পেছনে কী রকম একটা টান পড়ে। সর্বক্ষণ মনে হয়, পেছনে ফিরে দেখে।

নাহ, এ আমার কী হচ্ছে ?

বাবর নিজেকে বলে। উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করে। ফুরফুর গলায় ডাকে, জাহেদা, ও জাহেদা।

কী ?

তোমার পায়ে ধুলো। ভারি মিষ্টি লাগছে দেখতে।

জাহেদা চলতে চলতে বলে, জিভ দিয়ে পরখ করবেন নাকি ?

বলেছিল ঠাট্টা করে। কিন্তু বলেই সে বোঝে, বলাটা ঠিক হয়নি। লজ্জা করে তার। সারা শরীর খুস খুস করে উঠে জাহেদার। নিজেকে নগ্ন মনে হয় হঠাৎ। লুকোতে ইচ্ছে করে। চলছিল সে বাবরের আগে আগে, হঠাৎ গতি শিথিল করে ফেলে সে, কিংবা হয়ে আসে আপনা থেকে।

আর বাবরের মাথায় মুহূর্তে একটা রক্তবর্ণের ফুল ফুটে। খেলে যা, খেলারাম, তুই আবার

খেলে যা।

ইচ্ছে করে, সত্যি সত্যি জাহেদাকে কোলে করে তার ধুলো পায়ে মুখ দিয়ে দেখে। নাভির কাছে কোমল উষ্ণতা আবার ফিরে আসল বাবরের। এতক্ষণের সেই ভার যেন নেমে যায়। হালকা লাগে নিজেকে। নাহ, সে যে ভাবছিল, ভেতরে একটা কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তার, তা বোধহয় সত্যি নয়। সে যা ছিল তাই আছে।

খেলারাম, খেলে যা।

বাবর তার দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত কাপড় যেন খুলে নেয় জাহেদার। আবার বেরিয়ে পড়ে তার গোলাপি নরম স্পন্দিত মাংস।

দাঁড়িয়ে পড়লেন যে!

জাহেদা জিগ্যেস করে। তখন চৈতন্য হয় বাবরের।

আবার হাসছেন!

হাসিটা আরো দীর্ঘায়িত করে রাখে বাবর। তারপর বলে, সত্যি মন্দির দেখা কিছু নয়। তুমি ঠিকই বলেছ।

তার মানে ?

আবার আমার ইচ্ছে করছে। এখুনি এখানে।

জাহেদা ভ্রুকুটি করে।

সত্যি, এখানে যদি আমাদের শোবার ঘরটা কেউ মন্ত্রবলে উড়িয়ে আনতে পারত জাহেদা। যদি সেটা সত্যি হতো।

চলুন, মন্দির দেখতে যাই।

মন্দির হলো ভেতরের আঙ্গিনায়। বাইরে বিরাট মাঠ পেরিয়ে যেতে হয়। সেই মাঠে, গাছতলায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। এরা এসেছিল মেলায়। এক জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে বসেছে কলাপাতা নিয়ে। ভাত রান্না হয়েছে মাটির হাঁড়িতে। মা সেই ভাত, গরম ধোঁয়া ওড়ানো লাল চালের ভাত উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে কলার পাতে। পাশে ওদের বাবা বসে আছে চোখ রক্তবর্ণ করে। সারারাত গাঁজা খেয়েছে নিশ্চয়।

জাহেদা অবাক হয়ে যায়। বলে, এই ধুলোর মধ্যে পাতায় করে ভাত খাবে নাকি ওরা ?

হ্যাঁ খাবে।

এহ মা।

সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে যেন জাহেদার। বাবর জিগ্যেস করে, কী হলো তোমার ? কী হলো ?

মনে হচ্ছে আমারই দাঁতে বালি লেগেছে।

দেশের প্রায় সব মানুষেই এইভাবে খায়।

মাটিতে ?

হ্যাঁ মাটিতে। তবু তো খেতে পাচ্ছে ওরা, অনেকে তাও পায় না।

আচ্ছা ওরা সঙ্গে করে প্লেট আনতে পারে না।

হা হা করে হেসে ওঠে বাবর।

হাসির কী হলো?

তোমার কথা শুনে ফ্রান্সের সেই রাণীর কথা মনে পড়ে গেল।

ঠাট্টা করছেন?

না। সেই রাণী বলেছিল, সব ক্ষুধার্ত মানুষ দেখে, ওরা রুটি নেই তো, কেক খায় না কেন?

এ আপনার বানানো গল্প। শুধু শুধু আমাকে ঠাট্টা করবার জন্যে। বলুন, বানানো নয়?

হ্যাঁ, বানানো। বাবর মিথ্যে করে বলল। তারপর বলল, চল এগোই।

আরেকটা গাছের তলায় তখনো একজন বসে আছে রুদ্রাক্ষের তৈরি মালা নিয়ে। বিক্রি করছে।

কত করে?

আট আনা।

মাত্র আট আনা! জাহেদার চোখ হঠাৎ খুশিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এত সুন্দর জিনিস। বলে, গলায় পরে বেরুলে এত মানাবে। আমি কিন্তু এক ডজন নেব।

এক ডজন?

হ্যাঁ, পাপ্পুকে দেব, শরমিনকে দেব, সবাইকে দেব।

কেনা হলো মালা। বাবর দাম দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল জাহেদা। বলল, না আমি দেব। আপনার কাছে পয়সা নেব কেন?

আমার কাছে শুধু চুমো নিও তুমি!

সত্যি সত্যি রাগ করে এবার জাহেদা। বলে, আপনি শুধু ঐ এক কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না।

তাই নাকি।

হ্যাঁ তাই। আমাকে কী মনে করেন? দেখব আপনার মন্দির।

মন্দিরটা আমার নয়।

বাবরের ঠাট্টা যেন আরো জ্বালিয়ে দেয় জাহেদাকে।

আপনার মন্দির, আপনিই দেখুন।

মুহূর্তে জাহেদা ফিরে লম্বা পা ফেলে দৌড়ুতে শুরু করল ফিরতি পথে। হঠাৎ করে এমন রাগ করবে বুঝতে পারেনি বাবর।

আরে, কী হলো শোন।

বাবর তার পেছনে তখন দৌড়্‌ল তাকে ধরতে। ভাত ফেলে সেই ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রুদ্রাক্ষের মালা যে বিক্রি করছিল সেও এবার উঠে পেছন থেকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে ডাকতে লাগল।

ডাক শুনে তাকাল বাবর। আরে, ওকে দামটা দেয়া হয়নি। পকেটে হাত দিল বাবর। বিরক্ত কণ্ঠে জিগ্যেস করল, কত দাম ?

ছয় টাকা।

কিন্তু সঙ্গে দশ টাকার নোট। লোকটার সাথে ভাংতি নেই। কী মুশকিল। বাবর তাকিয়ে দেখল, জাহেদাকেও এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কী করবে সে ? দশ টাকার নোটটাই দিয়ে দেবে ? না, আরো আটটা মালা নিয়ে পুরো করবে টাকাটা ? জাহেদা ভীষণ রাগ করেছে নিশ্চয়। নিজেকে ভেতর থেকে খারাপ লাগছে বাবরের। ছোট্ট একটা মেয়ে হঠাৎ করে খেপে গেলে বাড়িশুদ্ধ মানুষ যেমন আদর করে থামাতে অস্থির হয়ে ওঠে, তেমনি লাগছে তার।

জাহেদার চলে যাওয়া পথের থেকে চোখ ফিরিয়ে বাবর যখন লোকটাকে দশ টাকার নোটটাই দিতে তৈরি, তখন দেখে লোকটা নেই।

আরে, এ আবার গেল কোথায় ?

দু' একজন মানুষ তখন দাঁড়িয়ে গেছে বাবরের পাশে। তাদের একজন বলল, ভাংতি আনতে গেছে।

নিঃশ্বাস ফেলল বাবর। বড় করে একটা নিঃশ্বাস। কিছু করবার নেই। দাঁড়াতেই যদি হয়, দাঁড়াবে সে। ভাবনা করে লাভ নেই।

জাহেদা হেঁটে ঢাকা ফিরে যাবে না, গাড়িতেই গিয়ে বসবে। এত ভেবে কী হবে ? কবে কোনোদিন এত ভেবেছ বাবর ?

হাসল বাবর। নিজের দিকেই তাকিয়ে সে হাসল মনে মনে। খেলারাম, খেলে যা। তোর কাজ শুধু খেলে যাওয়া হাঃ।

একটা সিগারেট ধরাল বাবর। ধুলো পায়ের পথ দেখতে লাগল। পাতা ঢাকা। ভিজে ভিজে। যেখানে ছায়া, সেখানে ভারি সুন্দর ঠাণ্ডা। যেন সারা জীবন শুয়ে কাটিয়ে দিতে লোভ হয়। কানে যেন বাঁশির সুর শুনতে পায় বাবর। সেই ছেলেটা খুব ভাল বাঁশি বাজাত।

কোন ছেলেটা ?

নামটা মনে নেই। তার বয়সী ছিল। লেখাপড়া করত না। বাপ ছিল বাজারের কুলি। ছেলেটাও ছোটখাট মোট বইত। আর ফাঁক পেলেই কোমর থেকে বাঁশি বের করে বাজাত। তুতুর-তুয়া-আ-আ— এমনি একটা সুর ছিল। সেই সুরটাই ঘুরে ফিরে বাজাত। তারপর একদিন সাপে কাটল তাকে।

নাঃ। কবে কোনদিন ভেবেছে বাবর ? ভাববে না সে। সব ভাবনার গলা টিপে মেরেছে

সে বহুকাল আগে। ভাবনা তার শুরু। এই তো সে বেশ আছে, ভাল আছে।

লোকটা ফিরে এলো খুচরো নিয়ে। টাকা গুনে নিয়ে এগুল বাবর। পেটের কাছে টনটন করে উঠল তার। একটা ঝোপ খুঁজে হালকা হলো। এখান থেকে মন্দিরের চূড়া খানিক দেখা যাচ্ছে। রোদ পড়েছে সূচাল মাথায়। ময়রার দোকানে থরে থরে সাজান চৌকো সন্দেশের চূড়ার মত।

জাহেদা ঠিকই বলেছিল। মন্দির দেখা, রংপুরে আসা, একটা উপায় মাত্র। সে এসেছে অন্য কিছুর লোভে। সেটা তার পাওয়া হয়ে গেছে। আর কী দরকার ? মন্দির থাক মন্দিরের ভিতে। আমি চলি।

বাবর বলল, হ্যাঁ চলি।

আমার সেই সাঁকো পেরিয়ে বাবর এলো গাড়ির কাছে। গাড়ির গায়ে মিহি ধুলোর পর্দা পড়েছে। কিন্তু জাহেদা নেই। গেল কোথায় ?

চারদিকে চোখ চালিয়েও জাহেদাকে কোথাও দেখা গেল না। তখন একটু উদ্বেগ হলো। আরে, এ যে দেখছি সত্যি সত্যিই রাগ করেছে। বাবর জিগ্যেস করল, পাশেই চায়ের দোকানে। তারা বলল, পথ দিয়ে হেঁটে গেছে। কোনদিকে ? পাকা সড়কের দিকে। মেয়েটা পাগল নাকি ? হেঁটেই রওয়ানা দিল ঢাকায় ?

বাবরের মনে হঠাৎ একরাশ স্নেহ ঝাঁপিয়ে পড়ল। না, সত্যি ছেলেমানুষ। এক মুহূর্তের জন্যে জাহেদাকে মনে হলো তার যেন ছোট্ট একটা মেয়ে। গাড়িতে বসে মোটর স্টার্ট দিল বাবর। এখানো পাশে জাহেদার ক্ষীণ সুবাস টের পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দর সুগন্ধ। সকালে জেগে উঠে মনে করতে না পারা স্বপ্নের মত।

খানিক দূরে যেতেই চোখে পড়ল জাহেদাকে। একটা কালভার্টের ওপর বসে আছে উল্টো দিক মুখ করে। তার পূর্ণ টানটান পিঠ দেখা যাচ্ছে কেবল। আর মাথায় একরাশ চুল। গাড়ি থামাল তার পাশে বাবর। মেয়েটা তবু মুখ তুলে তাকাল না। বাবর হর্ণ দিল। তন্ময়তা ভাঙ্গল না। তখন নেমে এলো সে গাড়ি থেকে। সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, জাহেদা।

উত্তর নেই।

রাগ করেছ ?

উত্তর নেই।

তখন বাবর বসল তার পাশে। আরেকটা সিগারেট ধরাল। টানতে লাগল নিঃশব্দে। না, সেও কথা বলবে না। তার কেমন যেন মজাই লাগছে এই ছোট্ট খেলাটুকু করতে।

সিগারেট শেষ হলে বাবর খুব কায়দা করে ছুঁড়ে দিল টুকরোটা। অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। ধোঁয়া উঠতে লাগল পাকিয়ে পাকিয়ে। অল্প বয়সী ছেলে একটা যাচ্ছিল, সে হঠাৎ দেখতে পেল তা। যেন পথ চলতে সোনা পেয়ে গেছে, খুশিতে সে তুলে নিল সিগারেটের টুকরোটা। তারপর কষে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

হাসল বাবর।

হাসছেন!

না, তোমাকে নয়। ঐ ছেলেটাকে দেখে।

আপনি আমাকে কী মনে করেন?

বলে এমন করে জাহেদা বাবরের দিকে তাকাল বাবর একটা হালকা উত্তর দিতে যাচ্ছিল; থমকে গেল। একেবারে নতুন লাগছে জাহেদাকে। নতুন চেহারা। অর্থটা যেন ভাল বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মনের মধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে। ভালবাসা? জাহেদা কি তাকে ভালবেসে ফেলেছে? একটা মানুষের ওপর জীবনের দায় দিলেই এমন দৃষ্টি ফুটে উঠে দু' চোখে।

না না। ভালবাসা নয়। আমি কাউকে ভালবাসি না। কাউকে না। ভালবাসা বিশ্বাস করি না। এ হতে পারে না। এ আমি চাই না।

বাবর মাথা দোলাতে লাগল।

অসম্ভব; হতে পারে না।

মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে পড়ে তার।

জাহেদা ফিরে তাকায়। জিগ্যেস করে, কী হতে পারে না?

কিছু নয়। আসলে কী জান, আমার একটা বস্তুর অভাব বড় বেশি। শুনবে?

জাহেদা তাকিয়ে থাকে।

বাবর বলে, ধৈর্যের অভাব।

বাবর মনে মনে বলে, না, আমাকে ফেরাতেই হবে। ভালবাসার সেই হাওয়া যদি বইতে থাকে, যদি সে বইতে দেয়, তাহলে তা ঝড় হয়ে দাঁড়াবে। কিছুতেই সে তা হতে দিতে পারে না। তাকে ফেরাতেই হবে।

বাবর ওর হাত ধরল। বলল, চল গাড়িতে যাই।

প্রায় টানতে টানতে গাড়িতে এনে বসাল তাকে।

সমস্ত কিছু ভেঙ্গে দেবার আক্রোশ ফুসতে থাকে বাবরের মনের মধ্যে। গাড়ি চালাতে চালাতে সে কথা খুঁজতে থাকে। এমন কথা, যা গুঁড়িয়ে দেবে ঐ হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করবার মিথ্যে সাঁকোটা।

বাবর হঠাৎ টের পায়, জাহেদা তার ঊরুতে একটা হাত রেখেছে। সে হাত আমন্ত্রণের নয়, আশ্রয় সন্ধানের।

আরো শঙ্কিত হয়ে ওঠে বাবর। জাহেদা তাকে ভালবেসে ফেলেছে।

তাই তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে মন্দির দেখা। এখন তার পৃথিবী কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছে বাবরকে ঘিরে। এ কী হলো? এ রকমটা তো সে চায়নি।

মেয়েটা কি আশা করেছে, এখন সে একটা প্রেমের গান গুন গুন করবে, না, রবি ঠাকুরের একটা কবিতা আবৃত্তি করবে, যেমন সব মেয়ে স্বপ্ন দেখে উপন্যাস আর সিনেমার কল্যাণে।

বাবর হঠাৎ বলে, শুনবে একটা কবিতা ?

মনে মনে আবছা একটা নিষ্ঠুরতা অনুভব করে বাবর।

শুনবে ?

জাহেদা মুখে কোনো উত্তর দেয় না। কিন্তু বোঝা যায়, শুনতে কোনো আপত্তি নেই তার। মনে মনে হাসে বাবর। ঠিকই সে ধরতে পেরেছে। জাহেদা প্রেমে পড়েছে তার। হ্যাঃ।

বাবর বলে, রবি ঠাকুরের শেষের কবিতায়— মনে আছে শেষের কবিতার কথা কাল না পরশু তোমায় বলছিলাম ?

হ্যাঁ।

সেই শেষের কবিতা যে কী করে গেল, কবিতা শোনান হয়ে দাঁড়াল একটা আচার।

আচার ?

আরে না, না, আমের, তেঁতুলের আচার নয়। তোমার বাংলা পড়া থাকলে জানতে এ আচার মানে তোমরা যাকে ইংরেজিতে বল রিচুয়াল।

ও।

আচ্ছা, একটা ইংরেজি কবিতাই শোনাই। ইংরেজি মানে ইটালিয়ান ভাষায় লেখা। সিজার পাভিসের। পড়েছি ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজিটা ভাল মনে নেই। বাংলা করে বলি।

খানিক চুপ করে থেকে মনে করে নেয় বাবর। গাড়ির কাচ তুলে দেয় একটু। বাতাস এত জোরে কাটছে যে কথা হারিয়ে যেতে চায়। বলে শোন, সিজার পাভিসের কবিতাটা এ রকম—

> সমস্ত কিছুতে হতাশ ঐ বুড়ো লোকটা
> তার ঘরের চৌকাঠে বসে
> দেখে চনমনে রোদে
> মদ্দা আর মাদি একজোড়া কুত্তা-
> তারা রক্তের নিয়মে খেলছে।

চোখ কালো করে তাকায় জাহেদা। বলে, কারা খেলছে ?

মদ্দা আর মাদি একজোড়া কুত্তা। কুকুর। ডগস্। রাগ কোরো না। ভাল কবিতা। আগে শোনাই তো।

> মদ্দা আর মাদি একজোড়া কুত্তা-
> তারা রক্তের নিয়মে খেলছে।
> ভন ভন করে মাছি বুড়োটার ফোকলা মুখে;
> বৌটা মারা গেছে বেশ কিছুদিন।
> সে, আর দশটা কুত্তির মত,
> জানতে চায়নি কিছু,

কিন্তু ছিল তার রক্তের নিয়ম।
বুড়োটা, তখনো তার দাঁতগুলো যায়নি,
এ ব্যাপারে পরম রসিক; রাত এলে বিছানায় যেত তাকে নিয়ে।
রক্তের নিয়ম, বড় সুন্দর।

জাহেদা বলে, থাক, শুনতে চাই না।

শোন, ভাল কবিতা। সিজার পাভিসের নাম শোননি ?

কোনো দরকার নেই।

বাবর সে কথার জবাব না দিয়ে মনে মনে অনুবাদ করে মুখে আবার আবৃত্তি করতে থাকে—

কুত্তার জীবনে এই একটা চমৎকার দিক—
অফুরন্ত স্বাধীনতা।
সকাল থেকে সন্ধে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান :
কখনো একটু আহার :
কখনো একটু ঘুম :
কখনো একটা মাদি কুত্তার সওয়ার হলুম—
রাত না দিন, বয়েই গেল!
শুঁকে দেখার স্বাভাবিকতায় সে চলে;
যা নাকে লাগে তাইই তার হয়ে যায়!

চুপ করুন। জাহেদা চেঁচিয়ে ওঠে না, মিনতি করে।

নিষ্ঠুরতা যেন আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাবরের মনের মধ্যে। স্নেহ, দয়া, ভালবাসা। হাঃ! এ কীসের মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে চায় তাকে জাহেদা ? জানে না, বাবরের জানা আছে কী করে বেরিয়ে আসতে হয়! বেরিয়ে সে আসবেই। ভালবাসার জন্যে জাহেদাকে সে আনেনি। বাবর বাঁচে এক মুহূর্ত থেকে পরের মূহূর্তে। ছেলেবেলায় টেলিগ্রাফের এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটিতে ছুটে যাবার মত। সেই ভাবনাহীন খেলার মত।

বাবর বলল, এখনো কবিতাটা শেষ হয়নি জাহেদা। বাকিটা শোন।

না।

শোন।

না, না।

বেশ, তবে আমি নিজেকেই শোনাচ্ছি। তোমার ইচ্ছে না হয়, তুমি শুন না। তুলো থাকলে কানে দাও।

আমার কাছে তুলো থাকবে কেন ?

মেয়েদের ব্যাগে তুলো থাকেই।

ভারি তো জানেন!

হ্যাঁ, মাসে মাসে তোমাদের দরকার হয় যে।

বাবর নিষ্ঠুর গলায় বলে। সব কিছু গুঁড়িয়ে দিতে চায় সে। তুচ্ছ করতে চায়। মেয়ে নয় তো, একটা চেন বাঁধা পশুকে যেন খাঁচাচ্ছে সে।

বাবর আবৃত্তি করে—

বুড়োটা ভাবে
একবার সেও ঐ কুত্তার মত
গমক্ষেতে করেছিল দিনের বেলায়।
এখন মনেও নেই কোন কুত্তির সাথে
কিন্তু মনে আছে
চড়া রোদ
দরদর ঘাম
আর অনন্ত অনন্ত পর্যন্ত করে যাবার ইচ্ছেটা।
অবিকল বিছানায় যেমন।
তাকে আবার অতীত ফিরিয়ে দিলে
সে করবে একমাত্র গমক্ষেতে, দিনের বেলায়।

পথ চলতে চলতে
এক মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে গেল দেখতে।
মুখ ঘুরিয়ে গেলেন এক পাদ্রী!
রাস্তায় যা খুশি হয়!
এমনকি এক মহিলা—
পুরুষ দেখে চোখ নামান যিনি—
তিনিও দাঁড়িয়ে গেছেন দেখতে।
কিন্তু বালক,
ধৈর্যের অভাববশত
সে ছুঁড়তে লাগল ঢিল।
বুড়োটা ক্ষেপে গেল।

আবৃত্তি শেষে হা হা করে হেসে উঠল বাবর। আবার বলল, বুড়োটা ক্ষেপে গেল। কেন ক্ষেপে গেল জান জাহেদা? কারণ, সে বুড়ো হয়েছে, তার নিজের এখন সাধ থাকলেও সাধ্য নেই।

জাহেদা একবার দু'হাতে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করল নিজের। দুঃখে! কবিতার শৈলী সে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না। তার ভীষণ কষ্ট হয়, বাবর কেন বেছে বেছে এই কবিতা শোনাল তাকে।

বাবর বলল, রাস্তায় ঘটনা কী হচ্ছিল জান? ঐ যে কবিতায়, যা দেখে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে, এমনকি পাদ্রীটাও! একটা কুত্তা আর একটা—

চুপ করুন।

বাবর একটু থেমে ঘোষণা করল, সিজার পাভিস ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট। আমি কবি হলে ওর সব কবিতা অনুবাদ করে বই বের করতাম।

সাঁ করে গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাল বাবর।

এখানটা নির্জন। দু'পাশে আখের খেত। রোদে আকাশ পুড়ে যাচ্ছে। বিশ্বের স্তব্ধতা এখানে উপুড় হয়ে আছে।

গাড়ি থামতে দেখে জাহেদা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কী বলবার জন্য রক্তিম ঠোঁট তার কেঁপে উঠল একবার।

হাঃ

বাবর তাকে হঠাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, শক্ত করে বেঁধে, গ্রাস করে নিল জাহেদার ঠোঁট। আর জাহেদা তাকে দু'হাতে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল পাগলের মত। চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু পারল না। তখন চোখ বেয়ে উষ্ণ অশ্রু হঠাৎ অবিরল ধারায় পড়তে লাগল তার।

ঠোঁট দিয়ে সে অশ্রুর স্বাদ নিতে নিতে বলল, চল ডাকবাংলোয় যাই। আমি আরেক বার তোমাকে ভালবাসতে চাই। ইংরেজিতে কথাটার যে আরেক মানে আছে, তাই, তাই আমি চাই।

২২

ঘরে ঢুকেই জাহেদাকে কোলে তুলে নিল বাবর। তারপর সোজা বিছানায় নিয়ে ফেলে দিল তাকে। ধপ করে পড়ল সে গরমকালের পাকা ফলের মত। ব্যথা করে উঠল পিঠে। কিন্তু বাবরের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন শক্তিশূন্য মনে হলো তার নিজেকে। মনে হলো কোনোদিন এই লোকটাকে সে দেখেনি।

বাবর যেন রাসায়নিক একটা পরীক্ষা করতে লেগেছে বকযন্ত্র নিয়ে; কিংবা ডাক্তার সে, এক্ষুণি করবে কারো দেহে অস্ত্রোপচার; অথবা ডাকাত, তোরঙ্গ খুলে লুণ্ঠিত সম্পদ দেখবে।

বাবর শার্টের হাত বোতাম খুলল। গোটাল যেমন খেলোয়াড় মাঠে নামবার আগে গোটায়। সামনের কয়েকটা বোতাম তারপর। পাশে বসল জাহেদার। বসে, জাহেদাকে

ঘুরিয়ে উপুড় করে দিল সে।

তীব্র প্রতিবাদ ঠেলে বেরুতে চাইছে জাহেদার ভেতর থেকে। কিন্তু অবাক হয়ে গেল সে নিজেই, একটা কথা বেরুল না। বরং যেন, নিজেকে প্রস্তুত করছে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আপন মৃত্যুর জন্যে, ঠিক যেমন হরিণ শিশুর সম্মোহন হয় অজগরের ধ্বক ধ্বক হাসি-হাসি চোখের সামনে।

জাহেদাকে উপুড় করে তার পিঠের বোতামগুলো খুলে ফেলল বাবর। অবিকল সপ্তর্ষির মত কয়েকটা তিল তার পিঠে। বাবর সেই তিলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিল একবার। তারপর কাঁধ ধরে তাকে তুলে বসিয়ে জামা খুলে জামাটা ফেলে দিল মেঝেয়। জাহেদা দু'হাতে বুক ঢেকে মুখ নিচু করে বসে রইল। বাবর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জামা খুলে ছুঁড়ে মারল মেঝের পরে। নিজের জামা ঢেকে দিল জাহেদার জামা। তারপর বাবর জাহেদার দু'পা ধরে ওপরে তুলে ফেলল এক ঝটাকায়। আর তার টাল সামলাতে না পেরে জাহেদা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। পড়েই সে উপুড় হয়ে গেল বুক ঢাকতে। লোকে যেমন করে মুরগির পা ঝুলিয়ে চামড়া খসিয়ে নেয়, তেমনি করে বাবর একটানে খুলে ফেলল তার পাজামা। পা ছেড়ে দিয়ে এবার পিঠে ছোট জামার হুকে হাত দিল বাবর। হুক খুলে আনবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাকে সোজা করে দু'হাত একে একে ফিতে থেকে মুক্ত করে বাবর নিজের ট্রাউজার খুলল। বেরিয়ে পড়ল নীল অন্তর্বাস। এক বন্ধু বিলেত থেকে এনে দিয়েছিল। হঠাৎ তার কথা মনে পড়ল একবার। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। অন্তর্বাসটা ছুঁড়ে ফেলল সে নিজের বিছানায়।

জাহেদা।

উত্তর দিল না জাহেদা।

জাহেদা।

জাহেদা বালিশে মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়েই রইল।

জাহেদা।

এবার বাবর তাকে ঘুরিয়ে সোজা করে দিল। কাঁচির মত দু'পা করে শুয়ে রইল জাহেদা। একটা হাত চোখের পরে রাখা— কনুয়ের ত্রিভুজ ঠিক ভুরুর মাঝখানে।

আমাকে দ্যাখ জাহেদা।

অপেক্ষা করল বাবর।

আমাকে দ্যাখ।

আরো অপেক্ষা করল সে।

দ্যাখ আমাকে।

বাবর আর অপেক্ষা করল না। দু'হাতে সরিয়ে দিল জাহেদার চোখ থেকে হাতের শাদা ত্রিভুজ।

জাহেদা চোখ বুজল।

তখন তার বুকে হাত রাখল বাবর।

তোমার শরীরে পদ্মকাঁটা দিয়েছে।

বাবর একবার বুক থেকে বাম উরু পর্যন্ত হাত বুলিয়ে আনল জাহেদার। আবছা লাল একটা দাগ পড়ে গেল সেখানে। বাবর তাকিয়ে রইল, কখন মিলিয়ে যায় দাগটা।

মিলিয়ে গেল। তখন বাবর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নিচে জাহেদার শরীর নিয়ে।

বলল, পাথর হয়ে থেক না।

জাহেদার কানে শুধু বাথরুম থেকে অবিরাম ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়বার শব্দ। বাবরের কথা শুনতে পেল না সে, কিন্তু শরীর যেন শিথিল হয়ে এলো হঠাৎ। বাবর বলল, লক্ষ্মী মেয়ে।

তারপর ভেতরে যেতে যেতে সে আবার বলল, আজ সারা বিকেল সারা রাত আমরা কোথাও যাব না' শুধু ভালবাসব।

এবার একেবারে ভেতরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাবর শুধু বলল, কাল ঢাকা যাব। কাল ভোরে।

২৩

সারাপথ প্রায় একটা কথাও হয়নি দু'জনের। পীচের পরে মোটরের চাকার শব্দ, বাতাসের শব্দ ফেরিতে জলের ছলছল আর বাজারে মানুষের কোলাহল।

কিন্তু সে স্তব্ধতাও ছিল যেন ভারশূন্য। গাড়ি যতই ঢাকার কাছে আসছে ততই যেন গুরুভার হয়ে উঠছে এই স্তব্ধতা।

নয়ার হাট ফেরি পার হল ওরা।

বাবর বলল, আর ফেরি নেই। এই ছিল শেষ। এবার সোজা ঢাকা।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সোয়া পাঁচটা বাজে। শীতের ছোট্ট দিন। এরি মধ্যে মলিন হয়ে আসছে বেলা। খেতের পরে এখানে সেখানে ধোঁয়া আর কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। দূরের গাছপালা এরি মধ্যে অস্পষ্ট গম্ভীর।

সত্যি কাল সারা বিকেল সারা সন্ধে বাবর ডাকবাংলো ছেড়ে বেরোয়নি। এমনকি ঘর ছেড়ে পর্যন্ত নয়। চৌকিদার খাবার এসে দিয়েছে। প্রণব বাবু এসেছিলেন একবার। তাকে প্রায় ধুলোপায়েই বিদায় করে দিয়েছে বাবর।

এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম গল্প করে যাই।

জাহেদার শরীরটা ভাল নেই।

বাবর মিছে কথা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রণব বাবু বলে উঠেছিলেন, ও তাই বুঝি। সুষমাকে পাঠিয়ে দিই।

না, না, তার দরকার হবে না।

বলেন কী মশাই। আমাদের দেশে এসে অসুখ হবে, সেবাযত্ন পাবে না! ওকী কথা!

অনেক ধন্যবাদ। আপনি কিছু ভাববেন না। কাল দুপুরে আসবেন, মেলা গল্প করা যাবে।

বাবর ভাল করেই জানত, কাল দুপুরে সে থাকবে ঢাকার পথে। বগুড়ার কাছে এসে আজ একবার প্রণব বাবুর কথা মনে হয়েছিল তার। কিন্তু তার চেয়ে বেশি মনে পড়ছিল সুষমার ছায়া-ছায়া মুখখানা।

এরি মধ্যে জাহেদা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে বাবর। নতুন কোথাও যাবার জন্যে মনের মধ্যে পাখা ঝাঁপটাচ্ছে। সুষমার মত কারো জন্যে। সুষমাকে বেশ লেগেছে তার। সুষমার কথা বলতে গেলে সারাদিনই থেকে থেকে মনে পড়েছে তার। শিস দিচ্ছিল প্রায় সারাটা পথে বাবর।

জাহেদাকে এখন হোস্টেলে ফিরিয়ে দিলে বাঁচে সে।

জাহেদা যে সারা পথ চুপ করে আছে, এটা যেন ভাগ্যের কথা। কথা পর্যন্ত বলতে ইচ্ছে করছে না আর বাবরের। নিজেকে মনে হচ্ছিল তার ঐ লরী ড্রাইভারদের মত বড় বড় ট্রাকে করে মাল নিয়ে জেলা থেকে জেলা যাচ্ছে খালাস করতে। ফেরিতে বসে পান খাচ্ছে, সস্তা সিগ্রেট টানছে। রোদে পুড়ছে ত্রেপল ঢাকা বস্তার সার, বাক্সের স্তূপ। কোনো আবেগ নেই, ভবিষ্যতের দায় নেই। নিয়ে চল, ফেলে দাও। হাঃ।

কিন্তু এই যে এতক্ষণ সত্যি সত্যি চুপ করে আছে জাহেদা, এটা এখন ধীরে ধীরে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভাবছে কী মেয়েটা ?

বাবর একবার আড়চোখে তাকাল জাহেদার দিকে। না, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যে মেয়েকে সে নিয়ে এসেছিল সে যেন অন্য কেউ।

সত্যি সত্যি তাকে ভালবেসে ফেলেছে নাকি ? ভাবছে নাকি বিয়ের কথা! অত বড় বড় বক্তৃতা দিলাম যাবার পথে, সব পানিতে গেল!

শেষে আর থাকতে পারল না বাবর। নীরবতা ভেঙ্গে বলল, কি, একেবারে চুপ করে আছ যে!

জাহেদা চমকে তাকাল তার দিকে। এতক্ষণ পর শব্দগুলো যেন হাততালি দিয়ে পায়রা উড়িয়ে দিল হঠাৎ।

বাবর আবার বলল, পথে এত সাধাসাধি করলাম কিছু খেলে না পর্যন্ত। কী হয়েছে ?

জাহেদা তবু কিছু বলল না।

বেশ, নাই বললে কথা।

বাবর ঘাড় কাত করে গাড়ি চালাতে লাগল। শিস দেবার চেষ্টা করল একবার, কিন্তু হলো না। ভালই লাগল না।

জাহেদা পরেছে কালো রংয়ের পাজামা, আর শাদা জামা। বোধহয় তারি জন্যে মুখ

দেখাচ্ছে কেমন পাণ্ডুর। একবার একটু মায়া করে উঠল বাবরের মনটা। পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেলে দিল সে। ঢাকায় গিয়ে বাবলিকে আবার দেখতে হবে। বাবলি রাগ করলেও, রাগ তো আর হিমালয় নয় যে আছেও, থাকবেও।

হঠাৎ জাহেদা তাকে ডাকল. শুনুন।

আমাকে বলছ।

হ্যাঁ।

কী বল।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে ?

কেন, ঢাকায়। এই তো এসে গেলাম। আর এক ঘণ্টা। তার পরই তুমি পৌঁছে যাবে তোমার হোস্টেলে। গেট খোলা পাবে তো ? ক'টায় যেন বন্ধ হয়।

না।

কী, না ?

হোস্টেলে যাব না।

হেসে উঠল বাবর। বলল, তার মানে ?

জাহেদা কোনো জবাব দিল না সে প্রশ্নের।

বাবর আবার জিগ্যেস করল, তাহলে যাবে কোথায় ? কোনো বান্ধবীর বাড়িতে ? ঠিকানা বল তবে ?

না।

কী, না ? ঠিকানা বলবে না ? না, বান্ধবীর বাড়িতে যাবে না ?

কারো বাড়িতে যাব না।

দুষ্টুমি করছ ?

না।

সত্যি বলছ ?

হ্যাঁ।

তাহলে কোথায় যাবে শুনি ?

আপনার বাসায়।

আমার বাসায় ?

হ্যাঁ, আপনার বাসায়।

ছেলেমানুষ!

কেন ?

আমার বাসায় কী করে যাবে ?

যে করে আপনার সঙ্গে রংপুর গেলাম।

বলে জাহেদা সরাসরি তাকাল বাবরের দিকে। সে চোখের দৃষ্টি একরোখা নয়, কম্পিত— যেন দৃষ্টি জোড়া পেছনে পালিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনো পড়েনি বাবর। কিন্তু কোনোদিন কোনো কিছুই বাবরকে অপ্রস্তুত করতে পারেনি। বাবর কথা খোঁজার সময় নিতে হেসে উঠল। হাসির অবসরে ভাবতে লাগল, কী বলে।

বলল, রংপুরে গিয়েছিলে গাড়ি করে। গাড়ি করে আমার বাড়িতে অবশ্যই ফেরা যায়। কিন্তু ফিরতে পারা আর ফিরে যাওয়া কি এক কথা?

আমি কিছু বুঝি না।

জাহেদা জেদি মেয়ের মত মাথা নাড়তে লাগল ক্রমাগতঃ।

আমি কিছু বুঝি না।

তুমি ছেলেমানুষ।

আমাকে নিতে চান না আপনার বাড়িতে?

নেব না কেন, যখন খুশি আসতে পার। কিন্তু এখন তুমি যাবে হোস্টেলে।

না।

আমি তোমাকে হোস্টেলে নিয়ে যাচ্ছি।

না।

হ্যাঁ।

না।

সন্ধে হবে এক্ষুণি। ঘরে যাবে, লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়বে। আর যদি চাইনিজ খেতে চাও, পথে থামতে পারি।

না।

বাববার না বলছ কেন?

আপনি আমাকে ফেলে যাচ্ছেন।

বলেই জাহেদা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। মাথা নামিয়ে নিল। ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার সারা দেহ। কান্নার শব্দ প্রবল হয়ে উঠল।

গাড়ি চালিয়ে চলল বাবর। সাভারের বাজার পেরিয়ে গেল এক্ষুণি। সট্ সট্ করে সরে গেল দোকানের ন্যাংটো বিজলি বাতিগুলো।

জাহেদার কান্না থামল না।

তখন ভীষণ রাগ হলো বাবরের। সে একটা সিগারেট ধরাল। শব্দ করে ফোঁস ফোঁস করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল সে। ইচ্ছে করতে লাগল এখুনি কোথাও নামিয়ে দেয়।

না, কিছুতেই সে প্রশ্রয় দেবে না। তার কেউ নেই। কেউ হবেও না কোনোদিন। মানুষের যত জ্বালা এই মানুষে মানুষে অন্ধ বন্ধন থেকে।

হাঃ। খেলারাম।

চোখে স্পষ্ট দেখতে পায় দেয়ালে সেই অপটু হাতে বড় বড় করে লেখা— খেলারাম খেলে যা।

এই তার দর্শন, এই তার সত্য।

হঠাৎ যেন দম আটকে মরে যাচ্ছে এমনি শব্দ করে উঠল জাহেদা। যাক, মরে যাক।

না, আর পারা যাচ্ছে না। কান্না তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বাবর সাঁ করে গাড়ি পাশে নিয়ে থামাল।

একদিকে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ মাঠ। আরেক দিক কাঁঠাল বন। কোথাও কেউ নেই। যেন এ গ্রাম ছেড়ে সমস্ত লোক কোথায় কবে চলে গেছে। এমনি যেন কবে, কোন অতীতে একবার দেখছিল বাবর— এমনি স্তব্ধতার মাঠ বন ভেঙ্গে সে হেঁটে যাচ্ছিল একদিন।

বাবর সিগারেট পিষে ফেলে জিগ্যেস করল, এখন বল, কাঁদছ কেন ?

জাহেদা মাথা নাড়ল। সেটা তার কথার উত্তরে নয়, কান্নার অভিঘাতে।

বেশ, তবে কাঁদ। যখন থামবে, তখন ব'ল, পৌঁছে দেব।

আপনাকে দিতে হবে না পৌঁছে।

জাহেদা দড়াম করে গাড়ির দরোজা খুলে বেরুল।

আরে, দেখ, দেখ, পেছনে গাড়ি আসছে কিনা।

কিন্তু ততক্ষণে জাহেদা রাস্তা পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। বাবরের একবার ইচ্ছে হলো, ফেলেই চলে যায়। জানে সেটা এক অসম্ভব অবাস্তব ভাবনা; কিন্তু মনের মধ্যে তাই নিয়েই খানিক নাড়াচাড়া করল সে।

তারপর সেও বেরুল। যতটা জাহেদাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে, তারচেয়ে বেশি শরীর হালকা করতে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে কাঁঠাল বনে নেবে একটা গাছ পছন্দ করে প্রস্রাব করল। তারপর যখন শেষ হলো তখন চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে জাহেদা দূরে একটা গাছের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবর কাছে গিয়ে বলল, মেয়েদের এই সিনেমার ভঙ্গিগুলো আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

কী বললেন ?

জাহেদা ফিরে তাকাল তার দিকে। না, সে চোখে অশ্রু নেই। কখন সে মুছে ফেলেছে, কিংবা শুকিয়ে গেছে। পড়তি বেলায় ম্লান আলোয় লাল অঙ্গারের মত দেখাচ্ছে সে মুখ।

সত্যি কথা শুনবে ? বাবর তাকে বলল।

বলুন।

তুমি যা করছ তা ছেলেমানুষেও করে না।

বারবার আমাকে ছেলেমানুষ বলার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে ?

বাবরের মনে হলো গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় মেয়েটার। কিন্তু তার বদলে সে হেসে ফেলল, অধিকার দেবার প্রশ্ন নয়। প্রমাণ করছ তুমি। নইলে বলতে না যে তোমাকে ফেলে যাচ্ছি। নইলে, এভাবে গাড়ি থেকে নামতে না এখানে।

মনে করেছেন, আমি খুব বিপদে পড়েছি ?

না।

ভেবেছেন, আপনি আমাকে কিনে ফেলেছেন ?

তাও না।

আমাকে যা খুশি তাই করতে পারেন ভেবেছেন ?

তেমন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি কি ?

কী হইছে ভাইসাব ?

পেছনে হঠাৎ মানুষের গলা শুনে ফিরে তাকায় বাবর। দ্যাখে তিনটে লোক। হাতে লম্বা ছুরি, আর একরাশ কাঁঠাল পাতা। বোধহয় ছাগলের জন্যে কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

মাঝখানের যুবক আবার প্রশ্ন করে, হইছে কী ভাইসাব কন না ?

কী চাও তোমরা ? বাবর জিগ্যেস করে।

কিছু না। একগাল হেসে বাঁ পাশের যুবক বলে, সোর শুইনা মনে করলাম কাইজা লাগছে। তাই জানবার আইলাম।

কিছু নয়, যাও তোমরা।

তখন ডান পাশের যুবক বলল, আরে, পিকনিকে গেছিল বোধ করি পিরীতের মানুষ লইয়া, ফেরনের পথে আকাম করতে চায়।

মাইয়াডাও মন্দ না।

বাবর হঠাৎ টের পায় সন্ধে হয়ে গেছে। দূরের কিছু ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। কোথা থেকে আজান ভেসে আসছে। আর সরসর করে বাতাস বইছে কাঁঠাল গাছের পাতায় পাতায়।

বাবর বলল জাহেদাকে, কি যাবে না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে ?

নারে মাইয়া যাইবার চায় না।

মাঝের যুবককে ঠেলা দিয়ে মন্তব্যটা করল বাঁ পাশের যুবক। তখন সে বলল, হ, লাগে যেমুন তাই।

ডান পাশের যুবক বলল, চল যাইগা। শহুরা মানইষের তামশা দেখন লাগবো না।

বাবর বলল জাহেদাকে, চল।

বলে হাত বাড়িয়ে দিল জাহেদার দিকে। হঠাৎ সে হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল বাঁ পাশের যুবক।

কই লইয়া যান। দরকার হয়, ছেড়িরে আমরা পৌছাইয়া দিমু।

কিছু বোঝার আগেই বাবরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। বাধা দেবার আগেই গায়ে এসে পড়ে মারের পর মার। আর অন্যজন চেপে ধরে জাহেদার মুখ। আরেকজন ফিসফিস করে বলে ওঠে, এই শালারে তুই ধইরা রাখ। আমরা কাম সাইরা লই।

বাবরকে যে মার দিচ্ছিল, ততক্ষণে বাবরের ওপর চড়ে বসেছে। সে এবার বলে, আর আমি, আমারে ভাগ দিবি না?

আমরা আগে লই, তারপর তুই লইস।

জাহেদাকে ওরা নিয়ে যায় কোলের মধ্যে ছাগলের বাচ্চার মত। সমস্ত ঘটনা ঘটে মাত্র আধ মিনিটে। কিংবা তারো কম সময়ে। চোখের একটা মাত্র পলকে। এর জন্যে তৈরি ছিল না বাবর। কিন্তু আর্শ্চয, তার কোনো দুঃখ হচ্ছে না, রাগ হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে, এই-ই দরকার ছিল। মনে হচ্ছে, জাহেদার হাত থেকে সে এবার অতি সহজে বাঁচতে পারবে। তার হাসি পেল ভেবে যে লোকটা অহেতুক তাকে এত শক্ত করে ধরে রেখেছে। তাকে ছেড়ে দিলেও, সে চেঁচাবে না, পালটা আক্রমণ করবে না।

যুবক আরো দু' চারটে ঘা লাগায় বাবরকে। বুকের ওপর ঘোড়ার মত চড়ে আছে। সে হঠাৎ একটু পাছা আলগা করে আবার সর্বশক্তিতে ধপ করে বসে পড়ে। ঘোঁৎ করে আওয়াজ ওঠে বাবরের। যুবক বলে, শালা, রসের ছেড়ি লইয়া বাইরইছ। একা খাইয়া বাড়ি যাইবা। ভাগ দিয়া যাইবা না সোনার চান।

আবার একটা ঘুষি লাগায় সে বাবরের গলার নিচে। খ্যাক করে থুতু ফেলে বলে, একটা আওয়াজ করবা কি জবাই কইরা ফালামু। ফিলিম স্টার হুসনার লাহান ছেড়ি পাইছি, ছাইরা দিমু না। সাতবার লমু। সামনে পিছনে সাতবার। একেকজন শালার ব্যাটা শালা। টাউনে তোমরা ফুর্তি করো। আর আমরা শালায় ছাগলের পাতা কাইটা মরি।

আবার একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় সে বাবরের কণ্ঠার হাড়ে। তারপর ঘাড়ের গামছা দিয়ে মুখ বাঁধতে থাকে। চোখের সামনে যেন অন্ধকার হয়ে আসে সব বাবরের। সে কোথায় আছে, কেন আছে, সমস্ত বোধ হারিয়ে যেতে থাকে তার। একবার যেন মনে হয়, জন্ম থেকে অনন্তকাল এমনি করে শুয়ে আছে সুদীর্ঘ শীতের মধ্যে অন্ধকার কাঁঠাল বনে এই লোকটাকে বুকে পাথরের মত নিয়ে।

সমস্ত অন্ধকারটাই যেন পাথরের মত চাপ বেঁধে আসে তার চারপাশে। ক্রমশ এগিয়ে আসে। হৃদপিণ্ডের শব্দ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে আসে। যেন আর কোনো শব্দ নেই পৃথিবীতে, এই কাছে অথচ দূরে, ভেতরে কিন্তু বাইরে, দেখা তবু না দেখা জীবন স্পন্দনের জয়ঢাক ছাড়া।

হঠাৎ সমস্ত শব্দ আর অন্ধকার ছিঁড়ে আর্তনাদ ফেটে পড়ে জাহেদার।

বা—বা।

বাবরের মনে হলো, স্পষ্ট সে শুনতে পেল কোনো বালিকা তার ছোট্ট জীবনের কার্নিশে দাঁড়িয়ে অতল গহ্বরে পড়ে যাওয়া থেকে পায়ের নখে সর্বস্ব আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে একবার ডেকে উঠল।

দা — দা।

কোথা থেকে দানবের মত শক্তি এলো বাবরের। এক ধাক্কায় বুকে চেপে বসে থাকা লোকটাকে ফেলে দিয়ে সেই আর্ত চিৎকারের দিকে দৌড়ুল সে। চিৎকার করতে করতে দৌড়ুল, হাসুন, হা-স-নু-উ।

দা–দা! আ-আ-আ!

হা-সু। ভয় নেই হাসু— উ।

নিচু গাছের ডালে ডালে ছড়ে যেতে লাগল বাবরের মুখ, হাত, কাঁধ। সে তবু দৌড়ুতে লাগল। আর বুক ফাটা ডাক দিয়ে খুঁজতে লাগল মেয়েটাকে।

বোনকে ফেলে আর কোনোদিন বাড়ি যাবে না বাবর।

তার বাড়ি আছে। বাড়িতে সবাই আছে। হ্যাঁ, সব তার আছে। আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

খুঁজে পায় বাবর। একজন জাহেদার মুখ চেপে ধরে আছে, আরেকজন উলংগ হয়ে জাহেদার শরীরের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। বাবর লাফিয়ে পড়ে তাদের ওপর। দু' কনুয়ে সরিয়ে দেয় দু'জনকে। আর জাহেদার হাত ধরে টানতে টানতে বলে, হা–সু, হা–সু, আয়।

কিন্তু ততক্ষণে পালটা আক্রমণ করে তাকে দু'জন। আর ছুটে এসে যোগ দেয় তৃতীয় জন। বাবর চিৎকার করে বলতে থাকে, সরে যা, হাসু, পালিয়ে যা, পালা, পালা! হাসু, তোকে আমি বাঁচাব। ভয় নেই হাসু।

হঠাৎ মনে হয় পিঠের ভেতর গরম আগুনের হলকা বয়ে গেল। বাবরের শরীর একমুহূর্তের জন্য শিথিল হয়ে আসে। অনেকটা মদ এক ঢোকে খেলে যেমন গা ঘুলিয়ে ওঠে ঝাঁকিয়ে ওঠে, তেমনি করে ওঠে শরীর।

জাহেদা বিস্ফারিত চোখে দেখে, বাবরের পিঠে ওরা ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সে চিৎকার করে পিছিয়ে যায় একবার, তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বাবরকে। ছুরিটা টেনে বের করে। আর লোক তিনটে দাঁড়িয়ে থাকে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে।

বাবর জাহেদার হাত ধরে টানতে টানতে দৌড়ুতে দৌড়ুতে বলে, চল হাসু, চল, চল চলে আয়।

জাহেদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাকে মাটির ওপর হেঁচড়ে টেনে নিতে নিতে বাবর বলে, হাসনু আয়। হাসু আয়।

কিন্তু শরীরের সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে। জাহেদাকে আর টানতে পারছে না বাবর। সে তখন কোলে তুলে নেয় তাকে। মুখে চুমো দিয়ে টলতে টলতে ছুটতে ছুটতে বলে, ভয় নেই হাসু, আমি এসে গেছি হাসু, আমি এসে গেছি।

গাড়ির কাছে এসে পৌঁছায় বাবর।

কোনো রকমে গাড়ির দরোজা খুলে জাহেদার অচেতন দেহটা ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে সে

এঞ্জিনের চাবিতে হাত রাখে।

দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

চাবি ঘোরায় বাবর।

লাফিয়ে ওঠে এঞ্জিন। গর্জন করে ওঠে ক্রুদ্ধ এক শ্বাপদের মত। তারপর ছুটে বেরিয়ে যায় সমুখের দিকে।

বাবর স্বপ্নাবিষ্টের মত বলে, হাসু, তোকে আমি ফিরিয়ে এনেছি। আর ভয় নেই। বাড়ি এসে গেছি।

গাড়ির আলোয় সামনে অন্ধকারে তীব্র চলমান দু'টি শুভ্র স্রোতের মধ্যে কখন তার নিজের বাড়ি ঘূর্ণিপাকে নৌকার মত ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসবে তারই অধীর অপেক্ষায় গতি আরো বাড়িয়ে দেয় বাবর।

কর্ণ নদীর পুলের ওপর উঠতে মনে হয় আকাশের ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর উদ্দেশে সে ধাবিত।

হঠাৎ তার গাড়ি পুলের শেষ থামে ধাক্কা খেয়ে ডান দিকে ঘুরে যায় একবার। তারপর সেই নক্ষত্র প্রতিফলিত নদীতে গড়িয়ে পড়ে জাহেদাকে নিয়ে, বাবরকে নিয়ে। আরো একজন ছিল, সে হাসনু।

ঢাকা ও লন্ডন